অবিস্মরণীয়া

ইতিহাসের পথে-প্রান্তরে

নারায়ণ সান্যাল

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৬৫

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বাংলা কথাসাহিত্য-তথা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাহিত্যসম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আদিমার্দঙ্গিকেষু—

বন্দিনী বাঙলা গদ্যরীতিকে তুমি টুলো-পণ্ডিতদের অবরোধ থেকে মুক্ত করে আমাদের দাদু-দিদার অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিলে। নবজীবন দান করেছিলে তাকে। তুমিই রচনা করেছিলে সাধারণবোধ্য সহজ ভাষায় প্রথম বাঙলা উপন্যাস। সেটা কি নিতান্তই ঘটনাচক্রে ঐতিহাসিক রসমণ্ডিত ?

তা হোক বা না হোক, ইতিহাস নির্যাসজড়িত কাহিনী রচনা করতে বসলে আজও বাঙলা কথাসাহিত্যিক তোমাকেই আদি-মার্দঙ্গিকরূপে প্রণিপাত করে।

ইতিহাস-আশ্রয়ী উপাচারে পূজাবিধির এটাই গণেশ উপাসনা। 'হে অতীত কথা কও' প্রার্থনামন্ত্রে যে কাহিনীগুচ্ছের দুটি অর্ঘ্যমালিকা সাজিয়েছি তার প্রথমটি তাই তোমার শ্রীচরণারবিন্দে উৎসর্গ করতে চাই।

আশীর্বাদ কর পদস্পর্শ করে তোমাকে প্রণাম করার সুয়োগ লাভের আগেই আমি যেন আমার 'মা'কেও কাশীনরেশের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে পারি—আমার লেখা শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাসের বন্দিনী-জননী : রূপমঞ্জরীকে।

[প্রকাশের ক্রম অনুসারে সাজানো। A-R গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচক। নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে : A শিশু ও কিশোর সাহিত্য; B সদ্যসাক্ষর সাহিত্য; C না-মানুষ সংক্রান্ত, D বিজ্ঞান-আশ্রয়ী; E চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য; F ভ্রমণ সাহিত্য; G স্মৃতিচারণধর্মী; H মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী; I প্রয়োগবিজ্ঞান; J গোয়েন্দা গল্প; K গবেষণাধর্মী; L উদ্বাস্তু সমস্যা-আশ্রয়ী; M ইতিহাস-আশ্রয়ী; N জীবন-আশ্রয়ী; O দেবদাসী সম্পৃক্ত; P নাটক; Q সামাজিক উপন্যাস; R সংকলনগ্রন্থ।

* চিহ্নিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না, লেখকের ইচ্ছানুসারে পুনর্মুদ্রণ হবে না।

চিহ্নিত বই যুক্তাক্ষর-বর্জিত; নিতান্ত শিশুদের জন্য।

Ψ দে'জ পাবলিশিং প্রকাশনা।]

* 1. মুশকিল আসান P
2. বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প L
3. বল্মীক L
* 4. গ্রাম্যবাস্তু B
5. পরিকল্পিত পরিবার B
6. বাস্তুবিজ্ঞান I
7. ব্রাত্য Q
* 8. দশে মিলি B
9. মনামী H/Q
Ψ10. অরণ্যদণ্ডক L/Q
Ψ11. দণ্ডকশবরী F/Q
12. Handbook of Estimating I
13. অলকনন্দা Q
14. মহাকালের মন্দির M/Q
Ψ15. নীলিমায় নীল Q
Ψ16. পথের মহাপ্রস্থান F/K
17. সত্যকাম Q
Ψ18. অন্তর্লীনা H/Q
19. অজন্তা অপরূপা E/F/K
Ψ20. তাজের স্বপ্ন Q/H
Ψ21. নাগচম্পা J/Q
Ψ22. নেতাজী রহস্য সন্ধানে K/F
Ψ23. 'আমি নেতাজীকে দেখেছি' N
Ψ24. পাষণ্ড পণ্ডিত Q
Ψ25. কালোকালো A
26. শার্লক হেবো A
Ψ27. জাপান থেকে ফিরে F/M/K
28. আবার যদি ইচ্ছা কর Q/N
29. কারুতীর্থ কলিঙ্গ E
Ψ30. গজমুক্তা C/Q/K
31. 'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' N/Q
Ψ32. বিশ্বাসঘাতক D/Q/K
33. হে হংসবলাকা D/K
Ψ34. সোনার কাঁটা J
Ψ35. মাছের কাঁটা J
36. অশ্লীলতার দায়ে Q/K
Ψ37. লালত্রিকোণ K/Q
Ψ38. আজি হ'তে শতবর্ষ পরে D
39. অবাক পৃথিবী D/Q
40. নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা D/Q
Ψ41. পঞ্চাশোর্ধ্বে G/R/N
Ψ42. পথের কাঁটা J
Ψ43. চীন-ভারত লঙ মার্চ K/M
44. হংসেশ্বরী M/N/Q
45. প্যারাবোলা স্যার Q
46. ঘড়ির কাঁটা J
Ψ47. কুলের কাঁটা J
48. আনন্দস্বরূপিণী M/N/Q
Ψ49. লিভবার্গ N/M/Q
50. তিমি-তিমিঙ্গিল C/K/Q
51. কিশোর অমনিবাস A
* 52. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন E/K
* 53. গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা I
* 54. গ্রামের বাড়ি I

55. অরিগামি A/K
56. লা-জবাব দেহ্‌লী
অপরূপা আগ্রা E/K
Ψ57. না-মানুষের পাঁচালী C
58. সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম O/Q
59. সুতনুকা কোন দেবদাসীর
নাম নয় O/Q
Ψ60. রাস্কেল A/C
61. Immortal Ajanta E/F/K
62. Erotica in Indian
Temples E/K
Ψ63. রোদ্যাঁ N/M/E/K
Ψ64. ষাট-একষট্টি G
65. মিলনান্তক Q
Ψ66. নাক উঁচু A/P
Ψ67. ডিজনেল্যাণ্ড A/F
68. উলের কাঁটা J
Ψ69. লাডলিবেগম M/N/Q
70. পুরবৈয়াঁ Q
Ψ71. প্রবঞ্চক E/N/Q
Ψ72. অ-আ-ক খুনের কাঁটা J
73. পয়োমুখম্ K/F
Ψ74. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ', এক C/K/D/A
75. অচ্ছেদ্যবন্ধন Q
Ψ76. না-মানুষের কাহিনী A/C
Ψ77. সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা J
78. ছয়তানের ছাওয়াল Q
79. হাতি আর হাতি A
Ψ80. আবার সে এসেছে ফিরিয়া G
81. ছোঁবল Q/K
Ψ82. রূপমঞ্জরী-এক K/N/Q
Ψ83. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ', দুই C/K/D/A
Ψ84. কাঁটায় কাঁটায়-এক J
Ψ85. কাঁটায় কাঁটায়-দুই J
86. গাছ-মা A
Ψ87. মান মানে কচু Q
Ψ88. আম্রপালী Q
Ψ89. লেঅনার্দোর নোটবই R/K/E
90. স্বর্গীয় নরকের দ্বার R/K/E
Ψ91. এমনটা তো হয়েই থাকে Q/M
92. রিস্তেদারের কাঁটা J
93. কৌতূহলী কনের কাঁটা J
Ψ94. 'যাদু এ তো বড় রঙ্গ'-র কাঁটা J
Ψ95. 'অভি নী-ধাতু অল'-এর কাঁটা J
Ψ96. ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা J
Ψ97. দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা J
Ψ98. যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা J
Ψ99. বাস্তুশিল্প I
Ψ100. এক. দুই.. তিন... K/P
Ψ101. রানী হওয়া Q
Ψ102. হিন্দু না ওরা মুসলিম Q/K
Ψ103. কাঁটায় কাঁটায়-তিন J
104. বিশের কাঁটা J
105. সেরা বারো R
Ψ106. খোলামনে R
Ψ107. বুলডোজার লেডি K/R/N/Q
Ψ108. খাণ্ডবদাহন G/K
109. ভূতায়ন A
110. ড্রেস রিহার্সালের কাঁটা J
111. রানী কাদম্বিনী এবং ... N
Ψ112. দান্তে ও বিয়াত্রিচে ... N/M/E/K
113. দেবদাসী সুতনুকা O/K
Ψ114. কাঁটায় কাঁটায়—চার J
Ψ115. রূপমঞ্জরী—দুই K/N/Q
116. অগ্নিকন্যা মমতা : N
#117. কড়ুরয় ও খুকু-মা A
Ψ118. দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা J
119. সকল কাঁটা ধন্য করে J
120. এক বৃন্তে দুটি কাঁটা J
121. শহিদ তর্পণ/প্রসঙ্গ কাশ্মীর
122. মোনালিজার কাঁটা J
123. অবিস্মরণীয়া MR
124. অনির্বচনীয়া MR
125. বাছাই গল্প R

সূচিপত্র

কৈফিয়ত

সৌরমণ্ডলের রূপকার সূর্যের সঙ্গে হাউই-এর একটা নিকটদূর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। প্রাক-সৃষ্টির নীরন্ধ্র ঘনান্ধকারে প্রথমজনকে পালন করতে হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার আদিম আদেশ : 'লেট ফেয়ার বি লাইট !' আগে আলো, পরে উত্তাপ। আতসবাজির অন্তরেও যদি তারকার মুখে ছাই দিয়ে আসার বাসনা জাগে তবে তাকেও সর্ব প্রথমে সন্ধান করতে হবে একটি দেশলাই-কাঠির। আগে আলো, পরে উল্লম্ফন!

যাঁকে এ গ্রন্থটি উৎসর্গীত এবং যিনি করেছেন তাঁদের দুজনের মধ্যেও শতাব্দী-ব্যবধানে আছে একটি বিনিসুতোর আত্মীয়তার মালা। প্রথমজন কথা সাহিত্যের সৌরমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে প্রথমেই হাত পেতেছিলেন অতীত ইতিহাসের কাছে।

> তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
> পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া
> যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
> তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই।
> বিস্মৃতি যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
> ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও!

ভাষা দান করলেন মৌন অতীত বঙ্কিমলেখনীকে। যে গোপনতম বার্তা সঙ্গোপনে লুক্কায়িত ছিল দুর্গেশনন্দিনীর অন্তরের অন্দরে অন্দরে তাই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কারাপ্রাচীরের কন্দরে কন্দরে : "বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" ..... প্রাণেশ্বর .... ঈশ্বর .... স্বর!"

অধম গ্রন্থাকারের ক্ষেত্রেও একই পর্যায়ক্রম। কলমের খাপ খুলতে-না খুলতেই বার হয়ে এল রাজপুতানার ইতিহাস রাওয়ালা অর্থাৎ মহাকালের মন্দির।

তফাৎ কি নেই? আছে। পিতামহ বঙ্কিম সাহিত্যরসের মজ্জায় মিশিয়ে লিখে গেলেন প্রপিতামহদের কাহিনী। তাঁর প্রনাতি লিখেছে : প্রমাতামহীদের!

পিতামহ ভাগ্যবান। ইংরেজ শাসক তাঁকে এজলাস থেকে টেনে নামায়নি। দৌড় করায়নি বৃহত্তর বঙ্গের মাঠে-ঘাটে। তাই তাঁর লেখনীমুখ থেকে কর্নুকোপিয়ার অনর্গল ধারাস্রোতে নির্গত হয়েছে ইতিহাস-রসাশ্রিত উপন্যাস : সীতারাম, দেবীচৌধুরানী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ ইত্যাদি। অধম গ্রন্থকার ভাগ্যহীন। বিধানচন্দ্রের বিধানে তাকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে উদ্‌বাস্তু শিবিরে-শিবিরে। তাই তার কলমে মুক্তি পেল : **বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, বল্মীক, অরণ্যদণ্ডক, দণ্ডকশবরী।**

তবু তাকেও বারে বারে ফিরে আসতে হয়েছে মৌন-**ইতিহাসের পথে-প্রান্তরে।** নিরুদ্দিষ্টা প্রপিতামহী-প্রমাতামহীদের সন্ধানে।

আমার লেখা যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের অনেকেই আমাকে গ্রন্থাবলী রচনা করতে অনুরোধ করেছেন। যে অনুরোধ রাখা যায়নি। প্রতিবন্ধকতার মূলে আমার স্বভাবজাত পল্লবগ্রাহিতা। **বিশ্বাসঘাতক, হাতি আর হাতি, তিমিতিমিঙ্গিল, নাকউঁচু, বাস্তুশিল্প** আর ডিজনেল্যান্ডকে কী করে এক সাথে বাঁধাই করব?

তবে তাঁদের পরমার্শ আমি আংশিকভাবে মেনেছি। গোয়েন্দাকাহিনীগুচ্ছ কাঁটায়-কাঁটায় সাজানো গেছে। উদ্বাস্তুসমস্যা আর হিন্দু-মুসলমান 'দ্বন্দ্বের' কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে সোনার বাঙলায়। এবার ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলি দুটি খণ্ডে প্রকাশ করা গেল : অবিস্মরণীয়া এবং অনির্বচনীয়ায়। প্রথম খণ্ডে বৌদ্ধ যুগ থেকে সুলতানী আমলের শেষাশেষি পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে মুঘলে-আজম থেকে প্রাকস্বাধীনতা যুগ।

পূর্বাচার্য ইতিহাসবেত্তার দল বজ্রমণি-শলাকায় ইতিহাসের বৈদুর্যমণি সমুৎকীর্ণ করে গেছিলেন বলেই অধমের এই 'সূত্রস্য গতি'।

ইতিহাস-আশ্রয়ী সাহিত্য (তথা গোয়েন্দা কাহিনী) রচনায় আমার গুরু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে কখনো চাক্ষুষ দেখিনি। পত্রালাপও করিনি। ঠিকানাই জানতাম না। অথচ তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পূর্বেই আমার একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস—রাওয়ালায়—শরদিন্দুর ভাব, ভাষা, শৈলী, কৌতুকরীতি, এমন কি ঝিন্দের বন্দী প্রয়োগ-কৌশলে বিদেশী নায়ক-নায়িকাকে হিন্দের বন্দী করার কায়দাও অনুসৃত। তবু গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের একান্ত সাধনাবিষয়ে আজীবন ছিলেন অনবহিত। এমনকি বিশুপাল-বধের উপসংহারে যে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে তাও তাঁর অজানা।

সোনার-বাংলায় ঠাঁই হয়নি অরণ্যদণ্ডকের। আয়তনবৃদ্ধির আশঙ্কায়। ইতিহাসের পথে-প্রান্তরের দু-দুটি খণ্ডেও স্থান হল না লেখকের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাসটির নায়িকা : রূপমঞ্জরীর।

শুধু আকারবৃদ্ধির জন্য নয়। কাহিনীটি আজও অসমাপ্ত থাকায়।

নারায়ণ সান্যাল

কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রস

"আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মূল রসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি মিশ্ররস আছে অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে 'ঐতিহাসিক রস' নাম দেওয়া যাইতে পারে"।[1]

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐ 'ঐতিহাসিক রস' থেকেই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর জন্ম। আমরা বলি, তা তো বটেই; কিন্তু 'ঐতিহাসিক রস'-এর প্রভাবে সাহিত্যের নানারকম বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে, রবীন্দ্রশাস্ত্রে 'তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।' স্বাভাবিক হেতুতে। রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটির নাম ছিল 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'; আলোচ্য বিষয়ের চৌহদ্দিতেই তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাই-ভাতিজা-সন্তানাদি আছে কি না, থাকলে তাদের কী নাম, এসব প্রসঙ্গ ছিল বাহুল্য। আমাদের অবস্থা তা নয়। আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে বসেছি। তাই সব কিছুই আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

এখানে যদি আপনারা প্রতিপ্রশ্ন তোলেন—'ইতিহাস' বা 'সাহিত্যের' কোন্ সংজ্ঞায় আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চাই, তাহলে আমি নাচার। গুণীজন মাত্রেই জানেন যে, 'ইতিহ+আস' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসটির পূর্বকালে অর্থ ছিল—পূর্ব বৃত্তান্ত, লোকপরম্পরাগত কথা। তার ভিতর পৌরাণিক উপকথা, লোকগাথা, কাল্পনিক কাহিনী ইত্যাদির ছিল অবাধ যাতায়াত। এখন ইতিহাস বলতে আমরা তা বুঝি না। বুঝি—বাস্তবে যা ঘটেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই 'ঘটা' ক্রিয়াপদটির কর্তার কর্তৃত্ব নিয়েও সম্প্রতি মতভেদ দেখা দিয়েছে। 'কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি' সম্পাদনা করতে গিয়ে 1896-সালের 'মডার্ন'-সম্পাদক লর্ড অ্যাকটন যা বলেছিলেন তাতে 'ঘটা' ক্রিয়াপদের কর্তাটা হয় 'হাল্লার রাজা', নয় 'শুণ্ডীর রাজা'। ষাট বছর পরে স্যার জর্জ ক্লার্ক তার প্রতিবাদ করলেন নতুন সম্পাদনাকালে—তাঁর মতে ঐ 'ঘটা' ক্রিয়াপদের কর্তা হতে পারে 'উলুখাগড়া'ও। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যটি তুলে ধরে ই. এইচ. কার্ বললেন, "The clash between Lord Acton and Sir Clarke is a reflection on a change in our total outlook on society over the interval between these two pronouncements." মোটকথা, 'ইতিহাস' শব্দটির বর্তমানে যে প্রচলিত সংজ্ঞা তাই আমরা মেনে চলেছি—পুরাণ, লোকগাথা, মহাকাব্য ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তবে এই মওকায় বলে রাখি, আলোচনা সংক্ষেপ করতে সাহিত্যের কয়েকটি স্বীকৃত শাখা : কাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, যাত্রার পালাগান, গান ইত্যাদিকে আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি।

সকলেই জানেন 'ইতিহাস'-এর এক 'ফার্স্ট-কাজিন' আছে : 'ভূগোল'। সেও সাহিত্যের এক 'সুটার'। মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি করতে আসে। তার ফলে যে মিশ্র-রস পয়দা হয় অলঙ্কারশাস্ত্রে তারও নামকরণের চেষ্টা হয়নি। মহাজনগতস্য পন্থায় আমরা তাকে 'ভৌগোলিক রস' নাম দিতে পারি। স্বীকার্য, এটিও আমাদের আলোচ্য বিষয়সীমার বাইরে। কিন্তু দুটি কারণে ভূগোলের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে কাজে হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম হেতু : মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয় হেতু: 'ভূগোল'কে বাদ দিয়ে 'ইতিহাস'কে চিন্তা করা যায় না। প্রতিটি ইতিহাস ভূগোল-নির্ভর। এমনকি 'বিশ্ব-ইতিহাস' সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহের চৌহদ্দিতে সীমিত।

তাহলে মোদ্দা কী দাঁড়ালো?

আমাদের ত্রৈরাশিকের অঙ্কে তিন-তিনটি 'ভেরিয়েব্‌ল্' বা পরিবর্তনশীল উপাদান আছে। তন্মধ্যে দুটির 'মান' নির্ণেয় : 'ইতিহাস' ও 'সাহিত্য'। একটি আছে ভূষিমাল—ভেজাল : ভূগোল। ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ হিসাবে যেটুকু ভূগোল আছে তাকে তাড়ানো যাবে না। বাকিটাকে তাড়াতে হবে। বীজগণিত বলে, এক্ষেত্রে বজ্রগুণন পদ্ধতিই হচ্ছে 'হবির্বিনা হরির্যাতি...' শ্লোকের আখেরি প্রয়োগ : 'ধনঞ্জয়'-ব্যবস্থা। তাই করব আমরা। অর্থাৎ ভূগোল কীভাবে ইতিহাস ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে সেকথা সংক্ষেপে আলোচনা করে ভূগোলকে আমরা প্রবন্ধের বাইরে রাখব।

প্রথমেই আমাদের সমস্যাটার একটা 'চিত্রকল্প' পেশ করা গেল। অর্থাৎ মিশ্রণের কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনটি উল্লেখযোগ্য শাখা কী-ভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তাতে কী-জাতের মিশ্ররস পয়দা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে দু-একটি নামের ইঙ্গিত রাখা গেছে। সুধীজন ঐ ইঙ্গিত দেখেই সমঝে নেবেন। নামগুলি কখনো খাড়া হরফে—কর্তার পরিচয়ে ; কখনো বা *বাঁকা হরফে*—ইংরেজি অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলে metonymy — 'The Maker for his Works' অর্থাৎ তাঁর কর্মের।

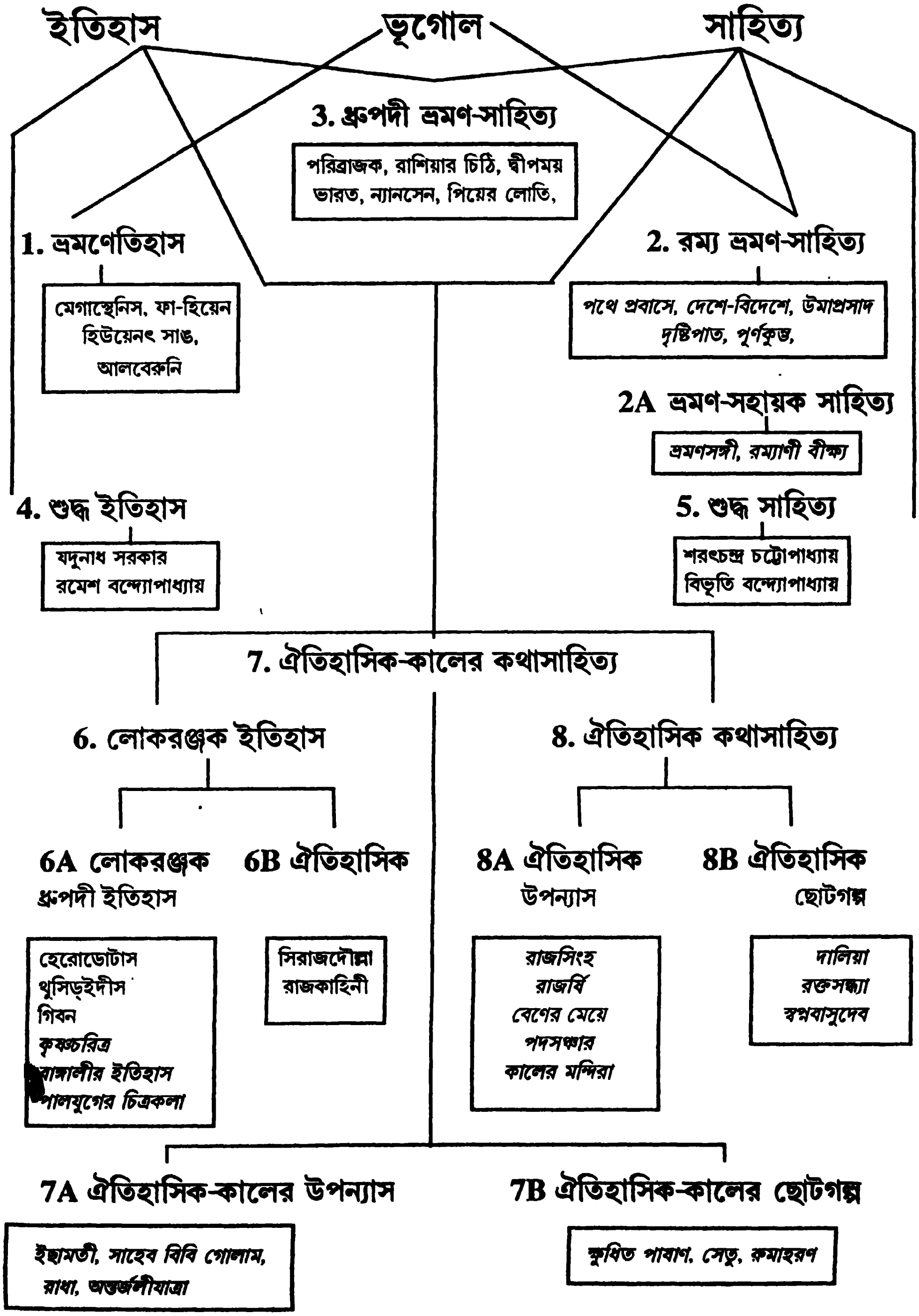
বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সর্বপ্রথমে ভূগোলকে উচ্ছেদ করা যাক।

(1) ভ্রমণেতিহাস [ইতিহাস + ভূগোল] :

সাহিত্যে উপেক্ষিত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা সমকালীন ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্যৎকালকে অবহিত করে। সাহিত্যগুণ আবশ্যিক নয়, হয়তো আদৌ অনুপস্থিত। তবু এ জাতীয় রচনা কালজয়ী। ভ্রমণকারী স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনকালে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক না হলে বা ঐতিহাসিকের প্রত্যাশিত অনুসন্ধিৎসা না থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাস হয়তো উপেক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ফা-হিয়েন যখন ভারতে আসেন তখন গুপ্তযুগের সূর্য মধ্যগগনে। মগধ-রাজধানী পাটলীপুত্রে তিনি রাত্রিবাস করেছেন। রাজা বা রাজবাড়ির উল্লেখ নেই। গুপ্তসম্রাট বা গুপ্তসংস্কৃতি তাঁর রচনায় উপেক্ষিত। সমকালীন অসীম প্রতিভাধর যাঁদের কেউ কেউ তখন ঐ শহরে উপস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করা চলে—অমরসিংহ, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, স্বয়ং কালিদাস, আর্যভট্ট, শূদ্রক—তাঁরা কেউ নেই ঐ ভ্রমণকাহিনীতে। অথচ সমকালীন ভারতবাসীর জীবনযাত্রার নানান চিত্র নিপুণ তুলিতে আঁকা! রাজগৃহের চিত্রকূট পর্বতচূড়ায় এক বিনিদ্র রাত্রির আশ্চর্য বর্ণনাও!

(2) রম্য ভ্রমণ সাহিত্য [ভূগোল + সাহিত্য] :

এবারেও ইতিহাস উপেক্ষিত। ভ্রমণকারী স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার পথে পথচলতি যে বর্ণনা দিচ্ছেন তার মূল লক্ষ্য পাঠকের মনোরঞ্জন। কখনো চরিত্রচিত্রণে, কখনো ঘটনা সংস্থাপনে, কখনো বা নিছক পরিবেশন-পারিপাট্যের প্রসাদগুণে। আবশ্যিক গুণ : ভাষার রম্যতা। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়ে পরিক্রমা সে-দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনার কথা, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের বিবরণ যে থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতা রচনাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। *দেশে-বিদেশে* ভ্রমণকাহিনীতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসঙ্গ কাহিনীর প্রয়োজনে এসে উপস্থিত। কিন্তু বিপ্লবী নেতা বা প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রনায়কেরা লেখকের কাছে পাত্তা পেলেন না। দু-দলকে হটিয়ে রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সগৌরবে অধিষ্ঠিত রইল খিদমদগার আবদুর রহমান। *পূর্ণকুম্ভে* লেখিকা দুচোখ ভরে যা দেখেছেন তা বারে বারে ছাপিয়ে উঠছে যা তিনি দেখছেন দুচোখ বন্ধ করে। *দৃষ্টিপাত*-এ ভূগোল কোথায়? 'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ'—বলে লেখক হুস করে পৌঁছে গেলেন দিল্লীর এয়ারপোর্টে। বাদবাকি ঐ রাজধানীর উচ্চকোটি সমাজের নানান-জাতির কক্‌টেইল। ভাষার প্রসাদগুণে তা কালজয়ী। রঞ্জনের *শীতে উপেক্ষিতা* প্রসঙ্গেও ঐ এককথা। এ-জাতীয় 'রম্য-ভ্রমণ-সাহিত্যের' মূল্য যাচাই করতে হলে স্মরণ করতে হবে গুরুবাক্য :



ইতিহাস
ভূগোল
সাহিত্য
3. ধ্রুপদী ভ্রমণ-সাহিত্য
পরিব্রাজক, রাশিয়ার চিঠি, দ্বীপময় ভারত, ন্যানসেন, পিয়ের লোতি,
1. ভ্রমণেতিহাস
মেগাস্থেনিস, ফা-হিয়েন হিউয়েনৎ সাঙ, আলবেরুনি
2. রম্য ভ্রমণ-সাহিত্য
পথে প্রবাসে, দেশে-বিদেশে, উমাপ্রসাদ দৃষ্টিপাত, পূর্ণকুম্ভ,
2A ভ্রমণ-সহায়ক সাহিত্য
ভ্রমণসঙ্গী, রম্যাণী বীক্ষ্য
4. শুদ্ধ ইতিহাস
যদুনাথ সরকার রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
5. শুদ্ধ সাহিত্য
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
7. ঐতিহাসিক-কালের কথাসাহিত্য
6. লোকরঞ্জক ইতিহাস
8. ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য
6A লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস
6B ঐতিহাসিক
8A ঐতিহাসিক উপন্যাস
8B ঐতিহাসিক ছোটগল্প
হেরোডোটাস
থুসিড্ইদীস
গিবন
কৃষ্ণচরিত্র
বাঙ্গালীর ইতিহাস
পালযুগের চিত্রকলা
সিরাজদৌল্লা
রাজকাহিনী
রাজসিংহ
রাজর্ষি
বেণের মেয়ে
পদসঞ্চার
কালের মন্দিরা
দালিয়া
রক্তসন্ধ্যা
স্বপ্নবাসুদেব
7A ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস
7B ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প
ইছামতী, সাহেব বিবি গোলাম, রাধা, অন্তর্জলীযাত্রা
ক্ষুধিত পাষাণ, সেতু, রুমাহরণ

"পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে,
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চলতি-মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা,
তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।"[2]

এই ধারার আর একটি উপধারা সাহিত্যে বর্তমান, যাকে 'ভ্রমণসহায়ক সাহিত্য' বলা যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য ভ্রমণকারীকে সাহায্য করা। এগুলি নানান জাতের। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কোন কোন জমিদার এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ভবিষ্যৎ যাত্রীদের সুবিধার্থে। হয়তো মুদ্রিত আকারে অভিজ্ঞতাটা স্থায়ী করার বাসনাও ছিল। সাহিত্য-গুণ তাতে থাক না থাক পরবর্তী ভ্রমণকারীদের তা প্রভূত সাহায্য করেছে। 1940 সালে পূর্ব রেল অল্প দামে দুই খণ্ডে *বাঙলায় ভ্রমণ* প্রকাশ করেন। তা অনবদ্য প্রকাশনা। এই ধারার অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হচ্ছে ও হয়েছে। *ভ্রমণসঙ্গী* বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গাইড বুক।

কোন কোন সাহিত্যিক এর সঙ্গে ইতিহাস এবং কল্পিত নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনী যুক্ত করে গাইড-বইয়ের মূল উদ্দেশ্যটা গোপন করেছেন। এই শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয় সুবোধ চক্রবর্তীর *রম্যাণী বীক্ষ্য* সিরিজ।

কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী না করে, ভ্রমণ সাহিত্য ক্রমাগত রচনা করে চলেছেন শঙ্কু মহারাজ।

আর একজন আশ্চর্য সাহিত্যিক ছিলেন এ-পাড়ায়, যাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য একাই একটি ধারা। তিনি কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী করেন না। গেজেটিয়ার ঘেঁটে প্রাচীন ইতিহাস পরিবেশনের বাসনা যাঁর আদৌ নেই। চোখ বুঁজে তিনি কিছু দেখেন বলে তো টের পাইনি। অবন পটুয়াও না কি তা দেখতে পেতেন না। দু-চোখ ভরে যা দেখেন তাই সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করেন। সজ্ঞান ভাষার মারপ্যাঁচও তাঁর রচনায় নজরে পড়ে না। তবু পাঠক-পাঠিকা বুঁদ হয়ে তাই পড়ে। নিশ্চয় বুঝেছেন কার কথা বলছি : ভ্রমণ-প্রেমিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(3) ধ্রুপদী ভ্রমণ-সাহিত্য [ইতিহাস + ভূগোল + সাহিত্য + সংস্কৃতি] :

খেয়া নৌকার মাঝি যখন ভাটিয়ালী গান ধরে তখন পারানির যাত্রী আপত্তি করে না, যতক্ষণ সে দাঁড়-জোড়া টানে, অথবা লগিটা ঠেলে। তাই রাশিয়ার চিঠিতে কবি যখন ভাষার মাধুর্যে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন তখন আমরা সেটা গ্রহণ করি consumer's surplus হিসাবে। যাকে বলে 'আনমোল ফাউ'। কারণ পারানি যাত্রীদের মূল লক্ষ্য নদীর ঐ অচেনা ওপারটা। সেখানে তখন নাকি সাম্যবাদের কী-একটা আজব পরীক্ষা হচ্ছিল! *রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময়-ভারত*-গ্রন্থে সাহিত্যগুণের চেয়ে আমাদের অধিক কৌতূহল দু-তরফা। প্রথমত, সুনীতিকুমারের মূল্যায়নে বালী-যবদ্বীপ-কম্বোজ অঞ্চলের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ইতিহাস ; দ্বিতীয়ত, লেখকের জনৈক সহযাত্রীর প্রতিক্রিয়া। অনুরূপভাবে *পরিব্রাজক* অথবা *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে* স্বামীজী ভারতআত্মার মুক্তিপথের দিশারী হিসাবে কী বলেছেন তা জানবার কৌতূহলই প্রবল, শুধু সুখপাঠ্য রম্যতাগুণ নয়।

দুজন বিদেশীকে নমুনা হিসাবে দাখিল করেছি বিশ্বসাহিত্য থেকে। ন্যানসেন (1861-1930) বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন (1922)। ভূপর্যটক যদি ধ্রুপদীসাহিত্য রচনার জন্য তা পেতেন, তা হলেও অবাক হবার কিছু ছিল না। তাঁর *উত্তরতম* (1897) ভ্রমণ কাহিনীর শৈত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া উষ্ণতা *সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে।* প্রতি দেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যার অপূর্ব সমন্বয়! অনুরূপভাবে পিয়ের লোতি (লুই মারী জুলেয়েন ভীয়ো, 1850-1923) কলমের মাধ্যমে তাহিতি দ্বীপের যে ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে পল গোগ্যাঁর তুলিতে আঁকা

ছবির। মুজতবা আলী সাহেবের ভাষায় "লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না।"

ভূগোলকে এখানেই বিদায় দিচ্ছি। শুধু এ পর্যায় শেষ করার আগে বলি, ভূগোলের বদলে 'বিজ্ঞান' যদি আলোচ্য ভেজাল হত, তাহলে আমাদের মাথার টুপি খুলতে হত ডারউইন বা ওয়ালেস-এর ভ্রমণকালীন রচনাকে ; কল্প-বিজ্ঞান হলে জুল ভের্ন থেকে আর্থার সি. ক্লার্কের অনেক মানস ভ্রমণকে। কল্পবিজ্ঞানী-কথাসাহিত্যিকদের রচনায় 'ইতি + হ + আস'র বদলে মিশেছে 'ইতি + হতে পারে + আশ'!

(4) শুদ্ধ ইতিহাস :

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। হরপ্রসাদ, দীনেশরঞ্জন, রামদাস সেন, রাখালদাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, স্যার যদুনাথ, অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ চন্দ, নীহাররঞ্জন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশোভন সরকার প্রভৃতির বিশুদ্ধ ইতিহাসের কথা বলতে চাইছি। এখানে সাহিত্যগুণ আবশ্যিক নয়। তবে কারও কারও রচনা নিজগুণেই সরস।

(5) শুদ্ধ সাহিত্য :

অনুরূপভাবে ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত শুদ্ধ সাহিত্য প্রচুর। আমরা নমুনা হিসাবে শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের কথা বলেছি। প্রথমোক্তের *নারীর মূল্য* শুদ্ধ সাহিত্য নয়। তেমনি বিভূতিভূষণের *স্বপ্ন বাসুদেব*-এ 'ইতিহাসের তাল' আর *চাঁদের পাহাড়*-এ 'ভূগোলের গোল' তালগোল' পাকিয়েছে।

(6) লোকরঞ্জক ইতিহাস [ইতিহাস + সাহিত্য] :

একনিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা প্রণিধান করলেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে ঐতিহাসিক গবেষণা সম্ভব নয়। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ও সম্পদগুলিকে সুরক্ষার প্রয়োজনেও জনমানসকে ইতিহাসের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। তৃতীয়ত ইতিহাসের শিক্ষায় বর্তমান সমাজকে যদি নতুন করে গড়তে হয়—ইতিহাস চর্চার যা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহলেও ইতিহাসকে লোকরঞ্জন করে তুলতে হবে। এই মানসিকতা থেকেই এই ধারাটির উৎপত্তি।

আমরা একে দ্বিধারায় বিভক্ত করেছি : ধ্রুপদী ও রম্য।

(6A) লোকরঞ্জক ধ্রুপদী-ইতিহাস :

এক হিসাবে বলা যায়, এই আদিম প্রেরণাতেই মানুষ মন্ত্রোচ্চারণের পর্বতশিখর অতিক্রমণে উন্নীত হয়েছিল মহাকাব্যের মালভূমিতে। রাজা-রাজড়ার 'ইতিহাস' রচনার মাধ্যমে সমাজসেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন গিলগামেশ, বাল্মীকি, বেদব্যাস বা হোমার। কিন্তু আজকের সংজ্ঞায় তা 'মহাকাব্য' হতে পারে, 'ইতিহাস' নয়। 'রামের অয়ন' সূর্যবংশের 'ইতিহাস' নয়। যেমন কৌরবদের ইতিহাস নয় মহাভারত। ধ্রুপদী-ইতিহাসের আদিসূরী বোধকরি হেরোডোটাস (আঃ 485-425 খ্রী. পূ.)। মহাপণ্ডিত সিসেরো (106-43 খ্রী. পূ.) যাঁকে বলেছিলেন 'ইতিহাসের জনক'। পর্যটকের ভূমিকায় তাঁর জন্মভূমি এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক কলোনি থেকে রওনা হয়ে ঈজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, থ্রেস, এমন কি পারস্য টায়ার, মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। চলার পথে ক্রমাগত মাল-মশলা সংগ্রহ করে যান। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, পৌরাণিক, পুরাতাত্ত্বিক, লোকায়ত গাথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে থাকেন। এর পর তিনি রচনা করেন তাঁর ধ্রুপদী ইতিহাস। শুরু করেন লীডিয়ারাজ ধনকুবের ক্রীসাস (Croesus, রাজত্ব 560-546 খ্রী. পূ.)-এর পারস্য-বিজয় থেকে। ক্রমে উপনীত হন পারস্য, ব্যাবিলোন এবং মিশরীয় রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে। খাঁটি ইতিহাস, কিন্তু শুনেছি তা নাকি সুখপাঠ্য। মেজাজেই পার্থক্য হিউয়েন সাঙ বা আলবেরুণীর সঙ্গে।

ঠিক তাঁর পরেই আবির্ভূত হলেন থুসিড্‌ইদীজ (Thucydides, আঃ 460 আঃ 400 খ্রী. পূ.)। ষাট বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই গ্রীক ঐতিহাসিকের কল্যাণেই আমরা জেনেছি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'পেলোপোন্নেসিয়ান' যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ। বিশ বছর বয়সে সাতটি রণতরীর নৌসেনাপতি হিসাবে যুদ্ধযাত্রা করেন ; পরাজিত হবার অপরাধে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগার থেকে পলায়ন করেন। পরবর্তী জীবনের চারটি দশক আত্মগোপন করে রচনা করে যান অমূল্য ইতিহাস। থুসিড্‌ইদীজ নাকি ঐতিহাসিক হিসাবে একদিক থেকে অনন্য—প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেই তাঁর নিজস্ব মতামত দাখিল করতেন। পেরিক্লস্‌কে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। গ্রীক সভ্যতার আসন্ন পতন সম্বন্ধে অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শুধু তাই নয়—সে পতনের হেতুগুলিও নাকি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু সেসব তো বহু-বহুযুগ আগেকার কথা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় মেগাস্থেনিজ (আঃ 300 খ্রী. পূ.) যে নোট রেখেছিলেন তা ইতিহাসের উপাদান বটে, 'ইতিহাস' নয়। অন্তত যেটুকু আমরা হাতে পেয়েছি। ভারতে প্রকৃত 'ইতিহাস' কোনদিনই রচিত হয়নি। রাজার ফরমায়েস মোতাবেক কিছু কিছু পুঁথি লিখিত হয়েছে বটে—যেমন কাশ্মীররাজের নির্দেশে কল্‌হন, বিল্‌হন—তাকে 'ইতিহাস' বলা চলে না। ইদানীংকালে গ্রীক ধ্রুপদী ঐতিহাসিকদের পথে নূতন করে যাত্রা শুরু করলেন ইংরাজ লেখক—ঐতিহাসিক শুধু নন, সাহিত্যিক গিবন। তাঁর রচিত *দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার* (1722-88)-এ কোন কল্পিত চরিত্র নেই, উপন্যাসের বাষ্পমাত্র নেই ; কিন্তু তা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর নভেলের মতো রাত জেগে পড়া যায়। পরীক্ষা পাশ করার জন্য নয়। গল্পের টানে। গল্প যদিচ খাঁটি ইতিহাস।

ইংরেজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে এ ধারাটি সগৌরবে টিকে আছে। মস্কোদমনব্যর্থ বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা পড়ুন টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*-তে। এবার সেটা বন্ধ করে খুলে বসুন শীরার-এর *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য থার্ড রাইখ্।* পড়ুন লেনিনগ্রাড-অধিকারে ব্যর্থ বিশ্বত্রাস হিটলারের 'ব্লিৎসক্রীগ্‌-বাহিনী'র পশ্চাদপসরণের বর্ণনা। দুইটিই বিশুদ্ধ ফরাসী শ্যাম্পেন। 'আধারকারে'র মতো কনৌসার না হলে স্বাদে মালুম হবে না প্রথমটি বটলড্ 1869 খ্রীষ্টাব্দে ; দ্বিতীয়টি নব্বই বছর পরে, 1959-এ। প্রথমটি সার্থক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', দ্বিতীয়টি সার্থক 'উপন্যাসোপম ইতিহাস'। দুটি-গ্রন্থেই মহাকালের বিচিত্র গম্ভীর সুদূরবিস্তৃত ঝংকার ধ্বনিত হচ্ছে। প্রথমটি কথাসাহিত্যিক লেও টলস্টয়ের রুদ্রবীণায়, দ্বিতীয়টি সাংবাদিক শীরার-এর অতন্দ্রসাধনার সুপার-রিপোর্টাজ-এ।

বাংলা সাহিত্যে রিপোর্টাজ যথেষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারে অথবা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপরে (রাজনৈতিক হেতুতেই) ঢাউস-ঢাউস গ্রন্থ লেখা ও লেখানো হচ্ছে। সেকালে যেমন রাজাদেশে *রাজতরঙ্গিণী* লেখা হয়েছিল একালেও তেমনি পার্টি-ফান্ড থেকে খরচ যোগানো হয়। অথবা সরকারী আদেশে গ্রন্থাগারে ব্যাপক বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দলগত প্রচারের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ পাঠককে ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত করার মানসিকতা নিয়ে একটা কালকে, একটা যুগের আন্দোলনের ইতিহাসকে কেউ তুলে ধরতে চান না শুধুমাত্র তথ্যনির্ভর গবেষকের নিষ্ঠায়। তাই পাশ্চাত্যদেশে গিবন-এর উত্তরসূরীর অভাব হয়নি ; বাংলায় চণ্ডীচরণ সেন, নিখিলনাথ রায় অথবা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র উত্তরসূরী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ অবশ্য কিছু কিছু রচিত হয়েছে। আমরা নমুনা হিসাবে চারটির নামোল্লেখ করেছি। সেগুলি ইতিহাস-বিষয়ক নয়। ইতিহাস-সম্পৃক্ত। রাখালদাসের *বাঙ্গালার ইতিহাস* বা রমাপ্রসাদের *গৌড়রাজমালা*-র পাতা ওল্টালেই বোঝা যায় যে, লেখকের মানসচক্ষে যে-পাঠক সে ইতিহাসের ছাত্র। কিন্তু নীহাররঞ্জনের *বাঙালীর ইতিহাস*-এ প্রত্যাশিত পাঠক শিক্ষিত কৌতূহলী বঙ্গবাসী। অর্থনীতি বা দর্শন কেন সে পদার্থবিদ্যার ছাত্রও হতে পারে। সরসীকুমার যখন *পালযুগের চিত্রকলার* ইতিহাস লিখছেন তখন তাঁর পাঠক শিল্পরসপিপাসু। ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*। মহাভারত বা

ভাগবতের একটি বিশেষ চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা ; কিন্তু এমন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা রচিত যে, ঐতিহাসিক রস তির্যকভাবে পাই। একই কথা শরৎচন্দ্রের *নারীর মূল্য* প্রসঙ্গে। কথাসাহিত্যিক এখানে প্রাবন্ধিক। ইতিহাস তাঁর বিষয়বস্তু নয় : সমাজ। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি ঐতিহাসিকের—দেশ-ভেদে, কালভেদে, ইতিহাসবেত্তার নিষ্ঠায় নারীর মূল্য তিনি নির্ধারণ করেছেন। এগুলিও ইতিহাস-রসসিক্ত। ব্যাপক অর্থে।

গিবন-এর অনুকরণে বাঙলা ভাষায় একটি যুগের, একটি কালের ধারাবাহিক রচনার পথিকৃৎ কোন্ ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক—এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। বাবু নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র *সিরাজদ্দৌলা* একই বৎসরে (1898) প্রকাশিত। তার পূর্বে বাঙলা ভাষায় বিশুদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশুদ্ধ উপন্যাস তিনই লেখা হয়েছে। কিন্তু 'গিবনঢঙের উপন্যাসপ্রতিম লোকরঞ্জক ইতিহাস' লেখা হয়নি। নিখিলনাথ এবং অক্ষয়কুমার প্রায় একই সঙ্গে তথ্যনির্ভর ইতিহাস পরিবেশন করলেন কথাসাহিত্যের ভাষায়। একই বছরে প্রকাশিত হলেও *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* বয়োজ্যেষ্ঠ। কারণ তার ভূমিকায় নিখিলনাথের স্বাক্ষরের তারিখ ১২ই শ্রাবণ এবং অক্ষয়কুমারের *সিরাজদ্দৌলার* ভূমিকায় লেখকের স্বাক্ষর আশ্বিন মাসে। অপিচ, নিখিলনাথের গ্রন্থে কোথাও অক্ষয়কুমারের উল্লেখ নাই। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ কাহিনীর উদ্ধৃতি আছে।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। এ দুই ঐতিহাসিকের অপেক্ষা প্রায় দুই দশকের বয়োজ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ সেন তিন-চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যা আমাদের বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে ঐতিহাসিক উপন্যাস পর্যায়ের। কিন্তু হেতুটি মর্মন্তুদ :

চণ্ডীচরণ ছিলেন সাবজজ। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম ও বিষয় নির্বাচন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ঝোঁকটা কোনদিকে : *অযোধ্যার বেগম* (1886), *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* (1886), *ঝাঁসির রাণী* (1888) এবং *মহারাজ নন্দকুমার* (1888)। শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় (পাণ্ডুলিপি : 1875) লেখক জানাচ্ছেন,

> "বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারেই জানেন না। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের উপর যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ...বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় না, এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।"[3]

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন :

> *মহারাজ নন্দকুমার* প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। গ্রন্থের নাম *মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে সামাজিক অবস্থা।* চণ্ডীচরণ শেষোক্ত দিকটির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণই স্পৃহনীয়। এজন্য মহারাজ নন্দকুমার এ নন্দকুমারের সঙ্গে যোগ নেই, এমন সমস্ত ঘটনারই বেশি উল্লেখ দেখি। গ্রন্থের আরম্ভে ও গ্রন্থের শেষে নন্দকুমারের উল্লেখ আছে। কিন্তু অংশটি শিথিলবিন্যস্ত।[4]

আমাদের ধারণা :দোষ লেখকের নয়। পাঠকের। পাঠকমানস ইতিহাসবিমুখ। তাছাড়া 'উপন্যাস'-এর পরিবর্তে 'ইতিহাস' লিখলে সাবজজ-সাহেবের অদৃষ্টে হয়তো লঙ-সাহেবের লাঞ্ছনা জুটত। কারণ 'নন্দকুমারাদি লিখিয়া তিনি (চণ্ডীচরণ) অচিরাৎ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন।'[5]

এজন্যই যদিচ লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লিখেছেন, আমরা গ্রন্থটিকে 'লোকরঞ্জণ ধ্রুপদী ইতিহাসের' তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য হলাম।

ধ্রুপদী ধারায় লোকরঞ্জণ ইতিহাসের গ্রন্থ-তালিকা এখানে পেশ করা সম্ভবপর নয়। নমুনা হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল : ফরাসী বিপ্লবের উপর কাজ (1837) করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন কার্লাইল (1818-83) ; ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে পোপদের ধর্মীয় শাসনের ইতিহাস (1834-37) রচনা করেছিলেন র‍্যাঙ্কে (1795-1886)। কার্ল মার্ক্স-এর (1818-83)

মহাগ্রন্থ Das Kapital (1867) যদিচ বিশুদ্ধ ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, কিন্তু আর. এইচ. টনি (Towney, 1886-1962)র *Religion & the Rise of Capitalism* (1926) কে লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস বলা যায়। টনি অবশ্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমস্যাটা দেখেননি। চার্চিলের (1874-1965) ছয় খণ্ডের *দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার*। টয়েনবীর (1889- ??) অতি বিশাল *বিশ্ব ইতিহাস* একাধারে বিশুদ্ধ ইতিহাস এবং লোকরঞ্জক।

অনুরূপভাবে বাঙলা ভাষাতেও সমান্তরালে একটি ধারা প্রবাহিত। এবারেও আমরা পূর্ণ তালিকা দাখিলের প্রয়াস না করে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি দিকচিহ্নের উল্লেখ করছি : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (1880-1961) *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস* অথবা *বাংলার ইতিহাস*; ঈশান স্কলার বিনয়কুমার সরকারের (1887-1949) তেরটি খণ্ডে প্রকাশিত বিশালায়তন *বর্তমান জগৎ*; সুরেন্দ্রনাথ সেনের (1890-1962) *অশোক*; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1891-1952) *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, সংবাদপত্রে সেকালের কথা* কিংবা *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*; যোগেশচন্দ্র বাগলের (1886-1962) *মুক্তির সন্ধানে ভারত* বা *স্ত্রীশিক্ষার কথা*; নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস*, বিনয় ঘোষের একাধিক গ্রন্থ, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের (1886-1962) *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ*; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস*।

(6B) লোকরঞ্জক রম্য ইতিহাস : সদ্য-বর্ণিত ধ্রুপদী লোকরঞ্জক ইতিহাসের সঙ্গে এর মৌল পার্থক্য রম্যতাগুণ। এ জাতীয় রচনাতেও কাল্পনিক চরিত্র আমদানী করার রীতি নেই, তবে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে আলাপচারীতে রত হলে আপত্তি করার রেওয়াজও নেই, শুধুমাত্র যদি দেখা যায় লেখক সেই কথোপকথনের মাধ্যমে ইতিহাসকেই পরিবেশন করছেন। কল্পিত কাহিনী নয়। সাল তারিখ সচরাচর বর্জিত, ফুটনোট বরদাস্ত করা হয় না। তবে গ্রন্থশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়—সহায়ক গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। এই ধারার প্রথম যুগের প্রচেষ্টা অক্ষয়কুমারের *সিরাজদ্দৌলা* (তিনি অবশ্য সাহিত্যের 'রম্যতা' গুণের চেয়ে ঐতিহাসিক 'তথ্য'কে সর্বত্র প্রাধান্য দিয়েছিলেন) এবং নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*। ইদানীং শোনা যাচ্ছে এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবারেও নমুনা হিসাবে অসংখ্য সাম্প্রতিক প্রকাশনার ভিতর দু-একটি বইয়ের নাম করি, যথা সুকন্যার *নূরজাহান*, শ্রীপারাবতের *বাহাদুর শাহ, জাহানারা*। অধম লেখকের *বেগ আনন্দস্বরূপিনী লাডলিম, হংসেশ্বরী*।

উপন্যাসের অথবা কথাসাহিত্যের ঢঙে রচিত, সাহিত্য রসসিক্ত এই গ্রন্থগুলিতে কল্পনার বিন্দুমাত্র আশ্রয় নেওয়ার রেওয়াজ নেই, তবু রচনাগুণে সাধারণ পাঠককে এগুলি ইদানীংকালে যথেষ্ট আকৃষ্ট করছে। শুধু রচনার গুণে নয়, আরও একটি হেতু আছে। সাধারণ পাঠক ইতিহাসকে আজকাল বেশি করে জানতে চায় কিন্তু ঐতিহাসিকদের ধ্রুপদী রচনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে এই জাতীয় বই লোকশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

স্বীকার্য, লেখকের একদেশদর্শিতা দোষে, 'শৌখিন মজদুরী'র প্রবণতায় এতে কখনও কখনও ক্ষতিও হচ্ছে। ইতিহাসকে কিছু লেখক বিকৃত করছেন। তাঁরা পরিশ্রম করতে নারাজ! বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। নমুনা হিসাবে একটি মাত্র জনপ্রিয় 'লোকরঞ্জক রম্য ইতিহাস'কে বেছে নিচ্ছি : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *পলাশীর যুদ্ধ*। গ্রন্থটি জনপ্রিয় হওয়ায় লেখক এর পর রচনা করেন : *পলাশীর পর বক্সার*। তপনমোহন প্রথমোক্ত গ্রন্থে লিখছেন :

> বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর (সিরাজদ্দৌলার) ঔদ্ধত্য-লাম্পট্য কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরও বেড়ে যেতে লাগল। বুনো স্বভাব যেন আরও বন্য হতে চলল। না হল তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তাঁর রাজকার্য চালানোর কোন জ্ঞানগম্যি। এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজদ্দৌলাকে কোনক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী ইংরেজ, কী ফ্রেঞ্চ, কী ডাচ একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি।[6]

এরপরে সেই পরিচিত দীর্ঘ ফিরিস্তি—গঙ্গার ঘাটে কোন সুন্দরী পুরললনা স্নান করতে এলে নিখোঁজ হয়ে যায়, খেয়া নৌকার যাত্রীদের মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা নাকি সিরাজের এক বিলাস ; গর্ভিণী নারীর উদর বিদীর্ণ করে ভ্রূণ দেখতে নাকি ভারি আমোদ পেতেন, ইত্যাদি, প্রভৃতি। তপনমোহনের পূর্বসূরীরা এসব কথা বলেছেন ; কিন্তু কেন, কারা এসব রটনা করেছিল তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। ইংরেজ ম্যাজিশিয়ানি কায়দায় বণিকের মানদণ্ডটাকে যখন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করল তখন তাদের ঐতিহাসিকদের বাধ্য হয়ে লিখতে হল কিছু : 'গিলি-গিলি—হোকাস-পোকাস।' হিন্দু রাজা-রাজড়া, মুসলমান আমীর-ওমরাহ্ নিজ নিজ স্বার্থে গদীর হকদারকে হটিয়ে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে কেন মদৎ দিলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে বই কি। প্রায় সকল পরবর্তী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত। অক্ষয়কুমার বলছেন :

> সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক ইংরেজ এবং মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে যে-সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুকীর্তির উল্লেখ আছে; কিন্তু গর্ভিণীর গর্ভবিদারণ, নৌকাসহিত ভাগীরথী-গর্ভে নরনারী নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচারের কোন উল্লেখ কোথাও নাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার অধিকাংশই নিছক রটনা।[7]

যুবরাজ সিরাজ মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত—একশবার। কিন্তু নবাব সিরাজ? শুনুন ঐতিহাসিক নিখিলনাথের জবানীতে :

> একটা কথা বলিয়া রাখি, সিংহাসনে আরোহণের পরেও ইতিহাসে সিরাজকে যে ঘোরতর মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যৌবনারম্ভে সিরাজ মদ্যপান করিতেন বটে কিন্তু আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।[8]

নিখিলনাথ আশঙ্কা করেছিলেন, পাঠক তাঁর কথা বিশ্বাস নাও করতে পারে ; তাই যুক্তির স্বপক্ষে সমকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিকের দীর্ঘ উদ্ধৃতি ফুটনোটে দাখিল করে সক্ষেদে বলছেন :

> ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।

তবু তপনমোহন সিরাজের স্বপক্ষে একটাও 'গুডকন্ডাক্ট'-এর সার্টিফিকেট খুঁজে পেলেন না। ঐ নবীন সেনের কাব্য ছাড়া! যে কারণে সমকালীন ঐতিহাসিক 'গুডকন্টাক্ট'-এর সার্টিফিকেট খুঁজে পাননি সে হেতুটি তো তপনমোহনের প্রতি প্রযোজ্য নয়! বিংশ শতাব্দীর লেখকের এ মানসিকতা কেন? নবীন সেন থেকে শচীন সেনগুপ্ত কেউই বলেননি যে, সিরাজ ছিল ধোওয়া তুলসীপাতা! কিন্তু ঐ জাতের একটি পাঁড় মাতাল—যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতিরাত্রে মদ্যপানে 'বেহেড' হয়ে যেত, সে যদি এককথায় মদ্যত্যাগ করতে পারে তাহলে সেই দৃঢ়চেতা-শয়তান Devil's dwe টুকুও পাবে না বিংশ শতাব্দীর লেখকের কাছে?

এ জাতীয় 'শৌখিন মজদুরী' ইতিহাস এবং সাহিত্য দু-তরফেই ক্ষতি করে!

(7) ঐতিহাসিক-কালের কথাসাহিত্য :

ব্যাপারটা কী? 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কী, তা আমরা জেনেছি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে। 'ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস' তাহলে কাকে বলছি?

পার্থক্যটা প্রণিধান করতে হলে সবার পূর্বে জানা দরকার কোন্ শর্তটি পালিত হলে দূরকালের একটি ইতিকথা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে স্বীকৃত হবে।

> কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুত্থান হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার

> একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূর বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।[৭]

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর বিবর্তন যখন আমরা বিচার করব তখন লক্ষ্য করব এই শর্তটি প্রত্যেকটি লেখককে পূরণ করতে হয়েছে। কখনো সোচ্চারভাবে, কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে। কিন্তু দূরকালের একটি কাহিনীতে—সুকথিত কাহিনীতে—যদি মহাকালের ঐ বিচিত্র-গম্ভীর সুদূর-বিস্তৃত ঝংকারটুকু শ্রুতিগোচর না হয়? তখন তাকে কী বলব?

ধরুন বিমল মিত্রের *সাহেব-বিবি-গোলাম*। দূরকালের কাহিনী। উপন্যাস। তাহলে কি এটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'? আমাদের বিচারে তা নয়। কেন নয়?

দেখছি, কতকগুলো কল্পিত চরিত্রকে দূরকালের একটি তাসের 'চিপেন্ডেল' টেবিলে হাত ফিরি করা হচ্ছে। সামাজিক আইনে প্রতিবারই সাহেবের পিট তোলার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে লেখকের পক্ষপাতিত্বে মাঝে-মাঝে তুরুপের গোলাম পিট নিজের কোলের দিকে টেনে নিচ্ছে। কল্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা কাঁদছি, সুখে হাসছি, কিন্তু ইতিহাস কোথায়? বাঈজী, বুলবুল, পায়রা-ওড়ানো, বাবু-কালচার মায় মহাকালের কর্ণধার 'ঘড়িবাবু'।—সব আছে—কিন্তু তবু তা ঊনবিংশ শতকের এক খণ্ডিত চিত্র। তা একদেশদর্শী। তা ইতিহাস নয়। তার হেতু—যে দুরবীনে আমরা সেই দূর কালটাকে দেখবার চেষ্টা করছি তার 'আইপীস'টা ঘষাকাচের! শিবের দোর ধরে যার জন্ম সেই সংস্কারাচ্ছন্ন ভূতনাথের চোখ দিয়ে বাংলার নবজাগরণের কালটাকে দেখা যায় না। তাই অগণিত কাল্পনিক চরিত্রের ভিড়ে ঠাঁই হয়নি কিছু পরিচিত মানুষের : বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। বিমল মিত্র বলতে চেয়েছেন It was the worst of times.....it was the season of darkness, বলতে ভুলেছেন, It was also the best of times, it was, nevertheless, the season of Light!

কিম্বা ধরুন কমল মজুমদারের : *অন্তর্জলী যাত্রা*। সমকালীন নিখুঁত চিত্র। 'সতীদাহ'-নামক ঐতিহাসিক প্রথার প্রভাব কতকগুলি কল্পিত নরনারীর উপর। তবু তাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলতে বাধে : সেটি সার্থক 'ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস'। হেতু ঐ—রুদ্রবীণার ঐ একটা তারের মূলরাগিণী শুনতে পাইনি।

আরও একটি অনবদ্য উদাহরণ—তারাশঙ্করের : *রাধা*।

আমাদের আপত্তি আছে তাকে 'ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস' বলতে! তা অসাধারণ, তা কালজয়ী, তা সাহিত্য জগতের দিকচিহ্ন। কিন্তু লেখক 'ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিতে চাননি। মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসীদলের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ঐতিহাসিক রসের ক্ষীণ সূচনা হতেই লেখক নৌকার দিক পরিবর্তন করে দিলেন। মনে হচ্ছে, লেখক কয়েকটি কল্পিত চরিত্রকে পাল্‌কিতে চাপিয়ে দু-আড়াই শ' বছর দূরের দেশে নির্বাসন দিয়েছেন। বাদশাহ বা নবাবের নাম মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হচ্ছে বটে, কিন্তু তারা লেখকের কাছে কোন পাত্তা পাচ্ছে না। 'ঐতিহাসিক রস' দানা বেঁধে উঠছে না। তার হেতু : তারাশঙ্কর সেই অতীতকালের সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে বড় করে দেখেছেন একটি তত্ত্বকে : 'রাধাতত্ত্ব'। উপন্যাস-অংশে লেখক সমকালীন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজের চিত্র আঁকতে অবহেলা করেননি, মায় বাজারে চাউলের দর পর্যন্ত। কিন্তু রুদ্রবীণার তারে বিগতযুগের ঝংকারকে ছাপিয়ে উঠছে একটা বাঁশীর তান। চরম দুঃখের আগুনে পুড়েই যে পরমপ্রেম নিখাদ হয়ে ওঠে, 'দ্বন্দ্ব' শব্দের যে দুটি অর্থ—এটাই লেখকের মূল বক্তব্য। পাত্রপাত্রীদের দূর কালে যেতে বাধ্য করেছেন এই কারণে যে, 'রাধাতত্ত্ব' তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি।

প্রায় একই কথা বিভূতিভূষণের *ইছামতী* প্রসঙ্গে।

'প্রায় একই কথা' বলছি এ জন্য যে, বিভূতিভূষণ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় সাধারণ নরনারীর—যারা উপন্যাস অংশের মূলচরিত্র নয়—কী অবস্থা, তা দেখতে ও দেখাতে চান। ইংরেজ কুঠিয়াল আর তাদের বশংবদ দেশীয় অনুচরদের অত্যাচারের চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন।

মূল বিচারটা বস্তুত 'রস'-এর। উপন্যাস-অংশের সঙ্গে ঐতিহাসিক রস কতটা মিশেছে, কী ভাবে মিশেছে এটাই বিচার্য। রাজা-রাজড়া অথবা সমকালীন ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তিদের যে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্য দেওয়া নেই। ধরুন *বৈকুণ্ঠের খাতা*। স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটিকা, ঠিক *মুকুট*-এর মতো। ঠিক? মোটেই নয়। রসের বিচারে দুটি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটিকা দুটি ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। কারণ *বৈকুণ্ঠের খাতায়* তিন-তিনটি নারী চরিত্র নাট্যকার এঁকেছেন নিপুণ তুলিতে। স্বীকার্য, তাঁরা মঞ্চে আসেননি। আছেন উইংস্-এর আড়ালে : কেদারের দজ্জাল পিসি, কেদারের সলজ্জ শ্যালিকা, আর বৈকুণ্ঠের সর্বংসহা 'নিরু-মা'। ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে নেপথ্যে থেকে মহাকালের মেঘডম্বরুর একটি বিচিত্র গম্ভীর গুরু গুরু আওয়াজ কানে আসা চাই। সে শব্দ নানান ঢঙের হতে পারে। তবে সে ধ্বনি মহাকালের। ঐতিহাসিক রস-এর মূল নিয়ামক-নায়ক : TIME !

সাহেব-বিবি-গোলাম্-এর ভূতনাথ অথবা *অন্তর্জলী যাত্রা*-র শ্মশানডোম নায়কোচিত চরিত্র কি না এটা বিচার্য নয়, সিডনে কার্টনও তো ছিল পাঁড় মাতাল। তার বাঁধা লব্জ্ : "আই কেয়ার ফর নোবডি অ্যান্ড নোবডি কেয়ার্স ফর মি।" তবু ডিকেন্স-এর *আ টেল অব টু সিটিজ* বিশ্বসাহিত্যের এক অনবদ্য সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারণ সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল নায়ক মহাকাল 'অতীত' একেবারে প্রথম পংক্তি থেকে ঘটমান 'বর্তমান' :

> It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness; it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were going direct the other way—in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil, in the superlative degree of comparison only."[10]

*দুই নগরীর কাহিনী*তে ফরাসী বিপ্লবের কোন বিখ্যাত/ কুখ্যাত নায়ক অনুপস্থিত ; কিন্তু বিপ্লবোত্তর পৈশাচিক রক্ততৃষ্ণার যে অমানুষিক বীভৎস-রস করুণ-রসে আপ্লুত হতে চাইছে সেই ঐতিহাসিক উপাদানটি লেখকের রুদ্রবীণায় মন্দ্রিত। আর সেই মূলতানের মূল তানে ঐ মদ্যপ নায়কের মাৎলামি-মাখা অগীত-গান একটা বেদনবিধুর ঐকতান তুলেছে।

(8) ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের বিবর্তন :

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যকে আমরা এখানে দ্বিধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', দ্বিতীয়, 'ঐতিহাসিক ছোটগল্প'। আকারে এবং চরিত্রগত পার্থক্যে দু-জাতির হলেও উভয়স্থলেই ঐতিহাসিক রস অনিবার্যভাবে উপস্থিত। একে একে আলোচনা করা যাক।

(8A) ঐতিহাসিক উপন্যাস :

আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন :

> ইতিহাসের কাহিনী নিয়েই আমাদের দেশে গদ্যগল্পের সূত্রপাত। বিগত শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে কিছু গল্প লিখেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। শশিচন্দ্রের পথ অবলম্বন করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলায় দুটি গল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি *অঙ্গুরীয় বিনিময়*, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে কিঞ্চিৎ ছায়া ফেলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে পশ্চাৎপট করে তাঁর রোমান্সগুলির গল্প জমিয়েছেন। তারপর শশিচন্দ্রের স্নেহপালিত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত রীতিমতো ইতিহাস-অনুগত উপন্যাস লিখলেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল।[11]

রমেশচন্দ্রের খুল্লতাত রায়বাহাদুর শশিচন্দ্র (1824-85) যে কাহিনী লিখেছিলেন তা ইতিহাসের

উপাদানে নয়। তাঁর *Reminiscences of a Kerany's life* সমকালীন বাঙালী বাবুদের সরকারী চাকুরীলাভের লোলুপতার বিরুদ্ধে শ্লেষ। *Sankar—a Tale of the Indian Mutiny* আজকের দিনে নিশ্চয়ই ইতিহাস, কিন্তু শশিচন্দ্র তা সিপাহীযুদ্ধের সমকালে দাঁড়িয়ে রচনা করেছিলেন। ফলে তা ইতিহাস নয়। তবে সিপাহীযুদ্ধের সমকালে রচিত লেখকের একটি পংক্তি না শুনিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে মন সরছে না।

> "ভবিষ্যতে একদিন ভারতবাসীর সম্মিলীত প্রয়াসে ইংরাজ বাধ্য হবে এ-দেশ ছেড়ে যেতে... তখন আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয়ের অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেবে।"[12]

ভূদেবচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হোন বা না হোন বঙ্কিমচন্দ্র (1838-94) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হাতে রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন তাঁর নায়কের মতোই দড়বড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে : *দুর্গেশনন্দিনী* (1865)। তার পরের পর্যায়ে *রাজসিংহ* পর্যন্ত আটখানা উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের কমবেশি যোগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং স্বরচিত একটিমাত্র উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর মর্যাদা দান করেছেন : *রাজসিংহ*। অন্যান্যগুলি, তাঁর মতে, খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণে' আচার্য যদুনাথ সরকার অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে তথ্যগত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস।' পরবর্তীকালে এক-এক গবেষক এক-এক কথা বলেছেন, যেমন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে *সীতারাম* ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, যেহেতু তার মুখ্য আবেদন নরনারীর প্রেম, দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি—সমকালীন ইতিহাস নয়। অর্থাৎ যে কারণে আমরা তারাশঙ্করের রাধাকে 'ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস' বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই নাম করতে হয় তাঁর দশ বছরের অনুজ রমেশচন্দ্র দত্তের (1848-1909)। এই আই. সি. এস. অফিসার সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে। তাঁর মোট ইংরেজি রচনার সংখ্যা দশটি—ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সব বিষয়েই। তাঁর একটি গ্রন্থে (Economic History of British India) ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ পদ্ধতি এমন সুচারুরূপে উদ্ঘাটিত করা হয়েছিল যে, জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক পরবর্তীকালে তার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, —"A book like this does more work than cart-loads of Congress resolutions"! বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে বাঙলাভাষার দিকে আকর্ষণ করেন। রমেশচন্দ্রের চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসই কালজয়ী : *বঙ্গবিজেতা* (বঙ্গদেশ 1874), *মাধবীকঙ্কণ* (শাহজাঁর শেষজীবন, 1877), *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* (শীবাজী ও আওরঙ্গজীব, 1878), *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (বঙ্গবিজেতার পরবর্তী রাজপুত কাহিনী, 1879)। রমেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের* ভূমিকাতেই বলেছেন :

> "পাঠক। একত্র বসিয়া একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাহিব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে। নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।[13]

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নামটি হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর। *বালক* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্ণকুমারী দেবী (1855-1932)। মাত্র একুশ বছর বয়সে রচিত তাঁর *দীপনির্বাণ* (1876) ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্র-উৎস টড-এর রাজস্থান। উপন্যাসে ঘটনার ভিড় কিছু বেশি, এবং আকস্মিকতা তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু তরুণী লেখিকা যে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উন্মাদনায় এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর *মিবাররাজ* (1887), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (1888) এবং *বিদ্রোহ* (1890)। স্বর্ণকুমারীর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস *ফুলের মালার* (1895) পটভূমি রাজা গণেশের আমলের বঙ্গদেশ। গবেষক বিজিতকুমারের মতে,

> স্বর্ণকুমারী দেবী তখন অভিজ্ঞতার প্রৌঢ় পরিণতিতে আসীন। *ফুলের মালাতে* স্বর্ণকুমারী

দেবী সার্থকতায় পৌঁছেছিলেন। *ফুলের মালার* ইংরাজী অনুবাদ 1909 খ্রীষ্টাব্দে মডার্ণ রিভিয়্যুতে বার হয় *The Fatal Garland* নামে।[14]

পুঠিয়া স্টেটের শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (1860-1908) কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন—*ফুলজানি, বিশ্বনাথ* এবং *শক্তিকানন*। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সাবডেপুটি কালেকটর। তিনখানি উপন্যাসের কোনটিই ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি। নানা কারণে। কিন্তু তাঁর শেষজীবনে আলিবর্দীর রাজত্বকালের পটভূমিকায় মেদিনীপুরের এক ভূস্বামী পদাঙ্কনারায়ণকে নায়ক করে যে কাহিনী লিখলেন—*রাইবণীদুর্গ* (1906), তা সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের *বউঠাকুরাণীর হাট* প্রকাশিত হয়েছিল 1882 খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ কালের মাপে ততদিনে বঙ্কিমের প্রায় সব কয়টি এবং রমেশচন্দ্রের চারখানি গ্রন্থই প্রকাশিত কিন্তু কবিজ্যেষ্ঠা স্বর্ণকুমারীর পাঁচখানির ভিতর মাত্র একটিই প্রকাশিত—*দীপনির্বাণ* (1876)। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় গ্রন্থরচনার পূর্বে রামরাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* এবং দুইখণ্ডে প্রকাশিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধি *পরাজয়* এর (1869) প্রথম খণ্ড পড়েছিলেন (দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের দুই বছর পর)।

বউঠাকুরাণীর হাট বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটি জলবিভাজন রেখা। ইতিপূর্বে কী বঙ্কিম, কী রমেশচন্দ্র, কী স্বর্ণকুমারী, কী শ্রীশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন স্বাদেশিকতার উন্মাদনায়, দেশাত্মবোধের উৎসাহে। এই প্রথম দেখা গেল একজন কথাসাহিত্যিককে যিনি নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠায় খাঁটি ইতিহাসকে উপন্যাসের কাহিনীর উপজীব্য করেছেন। যে কালে 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতিবাক্যটি সকলেই মেনে চলতেন সেই সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক বালকের "প্রাচীর-ঘেরা মন বেড়িয়ে পড়ল বাহিরে তখন, সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রকাশ দেখা দিল : *বউঠাকুরাণীর হাট* গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা।"[15]

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে রচনাবলীতে সংকলনের সময়ে পরিণত বয়সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ *বৌঠাকুরাণীর হাট*-এর ভূমিকায় লিখেছেন :

"এই উপলক্ষ্যে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলা দেশের বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময় তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোক। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।"[16]

এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এ-কারণে যে, স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার যে প্রচেষ্টার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন তার পুরোভাগে ছিলেন তাঁরই ভাগিনেয়ী স্বনামধন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী। স্বর্ণকুমারীর কন্যা। 1903 সালে সরলা দেবী চৌধুরাণী মহারাষ্ট্রের 'শিবাজী উৎসব'-এর অনুকরণে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসবে দীর্ঘ কবিতা লিখে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তবাসীদের সঙ্গে দেশাত্মবোধের মহাযজ্ঞে আত্মিক সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভাগ্নীকে সমর্থন করতে পারেননি। সাহিত্যিকের ইতিহাসনিষ্ঠার এটি এক দুর্লভ উদাহরণ।

তা হোক, কিন্তু *বউঠাকুরাণীর হাট* পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের প্রশংসা করেছিলেন। সম্ভবত তরুণ লেখকের ভিতর প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে বলেছেন

চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে

> পারেনি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস—একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *রাজর্ষিতে* (1886) উপন্যাস ও ইতিহাস হাত মিলিয়েছে। রাজা গোবিন্দমানিক্যের অহিংসা আর রঘুপতির সংস্কারাচ্ছন্ন হিংসার দ্বন্দ্ব যেন দুদিকই বজায় রেখে চলেছে। তাই রাজর্ষি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মেন লাইনে পরবর্তী জংশন-স্টেশন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (1853-1931) *বেণের মেয়ে* (1915)। বলা বাহুল্য *রাজর্ষি* আর *বেণের মেয়ের* মাজখানে অনেকগুলি ছোট ছোট স্টেশন আছে যেখানে লোকাল ট্রেন দাঁড়ায়। হারানচন্দ্র সাহার *রণচণ্ডী* (1876), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *জাল প্রতাপচাঁদ* (1882), কালীপ্রসন্ন দত্তের সিপাহীযুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস *বিজয়* (1884), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও সিপাহীবিদ্রোহমূলক *অমর সিংহ* (1889) প্রভৃতি প্রায় সমকালের রচনা—কিছু আগে-পরের। কিন্তু সেসব স্টেশনে গবেষক ভিন্ন আর কোন ডেলি-প্যাসেঞ্জার ওঠা-নামা করে না। স্বয়ং হরপ্রসাদের প্রথম প্রচেষ্টাও *কাঞ্চনমালা* প্রথমে বঙ্গদর্শনে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর *বেণের মেয়েকে* এই ধারাবাহিকতা ইতিহাসে দিকচিহ্ন বলতে হচ্ছে বিশেষ হেতুতে।

কাঞ্চনমালায় হরপ্রসাদ ছিলেন বঙ্কিমের অনুগামী একজন গতানুগতিক কথাসাহিত্যিক ; কিন্তু বত্রিশ বছর পরে *বেণের মেয়েতে* তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা নূতন দিকদর্শকরূপে উপস্থিত। ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন :

> *বেণের মেয়ে* ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। *বেণের মেয়ে* একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে বাঙ্গালার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?[17]

বেণের মেয়েতে রাজা হরিবর্মদেব এবং মহীপালের উল্লেখ আছে। যুদ্ধের পটভূমিকা সন্ধাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য অনুসারী, যদিচ যুদ্ধ বর্ণনা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম ও মানিকরামের অনুসরণে। যোদ্ধারা ডোম ও বাগ্‌দী। ভবদেব ভট্টও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লুই সিদ্ধাও তাই। কিন্তু হরপ্রসাদের কৃতিত্ব এই যে, তিনি 'ইতিহাস' বলতে রাজা-রাজড়ার কীর্তি-কাহিনী বোঝেননি। সমকালের সাধারণ মানুষের ছবি এঁকে গেছেন নিপুণ তুলিতে। ধনপতি-শ্রীপতি বা চাঁদ-সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার রীতিনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, কিন্তু নৌকার গলুইয়ের অন্তরালে মাঝি-মাল্লাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতাম না। বিলাসব্যসনে মগ্নচৈতন্য ধনীর পায়রা-ওড়ানোর বর্ণনা জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের দেহরক্ষী বাগ্‌দী, ডোম লাঠিয়ালদের কথা এতদিন শোনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'কে সার্থক হতে হলে যে শর্ত আরোপ করেছিলেন—মহাকালের রুদ্রবীণার বিচিত্র গম্ভীর ধ্বনি—হরপ্রসাদ যেন তার এক করোলারি এনে উপস্থিত করলেন। বললেন, 'মহাকাল'-এরও তো নানান রূপ! রুদ্রবীণার বদলে তিনি খেয়াল হলে মাঝে মাঝে খঞ্জনিও বাজান, কিংবা বাঁশি, এমনকি গুবগুবি!

আচার্য সুনীতিকুমারের মতে :

> রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস যে বাংলার শ্রেষ্ঠ রসরচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এঁদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গৌণ, মুখ্যবস্তু হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ ও চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর *বেণের মেয়ে* উপন্যাসে যে-

> ভাবে প্রাচীন সামাজিক বাতাবরণকে জিইয়ে তুলেছেন তা অদ্ভুত। তাঁর পূর্বে এ-বিষয়ে আর কেউ এতটা সার্থকতা দেখাতে পারেননি। রাখালদাস আরও পরবর্তীকালের পূর্ণতর তথ্যসম্ভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কয়খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তা একাধারে উপন্যাস আর অনবদ্য ঐতিহাসিক চিত্র।[18]

হরপ্রসাদের পরের ধাপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (1885-1930)। এবারেও এই গুরুশিষ্যের মাঝখানে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস এসেছে। শরৎকুমার রায়ের *মোহনলাল* (1906) একটি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থের নামকরণ যদিও নায়কের নামে, প্রধান চরিত্র খলনায়ক উমীচাঁদ। সে যেন শেক্সপীয়ারের ইয়াগো আর শাইলকের মিলিত ফল। তার ছলনায় সকলেই ফাঁদে পা দিয়েছে : রাণী ভবানি, তারাসুন্দরী, মীরণ, মীরজাফর, মোহনলাল, সিরাজ। দুর্গাদাস লাহিড়ীর *রাণী ভবাণি* (1909), দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *নানাসাহেব* (1929) এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস *ডঙ্কা নিশান*। পরবর্তী দিকচিহ্ন : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর সাতখানি উপন্যাস উল্লেখের দাবী রাখে : *শশাঙ্ক* (1914), *করুণা* (1915), *ধর্মপাল* (1916), *ময়ূখ* (1917), *অসীম* (1925), *লুৎফউল্লা* (1928), এবং *ধ্রুবা* (1932).

আচার্য সুকুমার সেনের মতে :

> রাখালদাস ইতিহাসের পাঠক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসের লেখক। ইনি ইতিহাস বিদ্যাকে অধিগত করেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মালমশলা টাট্কা সব্জির মতো স্বাদু। রাখালদাসের উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফল হয়। ....সাধারণ পাঠকের কাছে রাখালদাসের উপন্যাস—বোধকরি *ময়ূখ ছাড়া*—যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল ততটা পায়নি। সে দোষ সম্পূর্ণ সাধারণ পাঠকের নয়।[19]

সৌজন্যবোধে সুকুমার সেন-মশাই যে-কথা ইঙ্গিতে বলে থেমেছেন, আমাদের তা স্পষ্টাক্ষরে বলতে হবে। ইতিহাস সম্বন্ধে বৈদগ্ধ্যই সার্থক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-রচনার ছাড়পত্র নয়! সাহিত্য রচনার প্রসাদগুণও সমানভাবে প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুটি রসই থাকা চাই—ইতিহাস ও সাহিত্য। তাদের সুষম বণ্টনে রচনার সার্থকতা। *রাজসিংহ-এ* ঐতিহাসিক-রসের প্রাবল্য, প্রধান চরিত্রগুলি অধিকাংশই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে তা নয়। নায়ককে পিতৃপরিচয়ে সহজেই শনাক্ত করা যায়। নায়িকার পরিচয় বুড়ো ইতিহাসের মনে থাকত না যদি না বঙ্কিমবাবু তাকে পুনর্জীবিত করতেন। একই কথা *দেবী চৌধুরাণী* প্রসঙ্গে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা ফকির বিদ্রোহের সুবিখ্যাত নেতা মজনু শাহ্ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের এজলাসে পাত্তাই পেলেন না, লেখক হান্টার না গ্লেজিয়ার কোন সাহেবের সংকলিত নথীপত্র ঘেঁটে উদ্ধার করলেন *দেবী চৌধুরাণীকে*। এখানে চার আনা ইতিহাস, বারো আনা উপন্যাস। আর *কপালকুণ্ডলা?* পনের আনার পর সাড়ে-তিন কপর্দক উপন্যাস। আড়াই-গণ্ডা ইতিহাস উঁকি দিচ্ছে যখন মেহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেলিম ভারতের সিংহাসনে, আমি কোথায়!"

য়ুরোপীয় সাহিত্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। স্কট অতীতকে জীবন্ত করতে গিয়ে জীবন্ত মানুষ আমদানী করেছেন। *আইভ্যান হো-তে* প্রথম রিচার্ড ও জন উপস্থিত; কিন্তু তাঁদের ভূমিকা মুখ্য চরিত্রের নয়। অপরপক্ষে যাঁরা মুখ্য চরিত্র তাঁরাও নিতান্ত সাধারণ মানুষ নন—বীরত্ব, শিভ্যালরি, আত্মসম্মান ইত্যাদি নিয়েই তাঁদের চিন্তার জগৎ। তুলনায় থ্যাকারের হেনরি এসমন্ড-কে চিহ্নিত করা যায় বাস্তববাদী ধারায়। আর ডিকেন্স-এর *দুই নগরীর কাহিনীতে* লেখক 'বাস্তববাদী-রোমান্টিক'। নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম আর আত্মত্যাগের পাশাপাশি জ্যাকোবিনদের ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্ময় জাগায়। মনে প্রশ্ন জাগে—কে নিখুঁত? সিডনে কার্টন, না ম্যাডাম ড'ফার্জ? এর পাশাপাশি দেখুন টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*। এপিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক নরনারী সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেছেন বললেই যথেষ্ট হয় না—প্রমাণ করেছেন তাঁরাও রক্তমাংসে-গড়া সাধারণ

মানুষ—ঐ নেপোলিয়ান আর কুটুজোভরা। তাঁদের অসি-ঝঞ্ঝনা আর বীরত্বমহিমাকে সমাচ্ছন্ন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে অগণিত সাধারণ মানুষের আশা আকাঙক্ষা, হাসি-অশ্রুর খণ্ডকাহিনী : আন্দ্রে, নাতাসা, পিয়ের, প্লাতো প্রভৃতি। ইতিহাসের সমান্তরালে সমান তরঙ্গবেগে চলেছে মানবসত্যের নিত্য প্রবহমান ধারা। টলস্টয়ের *যুদ্ধ আর শান্তি* পড়তে পড়তে উপলব্ধি হয় লুকাস-এর উক্তির যাথার্থ্য :

> Truth lies in the secrets of human hearts, whose interactions are neglected by the historians. The characters of a novel are forced to be more rational than historical characers.

এইসব কথা মনে রাখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না—মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ এবং রাখালদাসের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেই ধারাটি পরবর্তীকালের অনেক অনেক কথাসাহিত্যিককে আকৃষ্ট করেছে। আজও তা রচিত হচ্ছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটির নামোল্লেখ করি : *পদসঞ্চার, উপনিবেশ, অমাবস্যার গান, গোপালদেব, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, লালকেল্লা, বহ্নিবন্যা, কেরী সাহেবের মুন্সী, জব চার্ণকের বিবি, লালবাঈ, সেই সময়* এবং, অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ, *রূপমঞ্জরী*।

কিন্তু আকারে ছোট হওয়ায়, উপন্যাসের স্বীকৃত লক্ষণাদি না দেখতে পেয়ে ইতিহাস-রসমণ্ডিত কথাসাহিত্যের আর একজাতির বেসাতিকে কী নামে অভিহিত করব? আমরা তাদের বাধ্য হয়ে বলেছে 'ঐতিহাসিক ছোট গল্প'।

এবারেও আমাদের মতে তা দু-জাতের।

একটি ধারা : **ঐতিহাসিক ছোটগল্প**—যেখানে ঐতিহাসিক-রস কাহিনীতে মিশ্রিত করা হয়েছ।

দ্বিতীয় ধারা : **ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প**—যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত, হয়তো ঐতিহাসিক কালটি অনির্দিষ্ট—শুধু বোঝা যায়, তা দূরকালের কাহিনী। বিশেষ প্রয়োজনে লেখক কয়েকটি কল্পিত চরিত্রকে দূরকালের পটভূমিকায় এঁকেছেন!

ঐতিহাসিক ছোটগল্প : *নববাবুবিলাস*-এর (1825) অস্তিত্ব সত্ত্বেও যেমন ধরা হয় *দুর্গেশনন্দিনী* (1865) বাংলাসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস, তেমনি বোধহয় আমরা ভূদেবচন্দ্রের *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এর (1857) অস্তিত্ব সত্ত্বেও ধরে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের *দালিয়া* (1891) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্প। তার কাঠামোটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, উপন্যাস হতে-হতে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে সেটি ছোটগল্প হয়ে গেছে। আট পৃষ্ঠার গল্পাংশ ছয়টি পরিচ্ছদে বিভক্ত, তদুপরি একটি ভূমিকা। যেন উপন্যাসের প্রথম খসড়া!

সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি মাঝে-মাঝে ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিখেছেন বটে কিন্তু শরদিন্দুর মতো একাত্ম হয়ে এই শাখাটিতে নিবদ্ধদৃষ্টি হননি। প্রাক-শরদিন্দু কালে মুসলমান-যুগ, শাহী দরবার, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র নিয়েই লেখকেরা মেতে ছিলেন; শরদিন্দু তাই শুধু মুস্‌লিম অধিকারকালে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন যুগ এবং বিচিত্র দেশ থেকে তাঁর কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকে কাহিনীগুলি দু-জাতের :

প্রথম দলে দূর-ইতিহাসের সঙ্গে শরদিন্দু বর্তমানকালের মেলবন্ধন করেছেন। এর অধিকাংশের মূলে 'জাতিস্মর' পরিকল্পনা। আচার্য সুকুমার সেন বলছেন : 'শরদিন্দুবাবু জাতিস্মর ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা ঠিক জানি না'। তা থাকুন-না-থাকুন পাঠককে তিনি বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন। কোন কোন কাহিনীতে জাতিস্মর-তত্ত্ব স্বীকার না করেও অতীত ও বর্তমানের অদ্ভুত মেল-বন্ধন করা হয়েছে; যেমন, *ইন্দ্রতূলক, চন্দনমূর্তি*। শরদিন্দুর এই অতীত-বর্তমান একাকার করে দেওয়া যে-সব কাহিনী—*অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্তি, রক্তসন্ধ্যা, রুমাহরণ, ইন্দ্রতূলক, সেতু*—তার গঙ্গোত্রী বোধকরি গল্পগুচ্ছের ছোট গল্প *দুরাশা* (1898)। শরদিন্দু বলেছেন জাতিস্মর তত্ত্বটা তাঁর মস্তিষ্কে উদয় হয় জ্যাক লন্ডনের একটি উপন্যাস পাঠ করে। *দুরাশার* লেখক বুট জুতা এবং ম্যাকিন্টশ, বার্ডস্ আই এবং ফেল্ট-

হ্যাট সম্বল করে দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের কুয়াশা-ঢাকা একান্তে যে কাহিনীর অবতারণা করলেন তাতে ঐতিহাসিক রস ভরপুর :

> নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।[20]

এ কাহিনী যেদিন রচিত হয় তার পরবৎসর জন্মগ্রহণ করেন শরদিন্দু। কিন্তু এই ভাষা, এই আঙ্গিক, এই রসপরিবেশনের শৈলী তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা করেছিল দীর্ঘদিন, গল্পগুচ্ছের পৃষ্ঠায়।

দ্বিতীয় জাতের গল্পে বর্তমানকাল অনুপস্থিত। পাঠককে সরাসরি ঐতিহাসিক-কালে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর শুরু ও শেষ অতীতে : *বাঘের বাচ্চা, অষ্টম সর্গ, চুয়াচন্দন, বিষকন্যা, শঙ্খ-কঙ্কণ, রেবা-রোধসি* প্রভৃতি।

এ তো গেল 'কাল'-এর বিচার। এবার কাহিনীর গঠন-চাতুর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো এই ছোট গল্পগুলিতেও ইতিহাস আর কাহিনী, বাস্তব আর কল্পনার অনুপাতে গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কোথাও মূলচরিত্রগুলি ইতিহাসের পরিচিত নরনারী। ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক। যেমন, *মৃৎপ্রদীপ, অষ্টম সর্গ, তক্ত-মুবারক, রক্তসন্ধ্যা*। কোথাও বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থাপিতই করা হয়নি, যেমন *সেতু*। 'দেবপাদ কনিষ্ক' নামটা সে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র কালটাকে চিহ্নিত করতে। যেমন গল্পগুচ্ছের দালিয়া ; 'শাহ্ সুজা'র নাম শুধুমাত্র ভূমিকা অংশেই নিঃশেষিত। কখনো বা ঐতিহাসিক বস্তু, ব্যক্তি বা কালের ইঙ্গিতমাত্র করা হয়নি যথা : *মরু ও সঙ্ঘ, রুমাহরণ*।

মুজতবা আলী একবার বলেছিলেন :

> ক্লাইমেক্স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব। মোপাসাঁর পর বিস্তর লোক এনতার ছোটগল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়ে ভাল লিখেছেন ; কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারও হল না। চেখফ্ই প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেশ ছোট গল্প লেখা যায়। ... আর রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ, চেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে।[21]

শরদিন্দু অম্নিবাসের ষষ্ঠখণ্ডে সতেরটি ঐতিহাসিক ছোটগল্প সংকলিত। প্রকাশক আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, ঐ হচ্ছে 'সমুদয় ঐতিহাসিক ছোটগল্প'। আমরা যদি বিচার করে দেখি, তাহলে নজরে পড়বে আলী-সাহেবের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে তিনজাতের ছোটগল্পই শরদিন্দু লিখেছেন।

মোপাসাঁ-ধর্মী—আরও সহজে চেনা যাবে যদি বলি 'ও হেন্‌রি'-ধর্মী—এক জাতের ঐতিহাসিক ছোটগল্প রচিত হতে পারে যা নাকি অন-ঐতিহাসিক গল্পে সম্ভব নয়। এই কায়দাটিকে ইংরাজীতে বলে 'টুইস্ট ইন দ্য টেইল' [অ্যালিস-বর্ণিত মার্জারকথিত মূষিককাহিনী অনুসরণে বানান tail এবং tale দুইই হতে পারে]। বাঙলা কথাসাহিত্যে এ পারদর্শিতায় ও'হেনরির অনবদ্য তুলনা বনফুল। কিন্তু দুজনের কারও পক্ষেই শরদিন্দুর প্যাঁচ কষা সম্ভবপর নয়। কারণ প্যাঁচটা হচ্ছে কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় শেষ মুহূর্তে উদ্ঘাটন। ও'হেনরি বা বনফুল এ কায়দা করলেই তাঁদের ঐতিহাসিক ছোট-গল্পকার হয়ে যেতে হত। পাঠক যদি ইতিহাসে আলিম হন তাহলে দু-চার লাইন পড়েই মুখ টিপে হাসবেন ; আর আমার মতো গোলামার্কা হলে একেবারে শেষ পংক্তিতে পৌঁছে মাহাত্ম্যটা সম্ঝে নিয়ে বলবেন : মাই গড। ইনি গৌটামা বুড্ঢার সঙ্গে....

ধরুন, *বাঘের বাচ্চা*। শরদিন্দু কাহিনীতে বৃদ্ধ ও বালকের নাম দুটি এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি কাহিনীর শেষেও বাঙালীর অপরিচিত বানানে মারাঠী নাম দুটি লিখিত হল 'শিব্বা' এবং 'দাদোজী কোণ্ডু'রূপে। তবু পাঠক নিজের ইতিহাসজ্ঞানের মাপকাঠিতে কাহিনীর কোথাও না কোথাও চরিত্র দুটিকে সনাক্ত করবে এবং তৎক্ষণাৎ আবিষ্কারের বিমল আনন্দলাভ করবে। এবার ঐ বৃদ্ধ এবং বালকের কিছু কথোপকথন নমুনাস্বরূপ দাখিল করি :

> বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কিন্তু এ রকম (সংখ্যাগরিষ্ঠ ডাকাতদলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করে) মরে লাভ কী দাদো?' তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে, ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।'
>
> ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুশমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না বলছিলে ভয় কাকে বলে জানো না?'
>
> বালক বলিল, 'ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কী? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধা হবে। পরে ওদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদেরই জিত হল।'
>
> দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোননি?'
>
> বালক বলিল, 'রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যত বড় বীর, তিনি তত বড় বোকা।[22]

পড়ে মনে হয়—রমেশচন্দ্র মোটা মোটা দুখানি উপন্যাসে যা বলতে চেয়েছিলেন শরদিন্দু এখানে তা শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষামি' বলে শুনিয়ে গেলেন। একটি অনুচ্ছেদে *'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'* এবং *'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'*-এর নির্যাস। শরদিন্দুর এই কাহিনীটি অন্যান্য কাহিনীর মতো জনপ্রিয় নয়। তার হেতু এটি এতই উচ্চমানের যে, জনপ্রিয়তা গুণ এখানে প্রত্যাশিত নয়। মোহিতলাল মজুমদার একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে শরদিন্দুকে *চুয়াচন্দন* বইটির সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন (তাতে *চুয়াচন্দন* ব্যাতিরেকে *মরু ও সঙ্ঘ, রক্তসন্ধ্যা, বিষকন্যা* প্রভৃতি জনপ্রিয় গল্পগুলি ছিল)

> *চুয়াচন্দন*-এর গল্পগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে *বাঘের বাচ্চা*। একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে, reconquest of antiquity. ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন (চিঠি, ব্যক্তিগত, তাং 8.9.1940)।[23]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর একটি ছোটগল্পে (নাম মনে পড়ছে না) একটি অসাধারণ ও'হেনরি জাতীয় ওস্তাদের মার শেষরাত্রে মেরেছেন। নদীয়া জেলার ছেলে মেঘনা পার হতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মৃত্যুমুখে পড়েন। মাঝি যখন বলছে, 'বাবু আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করুন', তখন বাবু বললেন, 'আমি ডুবে মরি ক্ষতি নেই তুমি এই পুলিন্দাটা পৌঁছে দিও ওপারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে।' মাঝি জানতে চায় ঐ পুলিন্দাতে কী আছে? বাবু বলেন, একটা নাটকের পাণ্ডুলিপি, মানে যাত্রার পালা-গান আর কি!

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে পাঠক জানতে পারে বাবু হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র এবং পালাগানটা *নীলদর্পণ*। অসাধারণ 'টুইস্ট ইন দ্য টেইল'।

দু-একটি ক্ষেত্রে এই শেষ প্যাঁচ মারার উৎকট উৎসাহে শরদিন্দু যে কাণ্ডটা করেছেন তাকে 'ক্রিকেট' বলা যায় না। আমরা কী বলি তা অনুক্ত থাক, সেটা শ্রুতিকটু।

শরদিন্দুর বিচিত্র ভাষায় তা 'হস্তলাঘবতা'। ধরুন *আদিম* গল্পটিতে। লেখক প্রথম পংক্তিতে বললেন, "এই কাহিনীতে আদৌ স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীদের প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।"

আমরা মনে মনে বলি, 'বুঝেছি। যেমন শিবাজীকে 'শিব্বা', দাদাজী কন্বদেওকে 'কণ্ডু'।

শরদিন্দু ঐ সুবাদে মিশরের রাজার নাম দিলেন 'সূর্যশেখর', পত্তিনায়কের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়ে আছে তার সহোদরা ভগিনীর! পাঠক চমকে উঠে লাইনটা দুবার পড়ে। শরদিন্দু হাসতে হাসতে বলেন, "অমন চমকে উঠলে কেন হে? হবেই তো! ওর বাবা-মাও তো ছিল সহোদর ভাই বোন! কেন? সে-কথা বলিনি?" শেষপ্যাঁচটা মারবার জন্য লেখক নীল 'নদ'কে তিন-তিনবার 'নদী' বলেছেন। এটি বোধকরি শরদিন্দুর ও'হেনরিধর্মী নিকৃষ্টতম গল্প।

শেষ চমকটা যে ঐতিহাসিক ধাক্কা হতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। মোপাসাঁধর্মী অন-ঐতিহাসিক গল্পের শেষ চমক নানান জাতের হতে পারে। কখনো তা নিয়তির নিদারুণ নিষ্ঠুরতা (নেকলেস), কখনো ভালবাসার কাছে ভাগ্যের পরাজয় (গিফ্‌ট্ অব দ্য ম্যাজাই) আবার কখনো বা সতীত্বপনার মান-নিরূপণ (ব্যুল দ্য সূফ)।

যে কোনও প্রতিষ্ঠিত চরিত্র কাহিনীর শেষে ভিন্নরকম আচরণ করলে আমরা চমকে উঠি। সেটাও চমক বা stunt ! শরৎচন্দ্রের *'বিপ্রদাস'* যদি শঙ্করের *চৌরঙ্গিতে* স্ট্রিপ-টিজ নাচের আসরে উপস্থিত হন, অথবা *'গোরা'* যদি পরশুরামের অ্যাংলো মোগলাই 'কেফ্'-এ এসে 'ডবল ডিমের রাধাবল্লভী' অর্ডার দিয়ে বসেন তাহলে আমাদের প্লীহা কম্পন উপস্থিত হবেই। বস্তুত *দৃষ্টিপাত*-এর শেষপাতে আধারকারের কাহিনীতে এমন একটি অযৌক্তিক স্টান্ট-এর ধাক্কা আজও ভুলতে পারিনি। মনে হয়েছিল, এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত লেখক নায়িকার চরিত্রচিত্রণে কোথাও দেননি। এ হয় না! এ চমক মেলোড্রামাটিক!

ঠিক একই কাণ্ড ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের *দুরাশা গল্পে*। ঐতিহাসিক ছোটগল্প। যদিও ইতিহাস কালের-মাপে সাঁইত্রিশ বছর অতীতের। 1895-এ লেখা সিপাহী বিদ্রোহের গল্প। ওস্তাদ শেষ রাত্রে অনুরূপ ধাক্কা মারলেন! নিষ্ঠাবান নায়ক 'বিপ্রদাস' অথবা 'গোরা'র অপেক্ষা কম শুদ্ধাচারী নয়। তার পরিবর্তন দেখে চিৎকার করে বলতে গেলাম, "এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত লেখক কোথাও দেননি, ..."

বাকিটা বলা গেল না। মনে হল, তবু এমনটাও হয়! নায়ক তো দেবতা নয়, সে যে জানোয়ার—না হলে ওভাবে নায়িকাকে আঘাত করতে পারে? না, না, কী বলছি! নায়ক তো জানোয়ার নয়, সে যে দেবতা—না হলে মৃত্যুমুহূর্তে যবনস্পর্শিত পিপাসার পাত্র ওভাবে সরিয়ে রাখতে পারে? সব শেষে অনুভব হয়—নায়ক দেবতাও নয়, দানবও নয়, সে নিতান্তই : মরমানুষ!

আর তাতেই শেষ ধাক্কাটা ড্রামাটিক, মেলোড্রামাটিক নয়!

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে এখানে আরও একটি কথা বলি। ঐ যে পাঠকের মনে হল 'এমনটা যে হতে পারে তার কোন ইঙ্গিত *দুরাশা*-র লেখক কোথাও দেননি', সেটা ঠিক নয়। দিয়েছেন। কাহিনীর মধ্যেই। কিন্তু পাঠক তা খেয়াল করে দেখে না। শেষ চমকটা তাই 'প্রাপ্যপ্রাপ্তি'—নাকের উপর চশমা তুলে চশমা খোঁজা। কেউ দেখিয়ে দিলে তবে টের পাওয়া যায়। অথবা ন্যায়ের 'নস্যসূত্র' বা নাসাসূত্র'। সেটা কী জানেন তো? এমন সুনিপুণ কায়দায় শিরশ্ছেদ করা হল যে, লোকটা টেরই পেল না। তখন লোকটার নাকে নস্য দিতে হয়। হতভাগ্য নিজের মৃত্যুর কথাটা টের পায় যখন 'হ্যাঁচ-চো' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা ছিট্‌কে পড়ে!

চেখফ্‌ধর্মী ঐতিহাসিক ছোটগল্প অনেকগুলি লিখেছেন শরদিন্দু—অর্থাৎ যেখানে ওস্তাদের মার শেষ রাতে বা 'থ্রি-ইন-ওয়ান আইসক্রীমের কাপ' নিমন্ত্রণবাড়ির শেষপাতে আচমকা পরিবেশন করা হচ্ছে না। মেনুকার্ড ফেলা আছে চোখের সামনে। যেমন : *রক্তসন্ধ্যা*। পাঠককে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হল মীর্জা দাউদ কী-ভাবে পরজন্মে প্রতিশোধটা নিল, তারপর বলা হল কীসের প্রতিশোধ। 'বৈরীনির্যাতন' যেখানে পরিবেশ্য রস, সেখানে ঘটনার পর্যায়ক্রমে একটা চিরাচরিত রীতি আছে—বেদব্যাসের শকুনি থেকে মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য, সবাই সেটা মেনে চলেছেন। এখানে শরদিন্দুবাবু তা মানলেন না। তাই বলে কি 'ক্ল্যাইম্যাক্স' নেই! আছে। চোখ বুঁজলে আরবসাগরের লালে-লাল আকাশটা আজও দেখতে পাই।

বিভূতিভূষণের *স্বপ্ন-বাসুদেব* গল্পটির কথা বিবেচনা করুন। ঐতিহাসিক উপাদান নির্ভি-ভর—আছে-কি-নেই। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত একটি গরুড়স্তম্ভের ভগ্নাবশেষে উৎকীর্ণ করা একটি পংক্তি—সেটি একজন গ্রীক-এর দান। কেন? কেন? একজন অহিন্দু বিদেশী হঠাৎ গ্যাঁটের দীনার. খরচ করে গরুড়স্তম্ভ গড়ালো কেন? ইতিহাস বললে, কদ্দিন আগেকার কথা! তা কি আর মনে আছে আমার?

বিভূতিভূষণ কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলেন পাদপূরণ করতে।

শরদিন্দুর তৃতীয় জাতের রবীন্দ্রধর্মী কাহিনী : *মরু ও সঙ্ঘ*।

গীতিময়তাগুণে টৈটম্বুর। কিন্তু এটি 'ঐতিহাসিক ছোট গল্প' নয়—'ঐতিহাসিক—কালের ছোটগল্প'। কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা কাহিনীতে ছায়াপাত করেনি। লেখক ইতিহাসকে সাল-শতাব্দী দিয়ে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু একে থর মরুভূমির চৌহদ্দিভুক্ত কাহিনী কিছুতেই বলা যাবে না। কাহিনীর ভৌগোলিক অস্তিত্বটাই ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত। লেখক না বললেও আমরা জানি ঐ 'মরু'—তাকলামাকান, ঐ 'সঙ্ঘ' রেশম-সড়কের সহস্রাব্দী-চিহ্নিত উটের-কঙ্কালাকীর্ণ তারিম নদীর বাঁকে! রবিন্সন ক্রুসোকে নির্জন দ্বীপে খাওয়াতে-পরাতে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে বাঁচিয়ে রাখতে ডিফোকে প্রাণান্ত হতে হয়েছে। শরদিন্দু ভ্রুক্ষেপমাত্র করলেন না ওসব সমস্যা নিয়ে—কীভাবে গুটিকতক খর্জুরগাছের উপর ভরসা করে চারটি প্রাণী দুটি দশক টিকে রইল। সার্থবাহর দল যে মাঝে-মাঝে আসে না, এ-কথা তো বলা হয়নি। চারটি চরিত্রের টানা-পোড়েনে অক্ষয় হয়ে রইল একটি অনবদ্য ছোট গল্প।

পাতিমোক্ষমতে বহিষ্কারের বিধান মাথায় নিয়ে যেদিন নির্বাণ আর ইতি 'সঙ্ঘ' ত্যাগ করে 'মরু'র 'শরণ' নিল, শরদিন্দুর বর্ণনায়,

> সেইদিন মধ্যাহ্নে বাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবল প্রজ্বলিত বালুকার উপর হইতে একপ্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন তপ্ত তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নি-শ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত.পর্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।[24]

পাঠক বুঝতে পারে : আঁধি আসছে, পনের বছর পরে। কাহিনীর সমাপ্তি হল আর্ত মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ সঙ্গীতে—স্থবিরের শীর্ণকণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রে : হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময় ....

এতক্ষণে একটি ঐতিহাসিক নাম খুঁজে পাওয়া গেল বটে!

'রবীন্দ্রধর্মী' ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্পের শেষ তথা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণটি আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা : বিশ্বসাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প : *ক্ষুধিত পাষাণ*।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা ধুম তর্ক চালিয়ে যাব—সেটি 'ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প'।

'ঐতিহাসিক ছোটগল্প' নয়। 'ভূতের গল্প' তো নয়ই! আড়াই শ' বছর অতীতকালের দ্বিতীয় শা-মামুদ সশরীরে একবারও হাজির হননি। প্রাসাদটির মালিকীস্বত্বের প্রয়োজনে তার নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে মাত্র।

দুরাশার মতো এবারেও লেখক বারে বারে একাল-সেকালের মেলবন্ধন করেছেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে। সমকালে বরীচে তুলার মাশুল আদায়কারী দিনান্তে

> সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিতেছে ;ওপারে অনেকখানি বালুচর অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ের বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।[25]

আর এই বর্তমানকালের মধ্যভারতে অবস্থিত লেখক কল্পনায় আমদানি করেন অতীতকালের এক বন্দিনী নারীর কামনাবাসনা জর্জরিত অতৃপ্ত প্রেম :

> তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়িন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া, জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস![26]

'তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে জানি না', জানি না 'সেখানে সে কী ইতিহাস?' শুধু জানি—এই বাস্তব ঐ কল্পনা, এই কাহিনী আর ঐ ইতিহাসের একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র অনুভবের রাজ্যে। তার রহস্য জাগতিক অর্থে উদ্‌ঘাটন করতে গেলেই ভুক্তভুগী সাবধানবাণী শোনাবে : "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

ঐতিহাসিক-রসের কারবারীদের দায়বদ্ধতা :

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের লেখক তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলিকে ইতিহাস-নদীর স্রোতধারায় নৌকায় উঠিয়ে দেন। নৌকাগুলি লেখকের ইচ্ছানুসারে উজান-ভাঁটিতে যাতায়াত করে। কখনো ইতিবৃত্ত লগির ঠেলায়, কখনো একহাতে পুরাবৃত্ত অপরহাতে কাহিনীর দাঁড় তুলে নিয়ে। আবার কখনো বা স্রেফ কল্পনার পাল খাটিয়ে। লেখকের নির্দেশানুসারে নৌকাগুলি এ-ঘাট ও-ঘাটে ভেড়ে। মাঝ-গাঙে চড়ায় নেমে যাত্রীরা খিচুড়ি রেঁধে খায়। ক্রমাগত নজরে পড়ে ইতিহাস-স্বীকৃত স্বনামধন্যরা ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় পারাপার হচ্ছেন, অথবা ময়ূরপঙ্খী বজরায় নৌ-বিহারে মগ্ন। কল্পিতচরিত্রে-বোঝাই নৌকা কখনো পড়ে ঝড়-তুফানের খপ্পরে। লেখক নিষ্ঠুর হলে নৌকা উল্টে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সাহিত্যিক যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো করুণাময় হন, তাহলে নায়ক-নায়িকা জলের তলায় তলিয়ে যায়, উপন্যাসখানা ভেসে ওঠে ; দামোদর মুখুজ্জের মতো নিষ্ঠুর হলে নায়ক-নায়িকা ভেসে ওঠে, উপন্যাসখানা তলিয়ে যায়। মোটকথা কল্পিতচরিত্র-বোঝাই নৌকায় মাঝিমাল্লাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, ঐসব ঐতিহাসিক চরিত্রে 'বোঝাই নাওয়ের সাথে যাতে টক্কর না লাগে। ইতিহাস-নদীর দুই-কিনারের ভৌগোলিক সীমানা এবং স্রোতধারার 'কিউসেক'-এর গাণিতিক পরিমাণের উপরে লেখকের নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হয় না। তাঁকে ইতিহাসের নির্দেশেই গল্প ফাঁদতে হয়। সেটাই নিয়ম ; তবে সামান্য এদিক ওদিক হলে তা ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়ার রীতি আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ছাড়পত্র মোতাবেক :

> আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান-সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপর তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ (The Age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের *আইভ্যান্‌হো* পড়িতে বিরত থাকেন। অবশ্য য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রার-যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের *আইভ্যান্‌হোর* মধ্যে চিরন্তন মানব ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমনকি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশী যে, ক্রুজেড-যুদ্ধ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া তাহা পাঠ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই

> কি স্কট *আইভ্যানহো* লিখিতে পারিতেন না? পারিতেন কি না সে কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি, তিনি সে-কাজ করেন নাই।[27]

বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ*-র সমালোচনায় স্যার যদুনাথ সরকার বলছেন :

> এই বাদশাহ (আওরঙজীব) কোন যোধপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই...আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোনও হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সকলকে মুসলমান হইয়া থাকিতে হইত। ...তাই রাজসিংহের অন্যতম প্রধান চরিত্র যোধপুরী-বেগমের অস্তিত্বটাই টিকে না।

ফলে, আলমগীরের হারেমে 'চাটুজ্জে বামুন' যে কায়দায় ইমলিবেগমের জাত বাঁচালেন, সেটা সাদা-বাঙলায় ইতিহাসকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথের মতে,

> রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ...উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না। নায়িকা জেবউন্নিসা।

মোবারকের সঙ্গে জেবউন্নিসার গোপন প্রেমকাহিনী *রাজসিংহ* উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। অথচ *Studies in Aurangzibs Reign*-গ্রন্থে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, জেব-চরিত্র কলঙ্কমুক্ত ছিল।

জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে জানি না, বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের গরুটিকে অসঙ্কোচে হ্যাট-হ্যাট করে গাছের মগডালে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কিনা জানা যায় না, রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তবু এই সব হিমালয়ান্তিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতে *রাজসিংহ* একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। বলাবাহুল্য, এ-বিষয়ে পরবর্তীকালের কোনও সাহিত্যপণ্ডিত দ্বিমত হননি।

বিবেকের নির্দেশ এবং কালের বিবর্তনে আজ ঐ 'গুরুবাক্য'টিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছি না। আজ মনে হচ্ছে ঐ 'ম্যাগ্‌নাকার্টা'য় একটা 'প্রোভাইডেড-ক্লজ' বাদ গেছে! সেটা না থাকায় রবীন্দ্রোত্তর বর্তমান যুগের তা-বড় তা-বড় কিছু মহারথী স্বাধিকারপ্রমত্ত হবার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছেন! তাঁদের বক্তব্য : যেহেতু *আইভ্যানহো* এবং *রাজসিংহে* দু-একটি গরু গাছের ডালে উঠেছিল, এবং 'গুরুদেব' তাতে আপত্তি করেননি, তার ফলে আমরা অতঃপর বিরাট রাজার গোটা-গোশালা তাল-তমালের মাথায়-মাথায় বানাবো!

কোন্ মর্মান্তিক আঘাতে একথা বলছি সে-প্রসঙ্গে এখনি আসব, তার পূর্বে বলি—আমাদের মতে ঐ 'প্রোভাইডেড-ক্লজে' কী থাকা উচিত ছিল। আশঙ্কা হয়, এরপর যেকথা বলতে যাচ্ছি তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বাঙলার অধ্যাপক হয়তো ফতোয়া জারী করবেন : "যাঁহারা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন নারায়ণ সান্যালের 'কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রস' প্রবন্ধটি পড়িতে বিরত থাকেন।"

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে কালীক দূরত্ব :

ইতিহাস মানেই অতীতকাল ; ফলে প্রথম শর্ত : একটা ন্যূনতম কালীক দূরত্ব। কিন্তু ঠিক কতটা? স্বীকার্য : বিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সাহিত্যে আশা করা যায় না। হেতুটি এ নয় যে, বিজ্ঞান বাস্তবের কারবারী, আর শিল্প-সাহিত্যের বেসাতি অনির্বচনীয়, বিমূর্ত, ধোঁয়াশা! 'রুটওভার মাইনাস ওয়ান' অ-বস্তুটাও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই ; কিন্তু স্বয়ং আইনস্টাইনের মস্তিষ্কে ঐ $\sqrt{-1}$ যে বোধের অনুরণন জাগাতো আমার মতো অর্বাচীনের কাছেও তার একই মূল্য। অথচ বড়গল্প, 'নভেলেট', আর উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌টার মাপ কত তা আজও কেউ বলতে পারলেন না। তাই এক্ষেত্রে ন্যূনতম কালীক দূরত্ব যে কতটা তার কোন নির্দেশনা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় প্রশ্নটাকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। যাহোক একটা সীমারেখা টানতেই হয়। ছাপ্পান্নোটি পর পর দৃশ্যে সারারাতব্যাপী অভিনয় চালিয়ে ভোররাতে কি বলতে পারি এটা আমাদের 'একাঙ্কিকা'? যেহেতু দৃশ্যগুলি অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে ভাগ করা নয়?

আমরা একটা প্রস্তাব রাখছি, দেখুন মানতে পারেন কি না : যে শতাব্দীতে কাহিনীটি রচিত সেই

শতাব্দীর ঘটনায়-ভরা কাহিনীকে 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' বলা যাবে না। তার ফলে, আজ যদি কোন কথাসাহিত্যিক নেতাজী, লিন্ডবার্গ, বা রাসবিহারী বসুকে নায়ক করে কাহিনী ফাঁদেন তাহলে বলা যাবে না যে, তিনি 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' রচনা করেছেন। কিন্তু রোদ্যাঁ? যাঁর এক-পা গত শতাব্দীতে, এক-পা এপারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধতক? সেটা 'মার্জিনাল কেস'। 'অ্যা'-ও হতে পারে, 'অ'-ও হতে পারে। আর স্বামী বিবেকানন্দ? মাত্র দু বছরের জন্য যিনি বিংশ-শতাব্দীকে চরণধূলি দিয়ে গেলেন? তিনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি?

কিন্তু নাঃ। এ ফর্মুলাটাকে মানা যাচ্ছে না। তাহলে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এপিক্ ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকেই বাতিল করতে হয়। নেপোলিয়ানের মৃত্যু 1821, *যুদ্ধ আর শান্তি* প্রকাশিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। ব্যবধান পঞ্চাশ বছর হয়-কি-না হয়। তাহলে কি হাফ-সেঞ্চুরিতে হাততালি দেওয়ার ব্যবস্থা করব? কিন্তু তাও মানা যাচ্ছে না শরদিন্দুর প্যাঁচে। তিনি জাতিস্মরের ভেক ধরে হিসাবটাকে নয়-ছয় করে ছেড়েছেন! *মৃৎপ্রদীপ* গল্পে বিংশ শতাব্দীর আর্কিওলজিস্ট পাটলীপুত্রে এক্সকার্শান করতে গিয়ে হুস করে ষোলো-শতাব্দী পিছিয়ে গেলেন। একলাফে পৌঁছালেন চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্তের অন্দরমহলে! আমরা চোখ কচ্‌লে, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে সামলে নিতে নিতেই দেখি—সেই আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক গুপ্তযুগ থেকে উল্টোদিকে 'জয় রাম' বলে আবার এক লাফ মেরেছেন। গুপ্তযুগের চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা মুহূর্তমধ্যে হয়ে গেল প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতায় রুমাহরণরত 'গাক্কা'।

এতক্ষণে মালুম হচ্ছে কোন্ মর্মান্তিক হেতুতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ থেকে আচার্য সুকুমার সেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' ন্যূনতম কালীক দূরত্ব বিষয়ে স্রেফ স্পিকটি নট! অঙ্কের অঙ্কে উঠে বসতে গররাজি!

বেশ, ন্যূনতম না-হোক, দূরতম কালীক দূরত্ব? সেটা অন্তত নির্দিষ্ট করা যায়। এবারে আমাদের প্রস্তাব : ইতিহাস যতদূর পিছাতে পারে।

ইতিহাস? প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী নয়? *রুমাহরণ* বাতিল?

আচ্ছা না হয় 'প্রাগৈতিহাসিক কাল' পর্যন্ত। নৃতত্ত্ব সাল-শতাব্দী দিয়ে আজও চিহ্নিত করতে পারেনি 'কাল'-টাকে ; আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলব : *হোমোস্যাপিয়ান্স*-এর সেই অচিহ্নিত জন্মলগ্ন পর্যন্ত।

তার অর্থ এই অধম গ্রন্থকারের *নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা* বাতিল?

হ্যাঁ, তাই! তার নায়ক-নায়িকা 'মানুষ' নামক দ্বিপদীজীব ছিল না—ছিল 'প্রায়-মানব' :হোমো-ইরেক্টস! তাকে বড়জোর 'পুরা-নৃতাত্ত্বিক কাহিনী' বলা চলে, 'প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী'ও নয়।

এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার। শুধু সময়ের দূরত্বই 'ঐতিহাসিক রস' এর মাপকাঠি নয়। লক্ষ্য করতে হবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক কি না। আচার্য সুকুমার সেন 'প্রাগৈতিহাসিক' কালের কাহিনীকেও 'ঐতিহাসিক গল্প' বলে স্বীকার করেছেন। শরদিন্দু অমনিবাস-এর ভূমিকায় বলছেন :

> ঐতিহাসিক গল্পের....একটির কাল হল আর্যদের আগমনের গোড়ার দিকে *(প্রাগ্‌জ্যোতিষ)*, একটির কাল তারও আগে *(ইন্দ্রতুলক)*। একটির কাল প্রাচীন, তবে অনির্দেশ্য *(রুমা হরণ)*। আর একটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া *(আদিম)*।

পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল উপরিলিখিত চারটি ঐতিহাসিক গল্পের কালের অনেক পরবর্তী সময়ে। তবু আমরা পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত কাহিনীকে 'ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত' বলে স্বীকার করতে রাজি নই। এজন্য সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা*, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *পাঞ্চজন্য*, অথবা সুবোধ চক্রবর্তীর *ভাগবত* ইত্যাদি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক-রসসিক্ত বলে গ্রহণ করতে পারছি না। সেগুলি পৌরাণিক-রসমণ্ডিত।

আগেই বলেছি, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'রস'-এর বিচারটাই মুখ্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের যে শাখাটিকে আমরা 'ইতিহাস' বলি তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক যত নিকট ধর্মের সম্পর্ক তত নিকট নয়।

ধর্ম 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' বলে দু-হাত তুলে নাচে। বিজ্ঞান আর ইতিহাস 'বিশ্বাস'কে বাতিল ধরে

ধূম তর্ক বাধিয়ে বসে। সুতরাং বিশ্বাস-ভিত্তিতে নয়, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়, যুক্তিনির্ভর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি কোন সাহিত্যিক পুরাণ অথবা মহাকাব্যের আলোচনা করেন তাহলে আমরা তাকে 'ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত' বলে সাদরে গ্রহণ করব। যথা : শ্রীঅরবিন্দের অসমাপ্ত প্রবন্ধ : *Vyas & Valmiki* ; গিরীন্দ্রশেখর বসুর *পুরাণপ্রবেশ*, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*। মূল প্রশ্নটা দৃষ্টিভঙ্গির, পরিবেশিত 'রস'-এর। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আমরা কোন্ যুক্তিতে *কৃষ্ণচরিত্রকে* ঐতিহাসিক-রস-মণ্ডিত বলে স্বীকার করছি অথচ গজেন্দ্রকুমারের *পাঞ্চজন্য* অথবা সুবোধ চক্রবর্তীর *ভাগবতকে* বলছি পৌরাণিক রস-সিক্ত।

কথা হচ্ছিল ঐতিহাসিক-রস পরিবেশনের 'ডীলার'দের দায়বদ্ধতা নিয়ে। আমাদের অভিমত : কোন কথাসাহিত্যিক যদি ডীলারশিপের জন্য দরখাস্ত করেন তাহলে অতঃপর তাঁকে একটি 'এগ্রিমেন্টে' স্বাক্ষর করতে হবে। ভদ্রলোকের-চুক্তির যুগ অতিক্রান্ত!

আমরা দেখছি, স্কট-এর *আইভ্যান্‌হো* প্রসঙ্গে ফ্রীম্যান-সাহেবের 'ফ্রীডাম বিরোধিতা'-র বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাকে বলে 'অসুরারিরিপু'! সাহিত্যের নিত্যসত্যের অনুরোধে তিনি অবাধ স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছিলেন সাহিত্যিকদের তরফে।

কেন আমরা আজ সেই 'অবাধ ছাড়পত্রের' বিরোধিতা করছি এবার তা বলি।

প্রথম কথা : রবীন্দ্রনাথের আমলে লেখকেরা একটা অলিখিত শালীনতার সীমারেখা মেনে চলতেন। তাছাড়া সে-আমলে একাধিক ক্ষমতাশালী পত্রিকাগোষ্ঠী ছিল। একপক্ষের স্বাধিকারপ্রমত্ততার লক্ষণ দেখলে অন্যপক্ষ পরের সংখ্যা 'সংবাদ সাহিত্য' বা 'সমালোচনা-সাহিত্যে' সোচ্চার প্রতিবাদ করতেন। সবাই অলিখিত 'ভদ্রলোকের চুক্তি' মেনে চলতে বাধ্য হতেন। এখন বাঙলা সাহিত্যে অলিগার্কিয়াল শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। পা. পৃ. সা. স.! পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়ক সাহিত্যিক সমিতি। অপজিশন পার্টি বলে কিছু নেই। তাই আমাদের বক্তব্য : ঐ ছাড়পত্রটা অতঃপর 'অবাধ' থাকতে পারবে না।

আমাদের প্রস্তাব : কথাসাহিত্যিক কোন ক্ষেত্রেই ইতিহাসের—না শুধু ইতিহাসই বা কেন? —ইতিহাস-পুরাণ-সংস্কৃতি-ধর্ম, যা কিছু এই ভারত সভ্যতার সহস্রাব্দিস্বীকৃত 'নিত্যস্বরূপ', ভারত-আত্মার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির স্তম্ভ, তা পরিবর্তন করতে পারবেন না, তথাকথিত 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'র অনুরোধে।

ধরুন *মেঘনাদবধ কাব্য।* লেখকের নির্দেশে নায়ক ও খল-নায়ক স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হলেন। 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'র অনুরোধে মাইকেলের সে অধিকার ছিল। মানছি! কিন্তু মাইকেলের নির্দেশে রাবণ পারত না পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে যেতে! অথবা শ্রীরামচন্দ্র পারতেন না খলনায়করূপে মন্দোদরীকে অপহরণ করতে! অসীম ক্ষমতীশালী শ্রীরাম তা পারতেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইদানীং তাই হচ্ছে। 'অবাধ' ছাড়পত্র আছে যে! গুরুদেবের! পৌরাণিক চরিত্র নয়, ঐতিহাসিক চরিত্রও লেখকের ইচ্ছানুযায়ী 'নারীহরণ' করছেন, বাস্তবে করুন না করুন!

শারদীয়া ১৩৮৪ *শিলাদিত্য* পত্রিকায় চাণক্য সেনের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় : *গৈরিলা।* পরে গ্রন্থাকারেও তা প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাস্থল আফ্রিকার আঙ্গোলা রাজ্য। কাহিনীর কল্পিত-নায়কের নাম অগস্টিন্‌হো নেটো। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন S. P. L. A. —পার্টির বিপ্লবী, কাহিনীর কালে হয়েছেন আঙ্গোলার প্রধানমন্ত্রী। লেখক তাঁর উপন্যাসে চরিত্রটিকে আঁকলেন আদ্যন্ত চাইনীজ ইংকে। তার সবটাই কালো। সে মদ্যপ, চরিত্রহীন, নারীমাংসলোলুপ, ঘুষখোর, স্বজনপোষক—এককথায়, মূর্ত শয়তান। কীমাশ্চর্যমতঃপরম্! আলোচ্যকালে, আলোচ্য দেশের বাস্তব শাসকের নামও আগস্টিন্‌হো নেটো এবং তিনিও এককালে ছিলেন ঐ S. P. L. A, - বিপ্লবী পার্টির নেতা!!

লেখক তাই কাহিনী-শেষে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন :

"এ কাহিনীর চরিত্রগুলি ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সাহিত্যের প্রয়োজনে কয়েকটি বাস্তব

চরিত্রের কাল্পনিক ব্যবহার করা হয়েছে। অগস্টিন্‌হো নেটো আঙ্গোলায় S. P. L. A.-র নেতা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। ....কিন্তু এ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং কথোপকথনের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কল্পনায় বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।"

যার নির্গলিতার্থ : 'হোয়্যারাজ' গুরুদেব নিত্যসত্যের অজুহাতে কথাসাহিত্যিককে 'অবাধ' ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন, 'দেয়ারফোর' আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দুইগণ্ডে ইচ্ছামতো চুন ও কালির প্রলেপ দিতে পারি! আঙ্গোলার কোন কথাসাহিত্যিক অনুরূপভাবে একটি উপন্যাস রচনা করে যদি উপসংহারে কৈফিয়ৎ দেন—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে বাস্তবে ভারতের এক কবি ছিলেন। জোড়াসাঁকো এবং সোনাগাছী কলিকাতা শহরের দুই মহল্লা। জোড়াসাঁকোর জমিদারকে সোনাগাছীর পটভূমিকায় যেভাবে দেখানো হয়েছে তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কল্পনায় বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।" তাহলে চাণক্য সেন নিশ্চয় আপত্তি করবেন না ; সে নৈতিক অধিকার—আজ আর তাঁর নেই। আমরা আপত্তি করব। বাস্তবে অগস্টিন্‌হো নেটো কী চরিত্রের লোক তা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। আমাদের বক্তব্য : কথাসাহিত্যে কোনও **'বাস্তব চরিত্র'** আমদানি করলে **'কাল্পনিক কলঙ্ক'** তাঁর ললাটে লেপন করা চলবে না। তা সে চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ, হিটলার বা ইদি আমিন যেই হোক! চাণক্য সেন তাঁর 'সাহিত্যিক কল্পনায়' একটা কাল্পনিক আঙ্গোলিয়ান নাম কেন পয়দা করতে পারলেন না, খোদায় মালুম। কিন্তু আমাদের মতে তাতে তাঁর অপরাধের তিলমাত্র স্খালন হত না। কারণ স্থান-কাল-পাত্রে পরিচিত শনাক্তিকরণ চিহ্নে আমি যদি কোন বাস্তব ব্যক্তিকে বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমার উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট করি, তাহলে তাঁর নাম উচ্চারণ করি বা না করি, সেই পাত্রের আচরণ ইতিহাসস্বীকৃতরূপে অঙ্কিত করতে বাধ্য থাকব। আমাদের প্রস্তাব : ঐতিহাসিক-রসের ডীলারশিপ নিয়ে মুনাফা লোটার ইচ্ছা থাকলে প্রতিটি কথা-সাহিত্যিক এই শর্ত পালন করতে বাধ্য থাকবেন!

ইতিপূর্বেই বলেছি, ঐতিহাসিক রসের কারবারীকে সজাগ থাকতে হবে—ইতিহাসের স্রোতধারায় কল্পিতচরিত্র-বোঝাই নৌকা যেন ঐতিহাসিক চরিত্রে-বোঝাই নৌকায় ধাক্কা না মারে। তবে হ্যাঁ, নৌকা বাইতে গেলে অমন দু-একটা টক্কর ভুলে-ভাট্টে লেগে যেতেই পারে। তা যদি নেহাৎই যায়, লেখককে তৎক্ষণাৎ হুঁসিয়ার হতে হবে!

সে-অবস্থায় কল্পিত চরিত্রগুলি লেখক-নির্দেশে যা-ইচ্ছে করতে পারেন ; ঐতিহাসিক-চরিত্ররা তা পারেন না। তাঁরা ইতিহাস-প্রত্যাশিত আচরণ করতে বাধ্য থাকবেন। লেখক দায়বদ্ধ। কিছু উদাহরণ দিই, মালুম হবে—কী বলতে চাই।

ধরুন ঐতিহাসিক নৌকার যাত্রী একদল কীর্তনীয়া, নবদ্বীপ থেকে চলেছেন শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনমানসে। নৌকার দলপতি প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী। সেক্ষেত্রে লেখক নির্দেশে নিত্যানন্দ ঐ টক্কর-মারা বেসামাল নৌকার মাঝি-মাল্লাদের শাস্তি দিতে দনাদ্দন গোলাবর্ষণ শুরু করতে পারবেন না। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক নৌকার যাত্রীদল যদি হয় পর্তুগীজ হার্মাদ দস্যু, যার দলপতি *রক্তসন্ধ্যার* রক্তপিপাসু দা-গামা, তাহলে লেখক-নির্দেশে দা-গামা ডেক-এর উপর উঠে দু-হাত তুলে নৃত্য জুড়ে দিতে পারবেন না :

সরা! মারিলি নাও-এ ধক্কা।
তেঁহ কি প্রেমেও ফক্কা?

শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও জীবনীকার কোথাও ইঙ্গিতমাত্র দেননি যে, নিমাই পণ্ডিত মাধাইয়ের হাত থেকে একটি কুমারীকে রক্ষা করতে কোন বিদেশীকে সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম, নিমাই পণ্ডিত—যিনি সারাজীবনে কোনও বিবাহ-বাসরে পৌরোহিত্য করেছেন বলে বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লেখ নেই—একটি 'রাক্ষস-বিবাহ' দিচ্ছেন। পরমুহূর্তেই শুনি বিদেশী-বণিক অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করছে, 'ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?'

এ পর্যন্ত কথাসাহিত্যিক ছিলেন স্বাধীন। কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাবটি লিপিবদ্ধ করার সময় শরদিন্দু

ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ! আত্মবিশ্বাসের দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নিমাই পণ্ডিতের প্রত্যুত্তর শরদিন্দুর কলম থেকে নির্গত হলে কী হয়, সেই ডায়ালগ ইতিহাস-নাট্যকার কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত : "নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"

এই প্রত্যুত্তরের একটি শব্দ অদল-বদল করার অধিকার শরদিন্দুর ছিল না!

গল্প ওখানেই শেষ হতে পারত। হল না। আমরা সকৌতুকে দেখি শরদিন্দুর কলম এগিয়ে চলেছে, "চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, 'দেবতা, আপনার দক্ষিণা।'"

তা তো বলতেই পারে। চন্দন দাস 'চন্দ্রহাস' এর দাস। শরদিন্দুর সৃষ্ট চরিত্র। লেখক তাকে দিয়ে যা বলাবেন সে তাই বলবে। তাছাড়া নিমাই বিবাহ দিলেন, দক্ষিণা তো দিতেই হবে।

কিন্তু তারপরের অনুচ্ছেদে শরদিন্দু যদি লিখতেন "নিমাই মোহর কয়টি উঠাইয়া অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন। কহিলেন, অতঃপর তুমি আমার যজমানভুক্ত হইলে। পুত্রসন্তান জন্মিলে আমাকে সংবাদ পাঠাইও—অল্প খরচে অন্নারম্ভের ব্যবস্থাদি করিয়া দিব।"

তখন?—আজ্ঞে না, শরদিন্দু তা লেখেননি। কিন্তু লিখলে?

চুয়াচন্দন গল্পটি গঙ্গায় ডুবে মরত। বস্তুত পরের পংক্তিটা শরদিন্দু আদৌ লেখেননি। লিখেছে ইতিহাস, শরদিন্দুর কলম দিয়ে, "নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'ঐটি পারব না।'"

উপায় কী? শ্রীরামচন্দ্রই কি পায়ের মন্দোদরী-হরণ করতে অথবা বলা যায়, ভগবানই কি পারেন আর একটা ভগবান পয়দা করতে? কিংবা এসব অপ্রিয় সত্য কথা বলে হাটে-হাঁড়ি ভাঙার অপরাধে তাঁর সৃষ্ট আনন্দলোকের বাহিরে এই দুর্বিনীত অধম প্রবন্ধ-লেখককে বহিষ্কারদণ্ড দিতে? তেমনি নিমাই পণ্ডিত অনেক-অনেক কিছু পারেন ; কিন্তু ঐ এক মুঠি মোহর তাঁর অঞ্চলপ্রান্তে বেঁধে নিতে পারেন না। কল্পনা-বিস্তারের যাদুকর শরদিন্দু-ও পারেন না সে কথা কল্পনা করতে।

তাই বলছিলাম—কোন এক ঐতিহাসিক উপন্যাসকার যদি তাঁর কল্পিত কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবনকাল চিহ্নিত করেন 1863 থেকে 1902—দেখান যে, তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ভারত পরিক্রমা করছেন এবং 1893 খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো-শহরে এক ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে জগৎবিখ্যাত হচ্ছেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ছাড়পত্র বলে সেই কল্পিত নায়কের একটি গোপন রক্ষিতার উপস্থিতি 'কাহিনীর খাতিরে' আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই—লেখক উদারতা দেখিয়ে নায়কের নাম স্বামী নির্বোধানন্দ রাখলেও!

সাম্প্রতিককালে এই জাতীয় স্বাধিকার-প্রমত্ততা দেখাচ্ছেন কেউ কেউ। যেহেতু পূর্বজমানার ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ-সমন্বিত নটেগাছগুলি মুড়িয়ে দেওয়া গেছে তাই এর প্রতিবাদ কোথাও নজরে পড়ছে না। একটি উদাহরণ দিয়েছি। আর একটি দিই :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্থান-কাল এবং ঐতিহাসিক সনাক্তকরণচিহ্নে জনৈক সর্বজনমান্য পণ্ডিতের ছায়া-দিয়ে-গড়া এক কাল্পনিক নায়ক খাড়া করে বললেন,—'নায়ক জারজ!'

গ্রন্থকারের স্বীকৃতিমতে তাঁর কাহিনীর কাল 1840 থেকে 1870 ; ত্রয়োদশবর্ষে এই কাল্পনিক জমিদার-তনয় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ('বিদ্যাদায়িনী' নয়) প্রতিষ্ঠা করছেন, 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করছেন, বিদ্যাসাগর-মশায়ের উৎসাহে সমগ্র মহাভারতের (রামায়ণের নয়) বঙ্গানুবাদ করছেন। বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য, বহুবিবাহরোধ এবং বারবনিতা স্থানান্তরকরণে যেভাবে নায়ক সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন তাতে জোড়াসাঁকোর জমিদার নন্দলাল সিংহের পুত্রটির সনাক্তিকরণে কল্পনার কোনও অবকাশ রাখা হয়নি। অথচ ঐতিহাসিক কাহিনীকারের কল্পনায় নন্দলাল সিংহের পুত্র সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ : বাস্টার্ড!!

দুর্ভাগ্য আজ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের! *শনিবারের চিঠি* আজ আর বিলি হয় না। *অচলপত্র* সচল নয়। মোহিতলাল থেকে সজনীকান্ত, দেবজ্যোতি বর্মন থেকে বন্ধুবর দীপ্তেন সান্যাল আজ অনুপস্থিত। তাই এই বৃহদায়তন ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে ক্রমাগত নানান পুরস্কারে শুধু ভূষিতই করা হল—তার সমালোচনা করা হিম্মত করো হল না!

সুনীল ভূমিকায় বলেছেন,

"কৈফিয়ত দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।

বিশ্বাস করা কঠিন, উদীয়মান যশোপ্রার্থী কোন কিশোর নয়, এ যুক্তি একজন পরিণতবয়স্ক সাহিত্যিকের কলম থেকে নির্গত! লেখক—গ্রন্থশেষের বিজ্ঞপ্তিমতে যাঁর গ্রন্থসংখ্যা দ্বিশতাধিক —বিস্মৃত হয়েছিলেন কোন্ 'ভূমিকা' অভিনয় করতে তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ! তিনি আদৌ 'ঔপন্যাসিক' নন! তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাসকার'!

ভূমিকা লেখার সময় তাঁর স্মরণ ছিল না : দুটি 'ভূমিকায়' আসমান-জমিন ফারাক!

'ঔপন্যাসিক' হিসাবে যখন তিনি *পূর্বপশ্চিম*-অভিযানে যাচ্ছেন তখন যে-কোন কল্পিত চরিত্রকে 'জারজ' বানাতে পারেন ; কিন্তু যে মুহূর্তে স্থান-কাল-পাত্রের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে এসে দাঁড়িয়েছেন তৎক্ষণাৎ ওই 'ঐতিহাসিক-উপন্যাসকার' দায়বদ্ধ। 'দেশ'-এর কাছে নয়, সেটা তাঁর স্বরাজ্য—'দেশের' কাছে, যে দেশ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকে শ্রদ্ধা করে।

একটি 'ঐতিহাসিক' মহিলাকে 'অসতী' বলার অধিকার কোন কথাসাহিত্যিকের নেই। যতক্ষণ না তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারছেন। 'পাথুরে প্রমাণ' পেলেও সে-কাজ করা রুচিসম্মত কি না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন ; কিন্তু প্রমাণ না পেলে ও-কথা কোন ভদ্রলোকই লিখতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, 'ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক' এই ইংরেজী প্রবাদবাক্যের সূত্রে একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে বিশ্বসাহিত্যে। ওই একজনই এ হিম্মৎ দেখিয়েছেন : "তোমরা শোন! আমার কাহিনীবর্ণিত এই তিনজন বাস্তব সীমন্তিনী পরপুরষ ভজনা করে সন্তানবতী হয়েছিলেন! সমাজ তা জানে না, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই, দুনিয়ায় তার কোন সাক্ষী নেই! তবে আমি এ-কথা লিখে গেলাম এই অধিকারে যে, আমি—এই বাস্তব কাহিনীর লেখক, স্বয়ং সেজন্য দায়ী।"

বিশ্বসাহিত্যের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গ্রন্থকারের নাম : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস!

চাণক্য সেন অগস্টিন্‌হো নেটোর চরিত্র হনন করে লজ্জিত হননি, তবু সেকথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করার হিম্মৎ অন্তত দেখিয়েছেন। নলচের আড়াল দেননি। সুনীল এই স্বাধিকারপ্রমত্ততার শিকার হলেও স্বীকার করেননি। তবু অপরাধটা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন তা বোঝা যায় তাঁর কৈফিয়ত দেবার সকুণ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে :

> মূর্তিপূজা আর ব্যক্তিপূজার দেশ আমাদের। যেসব মানুষ নিজগুণে আমাদের চোখে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন তাঁদেরও দেবতার স্তরে উন্নীত করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি হয় না। কিন্তু উপন্যাস রচনার সময় নির্লিপ্তভাবে এক-একটি জীবনের সব কয়টি দিকই দেখাতে হয়। এতে ভক্তিমান পাঠকেরা ক্ষুণ্ণ হন অনেক সময়। রামমোহন রায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডিনার টেবিলে সুরাপান কিংবা দেশপ্রেমিক হরিশ মুখার্জির পরদারগমন প্রভৃতির উল্লেখই অনেকের কাছে ভয়াবহ মনে হয়। অনেকের মতে এসব তথ্য সত্য হলেও প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয়। আমি তা মনে করি না। ব্লাসফেমি আধুনিক সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট আঙ্গিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।

এটি সেই জাতের বঙ্কিম-রসিকতা নয়, "বোধহয় কোর্টশিপটা পাঠকের পছন্দ হইল না"।

এখানে নিজ অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন লেখক সাফাই গাইবার চেষ্টা করছেন। সুচিন্তিত কৈফিয়ত দাখিল করছেন, কারণ তিনি বুঝেছেন 'কৈফিয়ত দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের' কৈফিয়তটা ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের ক্ষেত্রে দাঁড়ায় না! তাই তিনি চারটি যুক্তি খাড়া করলেন :

এক : আমাদের দেশে মূর্তিপূজায় ও ব্যক্তিপূজায় সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন।

দুই : 'ব্লাসফেমি' আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক।

তিন : 'ব্লাসফেমি'তে কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।

চার : ঐতিহাসিক-কালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নমস্যব্যক্তিদের 'শ-কার' 'ব-কার' করার ইংরেজী প্রতিশব্দ : 'ব্লাসফেমি'।

একে একে আলোচনা করি :

সুনীল-নির্ধারিত সময়কালে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যটি তাঁর প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম 'এভিডেন্স'। মূর্তিপূজা আর ব্যক্তিপূজায় বাঙালী যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকত তাহলে *'মেঘনাদবধ কাব্য'* কিছুতেই সাদরে গৃহীত হত না বাংলাসাহিত্যে। জাত তুলে বাঙালী পাঠক-মানসকে গাল দেওয়ার পূর্বে লেখককে দুটি কাজ করতে হবে। এক : 'শ্রীরামচন্দ্রের' চেয়ে জনপ্রিয় একটি সর্ব ভারতীয় নায়ককে খুঁজে বার করা। দুই : *ভাষা রামায়ণ* আর *গীতাঞ্জলির* মাঝখানের ঐ পাঁচশ বছরের ভিতর *মেঘনাদবধ* অপেক্ষা কোন অধিক জনপ্রিয় কাব্য খুঁজে বার করা। ও-দুটি কাজ যিনি পারেন না তাঁর অধিকার নেই বাঙালী পাঠককে 'হিরো-ওয়র্শিপের' জন্য গালমন্দ করার।

আর একটি উদাহরণ দিই : এ পোড়া-দেশে রাজা-গজার বড় অভাব। আমি বঙ্গ-'দেশ'টার কথা বলছি! কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার কথা নয়। আদিশূর থেকে রাজা গণেশ বা শশাঙ্কের ঐতিহাসিক উপাদান এতই নগণ্য যে, বাঙালী একটা জুৎসই হিরোই জোটাতে পারেনি 'ওয়র্শিপ' করার জন্য। রাজপুতানা ভাগ্যবান, পেয়েছে প্রতাপকে ; মারাঠীরা নাচানাচি করার সুযোগ পেয়েছে শিবাজীকে নিয়ে। কুল্লে একটিমাত্র রাজা-গজা মজুত ছিলেন আমাদের ভাঁড়ারে : যশোরের প্রতাপাদিত্য। সেই যে গো—সেই রাজামশাই, যিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দিল্লীশ্বরের সেনাপতির বিরুদ্ধে! বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের নায়কের বাপের বিরুদ্ধে! আমাদের সেই সবেধন নীলমণি রাজা-মশাইকে জোড়াসাঁকোর বাবুমশায়দের এক 'পোলাপান' হাটের মাঝে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিলেগা!

হ্যাঁ, তাই দিয়েছিলেন। মূর্তিপূজক আর ব্যক্তিপূজক বলে সুনীলকর্তৃক ধিক্কৃত বাঙালী পাঠক টুঁ শব্দটি করেনি। তার হেতু এ নয় যে, লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কেওকেটা। সে তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক বালক! নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে এমনকি পরেও সেই লেখককে নানা সমালোচক নানাভাবে আক্রমণ করেছেন ; কিন্তু *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট*-এ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রহননের অপরাধে কেউ কোনদিন কোনও অভিযোগ আনেননি। কেন? কারণ সেই তরুণ লেখক ইতিহাসকে তিলমাত্র অতিক্রম করেননি! প্রতাপাদিত্যের দম্ভ, কবি বসন্ত রায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার, ঐতিহাসিক সত্য। সেই বাস্তব দোষগুলিই তুলে ধরেছিলেন বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ব্লাসফেমি' কলাকৌশলের সুফললাভের লোভে প্রতাপাদিত্য জননীর সতীত্ব সম্বন্ধে কোনও অলীক অভিযোগ আনেননি বাবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো!

মূর্তিপূজায় বাড়াবাড়ি—যদি সত্যই বাঙালীর চরিত্রগত দোষ হয়—নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। অনুরূপভাবে 'ব্লাসফেমি'-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রবণতাই কি প্রশংসনীয়? রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ মদ্যপান করতেন কি না, শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে কোন্ ধর্মমতে বিবাহ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে কবে, কোথায়, কতবার সাক্ষাৎ করেছিলেন—এগুলিই কি হবে প্রাবন্ধিক আর কথাসাহিত্যিকের গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তু? পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক পেট্রিয়ট হরিশ মুখার্জির নানা কীর্তিকাহিনীর কথা শুনেছি, কিন্তু সুনীলের মতো অনুসন্ধিৎসা, গবেষকমন, এবং দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে অমন একটা 'আনন্দবার্তা' শুনিনি। নিশ্চয় ওঁর আস্তিনের তলায় কিছু অকাট্য প্রমাণ লুকোনো আছে, নাহলে—হোক সজনীকান্ত থেকে দীপ্তেন অনুপস্থিত এবং বঙ্গসাহিত্য অলিগার্কিয়াল 'দেশ'শাসকের কব্জায়—এতবড় একটা অভিযোগ তিনি ছাপা-হরফে আনতেন না। কিন্তু সাহিত্যিক কি কর্পোরেশনের ভূগর্ভস্থ 'সুয়্যর-লাইন'-এর ধাঙড় যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ....

না, তুলনাটা ঠিক হচ্ছে না। ধাঙড় ময়লা ঘাঁটতে বাধ্য হয়। সেটা তার জীবিকা। আমাদের মালিন্য অপসারণের দায়িত্ব নিয়েছে বলেই সে ময়লা ঘাঁটে। একই হেতুতে বদলের থেকে মোরাভিয়া, শরৎচন্দ্র থেকে সমরেশ ময়লা ঘেঁটেছেন। ইবসেনকে একজন সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "সমাজের ক্লেদাক্ত দিকের ছবি আপনিও তো কম আঁকেননি, তাহলে এমিল জোলার ঐ বর্ণনায় আপনার আপত্তি কেন?"

ইবসেন জবাবে বলেছিলেন, "Zola goes down in the mire to wallow in it, I go down in the mire to cleanse it."

পাঁকে নামার মধ্যে সরমের কিছু নেই। নফর কুণ্ডু সেটা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন—"পঙ্কে সে মানেনি অগৌরব/ সে শুধু মানসচক্ষে দেখেছে যে বিপন্ন মানব।" ম্যানহোলে নেমে অচৈতন্য ধাঙড়কে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেন নফর কুণ্ডু!

'ব্লাসফেমি'র কুফলহীন সুফল আহরণে নয়।

☆ ☆ ☆

'ব্লাসফেমি'র যুক্তিটা বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের এই জাতীয় অর্বাচীন উক্তি তরুণ সাহিত্যিকদের বিপথে পরিচালিত করার আশঙ্কা থাকায়। 'ইতিহাস' এবং 'সাহিত্য'—উভয়ের সঙ্গেই ব্লাসফেমির কী সম্পর্ক সেটা যাচাই করা দরকার :

Blasphemy শব্দটার প্রকৃত অর্থ কী, তা সমঝে নিতে অভিধান হাৎড়াতে হল। দেখা গেল, একেবারে আদিযুগে—আব্রাহাম বা মোজেস-এর আমলে শব্দটার অর্থ ইহুদিদের কাছে ছিল : ঈশ্বরকে অসম্মান বা অপমান করা। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত। সেই অর্থটি বরাবর চালু আছে। সর্বদেশে, সর্বকালে। এখানে 'ঈশ্বর' ইংরাজী হরফে লিখতে একটা ক্যাপিটাল 'G' লাগবে। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, কিংবা ভিন্ন সংজ্ঞায় বিশ্বাসী? অথবা ঈশ্বর মানেন না? সেখানেও 'ব্লাসফেমি' অর্থবহ, অর্থাৎ অনর্থবহ! বুদ্ধদেবের কাছে তার অর্থ—'বিনয়, সদাচার, বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ'। আইনস্টাইনের কাছে Reviling the cosmic law' যার স্রষ্টা সেই illimitable superior spirit', সেই 'Superior reasoning power, which is revealed in this comprehensible universe.'। শচীশের জ্যাঠামশায়ের কাছে শব্দটার অর্থ : "প্রচুরতর লোকের প্রভূততম সুখসাদনে" বাধাদান।

একটা কথা বলা দরকার : সুনীল যখন ব্লাসফেমির সুফল-কুফলের এই ব্যালেন্স-শীট টানেন, ডেবিট-ক্রেডিটের হিসাব মেলাতে বসেন, তখনো 'রুসদি-খোমেনি' ঘটনাচক্র ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। সেকথা জানাজানি হবার পর ব্যালেন্স-শীটে কিছু বদল হবে কিনা সেটা *সেই সময়ের* পরবর্তী সংস্করণে জানতে পারব। সে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তাই আমি নীরব।

এবার খুঁজে দেখতে থাকি, 'ব্লাসফেমি' শব্দটার আধুনিক প্রয়োগ কীভাবে হয়। দেখছি, ইংরেজি ভাষার পণ্ডিতেরা ব্লাসফেমির সমার্থবোধক যে শব্দগুলিকে এককাট্টা করেছেন, তারা হল :

> Profanity, Cursing, Obscenity, Swearing এবং Vulgarity. বলা হচ্ছে : These works all refer to crude or foul language. **Profanity** emphasizes abusive vituperation or rage expressed in irreverent use of religious terms and names applied to the deity. More loosely, profanity may be used as the general term for any sort of habitually foul language....**Blasphemy**, a stronger term than profanity, as applied to choice of language, is restricted specifically to an irreverent use of religious terms, especially the name of the deity, this may be done as a habitual mannerism of speech, to shock others, or to insult a particular person...

অর্থাৎ ব্লাসফেমিক আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক বলে মনে করবেন সেই কথা-সাহিত্যিক যাঁর কলমে খিস্তি ছাড়া আর কিছু বার হতে চায় না (habitual mannerism of speech, সুনীলের লেখায় তা দেখিনি)। অথবা অপরকে আঘাত করতে (to shock others, কাকে? রামমোহন? দেবেন ঠাকুর? হরিশ মুখুজ্জে? পাঠককে? কেন? তারা লেখকের কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে?) কিংবা বেমক্কা কাউকে অপমান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার তির্যকতৃপ্তিতে (or to insult a particular person. এটা হতে পারে! হাউই-এরও তো মাঝে মাঝে সখ হয় তারকার মুখে ছাই

মাখিয়ে দিয়ে আসতে)। কিন্তু দেবেন ঠাকুর বা কালীপ্রসন্ন এত দূর কালের মানুষ যে, তাঁদের শ-কার ব-কার করে আজ কেউ তির্যক আনন্দ পেতে পারে না।

তাহলে কেন এই মানসিকতা?

রুসদির এজাতীয় চিন্তা হতে পারে। "আছি মার্গারেট থ্যাচারের বাক্-স্বাধীনতার দেশে। আমার ভয়টা কী?—'ব্লাসফেমির কুফল কিছু নেই। সবটাই সুফল'। রয়্যালটি এক কোটি ডলার সুইস্ ব্যাঙ্কে জমা হলে সপরিবারে ডুব মারব।"—এ জাতীয় চিন্তা তাঁর হতে পারে। 'অমূল্য সেন'-এর চিন্তাধারাও হয়তো ঐরকমই ছিল। 'দ্বিশতাধিক গ্রন্থ' রচনার সৌভাগ্যলাভ তাঁর ঘটেনি। শ্রীচৈতন্যদেবকে শ-কার ব-কার করে লেখা বইটা বাজেয়াপ্ত না হলে ঐ রগরগে রচনার সুফল অনেক ফলত ; বাজেয়াপ্ত হওয়াতেও লোকসান হয়নি—'কুফল কিছু নেই'—নামটা সাহিত্যসেবীরা মনে রেখেছে! সুখ্যাতি না হলেও কুখ্যাতিতে!

এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, ধর্মের নামে, চার্চের নামে, গুরুবাদের নামে যে ভণ্ডামি, যে অনাচার তার প্রতিবাদ করাকে কিন্তু 'ব্লাসফেমি' বলে না। কোন অভিধান সে কথা বলেনি। পোপ দশম লেও সে-আমলে আলটু-বালটু যাই বলে থাকুন মার্টিন লুথার রচিত *On the Babylonish Captivity of the Church*—যা-থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের জন্ম—তাকে 'ব্লাসফেমাস' বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন রোমা রোলাঁকে বলেন :

> Indian religious life suffers from this lack of wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do good to India today...

তখনো 'নিরীশ্বরবাদী' রবীন্দ্রনাথ ব্লাসফেমাস নন। কারণ একই নিশ্বাসে কবি বলেছেন :

> for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith... It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people.

এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্লাসফেমাস্ নন!

কাজী নজরুল একবার রুখে উঠেছিলেন :

> ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভীড়
> তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?
> শুম্ভ-নিশুম্ভরে যে মারিল সে চণ্ডী কি গেছে মরে?
> কুম্ভমেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে?
> জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
> আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক?

রুসদি মুসলমান ; তবু খোমেনির মতে সে কাফেরেরও অধম! কাজী নজরুলও মুসলমান। তবু ঐ 'শেষ সওগাত' শুনে হিন্দু বাঙালী-পাঠক লজ্জায় মাথা নিচু করেছে ; একবারও বলেনি, ওটা বিধর্মীকবির ব্লাসফেমি!

তাহলে কোন্ 'ব্লাসফেমি'র জয়গানে সুনীল এত সোচ্চার? কেন?

দর্শনে যাঁরা নিরীশ্বরবাদী—চার্বাকের মতো লোকায়ত মতের প্রচারক, তাঁরাও 'ব্লাসফেমাস' বলে চিহ্নিত নন। নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল যখন এই বিংশ-শতাব্দীর অবক্ষয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন :

> Do you think that if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you should produce nothing better than the ku klux klan, the Fascisti and Mr. Winston Churchill?

অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী আর্তনাদ করেন :

"The scheme of the universe is devilish. I could have created a better world."

তখন তাঁরাও blasphemous নন! উক্তি তো ছাড়, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছেন যে নারায়ণ তাঁকে সাক্ষী মানছি, তিনিই স্বীকার করবেন স্বয়ং ভৃগু ঋষিও 'ব্লাসফেমাস্' নন!

তাহলে সুনীল সজ্ঞানে এমন একটা বে-তালা কথা কেন বললেন?

এবার সেই প্রসঙ্গেই আসব।

ঐতিহাসিক-রসস্রষ্টার সজ্ঞান বিকৃতির স্বীকৃতি ও নির্ঘণ্ট

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি ইতিহাস আর সাহিত্যের মিলনে তিনটি শাখার জন্মলাভ হয়েছে। তার প্রথমটি মূলত ইতিহাস, পরের দুটি মূলত কথাসাহিত্য। নির্ভেজাল 'বিশুদ্ধ ইতিহাস' থেকে নির্ভেজাল 'খাঁটি সাহিত্যে' সংক্রমণের পথে এই যে তিনটি মিশ্ররস, এখানে ঐতিহাসিক-তথ্যের বিকৃতি কী-পরিমাণে অনুমোদনযোগ্য তার একটা ফিরিস্তি—আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছি—তা দাখিল করি। ইতিহাসের পণ্ডিত এবং সাহিত্যাচার্যরা মিলিতভাবে একটা সেমিনার করে শেষ নিদান দেবার অধিকারী। আপনি-আমি নই। ভূষণ্ডীর-মাঠের সমস্যাও ঐজাতের সমাধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল।

খাঁটি ইতিহাসে তথ্যের বিকৃতি বিলকুল নামঞ্জুর। 'ঐতিহাসিক রস' তাতে এতই জমাট যে, তার স্বাদ তিক্তকষায়। তা হচ্ছে স্যাকারিন ট্যাবলেট! তবে নাকি যাঁরা ইতিহাসের ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের এছাড়া উপায় নেই! 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' হচ্ছে পায়েস অথবা ফির্নি। মিষ্টরস যথেষ্ট ; কিন্তু তার সঙ্গে আছে—হিন্দুযুগ হলে আতপ চাউল, মুসলীমযুগ হলে সিমাই। জলীয় অংশ আছে—নিছক বিশুদ্ধ উপন্যাসের মতো পাৎলা সরবৎ নয়, ঘনীভূত অবস্থায়। আর 'লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস' হচ্ছে মিছরির স্ফটিক! খাঁটি ঐতিহাসিক-রসের মিষ্টত্ব ছাড়া আর কিছু ভেজাল নেই 'গিবন থেকে সীরার'-এ। কিন্তু তার স্বাদ স্যাকারিনের মতো তেতো নয়। সরবতের মতো তা তরলও নয়। নিছক 'অব্‌জেকটিভ' নয়, সূক্ষ্মভাবে 'সাব্‌জেকটিভ'। অর্থাৎ ইতিহাস পরিবেশনের অন্তরালে লেখকের ব্যক্তিমানস উপস্থিত। তিনি আছেন বলেই মিষ্টরসটা স্ফটিকের মতো সুন্দর স্বচ্ছ দানা বেঁধে উঠছে। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিমানসটা থাকবে সঙ্গোপনে। তাকে সহজে দেখা যাবে না। সে থাকবে মিছরির দানার সুতোটির মতো।

খাঁটি ইতিহাসে তো বটেই এমন কি লোকরঞ্জক ইতিহাসেও গল্পের গোরু গাছে উঠতে পারে না। প্রথমত, গল্পে গোরুই নেই, সব ঐতিহাসিক চরিত্র ; দ্বিতীয়ত, চতুর্দিকে কাউ-ক্যাচার গেট। কল্পিত চরিত্র বা ঘটনা থাকবে না। কল্পিত কথোপকথন না থাকাই বাঞ্ছনীয়। নেহাৎ যদি থাকে তাহলে ইতিহাসস্বীকৃত পাত্রপাত্রীকে ক্রমাগত সার্কাসের খেলা দেখাতে হবে। ইতিহাসের দুই খুঁটিতে বাঁধা টানা-তারে উপর সন্তর্পণে তাদের হাঁটতে হবে। এক-পাও এদিক ওদিক করতে পারবে না। এই কঠিন শর্ত মেনেই গিবন ঐ অতবড় কাজটা করেছেন, করেছেন শীরার। করেছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তবু সে-সব গ্রন্থ উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক, মিষ্টস্বাদী, সাহিত্য-রসমণ্ডিত বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা।

'ঐতিহাসিক-কালের কথাসাহিত্যে' অতীত কালটাই থাকে, ইতিহাস প্রায় থাকেই না। ফলে সেখানে ইতিহাস বিকৃত হওয়ার প্রসঙ্গ বিশেষ ওঠে না।

যা কিছু ঝামেলা তা ঐ : 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে'—উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবাধ ছাড়পত্রটি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়েছে, সেকথা আমরা বলেছি। আমাদের আরও কয়েকটি প্রস্তাব আছে। সেগুলি আপনাদের খেদমতে পেশ করি :

প্রথম কথা : ঐতিহাসিক তথ্য তো গাণিতিক ধ্রুবক নয়, দৃষ্টিকোণ, তথ্যসংগ্রহের উৎস, প্রভৃতি মতপার্থক্যের কারণ ঘটাতে পারে। হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভের যাথার্থ্য বিষয়ে যেমন সে-যুগে ছিল দু-দুটি মত। আমাদের প্রস্তাব ঐ জাতীয় ইতিহাসের বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের একটিকে অবলম্বন করে যদি

কথাসাহিত্যিক গল্প ফাঁদেন তাহলে ফুট-নোট বা পরিশিষ্টে ঐ মতভেদের বিষয়ে যেন পাঠককে অবহিত করেন।

দ্বিতীয় কথা : সাহিত্যের নিত্যসত্যের অনুরোধে কথাসাহিত্যিক যদি স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সজ্ঞান বিকৃতি ঘটান (আমাদের মতে 'ঐতিহাসিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির নিত্যসত্য'কে অস্বীকার না করে) তাহলে সেকথাও পরিশিষ্ট বা ভূমিকায় স্বীকার করে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বাঙলা ও দেশীয় সাহিত্যে। কারণ এখানে আমাদের মা-মাসি-বোনেরা, অনেক সময় খুড়ো-জ্যাঠাও ইতিহাসকে চিনতে পারেন ঐ জাতীয় লোকরঞ্জক কথাসাহিত্যের সাহায্যে। হেরোডোটাস থেকে টয়েনবি তাঁদের নাগালের বাইরে। তাই এই অনুরোধ। কথাসাহিত্যিকের অধিকার আমরা এখানে খর্ব করছি না। শুধু বিনীত অনুরোধ—পরিশিষ্টে দয়া করে জানিয়ে দেবেন : কোন্ কোন্ বৃক্ষশাখে গল্পগোরু গরুড়াবলোকনে আমাদের মতো গোলামার্কা পাঠকদের দেখতে পাচ্ছে।

তৃতীয় কথা : 'সময়' যেখানে উপন্যাসের স্বীকৃত নায়ক—অর্থাৎ একটা মনগড়া দূরকালের আষাঢ়ে কাহিনী পরিবেশন করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, অপরপক্ষে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কালকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করাই যেখানে লেখকের মৌল লক্ষ্য, সেখানে গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্ট আবশ্যিক। কারণ তথ্যনির্ভর এইসব আকরগ্রন্থ ভবিষ্যৎ-কথাসাহিত্যিকদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে, করবেও। তখন ঐ নির্ঘণ্টটি অপরিহার্য।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *'সেই সময়'* পাঠের সময় 'হটী বিদ্যালঙ্কার' নামটির উল্লেখ পেয়েছি, মনে ছিল। যখন পড়ি, তখন আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না যে, ঐ নামটি নিয়ে আমাকেই একটি 'গো + এষণা' করতে হবে। পরে সে-কাজে যখন হাত দিলাম তখন হাজার পৃষ্ঠার গন্ধমাদনে আমার বিশল্যকরণীকে খুঁজে বার করতে পুরো একটি দিন সময় লেগেছে। তবু সারাটা দিন খেটেছি একটা বিশেষ হেতুতে। আমার মনে ছিল, সুনীল ঐ নামটা তাঁর হাজার পৃষ্ঠার ভিতর একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন ; এবং পাঠকালে আমার অবচেতন মনে একটা ছায়াপাত ঘটেছিল—সেখানে একটি কালানৌচিত্য দোষ ছিল।

খুঁজে যখন পেলাম (প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ মুদ্রণ, পৃ: 259) তখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা—হ্যাঁ একটা 'অ্যানাক্রনিজম' হয়েছে—অতি সামান্য ব্যাপার ; একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশে : "এক্ষণে শিক্ষা দিতেছেন।"

আলোচনা করছেন বীটন, রামমোহন ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সময়টা সুনির্দিষ্ট না হলেও আন্দাজ করা যায়। ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক। কথাপ্রসঙ্গে বীটন বললেন, "স্ত্রীশিক্ষার চল আপনাদের মধ্যে আগেও ছিল বলিতেছেন? আমি কখনো শুনি নাই।"

মদনমোহন তখন অনেকগুলি বিদুষী মহিলার নাম শুনিয়ে শেষে বললেন, "আর কত উদাহরণ দিব? এত প্রাচীনকালেই বা যাইবার প্রয়োজন কী? হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধা রমণী বারাণসীতে টোল খুলিয়া এক্ষণে রীতিমতন ছাত্রদের শিক্ষা দিতেছেন।"

হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। মদনমোহন তখন অজাত!

প্লীজ! আমাকে ভুল বুঝবেন না। সুনীলের ঐ সামান্য ভুল ধরতে এ প্রসঙ্গ তুলিনি।

সুনীলের কৃতিত্বকে ছোট করে দেখানোর জন্যও নয়। তাঁর *সেই সময়* নিঃসন্দেহে একটি মহৎ প্রচেষ্টা। আড়াই বছর ধরে 'দেশ'-শাসন করেছে বলে নয়। বঙ্কিম-আকাদেমী এবং দু-দুবার আনন্দ পুরস্কার লেখককে দেওয়া হয়েছে বলেও নয়। তিনি বিগত শতাব্দীর 'বাঙলার নবজাগরণের বার্তা বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলে। তাঁর গ্রন্থের মূলরস কেন্দ্রীয় চরিত্র নবীনচন্দ্রের জননী এবং জননীর তথাকথিত 'সিডিউসার'-এর মনগড়া টানাপোড়েন নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শারদাকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা। জনসাধারণের সার্বিক অশিক্ষা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতাকে মূলধন

করে একদল তথাকথিত সমাজপতির দেশ-শোষণের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের মরণপণ সংগ্রামের সুলিখিত ইতিকথা।

ইতিপূর্বে কঠোর সমালোচনা করেছি বলে ভুল বুঝবেন না আমাকে। সুনীলের কৃতিত্বটা যদি উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে বৃথাই পঞ্চাশ বছর ধরে কলম আঁকড়ে পড়ে আছি। অকুণ্ঠভাষায় স্বীকার্য : একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে একটি বিশেষ কালকে যে সর্বসাধারণের কাছে এভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব সে-চিন্তা আমার মস্তিষ্কে জাগ্রত করেছেন আমার চেয়ে দশ বছরের অনুজ এক কথা-সাহিত্যিক। সে জন্য নিশ্চয় মাথার টুপি খুলব!

আর সেটাই হল ট্র্যাজেডি!

স্কট-এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ইতিহাসের বিশেষ সত্য আর সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই...স্কট আইভ্যান্‌হো লিখিতে...পারিতেন কিনা সেকথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে-কাজ করেন নাই।"

কী দুঃখের কথা! কী অপরিসীম দুঃখের কথা! সুনীলের ক্ষেত্রে সে-কথা বলে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—নবীনচন্দ্রের জন্মসংক্রান্ত কাল্পনিক জটিলতা আমদানি না করেও লেখক রসোত্তীর্ণভাবে ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি প্রণয়ন করতে পারতেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল! জোড়াসাঁকোর জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহের জনক নন্দলাল সিংহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় কিছুই নেই। লেখক যদি বলতেন—তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী, হতোমের এসব 'আধিক্যেতা' অথবা 'বিদ্যেসাগরের ছেলে-খেপানো বাতিক' তিনি সহ্য করতে পারেননি, তাহলে তা আমরা মেনে নিতাম। বিশ্বাস করতাম, এজন্যই পুত্র এবং পিতার অথবা পিতৃতুল্য কাকাবাবু বিধুশেখরের সংঘাত বেধেছিল। জেনারেশন গ্যাপের চিরাচরিত সমস্যা। তার পরিবর্তে লেখক তাঁর কল্পনাকে এমন এক অশালীন দূরত্বে টেনে নিয়ে গেলেন যার ফলে 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক এক হতভাগ্যের ঠাঁই হল না *সেইসময়*-এ।

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী!"

ভাবা যায়? একটা হাজার পৃষ্ঠা-ব্যাপ্তি বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার সময়ের ব্যাপ্তি 1840-70, পরিধি কলকাতার সমাজজীবন—এবং সেখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের প্রবেশাধিকার নেই! অনিমন্ত্রিত কোন্ মর্মান্তিক হেতুতে? কারণ লেখক বিম্ববতী-বিধুশেখরের অবৈধ-সম্পর্কের অলীককাহিনী পরিবেশনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তাতে যদি শিবহীন যজ্ঞ করতে হয় সো ভি আচ্ছা।

অবৈধ 'প্রণয়' নয়। অবৈধ 'জৈবিক-সম্পর্ক'! 'প্রেম' ব্যাপারটাকে হাজার বছরের সাহিত্য এমন একটা মর্যাদা দিয়েছে যার খাতিরে অনেক কিছু মেনে নেওয়া যায়—তা অবৈধ হলেও। লেখক তা দেখাতে চাননি! প্রেমের বাষ্পমাত্র নেই। সে নেপথ্য-কাহিনী পাঠকের আন্দাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, এক পক্ষের কাম, অপর পক্ষের গর্ভধারণের বাসনা। পাঠকের চিন্তাধারাকে এই অনৈতিহাসিক অশালীন ভ্রান্তপথে পরিচালিত করতে অথবা কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রগরগে করে তুলতে লেখক ইতিহাস-বিরুদ্ধ কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন :

এক : নবীনকুমারের জননী নিরক্ষরা। দীর্ঘ স্বামী-সহবাসেও সন্তানবতী হতে পারেননি। মহিলাটির ধারণা : প্রৌঢ় স্বামী (সাতচল্লিশ-বছর বয়সী রামদুলাল) শারীরিক অক্ষমতায় পিতা হবার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় সন্তানধারণের শেষ-সীমান্তে উপনীত সেই নিরক্ষরা অশিক্ষিতা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মাতৃত্ব কামনায় যদি....

দুই : রামদুলাল প্রৌঢ়। আযৌবন বহু রমণীর সঙ্গে সহবাস করেছেন অথচ বৈধ-অবৈধ কোন ভাবেই পিতৃত্ব-গৌরব লাভ করেননি। লুপ্তপিণ্ডোদক হবার আশঙ্কায় গঙ্গানারায়ণকে দত্তকপুত্র নিয়েছেন। এমতাবস্থায় সেই প্রৌঢ় যখন সংবাদ পেলেন তাঁর প্রায়-যৌবনোত্তীর্ণা ধর্মপত্নী অকস্মাৎ গর্ভবতী হয়েছেন তখন...

তিন : রামদুলালের বন্ধু বিধুশেখর পাকা উকিল, কুচক্রী, প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ। সেও আন্দাজ করেছে বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর অবস্থা। এমতাবস্থায় সুন্দরী বন্ধুপত্নীর আযৌবনের বাসনা চরিতার্থ করতে যদি সেই কুচক্রী সুযোগসন্ধানী....

ডট...ডট...ডট হচ্ছে রগরগে উপন্যাস।

কিন্তু ইতিহাস কী বলে?

এক : মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জননী ত্রৈলোক্যকামিনী আদৌ নিরক্ষরা ছিলেন না। ডঃ পরেশচন্দ্র দাসের অমূল্য গ্রন্থের 37-38 পৃষ্ঠায় তাঁর হস্তাক্ষরের ফটোকপি আছে। তাঁর বিবাহ হয় সাড়ে-চৌদ্দ বছর বয়সে। স্বামীর বয়স উনিশ। বিবাহের মাত্র পনের মাস পরে তাঁর পুত্র কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। এ সংবাদ *সংবাদ প্রভাকরে* এবং *ক্যালকাটা কুরীয়ারে* মুদ্রিত হয় [24.2.1840]।

দুই : কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ বিবাহ করেন উনিশ বছর বয়সে। সন্তানের পিতা হন বিংশতি বর্ষে, পরলোকগমন করেন পঞ্চবিংশতি বর্ষে। দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনি।

তিন : কালীপ্রসন্ন ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হলে যে মহাত্মা তাঁর অভিভাবক হন তাঁর নাম হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি কুচক্রী উকিল ছিলেন না, ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ন্যায়াধীশ। ব্রাহ্মণ নন, কায়স্থ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*-গ্রন্থে এই আধুনিকশমন, ডিরোজিও-শিষ্য, আদর্শচরিত্র হরচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রথমে ছিলেন মুন্সেফ, পরে সেকেন্ড ম্যাজিস্ট্রেট, অন্তিমে আদালতের জজ। সুনীল ভূমিকায় বলেছেন, "স্বেচ্ছায় কোন ভুল তথ্য আমি দিইনি...যাঁকে অবলম্বন করে নবীনকুমারকে গড়া হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তিচিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এতদিন পরে আর জানবার উপায়ও নেই।"

মন্মথনাথ ঘোষের *মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ* কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণাগ্রন্থ ঘাঁটলেই জানা যেত কালীপ্রসন্নের জন্মসময়ে তাঁর পিতামাতার বয়স কত ছিল। এমনকি, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানের মতো সহজলভ্য বই ঘাঁটলেই জানা যায় কালীপ্রসন্নের অভিভাবক রায়বাহাদুর হরচন্দ্র ঘোষ কী জাতের মানুষ ছিলেন।

কাহিনীর খাতিরে অনেক ঐতিহাসিক বিচ্যুতি মেনে নেওয়া যায়। গঙ্গানারায়ণ কালীপ্রসন্নের দাদা নন, দাদু! নবীনচন্দ্রের পিতা রামদুলালের বৃদ্ধবয়সে অপঘাত মৃত্যু হলেও কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান। কালীপ্রসন্নের পিতৃবন্ধু তথা অভিভাবক জাস্টিস্ হরচন্দ্রের মৃত্যু হয় কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায়।

লেখকের অজ্ঞতা, পরিশ্রমবিমুখতা অথবা অনুসন্ধিৎসার অভাব ক্ষমার্হ কিন্তু শালীনতাবোধের অভাবটাকেও একই যুক্তিতে মেনে নেওয়া চলে কি?

হয় স্বীকার করুন *সেই সময়* একটি উপন্যাস— *পূর্বপশ্চিম*-এর সগোত্র।

সে-ক্ষেত্রে আমরা মাথা পেতে মেনে নেব লেখকের দাবী : "কৈফিয়ৎ দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।" কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঐ লাইনটা তাঁকে বদলাতে হবে, "আমার কাহিনীর নায়ক 'সময়'। তার ব্যাপ্তি 1840-1870।" পরিবর্তে তাঁকে বলতে হবে যে, তাঁর কাহিনীর নায়ক জনৈক জারজ নবীনচন্দ্র।

অথবা স্বীকার করুন *সেই সময়* একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—*রাজসিংহ*-র সগোত্র।

সে-ক্ষেত্রে আমরা মাথা পেতে নেব লেখকের দাবী : "কাহিনীর নায়ক 'সময়'।"

কিন্তু সে-ক্ষেত্রে লেখককে জানাতে হবে কেন উৎসর্গপৃষ্ঠার সদর দরজা অতিক্রম করতে পারলেন না কালীপ্রসন্ন রাজসিংহ? কেন 'শিবহীন যজ্ঞ' করা হল? তখন আর লেখক দাবী করতে পারেন না : জারজ নবীনচন্দ্র সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয়র 'প্রক্সি'।

কেকটা খেয়ে ফেলা যায়, অথবা সঞ্চয় করা যায়। দুটোই করব—এ আবদার চলে না। চরমতম ট্র্যাজেডি সেটাই। এই সহজ কথাটা লেখকের না-জানা ছিল না। সেই সজ্ঞানকৃত অপরাধবোধেই

ভূমিকায় তিনি এলোমেলোভাবে একবার বলছেন, 'বাঙালী জাতিগতভাবে মূর্তিপূজক', আবার বলছেন, "আমি কোন মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করতে চাইনি একেবারেই, শুধু মাঝে মাঝে সেই সব প্রস্তরমূর্তির পূর্বতন খড়মাটির পা দেখিয়েছি মাত্র।"

তা কি সম্ভব? মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তিতে ক্রমাগত ছেনি-হাতুড়ি চালালে কয়েক কিলোগ্রাম মার্বেল-ডাস্টই যে শুধু পাওয়া যাবে। 'খড়মাটির পা'-য়ের সন্ধানী লেখককে কষ্ট করে যেতে হবে বারোয়ারিতলায়, পরিত্যক্ত গর্ধভবাহিনী শীতলা বা ওলাবিবির মাটির মূর্তির পদতলে! তাঁদের 'খড়মাটির পা' লুকানো আছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, হরিশচন্দ্র, বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মার্বেল স্ট্যাচু'তে 'খড়মাটি'র পা কোথায় যে, 'কালাপাহাড়ী' ব্লাসফেমিতে লেখক তা দেখাবেন?

যে 'অনুপপত্তি'র মীমাংসা হয়নি—কেন সুনীল বলেছিলেন 'ব্লাসফেমি' আধুনিক কথাসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক—তারও একই সমাধান :

আপনার-আমার মতো ঐ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকও জানেন : বৈদিক যজ্ঞবিধিকে নিন্দা করার সময় শাক্যসিংহ অথবা তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারকে ভর্ৎসনা করার সময় আদি শঙ্করাচার্য 'ব্লাসফেমি'-র আশ্রয় নেননি। 'সুন্দর'কে হত্যার অপরাধে কালাপাহাড়, একই হেতুতে চরম ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাভোরানোলা ব্লাসফেমাস! সত্যসুন্দরসম্পৃক্তশিব-হীন যজ্ঞ করে দক্ষরাজ যেমন হয়েছিলেন ব্লাসফেমাস! অপরাধবোধে দিশেহারা লেখক নিজেকে সান্ত্বনা দিতে তাই ব্লাসফেমির জয়গান করছেন দক্ষরাজার দক্ষতায়। সেটাই সবচেয়ে বেদনাবহ!

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অত প্রকাণ্ড একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিতর অত ছোট্ট একটা কালানৌচিত্যদোষ দেখাবার উদ্দেশ্য কোন ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবণতা নয়। কী জানেন? 'স্পুনারিজম'-এ স্লিপ্ অব 'টঙ্গ' (tongue) হয়! মূক হবার সৌভাগ্য যার হয়নি, মাঝে-মাঝে তার মুখ 'ফক্কাবেই'! ঠিক তেমনি সাক্ষর হবার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে মাঝে মাঝে তাকে 'পেন্‌সোম্‌নাম্বোলিজ্‌ম'এ ভুগতে হবেই। ইঞ্জিরি-হরফে না লিখলে মালুম হবে না। আমি সেই বিচিত্র রোগটার কথা বলছি : pen-somnambulism! অর্থাৎ ঘুমাতে ঘুমাতে কলম দু-চার-ছত্তর আলুট-বালটু লিখে চলে, কলমের মালিক টেরও পান না। আপনারা যদি অধম লেখকের 'বিশ্বাসঘাতক' কেতাবের প্রথম সংস্করণ জোগাড় করতে পারেন তাহলে দেখবেন মদীয় লেখনী কী বিশ্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! আমি লিখেছিলাম, "জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।" এ-কথা 'সজ্ঞানে' লিখেছি, প্রুফে সংশোধন করিনি, প্রিন্ট অর্ডার দিয়েছি। ছাপা বইখানি হাতে পাওয়ার আগে মালুমই হয়নি যে, কলমটা ঘুমের ঘোরে 'নাইটহুড' লিখতে 'নোবেল প্রাইজ' লিখেছে!

'পেন্সোম্নাম্বোলিজম্'-এর কথাই যখন উঠে পড়ল তখন কিছুটা 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশন করা যাক : পুরানো কালের কিস্‌সা। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বঙ্গ-সরস্বতী তখন কোন হোলসেলার 'টাইকুন'-এর কারাগারে বন্দিনী নন। নানান গোষ্ঠীর বাক্‌বিতণ্ডার 'টাইফুন' বইত সাহিত্যের আনন্দ বাজারে। হরেক পেড়-এ হরেক চিড়িয়ার কিচির-মিচির। সবচেয়ে প্রভাবশালী একদল পরিযায়ী-পক্ষী; হপ্তায় ছয়দিন তাঁরা হাওড়া-বোলপুর ইস্টিশানের মধ্যে ওড়াউড়ি করতেন। হপ্তার শুধু একটি বিশেষ বার ছিল ভিন্-পালকী কুঁকড়োর কব্জায় : শনিবারটা!

প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে একটি যুগান্তকারী উপন্যাস : *গোরা*। লেখক দারুণ হুঁশিয়ার! রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে তাঁর তিনদশকের সম্পাদকী-অভিজ্ঞতায় ঐ লেখক বাঙলা-সাহিত্যের একমাত্র সাহিত্যিক যাঁর বর্ণাশুদ্ধি হত না! তাঁর ব্যবহৃত বানানে সন্দেহ জাগলে—হ্যাঁ, সেকথাও স্বীকার করেছেন রামানন্দ, তিনি অভিধান হাৎড়ে বানানটা মিলিয়ে দেখে নিয়েছেন। অমিল দেখলে, পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে ছাপা অভিধানের বানানটা সংশোধন করে দিতেন। এ-হেন লেখকের কলম বেমক্কা পড়ে গেল গভীর গাড্ডায় : 'পেন্সোম্নাম্বোলিজম'! প্রবাসীতে ছাপা হল,

ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ সুদীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের

খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

নজরে পড়েছে? লাইনটা দ্বিতীয়বার পড়ুন। সহজে পড়বে না। 'শনির দৃষ্টি' চাই যে! পরের সংখ্যায় *শনিবারের চিঠিতে* সজনীকান্ত লিখলেন :

স্বয়ং রবীন্দ্রের আদেশেও রবির ক্ষমতা নাই খরমধ্যাহ্নে কোন বস্তুর ছায়া বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘতর করিবার!

বুঝুন ব্যাপার! সে এমন একটা যুগ গেছে বাংলা সাহিত্যের, যখন কল্পিত-চরিত্রের ছায়ার মাপ পর্যন্ত হবু নোবেল-লরিয়েট লেখকের খামখেয়ালীতে এদিক-ওদিক হতে পারত না! আর আজ...থাক! 'অ্যাড নশিয়াম' হয়ে যাচ্ছে।

হায়রে কবে কেটে গেছে সজনীকান্তের কাল!

আম্রপালী

বুদ্ধদেবের সমকাল

[আনুমানিক 580—544 খ্রিঃ পূঃ]



রচনাকাল : 1982
প্রথম প্রকাশ : 1983,—সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম—গ্রন্থে

উৎসর্গ : শ্রীমতী শর্মিলা সান্যাল, পরমকল্যাণীয়াসু

তথ্যসূত্র ও নির্দেশ :

(1) পৃঃ ৪৭ *The Wonder That was India*, Dr. A. L. Basham, Sidgwick & Jackson, London 1954, p. 185
(2) পৃঃ ৪৮ 'কামসূত্র', বাৎস্যায়ন, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোক
(3) পৃঃ ৪৯ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাবস্তাবদান জাতক
(4) পৃঃ ৪৯ 'অভিসার', রবীন্দ্রনাথ—তদেব

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুতনুকা শুধু 'একটি দেবদাসীর নাম' নয়, সুতনুকা ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম দেবদাসী। 'দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা নারী'—দেবদাসী বলতে যা বুঝি, তা আগে থেকেই ছিল, অনেক অনেক আগেকার যুগ থেকে; কিন্তু 'দেবদাসী' শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে সুতনুকার ঐ সুতনু ঘিরেই। তাদের কাহিনীই আপনাদের আজ শোনাতে বসেছি। সেই প্রসঙ্গেই আসছে আম্রপালীর কথা।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? আমার তথ্যের ভাঁড়ে ভবানী। কিছুই জানি না সুতনুকার বিষয়ে। নামটা যদি সার্থক হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় তার তনুদেহের প্রতিটি স্তরে থরে থরে সৌন্দর্যসম্পদ সঞ্চিত করেছিলেন পঞ্চশর। নামটা নিশ্চয় সার্থক। অজন্তা-কোনার্ক-মহাবলীপুরমের অনেক অনেক নায়িকার মূর্তি মনের চোখে ভেসে ওঠে ঐ নামটা শুনলে—তন্বী, মধ্যক্ষাম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী! আমার পুঁজি মাগধী প্রাকৃতে রচিত একটি শ্লোক আর তার নিচে সরল গদ্যভাষে একটি স্বীকৃতি। ব্যস, ঐটুকুই আমার সম্বল, সুতনুকা কাহিনীর উপাদান। 'ব্লাইন্ড' খেলব না আপনাদের সঙ্গে। প্রথমেই হাতের তাসটা টেবিলে বিছিয়ে দিই :

মধ্যপ্রদেশে সরগুজা রাজ্যে অনুচ্চ রামগড় পাহাড়। পাশাপাশি দুটি অকৃত্রিম পর্বতগুহা—যোগীমারা আর সীতাবেঙা; কে বা কারা কোন্ যুগে ঐ অকৃত্রিম পর্বতগুহাকে ছেনি হাতুড়ির শাসনে গুহামন্দিরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল তা জানি না। ভগ্নস্তূপ দেখে মনে হয় বৌদ্ধ-গুহা নয়, অর্থাৎ ভাজা-কান্‌হেরী-অজন্তা-নাসিক-এর সমগোত্রীয় নয়; ও দুটি পৌরাণিক হিন্দুমন্দির। কিন্তু রূপদক্ষের দল বৌদ্ধ শিল্পসৌকর্যে অভ্যস্ত। পাহাড়ের গায়ে 'বাস-রিলিফ'-এ (অর্ধ-উৎকীর্ণ প্রস্তর) যে ভাস্কর্য—মহাকালের পরুষ হস্তাবলেপনে ক্ষতবিক্ষত মূর্তিগুলি—ভারহুত-সাঁচীর ঢঙে। সেই বংশীবাদিকা-বীণারঞ্জিনী-নৃত্যরতা অপ্সরা-গন্ধর্ব দেবদাসীর দল। উপরে খিলানে দুর্বোধ্য হরফে কী-যেন লেখা। পণ্ডিতেরা তাই নিয়ে যুগে যুগে তর্কবিতর্ক করেছেন। ভারততত্ত্বের স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যাশম[1] শ্লোকটির ইংরেজী তর্জমা করেছেন :

"Poets, the leaders of Lovers,
Light up hearts which are
Heavy with passion,
She who rides on a seesaw,
The object of jest and blame,
How can she have fallen so deep in love
As this ?"

অনুবাদে যা দাঁড়ায় :

কবি, নগর-নাগর-নৃপতি
জ্বালিয়ে তোলে অন্তর, নিরন্তর রিরংসা-জর্জরিত।
কৌতুক-কর্দম-ক্লিশিত ঐ যে মেয়েটিকে
নাগরদোলায় দোলায়
ও কেমন করে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়
এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে?

এবং তারপরেই সহজ সরল গদ্যভাষে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : 'সুতনুকা নাম দেবদাসিক্যী তং কাময়িথ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদক্‌খে।'

তার অর্থ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এম. বয়ার তার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন "Sutanuka by name, Devadasi. The excellent among young man loved her, Devadinna by name, skilled in sculpture" টি. ব্লচ-এর মতে আক্ষরিক অনুবাদটা হওয়া উচিত : Sutanuka, by name, a Devadasi made this resting place for girls. Devadinna by name, skilled in painting." দ্বিতীয় অনুবাদটা কিছুতেই মানা চলে না।—'কাময়িত্থ' শব্দটির অনুবাদ না থাকায়। ব্যাশম নিজে ঐ পংক্তিটি অনুবাদের চেষ্টা করেননি; তাঁর মহাগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের

রিপোর্ট : "Sutanuka, the slave-girl of the gods, loved the excellent young man Devadinna, the artist." অর্থাৎ সুতনুকা নামের জনৈকা দেবদাসী তরুণ শিল্পীচূড়ামণি দেবদিন্নকে ভালবেসেছিল।

ব্যস্! এটুকুই আমার পুঁজি!

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? বয়ার সাহেবের মতে দেবদিন্ন সুতনুকার প্রেমে পড়েছিল, অথচ পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে সুতনুকা দেবদিন্নের প্রেমে পড়েছিল। কোন্‌টা সত্য? জানি মশাই জানি, আপনি যা বলতে চাইছেন সেটাও ভেবে দেখেছি আমি—খঞ্জনী যখন বাজে তখন একা বাজে না, কে কাকে বাজায়, এ প্রশ্নটাই বাহুল্য। ওরা একে অপরের স্পর্শে রোমাঞ্চিততনু হয়! সেই কম্পনই যখন শব্দতরঙ্গে তোমার আমার শ্রুতিতে ধরা দেয় তখন আমরা বলি—খঞ্জনী বাজছে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? 'প্রেমে পড়া' আর 'প্রেম লাভ করা'—প্রেমের দুনিয়ার কর্তৃবাচ্য-কর্মবাচ্য কি একই মুদ্রার 'হেড অর টেইল'? মূল্যমানের তাতে হেরফের হয় না? আমি কিন্তু তা মানতে রাজি নই। দেবদাসী ক্ষণিকবাদী, প্রেমজীবিনী— তাকে প্রহরে-প্রহরে প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়, সেটাই তার পেশা। প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন নাগর। অভ্যাসবশে অজানা অচেনা পুরুষকে সে সন্ধ্যারাত্রে *তুলে নেয় হাতে, মধ্যরাত্রে মুক্তগ্রন্থী নীবিবন্ধের মেখলায় অভ্যাসবশেই তাকে স্পর্শ করায়, ভোর রাতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়* অভ্যস্ত অবজ্ঞায়, 'পরশপাথর' খুঁজে ফেরা খ্যাপার মতো। তারপর বর্ষণমুখর কোন এক নির্জন নিশীথে যদি সেই অলসকন্যার নজরে হঠাৎ ধরা পড়ে—কটিবন্ধে নিকষিত হেমের স্বর্ণাভা, তখন সে কী করবে?কেমন করে খুঁজে পাবে সেই অবজ্ঞায়-ছুঁড়ে-ফেলা পরশ-পাথর? তাই তার জীবনে অনেক—অনেক বড় জাতের প্রাপ্তি, যদি সে তার মুঠিতে ধরতে পারে তরুণ শিল্পীর একান্ত প্রেমকে!

তা সে যাইহোক, সুতনুকার কাহিনী লিখতে বসে উপাদান পেয়েছি ঐটুকুই। স্থান-কাল-পাত্র চিহ্নিত; তার বেশি কোন তথ্য নেই। তথ্য থাক না থাক, সত্য আছে। ঐ অজ্ঞাত কবির শ্লোকার্ধটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

কবি বলেছেন, মেয়েটি নাগরদোলায় দোলে। উভয় অর্থেই। চক্রাবর্তনের পথে কখনও উঠে যায় উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শীর্ষবিন্দুতে—আদরে সোহাগে 'কমপ্লিমেন্টস'-এ সে তখন প্রাপ্তির সপ্তমস্বর্গে; তখন সে নগর-নাগর-নৃপতিদের লালসাজর্জর কামনার ধন। কবি তখন তার রূপবর্ণনায় অভিধান হাতড়াতে ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের[2] মূল্যায়নে তখন সে নৃপতি-শ্রেষ্ঠী-মহাপণ্ডিতদের সমপংক্তিতে উপবিষ্টা হবার মর্যাদাসম্পন্না।

কিন্তু তারপর? নাগরদোলার সেই শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকবাদিনী স্থাবর নয়। পরমুহূর্তেই শুরু হয় তার অধঃপতন। নামতে-নামতে-নামতে সে এসে উপনীত হয় সমাজের নিম্নতম 'নাদির'-এ! তখন সে শুধু কৌতুকের শিকার, কর্দমপঙ্কে ক্লেদাক্ততনু। জেরুসালেম অধিবাসীদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়—কে ঐ ভ্রষ্টা রমণীকে লোষ্ট্রাঘাতে প্রথম ভূতলশায়িনী করবে।

এমন একটি বিচিত্র মেয়ে কেমন করে পড়ে অমন প্রেমে? অমন গভীর—সুগভীর প্রেমে? জানি না। ইতিহাস জানে না। তবে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমাকে যদি ছাড়পত্র দেন, তাহলে কল্পনায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে পারি : রূপদক্ষ দেবদিন্নের প্রভায় প্রোজ্জ্বল যুগে যুগে সুতনুকার প্রেমকাহিনী।

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে কয়েকটি শব্দ পাই : বেশ্যা, গণিকা, পুংশ্চলী প্রভৃতি। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বা জীবনযাত্রার কোন নির্দেশ নেই। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যে তাদের চেহারাটা একটু স্পষ্ট ; পুরাণগুলি অধিকাংশই খ্রিস্টজন্মের প্রায় সমসময়ে বা পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু প্রাক-বুদ্ধযুগের কাহিনী পুরাণকারেরা কতটা নিষ্ঠাভরে রচনা করতে পেরেছিলেন সেটাই বিবেচ্য। বৌদ্ধযুগে রূপোপজীবিনীদের উল্লেখ আছে, বুদ্ধের জীবনকালে এবং প্রাক-বুদ্ধযুগের জাতক-কাহিনীতে, যদিও সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত।

জাতক-যুগের কয়েকজন রূপোপজীবিনীকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, রবীন্দ্রনাথের কৃপায়—বাসবদত্তা, শ্যামা প্রভৃতি। এরা দেবদাসী নয়; তার সহোদরা বলা চলে—এরা রাজনটী অথবা বৌদ্ধ জাতকের ভাষায়—জনপদকল্যাণী। কৌতূহলী পাঠককে এই প্রসঙ্গে জানাই যে, রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগুলি জাতক থেকে সংগ্রহ করলেও স্বকীয় কল্পনায় তাদের সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন ধরুন শ্যামার[3] কাহিনীটি। জাতক অনুসারে বজ্রসেন আদৌ অন্যায় অপবাদে ধরা পড়েনি; সে সত্যই ছিল চোর। উত্তীয়ও স্বেচ্ছায় আত্মবলি দেয়নি—শ্যামা তাকে কৌশল করে নগর-কোটালের কাছে পাঠিয়েছিল বলি দিতে। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা জাতকানুসারে চৌরচূড়ামণি বজ্রসেন শ্যামার অলঙ্কার অপহরণ করে পালিয়েছিল। শ্যামা তার সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ফিরেছিল বটে, কিন্তু তার প্রেরণার উৎসমূলে ছিল অপহৃত অলঙ্কারের পুনরুদ্ধার। বজ্রসেন-এর সাক্ষাৎ সে পায়, কিন্তু বজ্রসেনকে পায় না। বিফল মনোরথ শ্যামা তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে আসে। এই স্থূল উপাদানটুকু অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনী গড়ে তুলেছেন তার আবেদন সহস্রগুণে মর্মস্পর্শী!

কিংবা ধরুন, দিব্যদানের বাসবদত্তার[4] কাহিনী। মথুরাপুরীর ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক আছে।; কিন্তু উপগুপ্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরে ছিলেন তথাগতর একান্ত ভক্ত, কিন্তু পেশাগতভাবে ছিলেন একজন 'ফার্মাসিউটিস্ট'। মথুরায় জনপদকল্যাণী বাসবদত্তা তার দাসীকে পাঠিয়েছিল মুদি-দোকান থেকে কিছু 'কালাগুরু' কিনে আনতে। ঝি বাজার করে আনলে আজকের দিনের গৃহস্বামিনী যা করে থাকেন, বাসবদত্তাও তাই করতে বসল, অর্থাৎ হিসাব নিতে। তার মনে হল ওজনে কম আছে। উপগুপ্ত ঠিকমতোই ওজন করে দিয়েছিলেন, বাস্তবে দাসীটি বাজার থেকে ফেরার পথে ঐ দুর্মূল্য বস্তুটির কিয়দংশ হস্তলাঘবতায় স্থানান্তরিত করেছিল মাত্র। কিন্তু মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। কর্ত্রীর তিরস্কার শুরু হতেই সে গালে হাত দিয়ে সে-কালীন প্রাকৃতে বলেছিল, "ওমা আমি কনে যাব গো! হ্যাঁ দিদিমণি! অমন কতাটি বোলনি বাপু! অমন কন্দর্পকান্তি দোকানদার তোমারে ঠকাবে। তারে দেখলি তোমার নিজেরই পেত্যয় হতনি! সে যেন 'নিম্ময়ূর' কাত্তিক!"

দাসীর উদ্দেশ্য সফল হল। রূপবর্ণনায় কৌতূহলী বাসবদত্তা স্বয়ং এল তদন্তে এবং মজল। এখানে পৌঁছেও কবি কিন্তু জাতককারের বর্ণনার অনুসারী হতে পারেননি। জাতকবর্ণিত বৃষস্কন্ধ কামোদ্দীপক যুবাপুরুষ তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে গেল—"শুভ্রললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

পরের পংক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন জাতককারকে। ঐ পংক্তিটি জাতকের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ, "এখনো আমার সময় হয়নি.... সময় যখন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।"

কবির মতে সেই সময় এসেছিল বসন্তকাল, বাসবদত্তার সঙ্গ যখন বিষাক্ত; কিন্তু জাতককারের বর্ণনায় উপগুপ্ত নটীর কাছে এসেছিলেন বধ্যভূমিতে—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তা নটীর শেষমুহূর্তে।

এত কথা কেন বলছি?

সুতনুকা-দেবদিন্নের প্রেমকাহিনী কপোল-কল্পনায় সাজিয়ে নেবার কৈফিয়ত হিসাবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত হওয়ার এ প্রেরণা স্বয়ং গুরুদেবের!

জাতক—তা সে যখনই রচিত হোক প্রাক্-বুদ্ধযুগের কাহিনী। বুদ্ধদেবের সমকালে পাচ্ছি আর একজন রাজনটীকে। যাঁর কথা এখানে শোনাতে বসেছি—আম্রপালী। বৈশালী নগরীর জনপদকল্যাণী। আম্রপালীর জন্ম নিয়ে নানান কিংবদন্তি। বিনয় পিটক অনুসারে আম্রপালী স্বয়ম্ভূ। বৈশালী নগরী তখন লিচ্ছবীদের রাজধানী। লিচ্ছবীরাজ মহানামের একটি সুবৃহৎ আম্রকাননে আম্রপালী পূর্ণযৌবনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষাচার্যের নির্দেশে মহারাজ মহানাম সেই অযোনিসম্ভবার সন্ধানে নির্গত হন এবং আম্রকাননে তার সন্ধান পান। সকলকলাপারঙ্গমা এই সুতনুকাকে দেখে সকলেই মোহিত। ক্রৌঞ্চ, শাক্য, মগধী ও লিচ্ছবীবংশীয় সকল রাজা এবং রাজপুত্রেরা এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারে মুগ্ধ—সকলেই তাকে বিবাহ করতে উৎসুক। মহানাম প্রমাদ গণলেন! অযুত পাণিপ্রার্থীর ভিতর মাত্র একজনকেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব— বাকি সকলেই হয়ে যাবে তাঁর শত্রু! অগত্যা মহারাজ 'গণ'-এর শরণ নিলেন। গণ হচ্ছে 'সিটি কাউন্সেল'—নগর-প্রধানদের পঞ্চায়েত। গণ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন এই 'অনির্ভব' সুতনুকা ব্যক্তিবিশেষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে না—সে হবে বৈশালীর জনপদকল্যাণী : সর্বজনভোগ্যা প্রধানা নটী!

গণ-এর সিদ্ধান্ত অতঃপর জ্ঞাপন করা হল আম্রপালীকে। সে সহাস্যে বলল, আপনাদের এই বিচার আমি শিরোধার্য করতে স্বীকৃতা; কিন্তু বিনিময়ে আপনাদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। শর্তসাপেক্ষে আমি স্বাভাবিক পুরস্ত্রীর জীবন বিসর্জন দিতে স্বীকৃতা।

—কী শর্তত্রয়?

—প্রথম শর্ত : নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হবে আমার প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের সমতুল্য!

গণ এ শর্ত এককথায় মেনে নিলেন। জনপদকল্যাণী মহারাজার সমমর্যাদাসম্পন্না, 'ফার্স্ট-লেডি'! দ্বিতীয় শর্তটিও ওঁরা মেনে নিলেন; প্রতিটি অতিথি আমাকে প্রতি রাত্রের জন্য পাঁচশত কার্ষাপণ সম্মানমূল্য দিতে বাধ্য থাকবে; এবং একজন অতিথি বিদায় নিলে দ্বিতীয় জনকে আমার প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

কিন্তু তৃতীয় শর্তটি কী?

—প্রাসাদে আমার স্বনিযুক্ত প্রহরী ও সহচরী থাকবে। প্রাসাদ অভ্যন্তরে আমার আইনই প্রযোজ্য—গণ-এর কোনও এক্তিয়ার থাকবে না।

—তা কেমন করে সম্ভব? তোমার প্রাসাদে যদি কোনও অতিথি নিহত হয়? আমরা তদন্ত করে দেখতে পারব না?

—পারবেন। কিন্তু আমাকে পূর্বেই জানাতে হবে। আমার সম্মতিসাপেক্ষে তদন্ত হবে। অভিযোগ দাখিলের পর অন্তত সপ্ত দিবস অতিক্রান্ত হলে।

কঠিন শর্ত! কিন্তু গণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ আম্রপালী জানিয়েছিল সে যেমন স্বয়ম্ভূ, তেমনি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারিণী। দেব-অংশে তার আবির্ভাব—শাপভ্রষ্টা সে, গণ এ শর্ত মেনে না নিলে সে আত্মবিলুপ্তিতে বাধ্য হবে। গণ-এর ইচ্ছা ছিল না এ শর্ত স্বীকার করতে; কিন্তু কামনাজর্জর লিচ্ছবী নাগরিকদের পীড়াপীড়িতে এ শর্তটিও স্বীকৃত হল।

আম্রপালী হল বৈশালীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—বস্তুত সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন! প্রতি রজনীতে পাঁচশত কার্ষাপণ দক্ষিণা গ্রহণ করে অচিরে ধনি হয়ে উঠল বৈশালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা ধনী।

আমাদের কাহিনীর কালে—আর শুধু আমাদের 'কাহিনীর কাল' কেন, সর্বকালেই আর্যাবর্তের মানবশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শাক্যসিংহ—তিনি তখন পরিব্রাজক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সম্রাট হচ্ছেন মগধাধিপতি বিম্বিসার। গঙ্গার দক্ষিণে পাটলিপুত্র, উত্তরে বৈশালী। ভৌগোলিক দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর—তিন প্রহরের অশ্বচালনা এবং এক প্রহরে গঙ্গা-পারাপার। তবু অসীম শক্তিধর মগধাধিপতির কাছে ঐটুকু দূরত্বই দূরতিক্রম্য। হেতু : লিচ্ছবিদের সঙ্গে মগধের তখন প্রচণ্ড বিরোধ। বৈশালী নগরীতে মগধরাজকে শনাক্ত করতে পারলে লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা ভীষ্মপর্বের শেষ দৃশ্যটির পুনরাভিনয় করে ছাড়বে!

কিন্তু শুধু সে জন্য সসাগরাধরণীর অধীশ্বর ক্ষান্ত হবেন? বিশেষ সার্থবাহ পুণ্ডরীক সেদিন যে কথা তাঁকে বলল তা শুনেও!

পুণ্ডরীক স্বনামধন্য মাগধী বণিক। কার্যোপলক্ষে সে প্রায়ই যায় বৈশালীতে। একাধিক রজনী সে যাপন করেছে আম্রপালীর প্রাসাদে। পুণ্ডরীক মহারাজের বয়স্যস্থানীয়। তাই সেবার ফিরে এসে সে অকুণ্ঠভাবে বলেছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে মগধ-সম্রাট করেননি, করেছেন সামান্য মাগধী বণিক!

সম্রাট সকৌতুকে বলেছিলেন, এ কথা হঠাৎ মনে হল কেন পুণ্ডরীক?

—নিজ অভিজ্ঞতা নেই মহারাজ, শুনেছি সিংহাসনের গদি খুব আরামদায়ক। কিন্তু আম্রপালীর উপাধানের চেয়ে নয় বোধ করি!

—আম্রপালীর শয্যার উপাধান এতই কামদার?

—আজ্ঞে না! তার পীবর-বক্ষের যুগল উপাধানের কথা বলছি, মহারাজ!

বিম্বিসার বলেন, কেন? পাটলিপুত্রের জনপদকল্যাণী জাম্ববতীর কী দোষ হল?

পুণ্ডরীক সহাস্যে বলে, সেটাও আমাকে জেনে যেতে হবে। আম্রপালী জানতে চেয়েছে।

—কী?

—সে প্রশ্ন করেছিল, পাটলিপুত্রে রসালবৃক্ষ আছে কি না। জানতে চেয়েছিল, মহারাজের প্রাসাদকাননে কি শুধুই জামের গাছ? এ কথা বলেই কৌতুকময়ী একটি পাকা জাম ছুঁড়ে মেরেছিল আপনার গায়ে।

—আমার গায়ে? .

—না। মানে আপনার আলেখ্যের গায়ে। তার প্রমোদকক্ষে সমগ্র আর্যাবর্তের নৃপতিবর্গের প্রাচীরচিত্র। আপনার আলেখ্যটি তার শয্যার পদপ্রান্তে।

—পদপ্রান্তে ? আমাকে অপমান করতে?

—মহারাজ, আপনি মহাভারত পড়েননি? নিদ্রাভঙ্গে সে যে বিশেষ একজনের চিত্রই দেখতে চায়।

এরপর বিম্বিসারের পক্ষে আত্মসম্বরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক অভিসার রজনীতে গোপনে তিনি ছদ্মবেশে নির্গত হলেন। কিন্তু খেয়াঘাটের সীমান্তপ্রহরী তাঁকে শনাক্ত করে ফেলল। বিম্বিসার যে তাঁর অশ্বটিকে ছদ্মবেশ পরাননি। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নৃপতির বাহনটি ছিল অশ্বকুলে উচ্চৈঃশ্রবা। সম্রাট অশ্বারোহণে যতক্ষণে উপস্থিত হলেন আম্রপালীর প্রমোদকুঞ্জে ততক্ষণে সমগ্র বৈশালী চঞ্চল। অচিরে সেই গণিকালয়টি অবরুদ্ধ করল লিচ্ছবী সেনানায়কেরা। আম্রপালী মহান অতিথির পরিচর্যার কী আয়োজন করবে স্থির করে ওঠার পূর্বেই সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ পাষাণকুট্টিমে ধ্বনিত হল : দ্বার উন্মুক্ত কর, আম্রপালিকে ! তোমার প্রাসাদে তস্কর প্রবেশ করেছে!

প্রাসাদকুঞ্জের ইন্দ্রকোষের অন্তরাল থেকে আম্রপালী প্রশ্ন করে, কে তোমরা? কী চাও?

—আমরা লিচ্ছবী গণ-এর সেনাবাহিনী। সংবাদ পেয়েছি, বৈশালীর চিরশত্রু তোমার প্রাসাদ-অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে। পলাতককে সমর্পণ কর।

আম্রপালী অকুতোভয়ে বলে, গণ-এর বিচারে আম্রপালী সর্বজনভোগ্যা! সে অজাতশত্রু!

জনারণ্যের ভিতর কে যেন ব্যঙ্গ করে, অজাতশত্রু নয়, রাজনটি। তার বাপকে চাই!

আম্রপালী বলে, গণ-অধিপতিকে বল, তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করলাম। শর্তানুসারে সপ্তদিবস অন্তে প্রাসাদ তল্লাশি করতে পার তোমরা।

সপ্তদিবস-রজনী লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা অতন্দ্র প্রহরায় বেষ্টন করে রইল গণিকার কেলিকুঞ্জ। কিন্তু ভস্ম হবার আশঙ্কায় কি মদন বিরত হয়েছিল পঞ্চশর বর্ষণে? আসন্ন সর্বনাশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দুটি নরনারী সপ্তদিবস-রজনী বিভোর হয়ে রইল। তারপর কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে সেই সৈন্য-বেষ্টনী ভেদ করে মগধাধিপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন বিনয় পিটককার। কিন্তু ভোলেননি জানাতে যে, তিনি বৈশালীতে সেই আনন্দঘন সপ্তাহের একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে এসেছিলেন।

যথাকালে ভূমিষ্ঠ হল সেই সন্তান—পুত্রসন্তান—অভয় বা জীবক। বৈশালী তাকে সুনজরে দেখেনি। না দেখাই স্বাভাবিক—শিশুহত্যাও করেনি কিন্তু। অবজ্ঞায়, অনাদরে, শুধুমাত্র জননীর একান্ত সাহচর্যে শিশু হয়ে ওঠে বালক। পাঠশালে যায় না, গুরুগৃহে তার স্থান হবে না, গণিকালয়ের চৌহদ্দির ভিতরেই সে পৃথিবীকে চিনে নেয়।

লিচ্ছবীদের চিরশত্রুর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার অপরাধে আম্রপালী জাতিচ্যুতা— কেউই আর আসে না সেই উর্বশীবিনিন্দিতার সঙ্গসুখ কামনায়। তাতে আম্রপালী আনন্দিতা। পুরুষসিংহ বিম্বিসারের সিংহনাদের পর শিবাকুলের হুক্কাধ্বনি তার সহ্য হত না—সে যেন, অগাধ জলসঞ্চারী রোহিতমৎস্যের জলকেলির পর সফরির 'ফর্‌ফরায়ণ'! সে যেন মধ্যরাত্রের দরবারী কানাড়ার পর শেষপ্রহরের ক্লান্তিকর বায়স-বাচালতা।

দিন যায়। তারপর একদিন বৈশালীতে এলো গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর ভিতর দিয়ে যাত্রা করবেন। এক রাত্রি বাস করে যাবেন ঐ মহানগরীতে। মহাপরিব্রাজক তখন পরিণত বয়স্ক, সমগ্র আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। লিচ্ছবীরাজ ধন্য হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করতে থাকেন এই আশায় যে, শাক্যসিংহ সশিষ্য তাঁর প্রাসাদেই আতিথ্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন 'গণ'। তাঁরা সুশোভিত করতে থাকেন অতিথিশালাটি। আশা—মহামানব গণ-এর আতিথ্য গ্রহণ করবেন। আম্রপালী—বৈশালী নগরীর নটী—সেই যে-মেয়েটি নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে উপনীত হয়েছে অসম্মানের নিম্নতম পাতালে—সে নিশ্চিত জানে, রাজপ্রাসাদই হোক, অথবা অতিথিশালাই হোক, মহামানবকে প্রণাম জানাতে সে কোথাও যেতে পারবে না। সেসব স্থলে সমাজত্যক্তার আর

প্রবেশাধিকার নাই। উপেক্ষিতা হতভাগিনী রওনা হল নগরপ্রান্তে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানাতে। সঙ্গে তার কানীন পুত্র জীবক।

বৈশালী নগরসীমান্তে এক আম্রকাননে সশিষ্য অধিষ্ঠান করছেন মহাকারুণিক। এ সেই আম্রকানন, যেখানে দীর্ঘদিন পূর্বে আবির্ভূতা হয়েছিল অযোনিসম্ভবা আম্রপালী। আজ সে উদ্যান লোকে লোকারণ্য। 'লোকুত্তম' একটি পাষাণচত্বরে প্রলম্বিতপদমুদ্রায় ধ্যানস্থ। তাঁকে ঘিরে বসেছেন অযুত ভক্ত। বামদিকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ—সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ; দক্ষিণদিকে মহারাজ মহানাম এবং গণ-এর প্রতিনিধিরা। আম্রপালী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জনারণ্যের একান্তে আত্মগোপন করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত রূপই তার কাল হল। সভাস্থ সকলেই লক্ষ্য করল সেই পাপিষ্ঠাকে। কী সাহস! কানীন পুত্রটিকেও সঙ্গে করে এনেছে!

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর লোকুত্তমের ধ্যান ভঙ্গ হল। রুদ্ধশ্বাস জনতা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে। জনতার প্রথম সারি থেকে একযোগে দণ্ডায়মান হন—মহারাজ মহানাম এবং গণপ্রধান। উভয়েই যুক্তকরে কিছু নিবেদন করতে চান। কিন্তু তার পূর্বেই জনতার লক্ষ্য হল—মহাকারুণিকের করুণাঘন দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে জনারণ্যের শেষপ্রান্তে এক অন্তেবাসিনীর উপর, নির্নিমেষলোচনে যে এতক্ষণ দেখছিল মহামানবকে। শাক্যসিংহ সহাস্যে বললেন, আম্রপালিকে! বৈশালী নগরীতে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করতে চাই। তোমার সর্বতোভদ্রে আমার ঠাঁই হবে?

পরিবর্তে সভাস্থলে বজ্রপাত হলেও জনতা এমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হত না!

'সর্বতোভদ্র'। সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন! ঘৃণিত রাজনটীর গণিকালয়!

আম্রপালী উঠে দাঁড়াল। কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে এল। কি-যেন বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল তার। নতজানু হয়ে বসে পড়ল ওঁর পদপ্রান্তে।

মহাভিক্ষু সারিপুত্ত বললেন, জীবকমাতা! ভগবান বুদ্ধ তোমার গৃহে অতিথি হতে ইচ্ছাজ্ঞাপন করছেন। তুমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবে না?

না! পারবে না! কিছুতেই পারবে না! সেই পতিতালয়ে সে কেমন করে আহ্বান জানাবে 'লোকুত্তম'কে? হতভাগিনী তার অনিন্দ্য আননটি নামিয়ে আনে যুগলচরণে—আযৌবনের অযুত পুরুষসম্ভোগের ক্লেদ অশ্রুর বন্যায় যেন ধৌত হয়ে গেল।

লিচ্ছবীরাজ ও 'গণ'-এর পরাজয় ঘটল আবার। সেই ঘৃণিতা দুর্বিনীতা রাজনটী —যে আশ্রয় দিয়েছিল লিচ্ছবীদের চিরশত্রুকে, যে সেই মহাপাষণ্ডের বীর্যকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে পাপের পসরা পূর্ণ করেছে, সেই কলঙ্কিনীরই জয় হল আবার!

ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য অতিথি হলেন নটীর। পিটককার বলেননি—আশ্চর্য, কেন বলেননি—সে রাত্রে ভগবান বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কানীন পুত্রের জননীকে! বস্তুত কোনও উপদেশ যে দিয়েছিলেন এমনও ইঙ্গিত নেই। বোধকরি আম্রপালীর অন্তরে এমন একটি আকৃতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যার জন্য মৌখিক উপদেশ ছিল বাহুল্য। বুদ্ধদেব বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপনান্তে পরদিন পুনরায় পথে বার হলেন। এমন কত কত পুরুষই তো সম্ভোগরাত্রিশেষে যাত্রা করছে প্রাসাদ ত্যাগ করে; কিন্তু এ প্রস্থান তো শুধু প্রস্থান নয়, এ যে আম্রপালীর জীবনে এক মহাভিনিষ্ক্রমণ!

বুদ্ধদেব নগরসীমা অতিক্রম করার পূর্বেই ভূলুণ্ঠিত হল রাজনটীর ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি। পীত চীবরধারিণী ভিক্ষাপাত্র হাতে তার পূর্বেই বার হল পথে—তার হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কানীনপুত্র জীবক। দুজনের যৌথ-পুকারে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বৈশালীর রাজপথ :

প্রভু বুদ্ধ লাগি, আমি ভিক্ষা মাগি —

বিম্বিসারের অভিসারে বৈশালী লাভ করেছিল একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন : জীবক। শাক্যসিংহের অভিনিষ্ক্রমণে বৈশালী লাভ করল আর একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন : একটি মহাসঙ্ঘারাম, নগরীর কেন্দ্রস্থলে।

প্রাক্সন্ন্যাসজীবনে যে প্রাসাদের পরিচয় ছিল :

আম্রপালীর বেশ্যালয়!

সেই সর্বতোভদ্র!

সুতনুকা

প্রিয়দর্শী অশোক, মৌর্য যুগ

[আনুমানিক 297—237 খ্রিঃ পূঃ]



তথ্যসূত্র ও নির্দেশ :

(1) পৃঃ ৫৫ মেঘদূতবর্ণিত বিদিশা নগরীর অনতিদূরে, বর্তমান সাঁচীর নাম মৌর্যযুগে ছিল কাকনায়। Vide : **Sanchi,** The Publication Divn., Govt. of India, Jan. '60. p. 5

(2) পৃঃ ৫৫ বুদ্ধদেবের '2500-বর্ষ পূর্তি উৎসবে' প্রারম্ভিক ভাষণে মহাথের বলেছিলেন : সাঁচীর বৃহত্তম স্তূপে সংরক্ষিত আছে স্বয়ং লোকুত্তম বুদ্ধদেবের পূতাস্থি, যা মগধসম্রাট বিম্বিসার কুশীনগর থেকে সংগ্রহ করে এনে তাঁর রাজধানী পাটলীপুত্রে সংরক্ষণ করেন। পরে সম্রাট অশোক প্রিয়দর্শী সেটি সাঁচীতে স্থানান্তরিত করেন।

(3) পৃঃ ৫৫ এই শ্লোকটি সাঁচীস্তূপের পূর্ব তোরণে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এর অর্থ : 'বিদিশানগরীর দক্ষ কারিগরদ্বারা নির্মিত'।

(4) পৃঃ ৫৮ "এখন তুমি বার্ধক্যসীমান্তে উপনীত,
যমালয়ের সন্নিকটে তুমি উপস্থিত।
পথে আর কোনও বিশ্রামস্থলও নাই,
আর পথচলা-কালে তুমি কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও করোনি।"

ধম্মপদ, 237

খ্রিস্টপূর্বাব্দ দুইশত সাঁইত্রিশ। মহানগরী বিদিশার অনতিদূরে একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম। আর্যাবর্তের মানচিত্রে নামটি অচিহ্নিত : কাকনায়।[1] জনবসতি নিতান্ত অল্প, কিছু দূরে দূরে গোলপাতায়-ছাওয়া পর্ণকুটির; তার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে কিছু মেহনতি মানুষ। আর বিদিশা নগরী থেকে আগত কিছু ভাস্কর, যারা ইতিপূর্বে ছেনি-হাতুড়ি চালনায় ছিল অনভ্যস্ত। তারা হস্তিদন্ত-শিল্পী। বিজন প্রান্তরে সদ্য গড়ে-ওঠা গণ্ডগ্রামের মধ্যভাগে একটি অনুচ্চ টিলা; তার উপর দুটি ক্ষুদ্রকায় স্তূপ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি বিহার, একটি চৈত্য এবং কিছুদূরে যেন সামান্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে একটি ভিক্ষুণী বিহার।

নির্মীয়মাণ সঙ্ঘারামের প্রধান অর্হৎ মহাথের বুদ্ধভদ্রের দৃঢ়বিশ্বাস—কালে এই অখ্যাত জনপদটি হয়ে উঠবে মহাতীর্থ। বীজটি উপ্ত হয়েছে, মহীরূহে রূপান্তরিত হতে কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দী লাগবে—এই যা।

স্তূপ দুটির একটির গর্ভে সুসঞ্চিত মহাঅর্হৎ সারিপুত্ত এবং মহামৌদগল্ল্যায়নের পূতাস্থি। অপরটিতে সঙ্গোপনে সংরক্ষিত হয়েছে এমন এক সম্পদ যা অচিন্ত্যনীয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মগধরাজ অজাতশত্রু সেই মহাসম্পদটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন কুশীনগরের অধিপতি মল্লরাজের নিকট থেকে, তাঁর বিচক্ষণ ব্রাহ্মণমন্ত্রী দ্রোণের সহায়তায়। মাত্র দুই দশক পূর্বে দেবনাম পিয়তস্‌স সম্রাট প্রিয়দর্শী সেই পরম সম্পদটি স্বহস্তে সংরক্ষিত করে গেছেন স্তূপগর্ভে।[2]

মূল স্তূপটিকে ঘিরে গড়ে উঠছে থভ-সূচী-বেদিকা-প্রদক্ষিণপথ। পূর্ব-তোরণটি সুসমাপ্ত, তার বরাঙ্গে জাতকের নানান কাহিনী। বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে দক্ষিণ-তোরণ। মহাথের-এর অনুমতিক্রমে বিদিশার শিল্পীদলকে স্বীকৃতি দিতে তার একপ্রান্তে সম্প্রতি খোদিত হয়েছে একটি লিপি—"বিদিশাকেহি দন্তকারেহি রূপকম্মাম্ কৃতম[3]।"

আমাদের কাহিনী-কালে, সেই দুইশত সাঁইত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গণ্ডগ্রাম কাকনায়ে নেমে এসেছে এক মর্মবিদারক দুঃখের ঘনান্ধকার। সংবাদবহ পাটলিপুত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে সেই নিদারুণ বার্তাটি নিয়ে : সদ্ধর্মের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক দেবনাম পিয়তস্‌স মগধরাজ প্রিয়দর্শী আর ধরাধামে নাই।

ক্ষুদ্রায়তন চৈত্যে সমবেত হয়েছেন সকলে। চৈত্যটি আয়তাকার—দূরতম প্রান্তে একটি স্তূপ; দুই পার্শ্বে দুই সারি স্তম্ভ। ঘৃতপ্রদীপের আলোকবর্তিকায় সন্ধ্যার ঘনান্ধকার সত্ত্বেও চৈত্যাভ্যন্তর আলোকিত। এক দিকে বসেছেন ভিক্ষু, অপরদিকে ভিক্ষুণীর দল। সঙ্ঘারামের অগ্‌গবিনতা মহাভিক্ষুণী পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে স্তূপকে বরণ করলেন। মহাথের উচ্চারণ করলেন প্রার্থনামন্ত্র। সম্রাট প্রিয়দর্শীর আত্মার 'পরিনিব্বাণ' কামনা করে সান্ধ্যপ্রার্থনাসভার অবসান ঘটল।

মহাভিক্ষুণী সেবানম্রাকে পুরোভাগে নিয়ে ভিক্ষুণীর দল—সংখ্যায় তাঁরা মাত্র সাতজন—প্রত্যাবর্তন করলেন ভিক্ষুণী-বিহারে। অন্যান্য সকলে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বিদায় হলেন। মহাভিক্ষুণী তাঁর একান্ত-সহচরী মালতীকে ডেকে বললেন, আমার অজিনাসনটি বিছিয়ে দাও। আজ আমার উপবাস। আমি ধ্যানে বসব।

আদেশমাত্র মালতী ওঁর ধ্যানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিল। মহাভিক্ষুণী সেবানম্রা পঞ্চাশোর্ধ্বা; তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরনে পীতবাস, সর্বাঙ্গে নেই কোনও আভরণ। কিন্তু এখনও তাঁর দেহে জরা রেখাপাত করতে পারেনি। এখনও তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। নিঃসন্দেহে যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

সম্রাট প্রিয়দর্শীর মহাপ্রয়াণে তিনি আজ কিছু বিচলিতা। মালতী কক্ষ ত্যাগ করার পর তিনি অজিনাসনে উপবেশন করলেন না। পরিবেণের অপর প্রান্তে রক্ষিত একটি পেটিকার বন্ধন উন্মোচন

করতে থাকেন। পেটিকাটি নানান তাল ও ভূর্জপত্রের পুঁথিতে আকীর্ণ। তার ভিতর হস্তসঞ্চালন করে নিম্নতম স্থান থেকে তিনি উদ্ধার করে আনলেন একটি অতিক্ষুদ্র রত্নমঞ্জুষা। তার গর্ভস্থ বস্তুটি আজ তিন-দশক আলোকস্পর্শ লাভ করেনি। আজও করল না। বহুক্ষণ সেটিকে দুই হস্তে ধারণ করে মহাভিক্ষুণী রুদ্ধদ্বার পরিবেণস্থ নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মহাভিক্ষুণী আর দীপশিখা পরস্পরের উপমান তথা উপমেয় হয়ে গেল! তারপর অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বললেন, তুমি তো অশোক! তাহলে আমাকে কেন দিয়ে গেলে এত বড় শোক!

নাঃ! সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। রত্নমঞ্জুষার অভ্যন্তরে দৃক্‌পাতের লোভ সংবরণ করে পুনরায় সেটিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করলেন। অজিনাসনে ধ্যানে বসার উপক্রম করছেন এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত হল।

পুনরায় গত্রোত্থান করলেন মহাভিক্ষুণী। দ্বারের অর্গল মোচন করে বললেন, কী মালতি?

মালতী সলজ্জে ক্ষমা ভিক্ষা করে বলে আজ পূর্বাহ্ন থেকে এক অন্ধ বৃদ্ধ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। দুঃসংবাদ শ্রবণে আমরা কেউই সেকথা মনে রাখিনি। তিনি এখনও পরিবেণ-সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে অপেক্ষা করছেন।

মহাভিক্ষুণী বিস্মিতা হলেন, অন্ধ বৃদ্ধ! আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী? কেন?

—সেকথা তিনি শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে চান।

—উত্তম। কিন্তু যথাবিহিত অতিথি-সৎকার করা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আপনি অনুমতি করলে .....

—ঠিক আছে। তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

পরিবেণ অপ্রশস্ত। তদ্ভিন্ন সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। মহাভিক্ষুণী স্বয়ং এসে বসলেন পরিবেণ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের এক শিলাসনে। একটু পরেই বৃদ্ধের হস্তধারণপূর্বক মালতী প্রত্যাবর্তন করল। আগন্তুকের বয়স যদি ষাট হয়, তবে বলতে হবে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পরিধানে ধূলিমলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। নগ্নবক্ষের প্রতিটি পঞ্জর গণনা করা যায়। মালতী অন্ধকে সম্বোধন করে বলল, আপনি মহাভিক্ষুণী অগ্‌গবিনতার সম্মুখে এসেছেন। কী বলতে চান, বলুন?

বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে মহাভিক্ষুণীকে প্রণাম করলেন। বললেন, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, মা। কিন্তু আমি নিরুপায়। একটি ভিক্ষা আছে .....

—বলুন?

—আমি অন্ধ, অশক্ত। কিন্তু আমার পুত্রটি দক্ষ কারিগর। তাকে যদি অনুগ্রহ করে কাকনায় মহাবিহারের নির্মাণ কার্যে ....

—সেকথা বলতেই কি এই মধ্যরাত্রে ....

বৃদ্ধ সসঙ্কোচে বলেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মা!

মহাভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ আত্মসংশোধন করে বলেন, না, আমারই ভুল। শুনেছি আপনি দিবাভাগেই এসেছিলেন। আমরা একটি দুঃসংবাদ শ্রবণে—

—জানি মা, জানি। অমন ইন্দ্রের মতো মহারাজ .....

—ইন্দ্রের মতো! আপনি তাঁকে স্বচক্ষে কখনো দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি বইকি। তখন আমার দৃষ্টি ছিল তো। সে আজ চার দশক পূর্বেকার কথা। তাঁকে দেখেছি। শালপ্রাংশু, মহাভুজ। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম যোগীমহেশ্বর মন্দিরে।

মহাভিক্ষুণী একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কী? কী? কী মন্দির? যোগীমহেশ্বর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মধ্য আর্যাবর্তে। রামগড় পর্বতে। সেখানে নির্মিত হয়েছিল পাশাপাশি দুটি গুহামন্দির—যোগীমহেশ্বর এবং সীতা-বঙ্কিমা। যোগীমহেশ্বরে পূর্বযুগে থাকতেন আদিকবি বাল্মীকি। আর সীতা-বঙ্কিমায় বাস করতেন নির্বাসিতা সীতামাঈ। নিচ দিয়ে বহে চলেছে রেন্দ্‌ নদী। আমি সেই

গুহামন্দিরের ভাস্কর ছিলাম, মা। অনেক অনেক মূর্তি খোদাই করেছি সেখানে। গন্ধর্ব-কিন্নর, নৃত্যরতা দেবদাসী। তখন তো আমার দৃষ্টি ছিল .... আর জানলেন মা, মন্দিরের প্রবেশ-তোরণে আমি একটি মূর্তি খোদাই করেছিলাম; সুতনুকার ....

সজ্ঞান উচ্চারণ নয়, অনিবার্য প্রতিধ্বনির মতো মহাভিক্ষুণী বললেন,...সুতনুকার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ছিল সেই মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, রুদ্রাণী! অমন অসামান্যা সুন্দরীর—বাক্যটি শেষ হল না বৃদ্ধের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সেসব অবান্তর কথা শুনিয়ে কী লাভ? সুতনুকার সে রূপও নেই, রূপ দেখবার দৃষ্টিও নেই রূপদক্ষ দেবদিন্নর.....

বৃদ্ধ নীরব হল। বোধকরি সে কোন বিস্মৃত অতীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে, আপনারা কি এখনও আছেন? মায়েরা?

মালতী সাড়া দেয় না। প্রস্তর-বেদিকায় মাথা রেখে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দীপশিখাটি হাতে নিয়ে যেন স্তূপ প্রদক্ষিণ করছেন অগ্‌গবিনতা। এদিক-ওদিক নানাদিক থেকে ঐ অন্ধ বৃদ্ধের ভিতর তিনি কী যেন খুঁজছেন।

—মা?

সম্বিত ফিরে পান এতক্ষণে! ছি ছি ছি! এ কী করছিলেন এতক্ষণ! কিসের এ কৌতূহল? আত্মবিশ্বাস ফিরে পান তিনি। বলেন, কিছুই নেই বলছেন কেন রূপদক্ষ? যোগীমহেশ্বর গুহায় আপনার সেই মূর্তিটা তো শাশ্বত হয়ে রইল—

—না মা, নেই। অপরাধীদের সন্ধান না পেয়ে সহস্রাক্ষের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ঐ মূর্তিটার উপর। সেটাকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

এবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল অগ্‌গবিনতার। বললেন, মূর্তিটাও তাহলে রইল না?

—শুধু কি তাই মা? তার পরিবর্তে শাশ্বত হয়ে রইল একটা প্রহসন! কে যেন সেই বিদীর্ণ মূর্তির পাদমূলে কৌতুক করে উৎকীর্ণ করেছে একটি পংক্তি—"দেবদিন্ন সুতনুকাকে ভালবেসেছিল।"

অগ্‌গবিনতা ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্তা। কূর্ম যেমন তার হস্তপদাদি নিজ দেহবর্মের ভিতর লুক্কায়িত করে, ঠিক তেমনি নিজ বিচ্ছিন্ন চিন্তা, উচ্ছ্বাস হৃদয়াবেগকে সঙ্কুচিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনি দৃষ্টি খুইয়েছেন কবে? কী করে?

—সে সব কথা শুনে আপনার কী লাভ, মা? দুঃখীর জীবন বড় দুঃখের।

—তবু বলুন আপনি।

—সহস্রাক্ষ অপরাধীকে খুঁজে পায়নি, কারণ আমি মধ্য আর্যাবর্তের অরণ্য-পর্বতে দীর্ঘ তিনমাস আত্মগোপন করে ছিলাম। শুধু ফলমূল আর ঝরনার জলই ছিল আমার জীবনধারণের উপাদান। ঐ সময় কোনও বিষাক্ত ফলের রসে আমার দুটি চক্ষুই নষ্ট হয়ে যায়।

—তারপর?

—তারপর আর কী বলব, মা? সহস্রাক্ষের মৃত্যুর পর যোগীমহেশ্বরে গিয়েছিলাম কিন্তু সুতনুকার সাক্ষাত পাইনি। সে নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর আমিও পথে পথে ফিরতে থাকি। এক জন্মদুখিনী আমাকে গ্রহণ করে। সে ছিল খঞ্জ, অন্ধ নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভর করে এতদিন বেঁচেছিলাম। সে স্বর্গে গেছে; কিন্তু তার সন্তানটি আমারই মতো.... না। আত্মপ্রশংসা করব না মা, আর আপনি তো আমার হাতের কাজ দেখেননি! আপনি বরং নিজে পরখ করে তাকে কাজে বহাল করবেন।

অগ্‌গবিনতা এতক্ষণে সম্পূর্ণ আত্মস্থা হয়েছেন। না, ঐ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রতি কোন আকর্ষণ, কোনও অভিমান, কোন মোহ আজ তাঁর নাই। আজ এই মুহূর্তে যেন তাঁর উপসম্পদাগ্রহণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। একদিন—সেই যেদিন ছেনি হাতুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপের কাঙাল দেবদিন্ন প্রথম সুতনুকার তনুদেহটি আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছিল, চুম্বনে চুম্বনে তাঁকে উন্মাদ করে দিয়েছিল, সেদিন

যেমন সুতনুকার ইচ্ছা করেছিল রামগড় পাহাড়ের শিখরে শিখরে, ঘোষণা করে বেড়াতে : 'আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি অমৃতের আস্বাদ'—ঠিক তেমনি আজ অগ্‌গবিনতার ইচ্ছা করছিল, কাকনায়ের চৈত্য-বিহারের পথে পথে চিৎকার করে বলতে : "ওগো তোমরা শোন, আমি পেয়েছি মহাকারুণিকের কৃপা। আর কাউকে ডরাই না আমি! কিছুকেই ভয় করি না। বর্তমানকে জয় করেছিলাম, ভবিষ্যৎকে জয় করেছিলাম, আজ আমার অতীত-জয় সুসম্পন্ন!"

সুতনুকা দেবদিন্নের বন্ধনমুক্তা হয়ে চিৎকার করেনি, বসে পড়েছিল রতিক্লান্তার মতো। অগ্‌গবিনতাও চিৎকার করে উঠলেন না, বসে পড়লেন বৃদ্ধের পাশে ধুলায়। করুণায় আপ্লুত হয়ে গেল তাঁর মাতৃহৃদয়। বললেন, ভয় নেই, রূপদক্ষ দেবদিন্ন। আপনার পুত্রকে কাল নিয়ে আসবেন। তাকে এই সঙ্ঘারাম নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করব আমি। বাকি জীবনে আপনার আর অর্থাভাব থাকবে না।

পরম আশ্বাসে চরম কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধ পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল অগ্‌গবিনতাকে।

মালতি বৃদ্ধের হাত ধরে প্রস্থান করা মাত্র অগ্‌গবিনতা পরিবেণের অর্গল রুদ্ধ করলেন। এবার তিনিও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন পরিবেণ-প্রান্তস্থিত বুদ্ধপ্রতীক ক্ষুদ্র স্তূপকে। অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ করলেন :

> 'উপনীতবয়ো চ দানি'সিম্‌
> সম্‌পয়াতো'সি যমসস্‌ সন্তিকে।
> বাসোপি চ তে নত্থি অন্তরা
> পাথেয়্যম্‌পি চ তে ন বিজ্জতি।।[4]

বারম্বার আত্মসম্বোধন করে স্বীকার করলেন, "এতদিনে তোমার যৌবনজ্বালা প্রশমিত হয়েছে। তুমি বৃদ্ধা হয়েছ, মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীতা.... এমতাবস্থায় তুমি নিজের জন্য একটি নিভৃত পুণ্যদ্বীপ গঠন কর, নির্মল ও কামজয়ীর স্বাক্ষর রাখ।"

কামজয়ীর স্বাক্ষর! ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা উত্তরণের জয়স্তম্ভ। হ্যাঁ, এতদিনে সে মহান ব্রত-উদ্‌যাপনের মহালগ্ন সন্নিকট। যে অন্তর্লীন 'নাম'টি মনের অবচেতনে উঁকি দিলে ওই যৌবনোত্তীর্ণা ভিক্ষুণী আজও রোমাঞ্চিততনু হতেন সেই নাম রূপ-পরিগ্রহ করে তাঁর চর্মচক্ষুর সম্মুখে উপনীত হল—তবু তাঁর কোনও চিত্তবিকার ঘটল না। রূপদক্ষ দেবদিন্নর প্রেতাত্মাকে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয়ে করুণার উৎসমুখটি উন্মোচিত হল শুধু।

—নমো বুদ্ধায় গুরবে, ধম্মায় তারিণে, সঙ্ঘায় মহোত্তমায় নমঃ।

পুনরায় পেটিকাটি বন্ধনমুক্ত করলেন। ঘৃতপ্রদীপটি উজ্জ্বলতর করে নির্ভয়ে এবার উন্মোচন করলেন ক্ষুদ্রায়তন রত্নমঞ্জুষার আচ্ছাদন। দীর্ঘ তিন-দশকের বন্দিদশা উত্তরণে রাজাঙ্গুরীয় লক্ষ প্রতিবিম্বে হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে। এক প্রদীপের আলোকবর্তিকা লক্ষরূপ পরিগ্রহ করে পরিবেণের পাষাণচত্বরে জ্বেলে দিল দীপান্বিতায় তারার মালিকা। অগ্‌গবিনতা অট্টহাস্য করে ওঠেন এতক্ষণে। আত্মজয়ের সাফল্যে। অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করে বলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আত্মজয় সম্পূর্ণ না করে তোমাকে বিদায় দেব না। আজ এই মুহূর্তে আমি আত্মজয়ী! কালই তোমাকে বিদায় করে দেব। সঙ্ঘের রত্নভাণ্ডারই তোমার একমাত্র স্থান।

প্রদীপশিখাটি নির্বাপিত করে প্রস্তরশয্যায় শয়ন করলেন অতঃপর। মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন এতদিনে। অন্তর্লীন অতীত স্মৃতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করতে করতে এই তিন-দশক নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-জড়ানো সেই বুভুক্ষু সুতনুকাকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। আজ তিনি নির্ভয়। অনায়াসে মুক্ত করে দিলেন স্মৃতির রুদ্ধকপাট। ভেসে চললেন স্মৃতির চিন্তাস্রোতের উজানে —

সংবাদবাহক কর্তৃক আনীত একটি সুসংবাদে রামগড় পর্বতে আজ কর্মচাঞ্চল্য। সর্বত্রই একটা আনন্দোচ্ছ্বাস। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর পরমভট্টারক মগধাধিপতি সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক স্বয়ং আসছেন যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে। সম্রাট সদ্য সিংহাসন লাভ করেছেন; চলেছেন উজ্জয়িনী থেকে পাটলিপুত্র—সেস্থল থেকে যাবেন চেদীরাজ্যে, কলিঙ্গ বিজয়ে। পথে রামগড় পর্বত। সংবাদবহ তাই বার্তা এনেছে—সম্রাট যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা সমাপনান্তে যুদ্ধযাত্রা করতে চান।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যোগীমহেশ্বর এবং সীতাবঙ্কিমা মন্দিরে।

শুধু একজন এ আনন্দ সংবাদে বিচলিত। তাঁর রক্তচন্দন ত্রিপুণ্ড্রকের দুই পার্শ্বে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি যোগীমহেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষ। তাঁর একান্ত সহচর বলভদ্র প্রশ্ন করে, গুরুদেব, এ সংবাদে আপনাকে এত বিচলিত মনে হচ্ছে কেন?

সহস্রাক্ষ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বলভদ্র! আমার আশঙ্কা পরমভট্টারক পূজাদানমানসে আদৌ আসছেন না এখানে। চণ্ডাশোকের শ্যেন দৃষ্টি দেবদ্বিজে নাই, সে শুধু উদ্‌গ্রীব পরস্বাপহরণে।

গোপন কথাবার্তা হচ্ছিল মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী সুতনুকার একান্ত কক্ষে। সুতনুকা প্রশ্ন করে, কিন্তু তাতেই বা আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন গুরুদেব? আপনার তো সিংহাসনচ্যুত হবার আশঙ্কা নাই। আপনার এমন কী সম্পদ আছে যা তিনি হরণ করবেন?

সহস্রাক্ষ স্মিত হেসে বলেন, তুমি জান না, সুতনুকে। আমার মন্দির-ভাণ্ডারে এমন এক রত্ন আছে, যা মগধাধিপতির রাজকোষেও নাই।

সুতনুকা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না তার।

—সে সম্পদ তুমি! তোমার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি উজ্জয়িনী পর্যন্ত পৌঁছেছে। মহানগরী উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরে তোমাকে অপসারিত করার একটা ষড়যন্ত্র অনেক দিনই চলেছে। এত রূপ নাকি এ বিজন অরণ্যের পক্ষে বাড়াবাড়ি। একটা সংগ্রামের জন্য আমি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতও হচ্ছিলাম। কিন্তু মহাকাল-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটা হিমালয়ান্তিক মূর্খামি করে বসল। সম্রাট উজ্জয়িনীতে উপনীত হলে সে তাঁকেই নিবেদন করল এই বার্তা! ভাবল, চণ্ডাশোক এই বিজন বন থেকে উদ্ধার করে তোমাকে উজ্জয়িনীর মন্দিরে দেবদাসী করবে। মূর্খটা চণ্ডাশোককে চেনে না। চণ্ডাশোক শ্রবণমাত্র স্থির করেছে—সত্যই যদি তুমি সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হও, তবে তোমার উপযুক্ত স্থান রাজধানী পাটলিপুত্র। সেই মহানগরীর রাজনটী হবে তুমি।

বজ্রাহত হয়ে গেল মেয়েটি। আকৈশোর মুগ্ধ দর্শকের দৃষ্টির দর্পণে সে পাঠ করেছে ঐ বার্তাটি : সুতনুকা অসামান্যা সুন্দরী! কিন্তু তাই বলে পাটলিপুত্রের রাজনটীর পদ! সে যে উর্বশী-ঈপ্সিত!

স্মরণে আছে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার কথাও।

দুটি মন্দিরের মধ্যবর্তীস্থলে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। পশ্চাদ্ভাগে ধাপে ধাপে পর্বতসোপানে দর্শকাসন। সম্মুখে একটি সুবর্ণদণ্ড-শোভিত চন্দ্রাতপের কেন্দ্রবিন্দুতে সম্রাটের সিংহাসন। গুটি-তিনচার বয়স্য সমভিব্যাহারে তিনি আসীন; অর্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত দর্শকাসনের সম্মুখে নৃত্যগীতের আসর। একক নৃত্যে সেখানে স্বর্গ রচনা করছে যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা : সুতনুকা।

দর্শকদল স্তব্ধ, নির্বাক। নৃত্যান্তে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাল নর্তকী; প্রথমে দেবমন্দিরের দিকে ফিরে, পরে সসাগরাধরণীর অধীশ্বরকে।

সম্রাট আহ্বান করলেন, অগ্রসর হয়ে এস, রুদ্রাণি!

সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হল দেবদাসী।

সম্রাট তার চিবুকটি উঁচু করে ধরলেন। দীপালোকে দীর্ঘ সময় একদৃষ্টে কী যেন লক্ষণ মিলিয়ে দেখলেন। চুম্বনতিয়াসী তরুণীর মতো নতনেত্রে প্রতীক্ষা করে রইল মেয়েটি।

সম্রাট বলেন, তুমি সার্থকনামা। মর্তের উর্বশী।

সুতনুকার গণ্ডদ্বয়ে বালার্ক-অরুণাভা। সম্রাট বিদূষকের দিকে ফিরে বললেন, বল বটু, এই অনিন্দিতাকে কী পুরস্কার দেওয়া রাজধর্মসঙ্গত ?

বিদূষক তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, শিরশ্ছেদের আদেশ, মহারাজ! পাটলিপুত্রের রাজনটী এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহসই পাবে না। ওকে বরং স্বর্গে পাঠিয়ে দিন—উর্বশী-মেনকা-রম্ভার নাসিকা ছেদন করে তাই দিয়ে একটা রত্নহার বানিয়ে ও গলায় পরুক !

সুতনুকা হেসে ফেলেছিল; কিন্তু সহস্রাক্ষের অক্ষিতারকা জ্বলে উঠেছিল অলাতখণ্ডের মতো। তাহলে তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। বিদূষকের তির্যক ইঙ্গিতই তার প্রমাণ।

সম্রাট নিঃশব্দে নিজ অঙ্গুলি থেকে একটি হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করে পরিয়ে দিলেন সপ্তদশীর চম্পকাঙ্গুলিতে। আংটিটা মাপে বড় হল। তা হোক, অঙ্গুরীয় সমতে তার কম্র করটি মুষ্টিবদ্ধ করে নিজ বজ্রমুষ্টিতে গ্রহণ করে সম্রাট বললেন, এই সামান্য অঙ্গুরীয় তোমার পুরস্কার নয় সুতনুকে—এ শুধু আমার দখলী-স্বত্বের ইঙ্গিতবাহী। আমি চলেছি কলিঙ্গ বিজয়ে। যদি জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তবে তুমিই হবে আমার বিজয়ীর পুরস্কার! পরিবর্তে তুমি হবে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজনটী।

সুতনুকা বজ্রাহতা। সহস্রাক্ষ আগ্নেয়গর্ভ !

সম্রাট জনতার দিকে ফিরলেন। সেখানে সারি সারি উপবিষ্ট রূপদক্ষের দল, যারা অকৃত্রিম পর্বতগুহাকে ছেনি-হাতুড়ির শাসনে রূপান্তরিত করেছে কৃত্রিম গুহামন্দিরে। সম্রাট বললেন, আমার অভিলাষ—সুতনুকা এই মন্দির ত্যাগ করে পাটলিপুত্র যাত্রা করার পূর্বে তার একটি মর্মর আলেখ্য এই মন্দির তোরণের সম্মুখে খোদিত হোক। কে সেই দায়িত্ব নিতে সম্মত ?

সমবেত রূপদক্ষের দল অধোবদন হল।

সম্রাট বললেন, কে তোমাদের দলপতি ? রামগিরি পর্বতের শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ—

একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হল।

সম্রাট বললেন, রূপদক্ষ ! তোমার এবং তোমাদের কারুশিল্পে আমি মুগ্ধ। এখন আমি সম্রাট হিসেবে প্রশ্ন করছি না, শিল্প-শিক্ষার্থীর মতো জানতে চাইছি—বল, ঈশ্বরসৃষ্ট এই নারীমূর্তির হুবহু অনুকরণ কি সম্ভব?

বৃদ্ধ রূপদক্ষ সলজ্জে ঋণাত্মক শিরশ্চালন করল। জনতার একাংশে শ্রুত হল মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জনধ্বনি। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে বৃদ্ধ বলল, সম্রাট ! আমি বৃদ্ধ, নব্যযুগের রূপদক্ষরা এ বিষয়ে কী মত পোষণ করেন তা আমি জানি না।

—বটে ! তা নব্যযুগের রূপদক্ষদলের কী বক্তব্য? আমি যেন কী একটা গুঞ্জন শুনলাম মনে হচ্ছে।

এইবার আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হল একজন তরুণ ভাস্কর। সম্রাট স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তাকে দর্শন করে। অসামান্য রূপবান সেই তরুণ। বিংশতি-বর্ষ বয়ঃক্রম হতে পারে। শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প বিশ্বকর্মার ভূমিকায় মর্তে নেমে এসেছেন অভিনয় করতে !

—তোমার নাম? পরিচয়?

—আমার নাম দেবদিন্ন, আমি এক দীন লুপদক্‌খ।

—বল, রূপদক্ষ ! কী বলতে চাও আমার প্রশ্নের উত্তরে? এই নারীর হুবহু অনুকরণ কি সম্ভব?

দেবদিন্নের কণ্ঠস্বরে এবার দীনতা নেই, বরং কিছুটা দার্ঢ্যের ব্যঞ্জনা। বললে, সম্রাট ! আপনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বররূপে এ প্রশ্ন করেননি; নিজ স্বীকৃতিমতে এই মুহূর্তে আপনি শিল্প-শিক্ষার্থী। তাই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের পূর্বে আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করতে ইচ্ছুক : হুবহু অনুকরণ সম্ভব কি অসম্ভব এ প্রশ্নের পূর্বে বলুন, সেটা কি বাঞ্ছনীয়?

সম্রাটের ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, কেন নয়? সুতনুকার প্রস্থানের পরে তার একটি নিখুঁত প্রতিমূর্তির এখানে স্থায়ী আসন পাওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—"নিখুঁত" এবং "হুবহু" কি সমার্থক, মহারাজ?

সদ্ধর্ম গ্রহণের পূর্বে অশোক ছিলেন চণ্ডাশোক, কিন্তু শিল্পের প্রতি অনুরাগ তাঁর আবাল্য। কৌতূহলী হয়ে বলেন কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি যদি এ রমণীর প্রতিমূর্তি গড়ি, তবে আমি তা 'নিখুঁত' করতে চাইব, 'হুবহু' অনুকরণ নয়!

সম্রাটের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল মৃদু হাস্যরেখা। বললেন, তুমি কি মনে কর—ঐ আদর্শ রমণীমূর্তি ত্রুটিহীনা নয়?

যুক্তকরে রূপদক্ষ নির্ভয়ে নিবেদন করে তার বক্তব্য : আজ্ঞে হ্যাঁ সম্রাট! তাই মনে করি আমি।

সুতনুকা এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখছিল ঐ কন্দর্পবিনিন্দিত তরুণটিকে। তার এ কথায় সচকিত হল সে। তার নাসিকায় জাগল কুঞ্চনরেখা।

তৎক্ষণাৎ সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবদিন্ন বললে, এইবার ঐ অনিন্দিতার দিকে দৃকপাত করুন, সম্রাট! আমার প্রতিমূর্তির নাসিকা কোনদিন কুঞ্চিত হবে না। তার তনুদেহে শুধু অলঙ্কার থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না। তার দীপ্তি থাকবে, দাহ থাকবে না! তার বিকাশ থাকবে, প্রকাশ থাকবে না।

সম্রাট সহস্রাক্ষের দিকে ফিরে বললেন, এই রূপদক্ষকে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করুন। ব্যয়ভার রাজকোষের। প্রতিদিন সুতনুকা এক দণ্ডের জন্য এর সম্মুখে উপস্থিত হবে। বৎসরান্তে আমি এখানে প্রত্যাবর্তন করব। ও যদি নিজ প্রতিজ্ঞামতো মূর্তি নির্মাণে সক্ষম হয়, তাহলে ও হবে সম্রাট অশোকের রূপদক্ষদলের প্রধান; যদি ব্যর্থ হয় তবে যোগীমহেশ্বরকে নরবলি দিয়ে যাব আমি!

এরপরের একটি বৎসরের কথা মহাভিক্ষুণীর স্মৃতিপট থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সহস্রাক্ষ যেমনভাবে খনিত্রের আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করেছিল দেবদিন্নের গড়া নারীমূর্তিটি, ঠিক সেইভাবে নির্মম আঘাতের পর আঘাতে গত তিন দশক ধরে মহাভিক্ষুণী তাঁর স্মৃতির পাষাণফলক থেকে নির্মূল করেছিলেন পরবর্তী এক বৎসরের স্মৃতি। মনে পড়ে না, কিছুই মনে পড়ে না—একটি বৎসরের অপার্থিব আনন্দের সমুদ্রোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ স্তব্ধ। 'নিব্বাণ' প্রাপ্ত।

তবু সঙ্গীত সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও যেমন তার একটি রেশ থেকে যায়, ধূপ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরও যেভাবে বাতাসে ভাসতে থাকে তার সৌগন্ধ, তেমনি বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল আজও এই পঞ্চাশোর্ধ্বা মহাভিক্ষুণীর অন্তরে আভাসে ইঙ্গিতে ধরা দেয়!

এটুকু মনে আছে, প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নানান্তে এসে দণ্ডায়মানা হতে হত ঐ রূপদক্ষের সম্মুখে। আর মনে আছে—কী যেন একটা কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। সুতনুকার নাকি বারে বারে তাল কাটতো নৃত্যভঙ্গিমায়! নিত্যপূজায় দেখা যেত নানা জাতের ভ্রান্তি।

সম্রাট চণ্ডাশোক আর কোনদিন ফিরে আসেননি কলিঙ্গ যুদ্ধ থেকে। চণ্ডাশোক নিহত হয়েছিল চেদী রাজ্যে; সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন ধর্মাশোক। যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে।

তারপর? তারপর কী হল মনে নেই। শুধু এটুকু স্মরণ হয়—সহস্রাক্ষ জানতে পেরেছিল—চণ্ডাশোক নয়, ঐ রূপদক্ষ দেবদিন্নই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় সুতনুকাকে! বঞ্চিত করতে চায় যোগীমহেশ্বরকে তাঁর প্রধানা রুদ্রগণিকার সেবা থেকে। গুপ্তঘাতক নিয়োগ করল পুরোহিত। গোপনে সংবাদটা সুতনুকাই দিয়েছিল দেবদিন্নকে। অসীম ক্ষমতাশালী সহস্রাক্ষের সমস্ত ষড়যন্ত্রজাল বিদীর্ণ করে দেবদিন্ন আত্মগোপন করল। আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি।

অগ্‌গবিনতা জানেন না, দেবদিন্নের গড়া সেই নারীমূর্তিটি সুতনুকার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিল কি না, কিন্তু এটুকু জানেন—ঐ এক বৎসরে, না—ছেনি-হাতুড়ি নয়, অন্য কী-এক অতনু-মন্ত্রে সে সুতনুকানাম্নী একটি নারীর তনুতে তুলে দিয়েছিল অলঙ্কার, কেড়ে নিয়েছিল অহঙ্কার, সুতনুকার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল শুধু প্রেমের দীপ্তি, দাহ নয়! তার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছিল বিকাশ।

সুতনুকা বুঝতে শিখল—রুদ্রগণিকার ভূমিকা একটা প্রহসনমাত্র! একটা বিরাট ষড়যন্ত্রজালের সে শিকার, পিঞ্জরাবদ্ধ হতভাগিনী। সুতনুকা গোপনে একদিন মন্দির ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল রূপদক্ষ দেবদিন্ন। নিরুদ্দিষ্টকে সে খুঁজে বার করবেই। পারেনি।

তারপর একদিন তার ব্যর্থ মানবপ্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হল। দেহজ কামনা বাসনা নয়, মহাকারুণিকের কৃপাই হল একমাত্র কাম্য।

সুতনুকার মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যায় ঐ অন্ধ বৃদ্ধের সম্মুখে তার আত্মাও 'নিব্বাণ' লাভ করল—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সুসম্পন্ন!

পরিনির্বাণের একান্ত ইচ্ছা নিয়ে অবশিষ্ট রইল—দেবদাসী সুতনুকা নয়, বৃদ্ধাদাসী সেবানম্রা।

পরদিন প্রত্যুষে যখন শয্যাত্যাগ করলেন, তখনো তাঁর স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। পূর্ব আকাশে বালার্ক অরুণাভা—শুকতারা তার আলোকবর্তিকাটি এখনও ঐ দিবাকরের আলোকবন্যায় নিমজ্জিত করে দেয়নি। কিন্তু সে-মুহূর্ত আসন্ন। অগ্‌গবিনতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সর্বপ্রথমেই পুনরায় উন্মোচন করলেন সেই রত্নমঞ্জুষাটি। হীরকাঙ্গুরীয়টি নিষ্ক্রান্ত করে সেটি বেঁধে নিলেন পীতবসনের অঞ্চলপ্রান্তে। দিনের প্রথম কর্তব্য—সেটি সঙ্ঘের রত্নাগারে দান করে আসা।

মহাস্থবির বুদ্ধভদ্রকে অসঙ্কোচে পূর্ব জীবনের সমস্ত গ্লানির কথা খুলে বলেছিলেন একদিন—সে আজ তিন দশক পূর্বেকার কথা। সকল বার্তা শ্রবণান্তে মহাঅর্হৎ উপসম্পদা দান করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু স্বীকৃত হননি ঐ হীরকাঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করতে। বলেছিলেন ভিক্ষুণি! (তখনও তিনি অগ্‌গবিনতার পদে উন্নীতা হননি) এটি তোমার কাছেই রাখ। এটিকে দান করবার অধিকার আজও তুমি অর্জন করনি। যেদিন অন্তরে অনুভব করবে অতীত নিঃশেষে মুছে গেছে—সুতনুকার তিলমাত্র অবশেষ নেই তোমার অন্তরে, সেদিন এসে এটি আমাকে হস্তান্তরিত কর।

আজ সেই মহালগ্ন সমুপস্থিত।

পরিবেণের অর্গল উন্মোচনমাত্র দেখা হয়ে গেল মালতীর সঙ্গে।

পদবন্দনা করে মালতী বললে, মা, গতকল্য যে অন্ধ বৃদ্ধটি এসেছিলেন, তাঁর পুত্র এই অতি প্রত্যুষেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে কি অর্ধদণ্ডকাল পরে আসতে বলব?

অগ্‌গবিনতা সহাস্যে বললেন, না। আজকের শুভদিনটির সূচনা হোক তাকে আশীর্বাদ করে। সে আমার সন্তানতুল্য। তাকে আহ্বান করে নিয়ে এস।

পরিবেণের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পাষাণচত্বরে এসে উপবেশন করলেন অগ্‌গবিনতা। অল্প পরে মালতীর অনুগামী হয়ে এসে আবির্ভূত হল একটি বিংশতিবর্ষীয় তরুণ।

চিত্রার্পিতার ন্যায় আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মানা হলেন মহাভিক্ষুণী! তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল!

শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প মর্ত্যে নেমে এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে!

কৃতজ্ঞ তরুণটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে উদ্যত হল মহাভিক্ষুণীকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো দূরে সরে গেলেন অগ্‌গবিনতা! শুধু বললেন, ন্‌না!

—না? তরুণ রূপদক্ষ স্তম্ভিত। প্রশ্ন করে, আপনি, ... আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন না?

—না। প্রণাম গ্রহণের অধিকার অত সহজে জন্মায় না!

.... ও অগ্‌গবিনতা! কী বলিলে? প্রণাম গ্রহণের অধিকার তোমার নাই? তাহা হইলে গতকল্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলে কোন্ আক্‌কেলে?....

ক্ষুব্ধ ভাস্কর গাত্রোত্থান করে। মহাভিক্ষুণীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হয়। সেবানম্রার

মুণ্ডিতমস্তক ওর বৃষাংসের সমতলে। তরুণ ভাস্কর বলে, প্রণাম গ্রহণ করুন আর না করুন, আপনি পিতৃদেবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

—ন্‌না। —রুদ্ধকণ্ঠ থেকে একটিমাত্র নঞর্থক শব্দ নির্গত হল।

—কী 'না'? বিস্মিত তরুণ রূপদক্ষ কৌতূহলী।

অগ্‌গবিনতাকে বড় বিহ্বল মনে হল। সন্তরণ-অনভিজ্ঞা যেন সমুদ্রস্নানের সময় পায়ের নিচে বালুকার স্পর্শ পাচ্ছেন না। প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্তে যে ভয়ঙ্করী সমুদ্রতরঙ্গ তাঁর মাথার উপর উঠে পড়েছিল, পরমুহূর্তেই সাধন-অভ্যস্তার কাছে সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ সরে গেছে—তবু চরণপ্রান্তে যেন প্রত্যাশিত বালুকাভূমির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। মালতীর দিকে ফিরে বললেন, অতিথিসেবার আয়োজন কর, মালতি।

মালতীও প্রণিধান করেছে—বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে—কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে চলেছে। ঘটনা-পরম্পরা তার বুদ্ধিসীমার অতীত, কিন্তু স্থানত্যাগের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু প্রাণিধান করতে তার কালবিলম্ব ঘটল না।

তরুণ পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কী যেন একটা কথা তখন বলতে চাইছিলেন?

অসীম আয়াসে আত্মসংবরণ করে প্রৌঢ়া বললেন, হ্যাঁ, শোন, সাঁচী-কাকনায়ে তোমাকে কোনও নির্মাণকার্যের দায়িত্ব দিতে আমি অক্ষম।

বজ্রাহত হয়ে গেল প্রত্যাশী ভাস্কর!

অগ্‌গবিনতার অধর বেপমান। অস্ফুটে শুধু বললেন, বাধা আছে।

অধোবদন হল অতিথি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। কেন এভাবে প্রতারিত হল, কোন অলক্ষ্য নির্দেশে মহাভিক্ষুণী সেবানম্রা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন, তা জানতে চাইল না। প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে ভিক্ষুণী বললেন, শোন! তাই বলে তোমার হতাশ হবার কিছু নেই। তুমি মহাতীর্থ উরুবিল্বে গমন কর—

—উরুবিল্ব? সে কোথায়?

—তার বর্তমান নাম : বুদ্ধগয়া। সেখানেও একটি প্রকাণ্ড চৈত্যমন্দির, সঙ্ঘারাম নির্মিত হচ্ছে। তোমার দৃষ্টিহীন পিতৃদেবকেও নিয়ে যাও। সেখানে যাতে তুমি কর্মলাভে সফল হও তা আমি দেখব—সেখানকার মহাথেরকে আমি সুপারিশপত্র লিখে দেব।

বহুক্ষণ ইতস্তত করল তরুণ। কেন কাকনায়ে তার কর্মসংস্থান হতে পারে না—এ প্রশ্ন জানতে চাইল না। জানতে চাইল না কী তার অপরাধ। পরিবর্তে অস্ফুটে শুধু বলে, বুদ্ধগয়া যে অনেক দূরের পথ, মা। আমার পাথেয় কোথায়?

অগ্‌গবিনতা নিঃশব্দে তাঁর চীবরপ্রান্তে গ্রন্থিমোচনান্তে উদ্ধার করে আনলেন একটি অঙ্গুরীয়। ঐ সুঠাম তরুণের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করে তার অনামিকায় পরিয়ে দিলেন, সেই রাজাঙ্গুরীয়টি। এবার মাপে সেটা ঠিক হল। বিস্মিত তরুণ বলে, এ কী! এ যে হীরকাঙ্গুরীয়। এ যে মহার্ঘ।

—হ্যাঁ! তাই! মূল্য যাচাই করে সাবধানে এটিকে বিক্রয় কর। আর শোন, এই হীরকাঙ্গুরীয় যে তুমি আমার নিকট লাভ করেছ—এ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ কর না—না, তোমার পিতৃদেবকেও নয়।

এবার আর কৌতূহল দমন করা সম্ভবপর হল না। বললে, কেন?

অগ্‌গবিনতা নীরব। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাকুল।

ইতস্তত করে তরুণ বলে, এটা কি .... তাহলে অপহৃত সম্পদ?

—না, না, না,—আমি.... আমিই ঐ হীরাকাঙ্গুরীয়ের আইনসঙ্গত অধিকারিণী।

—তাহলে....?

একটু ইতস্তত করলেন মহাভিক্ষুণী। না, নীরব থাকার অধিকার তাঁর নাই! অভিধম্ম মতে এ স্থলে নীরবতার অর্থ তাঁর অন্তর নিষ্কলুষ। সেটা অসত্য! পাতিমোক্ষ-মতে যেন তিনি অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি নিতে উদ্যতা; তাই অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, কাকনায়-সঙ্ঘারামের অগ্‌গবিনতার এটি একটি... কী বলব? প্রাক্-সন্ন্যাসজীবনের বেদনাবহ দুঃস্বপ্ন।

শুকতারা এতক্ষণে সূর্যালোকে নিশ্চিহ্ন।

বালার্ক অরুণরাগে তরুণ ভাস্করের মুখমণ্ডল ভাস্বর। এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব ভিক্ষুণীর কম্র কপোল।

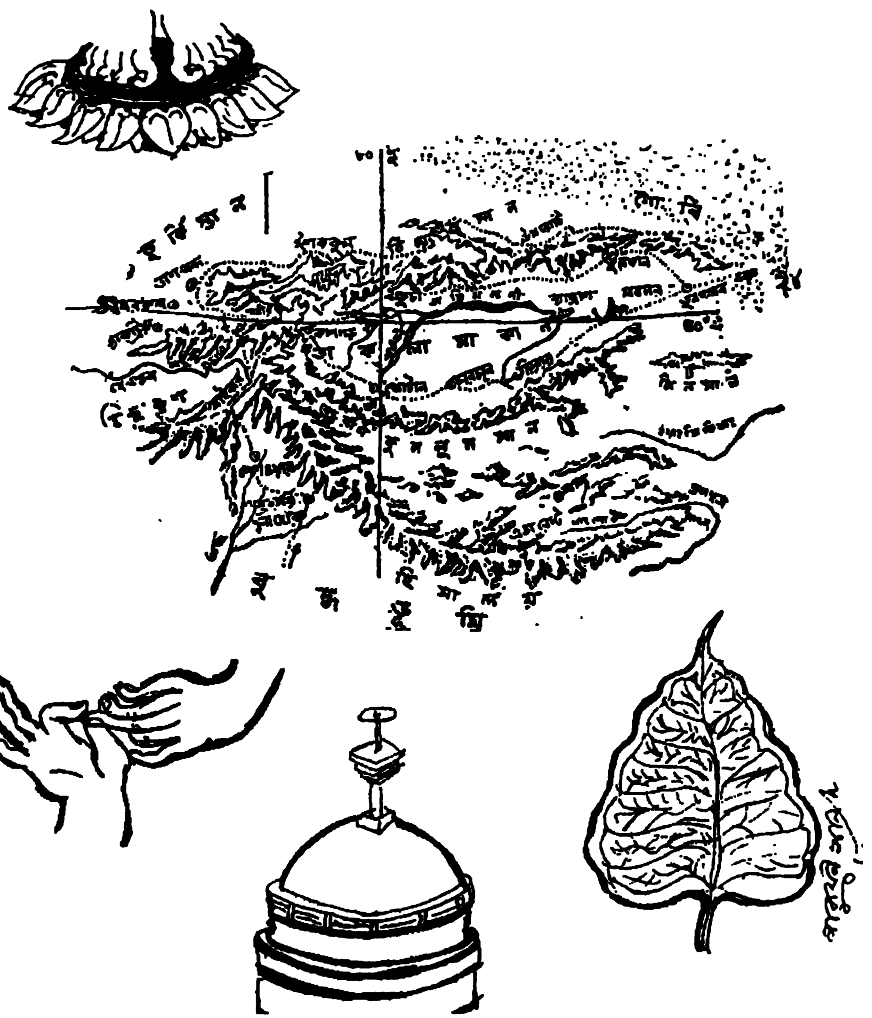
যেন উদয়ভানুর প্রথম কৌতূহল ঐ অসমবয়সের দুটি নরনারীর মুখে একটা কিছু খুঁজছে। বৃথাই! বোধকরি প্রভাতসূর্য সন্ধান করছিল সেই চিরন্তন প্রশ্নটার প্রত্যুত্তর —যোগীমারা পর্বতের কন্দরে দীর্ঘ বিশ শতাব্দী পূর্বে কোন্ অজ্ঞাত কবি যে প্রশ্নটা মহাকালের দরবারে একদিন পেশ করেছিলেন, যা আজও অমীমাংসিত প্রশ্নচিহ্নটিকে আঁকড়ে ধরে প্রতীক্ষা করছে :

"—ও কেমন করে নিঃশেষে নিমজ্জিত হল
এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে?"

আনন্দ স্বরূপিণী

ফা-হিয়েন, গুপ্তযুগ

[370—413 খ্রিঃ]



এ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অংশ শারদীয় 'শিলাদিত্য' ১৩৩৪-তে প্রকাশিত। ইতিপূর্বে 'মহাকালের মন্দির'-এ (রাওয়ালা) আমি ছিলাম সম্পূর্ণভাবে শরদিন্দুর ভাষা-অনুসারী। ক্রিয়াপদগুলি সেখানে কথ্যরূপ পরিগ্রহ করেনি। ফলে এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে মাঝে-মাঝে 'শবপোড়া-মরাদাহ' সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত একজনের দ্বারস্থ হওয়া গেল। তিনি বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন "ইংরাজিতে মূল সংস্কৃত basc-গুলিকে অবিকৃত রাখিয়া তাহার উপর বিভক্তি যোগ করা হয়। বাঙলায় অনুরূপ করা ভাল দেখায় না। তাই 'বুদ্ধযশার' 'বুদ্ধযশাকে' প্রভৃতি বাঞ্ছনীয়—'বুদ্ধযশস্-এর', 'বুদ্ধযশস্‌কে' নহে।" প্রথম প্রকাশকালে এই ভুলগুলি ছিল। এবার তা সংশোধন করেছি। প্রসঙ্গত জানাই স্বভাব-বিনয়ী পণ্ডিত আমাকে চিঠিতে আরও লিখেছিলেন :

"শৈবালো দীর্ঘিকাং প্রাহ
প্রোন্নমস্য শিরঃ স্বকম্।
শিশিরস্য কণো দত্তঃ
স্মর্তব্যঃ সর্বদা তব।।

বলাবাহুল্য এটি কণিকার একটি অণুকবিতায় সংস্কৃত অনুবাদ (শৈবাল দীঘিরে কহে....)

ভারতের ইতিহাসে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যতটা সমুজ্জ্বল মহাভিক্ষু কুমারজীব ততটা স্বীকৃতি পাননি। কাব্যে-উপেক্ষিত-র মতো সেই ইতিহাস-উপেক্ষিত কুমারজীবকে এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র বা নায়ক করতে চেয়েছিলাম। কী জানি হয়তো তাঁর অপেক্ষা অক্ষমতীই বেশি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।

নির্দেশিকা ও ব্যাখা : কাহিনী শেষে সন্নিবেশিত।

লক্ষযাত্রীর পদচিহ্নচর্চিত সহস্রাব্দীর মৃত্যুহীন পথ। লক্ষযাত্রীর নরকঙ্কাললাঞ্ছিত মৃত্যুলীন পথও বটে। শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবের। কুমারস্বামী যাকে বলেছিলেন 'প্রাচীন প্রাচী', সেই উপবৃত্তাকার মহান সংস্কৃতির দুইটি মূল নাভির যোজক এই ত্রিধারাপ্রবাহিত পার্বত্যপথ,—ইতিহাস যাকে চিহ্নিত করেছে 'রেশম-সড়ক' অভিধায়। উত্তরে তিয়েনশান, দক্ষিণে কারাকোরাম ও কুন্‌লুনশান, পশ্চিমে পামীরগ্রন্থী এবং পূর্বে ভয়ঙ্করী গোবি মরুভূমির দিকে অভিশাপবর্ষণদৃপ্ত দুর্বাসার প্রসারিত অঙ্গুলিসঙ্কেতের মতো ইঙ্গিতবাহী বালুকাস্তূপের আদিগন্ত বিস্তৃতি। এ পথের এক পার্শ্বে অভ্রংলিহ তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণীর ধ্যানস্তিমিত গাম্ভীর্য, অপর পার্শ্বে স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীর প্রতি ধাবমান পাতালস্পর্শী মৃত্যুখাদ। সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে প্রস্তর-সমাকীর্ণ পাকদণ্ডীর ঘূর্ণাবর্তে অতি সাবধানে পর্বতাবরোহণ করছিল একমুষ্টি মানবশিশু। তাছাড়া সমগ্র চরাচরে প্রাণের কোনও সাড়াশব্দ নেই। না; আছে—লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নির্মেঘ আকাশের নিঃসীমায় চক্রাকারে সঞ্চরমাণ কয়েকটি বিন্দু—ওরা জীবনের সঙ্কেতবহ নয়, জীবনাবসানের দ্যোতক, শকুনি-গৃধিনীর দল। উষর তাকলামাকান মরুভূমি আর জনমানবহীন তিয়েনশান পর্বতের এই প্রাণহীন প্রান্তরে ওই রেশম সড়কের ধারে ধারেই ওরা পায় জীবনধারণের উপাদান—মৃত্যুর বিনিময়ে : মুমূর্ষু মানুষ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র!

সংখ্যায় যাত্রীদল অন্যূন দশজন। দূর থেকে ওরা আলম্ব-প্রাচীরগাত্রে সঞ্চরমাণ সারিবদ্ধ পিপীলিকার মত প্রতীয়মান হচ্ছিল বটে, কিন্তু যাত্রীদল আরও নিকটবর্তী হওয়ায় এখন ওদের শনাক্ত করা যায়। তিনজন রমণী, একজন রাজপুরুষ, অবশিষ্ট কিঙ্করশ্রেণীর—পল্যঙ্কিকা-বাহক, দেহরক্ষী, পাচক ও ভৃত্য। শ্বেতবর্ণের একটি আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে যিনি দলের পুরোভাগে পর্বতাবরোহণ করছিলেন তিনিই পূর্বোক্ত রাজপুরুষ; যদিচ তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ আদৌ রাজবংশোচিত নয়। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গে গৈরিক কাষায়, তদুপরি পার্বত্য অঞ্চলের শৈত্যনিবন্ধন পশমের কম্বল। কটিদেশে বিলম্বিত—না, তরবারি নয়, পশম-রজ্জুতে আবদ্ধ অক্ষৌট-কাষ্ঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। বহিরাবরণে আড়ম্বরের অভাব সত্ত্বেও তাঁর দেহাকৃতিতে রাজকীয় মর্যাদার ব্যঞ্জনা— শালপ্রাংশু সন্নত দেহ, উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, চক্ষুতারকায় মধ্যএশীয় নির্মেঘ আকাশের ঘন নীলিমা। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ, যদিও তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে নাতিপ্রৌঢ় বলে ভ্রম হয়। ঋজু দীর্ঘ দেহ, ললাটে বা মুখাবয়বে তিলমাত্র বলিরেখাচিহ্ন নেই, আছে আত্মতৃপ্তির এক প্রশান্ত জ্যোতি। বহিরাবরণে না থাকলেও তাঁর ধমনীতে আছে রাজরক্তের স্বাক্ষর।

ইনিই আমাদের কাহিনীর নায়ক। এঁর নাম—থাক! নাম উচ্চারণে তাঁকে পরিচিত করা যাবে না। তোমরা তাঁর নাম শোননি। ইতিহাস তাঁর নামটি স্মরণে রাখতে ভুলেছে। এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি—তোমরা আমাকে মার্জনা ক'র। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। ইতিহাসচর্চা আমার সামান্যই। তবু বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয় হিসাবে আমাকে ভারতীয় ইতিহাস পাঠ করতে হয়েছিল। সে আজ ছয় দশক পূর্বেকার কথা। আমার সেই ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থে আমার এই নায়কের নামটি পাইনি। ইদানীংকালের বি.এ. পরীক্ষার ইতিহাসের প্রশ্নপত্রগুলি অন্বেষণ করে দেখেছি, তাঁর বিষয়ে সাম্প্রতিককালে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়নি। নিঃসন্দেহে তিনি ভারতের ইতিহাসে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়, বিস্মৃত! সে অপরাধ ওঁর নয়; সে পাপ তোমার, সে পাপ আমার। আমি তো মনে করি : বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে বিশ্ব-সংস্কৃতির মহাসভায় ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা-ধর্মের ধ্বজাধারীরূপে যদি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের নামটাই সর্বপ্রথমে মনে আসে তবে বিগত দ্বিসহস্রাব্দীতে যে পরিব্রাজকটির নাম স্মরণে আসা সঙ্গত, তিনিই আমার কাহিনীর ইতিহাস-উপেক্ষিত নায়ক—যাঁর নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে মধ্যপথে থেমে পড়েছি!*

স্থান, কাল আর পাত্র। প্রথমে 'স্থান', অর্থাৎ ভূগোল; তারপর 'কাল' বা ইতিহাস, সর্বশেষে 'পাত্র'—কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

প্রথমে ভূগোল। ঘটনাস্থলের অবস্থান—অক্ষাংশ ৪১° উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৮০° পূর্ব। ভূ-মানচিত্র অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন—আমাদের অবস্থান কেন্দ্রীয় রেশম-সড়কে; কুচী জনপদ ও কাশগড় নগরীর মধ্যবর্তী অংশে; তাকলামাকান মরুভূমির উত্তর-সীমান্তলীন পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত তারিম নদীর উত্তর উপকূলে। বোধ করি তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানটার প্রকৃত ধারণা হল না। না,—পাঠকের ভূগোলজ্ঞানের প্রতি এ কোনও তির্যক কটাক্ষ নয়; বস্তুত এ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে লেখকের নিজস্ব ধারণাও ছিল একই রূপ অস্পষ্ট, ধোঁয়াশায় আচ্ছাদিত। একমাত্র হিল্টনের 'লস্ট হোরাইজন' ভিন্ন অন্য কোনও ঔপন্যাসিকের অনুগামী হয়ে ওই নিষিদ্ধ দিগন্ত-বিলুপ্তির অজ্ঞাত রাজ্যে কখনও পদার্পণ করেছি বলে স্মরণ হয় না। ফলে একটু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে :

'প্রাচীন প্রাচী'-র দুই প্রধান প্রতিবেশী মহাচীন ও ভারত পরস্পরকে প্রথম কবে চিনল, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হল সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সরকারীভাবে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম নাকি মহাচীনে উপনীত হয় খ্রিস্টজন্মের সমসময়ে—বক্ষু উপত্যকার একজন জনপদনায়ক নাকি চীন সম্রাটকে খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে একটি বৌদ্ধগ্রন্থ উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও পূর্বে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করে কোন কোন পরিব্রাজক যে চীনখণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চ'ঈন বংশের প্রথম সম্রাট শী হোয়াঙ তি খ্রিস্টপূর্ব যুগেই নাকি তাঁর রাজধানীতে একজন বিধর্মী বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারককে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান্ বংশীয় সম্রাট উ-র একজন সৈন্যাধ্যক্ষ—'হো পুচিং' তাঁর নাম—উত্তর এশিয়ার এক উপজাতিনায়কের কাছ থেকে একটি সুবর্ণ-বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পানিক্কর। ওই যুগে থেরবাদী বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করতেন না। সুতরাং একথাই কি ধরে নেব যে, উল্লিখিত বুদ্ধমূর্তি একটি স্তূপের বিকল্প? বোধিদ্রুম, পদচিহ্ন, ধর্মচক্র ইত্যাদি কোন কিছুর প্রতীক? জানি না। মোট কথা, অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীন ও ভারত পরস্পরের পরিচয় পেয়েছিল, সখ্য-বন্ধনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল দুইটি বিকল্প পথে। প্রথম সড়কটা হিমালয়ের উত্তর সীমান্ত দিয়ে বিসর্পিল স্থলপথ; দ্বিতীয়টা সমুদ্রপথ—সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), শ্রীবিজয় (যবদ্বীপ), কম্বুজদেশ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (কোচিন চীন) হয়ে কান্তিগড় (ক্যান্টন) বন্দরে উত্তরণ। সেই পথটা সমুদ্রতরঙ্গভঙ্গের অনিত্যতায় পদচিহ্নরেখা রাখেনি কিছু। কিন্তু উত্তর হিমালয়ের স্থলপথ শুধু সহস্রাব্দীর যাত্রীচরণলাঞ্ছিতই নয়, নরকঙ্কাল সমাকীর্ণ, সুচিহ্নিত। সে পথের বাঁকে বাঁকে উদাসীন মহাকালের ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আজও দাঁড়িয়ে আছে স্মারকচিহ্ন—কপিশ, হাড্ডা, বামিহান, তুরফান, খ্যিজিল, তুনহুয়ান-এর ধ্বংসাবশেষ।

চীন ও ভারতের আত্মিক মিলনের পথে একাধিক বাধা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রক্তচক্ষুর বাধার কথা আমি তুলছি না, বলছি প্রাকৃতিক বাধার কথাই। যে প্রতিবন্ধকতা সারির পরে সারি। যেন তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চীনের দিক থেকে অগ্রসর হবার পথে প্রথম বাধার অর্ধাংশ দুরন্ত গোবি-মরুভূমি, অপর অর্ধাংশ তুষারমণ্ডিত দুরতিক্রম্য তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির প্রতিবন্ধকতা শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর : পশ্চিম থেকে পূর্বে যথাক্রমে—হিন্দুকুশ, পামীরগ্রন্থী, কারাকোরাম, কুন্‌লুনশান, মিন্‌শান পর্বত। এই দুই সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশে আদিগন্ত বালুকাময় সমুদ্র তাকলামাকান মরুভূমি। সর্বশেষ বাধা পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ অভ্রংলিহ মহা হিমালয় স্বয়ং।

তবু মানুষ হার মানেনি। নতিস্বীকার করেনি ভারত অথবা চীন। ঐ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে তারা মৈত্রীর পথ চিনে নিয়েছে। অন্বেষণ করে জেনেছে—কোথায় আছে অধিত্যকা, উপত্যকা, পাকদণ্ডীর পথ, পার্বত্যগুম্ফা, পানীয় জল। পাথরের বুকে দুলিয়েছে পাষাণ সোপানের শতনরী, নদীর কটিদেশে পরিয়ে দিয়েছে ঝুলন্ত-সেতুর মেখলা,—পাছে উত্তরকাল পথভ্রষ্ট হয় তাই লক্ষ দধীচি পথের প্রান্তে ছড়িয়ে রেখে গেছে বুকের পাঁজর। তাকলামাকান মরুভূমিকেই ভূগোলের

অন্তিম নিদান বলে তারা স্বীকার করেনি; ওরা খুঁজে বার করেছে মরুভূমির সমান্তরালে প্রবহমান প্রাণধারাকে : স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীকে। সেই জীবনদাত্রী তারিম নদীর অববাহিকায় মানুষ গড়ে তুলেছে সারি সারি মরু-পান্থশালা; খর্জুর-সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র জনপদে বালুকাস্তূপের গভীরে আবিষ্কার করেছে মাতৃস্তন্যের মতো সুস্বাদু লুপ্ত প্রস্রবণ। গড়ে তুলেছে—মরুপান্থগৃহ, বাণিজ্যকেন্দ্র, পার্বত্যগুম্ফার আশ্রয়ে সঙ্ঘারাম। ঐসব ক্ষুদ্র জনপদে প্রাণধারণের প্রয়োজন মেটাতে সহস্রাব্দীকাল ধরে যাত্রা করেছে লক্ষ লক্ষ যাত্রী—পদব্রজে, অশ্বারোহণে, অশ্বতরের পৃষ্ঠে, উষ্ট্রে। সে পথকে ইতিহাস আদর করে বলেছে—রেশম সড়ক, বলেছে মশলা-পথ।

এ পথ মোটামুটি ত্রিধারায়। যেন খাইবার গিরিবর্ত্মের মুক্তবেণী শেষবেশ যুক্তবেণী হল চীনের প্রবেশ তোরণ : তুনহুয়ান-এ। সরস্বতী-যমুনা-গঙ্গা। প্রথম সড়কটি তিয়েনশান পর্বতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে—সমরখন্দ, তাশখন্দ, খোকন্দ্ পার হয়ে, স্ফটিকস্বচ্ছ ঈশক্-কূল হ্রদের কিনার দিয়ে—যা ছিল চীন-ব্যাকট্রিয়া-পারস্যের বাণিজ্যপথ। দ্বিতীয় পথটি তারিম নদীর অববাহিকা-আশ্রয়ী, যে পথে পড়বে কাশগড়, কুচী, কারাশর, তুমশুখ, খিজিল, তুরফান। আর তৃতীয় সড়কটা তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর, হিমালয়ের তরাইয়ের কোল ঘেঁষে। সে পথও শুরু হয়েছে ঐ কাশগড় জনপদে; সে-পথে পড়বে ইয়ারকং, খোটান, চারচান, মিরান;—লবনরের প্রান্ত দিয়ে সে পথও শেষ হবে মহাচীনের প্রবেশ-তোরণে ওই যুক্তবেণীর মহান বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম : তুনহুয়ান-এ।

এই তিনটি বিকল্প পথরেখা ধরেই ভারতবর্ষ থেকে চীন-ভূখণ্ডে গিয়েছিলেন অযুত-নিযুত পরিব্রাজক—কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরত্ন, কুমারজীব, বুদ্ধযশা, বিমলাক্ষ, ধর্মক্ষেম, বুদ্ধভদ্র, গুণবর্মা, ধর্মগুপ্ত, শিক্ষানন্দ, বিনীতরুচি, বোধিধর্ম, বজ্রবোধি প্রভৃতি। যাঁদের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। আবার ঐ পথেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকের দল : ফা-হিয়েন, হিউ-এন-ৎসান, ইৎ-সিঙ, যাঁরা আমাদের ইতিহাসের 'মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন'। তাই বলছিলাম, এ-পথ শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবেরও। শুধু পরিব্রাজক নয়, এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে সওদাগরের দল, নিয়ে গেছে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে ভারতীয় রপ্তানী-সম্ভার : লাক্ষা, মশলা, গজদন্ত, তৈজসপত্র, মৃগনাভি, কস্তুরী, চন্দন—আর নিয়ে এসেছে চীনখণ্ড থেকে নানাবর্ণের চীনাংশুক, ভারতীয় হিন্দু-সীমন্তিনীর জন্য চীনাসিন্দুর, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, জেড-পাথরের ও চীনামাটির সৌখীন সামগ্রী।

ঐ মধ্যম রেশম-সড়কে কুচী ও কাশগড়ের সমদূরত্বে এ কাহিনীর পটোত্তোলন।

দ্বিতীয় কথা : কাল। ইতিহাস। সময়টা ২৯২ শকাব্দ অর্থাৎ ৩৭০ খ্রিস্টাব্দ। আমরা আছি সেই অজ্ঞাত বন্ধ্যাযুগে, যাকে ইতিহাস বলে 'ডার্ক এজ'। কুশান রাজবংশের গরিমা অস্তমিত, মালব ও সৌরাষ্ট্র-অঞ্চলে শক নৃপতিবৃন্দ 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করে কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করছেন। মগধে এক নূতন রাজবংশের সূচনা হয়েছে। গুপ্ত রাজবংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহ সেই স্বর্ণযুগে উষার আলো। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়েক শতাব্দী ধরে মগধ, লিচ্ছবি, কোশল ও কাশীরাজ কোনক্রমে মাৎস্যন্যায় এড়িয়ে নামমাত্র রাজত্ব করছিলেন। তার দুটি শক্তিশালী অংশীদার বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় নূতন যুগের সূচনা হল। আমাদের কাহিনীর কালে শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীতে কবি কালিদাসের হয়তো চূড়াকরণ হচ্ছে—মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের ত্রিংশতি বর্ষকাল রাজ্যশাসন অতিক্রান্ত হল। কিন্তু আমাদের কাহিনী যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সেখানে সমুদ্রগুপ্তের নাম কেউ জানে না। সেখানে মরুভূমির ভিতর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরূদ্যানের ন্যায় আছে কিছু ক্ষুদ্র জনপদ এবং তাদের শাসনকর্তা—কপিশ, নগরহার, কাশগড়, কুচী, খোটান, ইয়ারকন্দ, তুরফান, তুং-হুয়াঙ। তাঁদের রাজ্যসীমার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে উপনীত হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তই যথেষ্ট। অবশিষ্ট ভূখণ্ডের অধীশ্বর নিয়তির মতো উদাসীন আদিগন্তবিস্তৃত তাকলামাকান মরুভূমি।

আমরা যতক্ষণ ভূগোল-ইতিহাস আলোচনা করেছি ততক্ষণে ঐ যাত্রীদলের পর্বতাবরোহণ সমাপ্ত হয়েছে। ওঁরা উপনীত হয়েছেন উপলমুখর স্বচ্ছতোয়া এক পার্বত্যনদীর উপকূলে। নদী পারাপারের

জন্য একটি ঝুলন্ত সেতু আছে। বৌদ্ধভিক্ষু তাঁর তিনজন সহযাত্রিণীকে নিয়ে অতি সাবধানে সেতু অতিক্রম করে পরপারে এসেছেন। বর্তমানে ভৃত্য শ্রেণীর লোকেরা একে একে মালপত্র নিয়ে নদী পার হচ্ছে। ভিক্ষু ঐ নদীর অতি সন্নিকটে উপবেশন করে লক্ষ্য করছিলেন তাদের। পুরকামিনীদিগের মধ্যে দুইজন এতক্ষণ পল্যঙ্কিকায় বাহিতা হচ্ছিলেন। সেতুটি কিন্তু তাঁদের পদব্রজে অতিক্রম করতে হল। একজন বৃদ্ধা; কুচী জনপদের নৃপতি রাজা পো-সাঙ-এর ভগ্নী। বস্তুত, ঐ বৌদ্ধভিক্ষুর গর্ভধারিণী, ভিক্ষুণী জীবা। দ্বিতীয়জন তাঁর পরিচারিকা এবং রাজকন্যার বয়স্যা শ্রবণা। 'পরিচারিকা' বলা বোধ হয় ঠিক হল না, সে আদৌ বেতনভুক কিঙ্করী নয়, রীতিমত সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। রাজ-অমাত্য শিবমিশ্রের আত্মজা। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে আভিজাত্যের রীতি ও সংসর্গজ শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে সেকালে এভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের অনূঢ়া কন্যাকে রাজাবরোধে রাখার প্রথা ছিল। শ্রবণা পরিচারিকা নয়, বাস্তবে সে রাজকন্যার বয়স্যা। রাজকন্যাকে সঙ্গদান করতেই সে এসেছে এ দলের সঙ্গে। কুচী রাজকন্যা কিন্তু পল্যঙ্কিকায় বাহিতা হচ্ছিলেন না—এ দীর্ঘপথ তিনি অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন। তাঁর পোশাকও পুরুষোচিত। যোদ্ধৃবেশ। বক্ষে লৌহজালিক, পৃষ্ঠে তূণীর, কটিবন্ধে তরবারি। অশ্বটিকে নদীর কিনারে বন্ধনমুক্ত করে তিনি ফিরে এসে ভিক্ষুর অনতিদূরে এক প্রস্তরাসনে উপবেশন করলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভদন্ত! এই স্রোতস্বিনীর নাম কী?

ভিক্ষু করলগ্নকপোলে আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সম্পর্কে রাজকন্যার জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তবু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় রাজকন্যা তাঁকে আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করতে পারেন না। ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। স্মিতহাস্যের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন, আত্মানং বিদ্ধি।

রাজকুমারী অক্ষুমতীর সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার আছে। কাশগড়, কুচী, খোটান অঞ্চলে ইরানীয় কথ্যভাষার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথ্যভাষার সংমিশ্রণে এক প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত। লিপি ব্রাহ্মী নয়, খরোষ্ঠী; কিন্তু রাজকন্যা যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও তাঁর প্রাকৃত প্রশ্নের এই মার্জিত সংস্কৃত প্রত্যুত্তরের অর্থ তাঁর বোধগম্য হল না। সবিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে।

শ্রবণা বসেছিল অদূরে। তারও দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

রহস্যের উন্মোচন করলেন বৃদ্ধা জীবা। বললেন, অক্ষুমতী! এ জলধারা তারিম নদীর একটি উপনদী। এর নামানুসারেই জন্মলগ্নে তোমার নামকরণ করা হয়েছিল। কুমার তাই রহস্য করে বলছেন, তুমি ঐ নদীর ভিতরেই নিজেকে চিনে নাও। এ স্রোতস্বিনীর নাম : 'অক্ষু'।

রাজকুমারীর চক্ষুদুটি কৌতুকে নৃত্য করে ওঠে। হঠাৎ যেন ঐ উচ্ছল স্রোতস্বিনীর সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধন অনুভব করেন। ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, মাতৃদেবী যথার্থ কথাই বলেছেন অক্ষুমতী। ঐ নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখ। তোমার স্বরূপটি দেখতে পাবে। ঐ অক্ষু নদী তোমারই মতন চঞ্চলা, তোমারই মতন বেগবতী এবং তোমারই মতন সুশীতল, তৃষ্ণা-নিবারিণী!

রাজকুমারী লজ্জা পান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট এ-জাতীয় প্রশংসাবাক্য শ্রবণে তিনি আদৌ অভ্যস্তা নন। ভিক্ষু কুমারজীব গম্ভীর, স্বল্পভাষী, অপ্রমত্ত—বোধকরি মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, রুক্ষ-উষর মরু-অঞ্চলের মানুষ এই নদীর উপকূলে এসে কিছু উচ্ছল। কিন্তু হার মানবার মেয়ে অক্ষুমতীও নয়। সঙ্কোচকে জয় করে সে বলে ওঠে, কিন্তু মহাভাগ! প্রতিবিম্ব অবলোকনের অবকাশ কোথায়? এ দ্রুতছন্দ তটিনীর তো প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মতো মনের স্থিরতাই নেই।

: তাতেই তো সে তোমার সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হয়েছে অক্ষুমতী। কী বল শ্রবণা? পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রমণেও তোমার প্রিয়সখীর অন্তর কারও প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মত স্থিরতা লাভ করেছে কি? নদীর আর দোষ কী?

নিঃসন্দেহে ভিক্ষু আজ প্রগলভ হয়ে পড়েছেন। কথার পিঠে কথা। এবং সে-কথায় ছিল শ্লেষ। কুচী রাজকন্যার সৌন্দর্যের খ্যাতি বৈশাখী ঘূর্ণিঝড়ে তাড়িত তাকলামাকানের বালুকাপুঞ্জের ন্যায়

দ্রুতগতি ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। শুধু রূপ নয়। রাজনন্দিনী অক্ষুমতী সকলকলাপারঙ্গমা। পুত্রহীন কুচীরাজ পো-সাঙ মাতৃহীনা এই একমাত্র আত্মজাটিকে তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। পুরুষের যোদ্ধৃবেশে সে সমরনায়কদিগের নিকট যথোচিত সামরিক শিক্ষা পেয়েছে—অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, পর্বতারোহণ। এদিকে ভাষাশিক্ষা, সঙ্গীত, কাব্য, দর্শনের চর্চাও উপেক্ষিত হয়নি। ফলে রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রমাগত বিভিন্ন জনপদ থেকে ভাটের দল কুচী রাজসভায় এসে স্ব-স্ব রাজ্যের রাজকুমারদের বীরত্বগাথা ও নানা গুণকীর্তন করে যায়। কুচীরাজ কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি সকলকেই জানিয়েছেন, রাজকন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হলে তিনি এক মহা-স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন। রাজনন্দিনী নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁর জীবনসঙ্গীকে নির্বাচন করবেন। যতদূর জানা যায়—রাজকুমারী এখনও মনস্থির করতে পারেননি। তাই কুমারজীবের এই তির্যক ব্যঙ্গ !

শ্রবণা সসম্ভ্রমে বলল, থের! আপনার উপমান এবং উপমেয় কিন্তু অভিন্ন-আত্মা নয়। বিবেচনা করুন : আগামী বৎসর মদনোৎসবে স্বয়ম্বর সভায় প্রিয়সখীর অন্তর-দর্পণে স্থায়ী ছায়াপাত ঘটবে, পরন্তু চঞ্চলা অক্ষু নদীর অন্তরে কোনদিনই কারুর প্রতিবিম্ব পড়বে না।

পঞ্চাশৎবর্ষীয় মহাস্থবিরের প্রতি একটি অনূঢ়া পঞ্চদশীর এজাতীয় বাক্‌প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন—কালের মাপে আমরা আছি মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা এবং পর্দাপ্রথার প্রাক্‌যুগে। বহির্ভারতের পুরললনা হলেও বক্তা কবি কালিদাসের অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা। উজ্জয়িনীর নিপুণিকা-চতুরিকা দলের পূর্বসূরী। কালের পরিমাপে ও মৈত্রেয়ী-গার্গীর কিছু নিকটবর্তিনী। তাই আপনার-আমার কাছে যেটা প্রগল্‌ভতা বলে মনে হচ্ছে, সেটা নিতান্তই কৌতুক বলে প্রতীয়মান হল মহাস্থবিরের কাছে। তিনি পুনরায় সহাস্যে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না শ্রবণা। নারী ও নদী অভিন্ন-আত্মা। অক্ষুনদীর আর অক্ষুমতীর তুলনা এক্ষেত্রে ত্রুটিহীন। এই নদীর স্রোতরেখা ধরে যদি চলতে থাক উপনীত হবে—বাগ্রাশ-কোল হ্রদের উপকূলে। সেখানে পৌঁছে স্থির হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়বে অক্ষু। গতির বিনিময়ে সে সেখানে পাবে গভীরতা। তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, তার অচঞ্চল জলে নির্মেঘ আকাশের সবটুকু নীলিমাই প্রতিবিম্বিত। নদী ও নারীর সার্থকতা ঐ মহাসঙ্গমেই। সুপ্রবুদ্ধতনয়ার সার্থকতা যেমন রাহুলমাতায়।

তর্কে পরাজয়টা সহ্য হয় না শ্রবণার—বিশেষ, মহাভিক্ষু তো আজ স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত নন; ধর্ম ও দর্শনের রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে স্বেচ্ছায় কাব্যের নর্মভূমে নেমে এসেছেন কৌতুক-কুতূহলে। এ কাব্যভূমে অধিকার অক্ষুমতীর, এ রাজ্য শ্রবণার। এখানে সে হার মানতে রাজি নয়। তাই পুনরায় বলে, কিন্তু থের! সুপ্রবুদ্ধতনয়ার পরিণাম কি রাহুলমাতায়? অভিধম্মে উপসম্পদা গ্রহণে নয়?

তর্কের ঝোঁকে শ্রবণা এবার স্বরাজ্য ত্যাগ করে অন্যমনে প্রবেশ করে ফেলেছে মহাভিক্ষুর সাম্রাজ্যে। তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হন না মোটেই। বলেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না শ্রবণা—সেটা হবে আত্ম-অস্বীকার! তোমার সম্মুখেই সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন এ প্রতর্কের মূর্তিমতী প্রত্যুত্তর! অগ্রবিনতা মহা-ভিক্ষুণী জীবা।

মরমে মরে যায় শ্রবণা—নিজের প্রগল্‌ভতায়।

ভিক্ষুণী জীবার জীবনেও তিনটি পর্যায়। অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি ছিলেন অক্ষুমতীর মত কুচীরাজ-প্রাসাদের এক চঞ্চলা কিশোরী রাজান্তঃপুরিকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রাহুলমাতার মতো সার্থক হয়েছিলেন কুমারজীবকে মাতৃস্তন্যে পুষ্ট করে। বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কুচীনগরীর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মহীয়সী ভিক্ষুণী। আ-লী বিহারের অগ্রবিনতা।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারত ভূখণ্ড থেকে কুচীরাজের দরবারে উপনীত হয়েছিলেন একজন অত্যন্ত সুদর্শন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—ভিক্ষু কুমারায়ণ। তিনি বস্তুত ছিলেন কাশ্মীররাজার একজন অমাত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার দেহাবসানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মতান্তর হল। মনান্তর হল না। কারণ বীতশ্রদ্ধ কুমারায়ণ তাঁর যাবতীয় বিষয়সুম্পত্তি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে তথাগতের শরণ নিলেন। ঘর ছেড়ে পথে নামলেন। দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধ ধর্মে, হলেন পরিব্রাজক। যষ্টি এবং ভিক্ষাপাত্র সম্বল কুমারায়ণ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে রওনা হলেন উত্তর-পশ্চিমে। পেশওয়ার, কাবুল, খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পামীর গ্রন্থী উম্মোচন করে এলেন কাশগড় সঙ্ঘারামে। কিন্তু ভিক্ষুর একস্থানে বেশিদিন থাকতে নেই। বর্ষা শেষ হলে এবার পূর্বাভিমুখে চলতে থাকেন কুমারায়ণ; অক্ষুনদী অতিক্রম করে উপনীত হলেন খ্যিজিল-সঙ্ঘারামে, অবশেষে কুচী নগরীতে। কুচীরাজ সসম্মানে তাঁকে আশ্রয় দিলেন নিজের অতিথিশালায়। তাঁকে বরণ করলেন রাজগুরুরূপে। কুচীরাজ ধর্মমতে বৌদ্ধ, বস্তুত তাঁর রাজ্যের শতকরা নব্বই জনই বৌদ্ধ। জনপদের সর্বত্র শুধু চৈত্য, বিহার, স্তূপ আর সঙ্ঘারাম। মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দু প্রজা আছে; তাদের আছে একটিমাত্র মন্দির—প্রাগার্যসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ জীর্ণপ্রায় এক মদনদেবের মন্দির, তো-শান পর্বতশীর্ষে। বৌদ্ধভিক্ষু তিনি, উপসম্পদা লাভ করে তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। সুতরাং মহা সঙ্ঘারামে তাঁর আবাস চিহ্নিত হতে পারে না। মহান অতিথিকে পরিচর্যা করবার দায়িত্ব অর্পিত হল রাজভগিনী কিশোরী জীবার ওপর। এর পরের প্রকৃত ইতিহাস হারিয়ে গেছে; কিন্তু পরিণাম দেখে অনুমান করা যায়, মারবিজয়ীর রাজ্যে পঞ্চশর পুনরায় সফলকাম হয়েছিলেন। কুমারায়ণের উপসম্পদা গ্রহণ স্থগিত থাকল; একদিন তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন কুচীরাজের কাছে যে, তিনি জীবার পাণিপ্রার্থী।

অপূর্ব রূপবান পুরুষ ছিলেন এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তদুপরি বোঝা গেল শুধু অতিথি নয়, রাজকুমারীর অন্তরেও অনুরাগ সঞ্চিত হয়েছে। এক বসন্তোৎসবে মদনপূজার অবসানে কঞ্চুকী রাজকর্ণকুহরে কিছু অনুরাগ-রক্তিম সংবাদ পেশ করে গেল। রাজা সম্মতি দিলেন। কুমারায়ণ এবং জীবা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁদেরই সন্তান এই কাহিনীর নায়ক। পিতা ও মাতার নামের অংশ-বিশেষ যুক্ত করে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'কুমারজীব'। তাঁর জন্মের অনতিবিলম্বেই কুমারায়ণ জাগতিক বন্ধনমুক্ত হন। জীবা তখন পূর্ণ যুবতী। কুচী জনপদে এক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহই প্রত্যাশিত ঘটনা ছিল সেকালে। জীবা সে পথে গেলেন না; তিনি তখন বাগ্রাশ-হ্রদে উপনীত সার্থক অক্ষুনদীর মতো স্থির অচঞ্চল। তাঁর অন্তর তখন সমস্ত নীলাকাশকে প্রতিবিম্বিত করত—তথাগত বুদ্ধের করুণাঘন দুটি নয়নের মতো। সদ্যোবিধবা উপনীত হলেন কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান অর্হৎ বুদ্ধস্বামীর কাছে। বললেন, ভগবন্! সংসারে আমার বীতরাগ জন্মেছে; আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন।

মহাস্থবির বললেন, কল্যাণি, সংসারে তোমার বীতরাগ হয়েছে বলছ, পুত্রকে ত্যাগ করতে পারবে?

শিউরে উঠেছিলেন জীবা। বললেন, আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করেছি ভদন্ত। না, সংসারে আমার অনীহা জন্মেনি। পুত্রকে ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞায় আমি তথাগতের শরণ নিতে প্রস্তুত নই।

স্মিতহাস্যে মহাস্থবির বলেছিলেন, ভ্রম তোমার ইতিপূর্বে হয়নি জীবা, হল এখন। মাতৃস্নেহকে অস্বীকার করার নির্দেশ সদ্ধর্মে নাই। দীঘ্‌ঘনিকায় সঙ্গীতি মুত্তন্তে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—চিত্তশুদ্ধির চতুর্মার্গ : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। মিত্রের প্রতি যে ভাব তাই হচ্ছে মৈত্রী। সদ্যোজাত সন্তান-ক্রোড়ে জননীর নিকট আর কে মিত্র? মহারাহুলোবাদ সুত্তে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর পুত্র রাহুলকে বলেছেন, 'হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় ব্যাপাদ (বিদ্বেষ-বুদ্ধি) বিদূরিত হইবে।' সুতরাং হে কুমারজীব-মাতা আমি তোমাকে মৈত্রীভাবনা থেকে বঞ্চিতা করতে চাই না! তোমাকে উপসম্পদা প্রদান করব এবং তুমি সপুত্র ভগবান বুদ্ধের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাবে।

তাই হল। সন্তান ক্রোড়ে সদ্যজননী জীবা আশ্রয় নিলেন ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে। কুচী জনপদ

সীমান্তের বাহিরে। চল্লিশ লী[1] উত্তর সীমান্তে। এখানেই তিনি অতি যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা শিক্ষা করেন যথাক্রমে মহাযানী ও হীনযানী ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য। ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে মানুষ হতে থাকেন কুমারজীব। অতি শৈশবকাল থেকেই কুমারজীবের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি সমগ্র প্রার্থনা সুত্ত ও সহস্রগাথা কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। নয় বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় নবমবর্ষীয় বালক কুমারজীব অক্ষরজ্ঞানহীন বৌদ্ধ শ্রোতাদের অভিধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। অশীতিপর মহাস্থবিরের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছালো। একদিন তিনি স্বয়ং এলেন বালকের শাস্ত্রপাঠ শুনতে। পাঠান্তে তিনি মুগ্ধ হয়ে ভিক্ষুণী জীবাকে অন্তরালে ডেকে এনে বললেন, কল্যাণময়ি, আমার দৃঢ় প্রতীতি—তোমার ঐ পুত্র অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ। হয়তো সে আংশিক বোধিসত্ত্ব। তুমি এই অসামান্য বালকের যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন কর। পিঞ্জরের সীমিত পরিবেশে ঐ মহাগরুড়শাবককে আবদ্ধ রেখ না। তুমি তোমার স্বামীর দেশে চলে যাও, তথাগতের স্বরাজ্যে।

ভিক্ষুণী জীবা পথে বার হলেন অতঃপর। যে পথে কুমারায়ণ এসেছিলেন একদিন কাশ্মীর থেকে কুচীতে, সেই পথরেখা ধরেই বিপরীতমুখে তিনি এসে উপনীত হলেন ভারত ভূখণ্ডে। কাশ্মীর রাজ্যে। স্বামীর গৃহে স্থান হল না। না হোক, কাশ্মীর-সঙ্ঘারামের মহাস্থবির সানন্দে আশ্রয় দিলেন কুমারায়ণের স্ত্রীপুত্রকে। এই মহাস্থবিরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি—মহাপণ্ডিত বুদ্ধদত্ত। বস্তুত তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজের জ্ঞাতিভ্রাতা। প্রব্রজ্যা নিয়ে তিনি সমস্ত সম্পদ শতদানে বিতরণ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন সঙ্ঘের। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন, বালক কুমারজীব অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। মাত্র তিন বৎসরের ভিতর, অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষ অতিক্রমের পূর্বেই বালক কুমারজীব মধ্যম ও দীঘ্‌ঘ আগমের যাবতীয় সুত্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। এই সময় ভিক্ষুণী জীবা তাঁর পুত্রকে নিয়ে পুনরায় কুচীরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তোখারিস্তানে য়ু-চী রাজের নির্মিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামে তিনি সপুত্র কিছুকাল বাস করেন। প্রসঙ্গত, য়ু-চী উপজাতি হচ্ছে মধ্য-এশিয়া ও চীনের মঙ্গোলীয় জাতির একটি মিশ্রশাখা—কুষাণরাজ কদ্‌ভিস ভ্রাতৃদ্বয় ও সম্রাট কনিষ্ক এই য়ু-চী জাতির সন্তান।

কুমারজীব আজন্ম ব্রহ্মচারী। বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস নেন। এরপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি কুচীতেই ধর্মজীবন-যাপন করেন। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নিজ প্রচেষ্টায়। চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ ও স্মৃতি, জৈনধর্ম এবং নানা জাতের ব্যবহারিক বিদ্যা—পঞ্চবিজ্ঞান, চরক, শুশ্রূত ও জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ। ক্ষুদ্র কুচী জনপদে এমন কোনও পণ্ডিত ছিলেন না যাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তৃপ্ত হতে পারেন তিনি। রেশম-সড়কে যে সকল পণ্ডিতেরা যাতায়াত করেন তাঁদের ভিতরেও উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পান না। অন্তরের অন্তস্তলে যে অনুপপত্তি রয়েছে তার 'আরোগ্য' হবে কি করে? উপনিষদের ব্রহ্মলাভ এবং বৌদ্ধদের নিব্বাণলাভের মধ্যে প্রভেদ কী? উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, অজাত, অভূত, অকৃত। ধম্মপদও ঠিক ঐ কথাই বলছেন। উপনিষদ বলছেন, তিনি অজর, অমর, মৃত্যুর অতীত। থেরী গাথাও বলছেন, 'ইদং অজরং, ইদং অমরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকং'। মাণ্ডুক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন—'ব্রহ্মাং শিবং'; সুত্তনিপাত্ত বললেন, 'নিব্বানং পরমং শিবং'। তাহলে বিরোধ কোথায়? তথাগতের মহাপরিনির্বাণ কেন তাহলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ব্রহ্ম-রসাস্বাদন নয়?

স্থির করলেন পুনরায় পরিব্রাজক হয়ে যাবেন। হিমালয়ে অথবা তিয়েনশানের একান্ত গুহায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা হয়তো ওঁর সংশয় নিরাকরণ করতে সক্ষম হবেন। ঠিক এই সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল, কাশগড়ে গৌতমবুদ্ধের নিজস্ব ভিক্ষাপাত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভিক্ষাপাত্রটি মহাপরিনির্বাণকালে শাক্যমুনি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে। কাশগড়রাজ 'পু-তু' সেই ভিক্ষাপাত্রটি সংরক্ষণের জন্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেছেন। আগামী বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমায় তিনি চৈত্য-স্তূপের গর্ভে ঐ মহামূল্য সম্পদটিকে সংস্থাপিত করতে চান। কাশগড়রাজ এজন্য সমগ্র মধ্য-

এশিয়াখণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য বৌদ্ধ-অর্হৎ মহাস্থবির কুমারজীবকে আমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দে সম্মত হলেন কুমারজীব। ভিক্ষুণী জীবাও এ সুযোগ ছাড়লেন না। অনুগামী হলেন পুত্রের। রাজকন্যা অক্ষুমতী ও তার বয়স্যা শ্রবণাও রাজ-অনুমতি নিয়ে অনুগমন করল তাঁর। কাশগড় মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। কাহিনীর প্রারম্ভে আমরা তাঁদেরই দেখেছি অক্ষু নদীর উপকূলে।

এক বৎসর পরের কথা।

কুচী নগরী আজ উৎসবের সাজে সজ্জিত। পক্ষকালব্যাপী মহা উৎসব। হর্ম্যশীর্ষে নিশান, পথে পথে তোরণ, সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে দীপাবলী। রঙরেজিনীরা মাসাধিককাল দিবারাত্র পরিশ্রম করেছে—রাজ্যসুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ বুঝি তাদের গাত্রাবরণ নব-রঙে রঞ্জিত করতে উদ্‌গ্রীব। তাই স্বাভাবিক। আসন্ন বসন্তপূর্ণিমার প্রত্যাশায় আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরও যে রঙিন হয়ে উঠেছে আজ—যেমন ভাবে অন্তরকোরকনিবদ্ধ রক্তিম কামনা-বাসনা মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে পথবীথিকার ফুল্ল অশোক, কিংশুকে। বৎসরান্তিক মদনমহোৎসব সমাসন্ন। কুচীরাজ্যের জনপ্রিয়তম জাতীয় আনন্দোৎসব।

মদনদেব বৌদ্ধ দেবতা নন। বস্তুত গিরিমেখলবাহন হচ্ছেন শাক্যসিংহের প্রতিপক্ষ। তবু এ উৎসব বৌদ্ধ কুচীরাজ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব। মদনদেবের এ পূজার আয়োজন শুধু প্রাক-বুদ্ধ নয়, প্রাগার্যযুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহেন-জো-দারো, চানুদারো, হড়প্পায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। মিশরে মদনাঙ্কশায়িনী রতি ছিলেন ভিন্ন নামে—হোরাস জননী দেবী আইসিস্-এর পরিচয়ে। সেকেন্দার শাহ্-এর দেশে মদন ও রতির অভিধা ছিল ডিমিটার ও আফ্রোদিতে; রোমক-সভ্যতায় তাঁদের রূপান্তর ঘটেছিল—ব্যাকাস্ ও ভেনাস-এ। সেই নরনারীর মিলন ও প্রজননের দেবতা এশিয়া-মাইনরে এসে নূতন নামরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন—পাইরিজিয়ায় তিনি ছিলেন 'সাবাজিন'; তারিম নদীর অববাহিকায় তিনিই হয়েছেন মদনদেব। গৌতম বুদ্ধ যদি এশিয়ার অনির্বাণ সূর্য, তবে প্রেম ও প্রজননের এই দেবতাও শাশ্বত-কুজ্ঝটিকা। কুজ্ঝটিকার নাগপাশ ছিন্ন করে সূর্যের আবির্ভাব যদি চিরসত্য, তবে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে জীবন যতদিন আছে অন্তত ততদিন এ কুজ্ঝটিকার অস্তিত্বটাও অনস্বীকার্য সত্য। কুচী নগরীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সে সত্যটা স্বীকার করে—কী বৌদ্ধ, কী হিন্দু। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সঙ্ঘারামের সেই সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, যাঁরা মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে যাবজ্জীবন গিরিমেখলবাহনকে অস্বীকার করেছেন। এ উৎসব পরাধর্মের নয়, দেহধর্মের। শাস্ত্রোক্ত নির্দেশানুসারে নয়, লৌকিক। আনন্দের অনাবিল উচ্ছ্বাস। বর্তমানকালে আমরা, হিন্দুরা যেমন বড়দিনের উৎসবে মাতি; অথবা খ্রিস্টান, শিখ যুবক-যুবতী রঙ-দোলের উদ্দামতায় 'হোলী হ্যায়' উৎসবে মাতে।

এ বৎসর অবশ্য বার্ষিক উৎসবের আয়োজন অনেক ব্যাপক, অনেক বৃহৎ। তার হেতু দ্বিবিধ। প্রথমত, কুচীরাজ পো-সাঙ ঘোষণা করেছেন, মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে রাজকন্যা অক্ষুমতীর স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্বয়ম্বর-সভায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের নৃপতিনন্দনদিগকে আমন্ত্রণ করা অশোভন; কারণ মাত্র একজন ব্যতিরেকে অপর সকলকেই সেখানে প্রত্যাখ্যানের অমর্যাদায় মণ্ডিত করাটা অনিবার্য। কুচীরাজ তাই সুকৌশলে তাঁর রাজ্যে মদনোৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—অনুষ্ঠানসূচীতে স্বয়ম্বর-সভার উল্লেখ আছে মাত্র। যেন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা গৌণ, যে কেউ তাতে যোগ দিতে পারেন, নাও পারেন। ফলে কুচী জনপদে সমবেত হয়েছেন পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের রাজপুত্রেরা—এসেছেন অগ্নিদেশ (কারাশর), চক্কুক (ইয়ারকণ্ড), শৈলদেশ (কাশগড়), পুরুষপুর (পেশোয়ার), নিয়া, মীরাণ, তুরফান থেকে কুমার ভট্টারক ও তাঁদের অনুজগণ। সমবেত হয়েছেন ঐ সকল জনপদের বিশিষ্ট সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীতনয়। কুচী নগরীতে বর্তমানে এইটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়—দেববাঞ্ছিতা রাজকন্যা অক্ষুমতী কাকে বরমাল্য দেবেন! শোনা যায়, এজন্য নগরীর শৌণ্ডিকাপণে গোপনে বাজিও ধরা হচ্ছে। জনশ্রুতি—চূড়ান্ত নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকি মাত্র তিনজন

প্রতিযোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সমস্যা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের শীর্ষদেশে শৈলদেশের (কাশগড়ের) রাজকুমার 'তা-মো-ফু-ত'। তিনি দুর্ধর্ষ সমরনায়ক, ধর্মের বাতিক নেই। অশ্বারোহণ ও অসিযুদ্ধে প্রথিতযশা। চীনা ইতিহাসে তাঁর ঐ নাম উল্লিখিত বটে তবে তাঁর ভারতীয় নাম ধর্মপুত্র, পালিতে ধম্মপুত্ত। তিনি কাশগড়রাজ 'পু-তু'র (ভদ্রদেবের) জ্যেষ্ঠপুত্র, যুবরাজ। ত্রিভুজের অপর দুটি বিন্দু যথাক্রমে সূর্যভদ্র ও সূর্যসোম। চক্কুক অথবা ইয়ারকণ্ড-রাজ (বর্তমান নাম 'কারগালিক') ৎ-সান কীয়ুনের দুই উপযুক্ত পুত্র। দুজনেই বৌদ্ধভিক্ষু—অর্হৎ কুমারজীবের দুই প্রিয় শিষ্য। উভয়েই মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—এখনও সম্মত হননি কুমারজীব। কোনো কোনো প্রাকৃতজনের বিশ্বাস জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত কুমারজীব নাকি গণনা করে দেখেছেন—এঁদের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ অনিবার্য, সেজন্যই উপসম্পদা দান স্থগিত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গ রাজকন্যার অন্দরমহলেও ওঠে। ওঠায় তাঁর প্রিয়সখীর দল। তারা জানতে ইচ্ছুক রাজকন্যার মনোভাবটুকু। বস্তুত রাজকন্যা এ বিষয়ে কখন কী বলেন সে কথার উপর আসবাগারে প্রতিযোগীদের বাজারদর ওঠানামা করে। শুধু রাজকন্যার প্রিয়তমা বয়স্যা শ্রবণা কৌতূহল দেখায় না। মাঝে মাঝে জনান্তিক অবকাশে অক্ষুমতীকে বলে—কী ভাষায় বলে জানি না, তবে বর্তমান যুগের ভাষায় তার আক্ষরিক অনুবাদ ঃ 'অহো ভাগ্য! সন্দেহাতীত বুল্স্-আই-টিপ্স্ আমার অঞ্চলপ্রান্তে গ্রন্থীনিবদ্ধ, পরন্তু আমি ডার্বি সুইপ-এর ট্রিপলটোট্‌বঞ্চিতা।'

অক্ষুমতী কৌতুক করে বলেন, বটে! তুই জানিস ভাগ্যবানটি কে!

শ্রবণা বলে, আমি তো অন্ধ নই পিয়সহি! এক বৎসরকাল তোমার সঙ্গে শৈলদেশে অবস্থান করেছি। আমি যে শুনেছি, সেই পার্বত্যগুম্ফায় তোমার স্বপ্নমঙ্গলকথা! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, অক্ষুনদীর চঞ্চলতা ব্যাঘ্রাশ-কোল হ্রদে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! সেখানে একটিমাত্র মুখই আজ প্রতিবিম্বিত।

রাজকুমারী হস্তধৃত পাঙ্খাদ্বারা প্রিয়সখীকে ছদ্মতাড়না করেন।

লঘুচিত্ত অনূঢ়াদিগের এ সকল হাস্যপরিহাসের কথা থাক। যে কথা বলছিলাম। এ বৎসর বার্ষিক আনন্দোৎসবের আড়ম্বর বৃদ্ধির দুটি হেতু। একটি বিবৃত করেছি; দ্বিতীয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থবির কুমারজীব সম্প্রতি ৎ-সাওলী মহাবিহারে একটি অতি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর ধারণা জন্মেছিল, এ-গ্রন্থ কুষাণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক। খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে পঞ্চনদ-দেশে জলন্ধর মহানগরীতে সম্রাট কনিষ্ক একটি ধর্মমহাসভার আয়োজন করেছিলেন, বুদ্ধচরিত-প্রণেতা মহাপণ্ডিত অশ্বঘোষের সভাপতিত্বে। সে সভান্তে সর্বাস্তিবাদিগণই স্থবিরবাদীদিগের উপর প্রাধান্য পান। অর্হৎ বসুমিত্র প্রথমোক্ত মতের সুত্তগুলি 'মহাবিভাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাষায়, পালিতে নয়। প্রথমাবস্থায় কুমারজীবের ধারণা হয়েছিল, সদ্য আবিষ্কৃত গ্রন্থটি এ ঘটনার সমসাময়িক। পরে তিনি অনুধাবন করেন, এ গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত। তবু এটি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রজগতে এক অনবদ্য সঙ্কলন। গ্রন্থটি ঃ 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা'। একক প্রচেষ্টায় তিনি ঐ পুঁথির আদ্যন্ত পাঠোদ্ধার করেছেন। স্থির হয়েছে, ৎ-সিয়াওলী মহাবিহারে মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে থের কুমারজীব সমবেত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ঐ অমূল্য গ্রন্থটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। এজন্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বহু সঙ্ঘারাম থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও ক্রমাগত সমবেত হচ্ছেন কুচীনগরীতে।

কুচী শৈলনগরী একটি পার্বত্য সানুদেশের ক্রমনিম্নাভিমুখে। সোপানবলীর মতো প্রস্তরের ধাপে ধাপে হর্ম্যরাজি। প্রতিটি গৃহের ছাদ আবশ্যিকভাবে ঢালু। শীতে এখানে তুষারপাত হয়। বিশালায়তন উদ্যান কোথাও নাই। পর্বতগাত্রে 'ভূজঙ্গপ্রয়াত'-ছন্দে গ্রথিত বিসর্পিল পথ—দেবদারু, পাইন প্রভৃতি কদলীপুষ্পাকৃতি পাদপে সমাকীর্ণ। নগরীতে একাধিক বিহার ও সঙ্ঘারাম। প্রধান বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের নাম ওয়েন-সু; মহাস্থবির বুদ্ধস্বামী এই বিহারেরই থের ছিলেন, তাঁর নির্বাণলাভে বর্তমানে কুমারজীব থের হয়েছেন। এখানে প্রায় ষাটজন শ্রমণের নিবাস। তাছাড়া পো-সান পর্বতচূড়ায় চে-হু-লি বিহার এবং তা-মু বিহারেও শতাধিক শ্রমণের বাস। ভিক্ষুণীদিগের আবাসের জন্যও ছিল একাধিক পৃথক

বিহার—আ-লী এবং লিয়ুন-জো-কান সঙ্ঘারাম। ভিক্ষুণীদিগের বিহারের পরিচালনভারও মহাস্থবির 'ফু-তু-শে-মি' অর্থাৎ বুদ্ধস্বামীর উপর ন্যস্ত ছিল; বর্তমানে কুমারজীবের উপর। ভিক্ষুণী জীবা 'আ-লী' বিহারের সর্বপ্রধানা অর্থাৎ 'অগ্‌গবিনতা'। এই বিহারগুলি সচরাচর নগর কোলাহলের বাহিরে, নির্জন পর্বতচূড়ায়। নগরীর কলকোলাহল সেখানে অশ্রুত।

এই এক বৎসরে—ঠিকই বলেছিল শ্রবণা—রাজকুমারী অক্ষুমতী যেন ব্যাঘ্রাশ-হ্রদে উপনীত হয়েছেন; তাঁর অন্তর-দর্পণে অনপনেয় শাশ্বত প্রতিবিম্ব পড়েছে। আগামীকাল বসন্তোৎসব—সকলেই উচ্ছল, উদ্বেল। যাঁকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন, শুধু তিনিই বাতায়নপথে শূন্য দৃষ্টি প্রসারিত করে করলগ্ন কপোলে আত্মমগ্না : তিনি কি এ উৎসবে যোগদান করতে আদৌ আসবেন?

তিনি অর্থাৎ শৈলদেশের রাজধানীতে দৃষ্ট সেই অনিন্দ্যকান্তি বৌদ্ধ শ্রমণ। না, তিনি কোন জনপদ-নৃপতির কুমার ভট্টারক নন—তবু বংশমর্যাদার কৌলীন্য আছে তাঁর। তিনিও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—অপূর্ব রূপবান পুরুষ। দীর্ঘদেহী, সুগঠিততনু অলক্তকরাগরঞ্জিত দুগ্ধের ন্যায় যাঁর গাত্রবর্ণ, নয়ন যুগলে যাঁর দার্শনিক-সুলভ অতল জিজ্ঞাসার সহিত কবিসুলভ সৌন্দর্যতিয়াসের বিচিত্র বৈপরীত্য। কাশগড়ে নৃপতির তরফে তিনিই এসেছিলেন সপরিবারে কুমারজীবকে আমন্ত্রণ করে নিতে—নগরতোরণে। সেখানেই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন, তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাৎপটে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাজপুত্রী অক্ষুমতী। কে জানে, হয়তো ভিক্ষু বুদ্ধযশাও।

তারপর এক বৎসর বারে বারে তাঁদের সাক্ষাত হয়েছে। সসম্ভ্রম সৌজন্যে একটি দূরত্ব রেখে চলেছিলেন বুদ্ধযশা—ভিক্ষু তিনি, সদ্ধর্মের অনুশাসনের কামনাবাসনাকে ত্যাগ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে নির্বাণলাভের পথে তাঁর অভিযাত্রা; মহাপরিনির্বাণ-সূত্তে বর্ণিত প্রাক্‌বুদ্ধযুগের সন্ন্যাসী আলাঢ় কালাম-এর ধ্যান-রাজ্যে তিনি উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন কাশ্মীর মহাবিহারেই। তারপর গৌতম যেমন রাজগৃহ ত্যাগ করে উরুবিল্ব গ্রামে একক-সাধনে প্রবৃত্ত হতে যাত্রা করেছিলেন, বুদ্ধযশাও তেমনি তাঁর পূর্বসূরী কুমারায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খাইবার গিরিবর্ত্ম, পামীর-গ্রন্থী অতিক্রমণে এসে উপনীত হয়েছিলেন শৈলদেশে, কাশগড়ে। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে। মহাস্থবির কুমারজীব কুচী থেকে কাশগড়ে শুভাগমন করছেন শুনে তিনি তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা দেখলেন। বুঝলেন, এ ঘটনা সুনিশ্চিতভাবে তথাগতের নির্দেশেই। মহাথের কুমারজীবই হতে পারেন তাঁর গুরু, তাঁর আচার্য—তাঁর নিকটেই তিনি মরজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করবেন : উপসম্পদা!

কিন্তু!

কুমারজীব তো একাকী উপনীত হলেন না। তাঁর সঙ্গে আবির্ভূতা হলেন তাঁর ভগ্নী, দেববাঞ্ছিতা অপরূপ রূপবতী রাজকন্যা অক্ষুমতী। যে চিন্তা-ভাবনা-কামনা-বাসনাগুলি নির্মূল হয়েছে বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল, বুদ্ধযশা দেখলেন সেগুলি অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত ছিল মাত্র—নিদাঘ খরতাপে বালুকাস্তরের নিম্নে নিদ্রামগ্ন তৃণদলের মতো। যেন অক্ষুনদীর জলধারায় সেই শিশুতৃণ ঊষর বালুকাস্তূপ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরিত হতে চায়, অবাক বিস্ময়ে দেখতে চায় এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ প্রপঞ্চকে। যেন পুষ্পভারে মুঞ্জরিত হতে চায়। নিরতিশয় আন্তরিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন মুমুক্ষু ভিক্ষু।

বৎসরাধিককাল কুমারজীব অধিষ্ঠিত ছিলেন শৈলদেশে। তিনি মহাস্থবির, তাই তাঁর আবাস চিহ্নিত হয়েছিল মহা-সঙ্ঘারামে; ভিক্ষুণী জীবাও ছিলেন ভিক্ষুণীদিগের জন্য নির্দিষ্ট বিহারে। পরন্তু রাজকুমারী অক্ষুমতী ও শ্রবণা সংসারাশ্রমের জীব, সঙ্ঘারামে তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে না; তাই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল রাজ-অতিথিশালা। দুর্ভাগ্য ভিক্ষুবুদ্ধযশার—তিনিও ঐ রাজ-অতিথিশালার অতিথি। উপসম্পদা গ্রহণ না করায় কোন সঙ্ঘারামের পরিবেশে তাঁরও আবাস চিহ্নিত হয়নি। অতিথিশালাটি একটি মাত্র গৃহ নয়,—প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি একান্ত আবাস। এক-একটি এক-একজন অতিথির জন্যে চিহ্নিত। সেই উদ্যানবাটিকার ভিতরেও ছিল একটি ক্ষুদ্রারণ্যম

চৈত্য। সেই চৈত্য-সংলগ্ন কক্ষে প্রস্তর-শয্যায় বুদ্ধযশার বিশ্রামের আয়োজন। চৈত্যের কেন্দ্রস্থ কক্ষে অবস্থিত বুদ্ধমূর্তি সুশোভিত স্তূপমূলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনি পূজারতি করেন। উদ্যানবাটিকায় আশ্রয়প্রাপ্ত অতিথিবৃন্দ সমাগত হন সন্ধ্যাকালে। সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতে যোগদান করেন। বুদ্ধযশা তাই কিছুতেই ভুলে থাকতে পারেন না তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের মূলীভূত উপলক্ষ। প্রতিদিন দুই সখী যোগদান করেন প্রার্থনাসভায়। ভক্তমণ্ডলীর পশ্চাদভাগে অন্তেবাসীর মতো বসে থাকেন। তবু প্রার্থনান্তে বুদ্ধযশা যখন নিমীলিত নেত্রকে মুক্তি দেন, দেখতে পান জনারণ্যের প্রত্যন্তভাসে ঘৃতপ্রদীপের আলোকে সমুজ্জল একটি দেববাঞ্ছিতা যোড়শীমূর্তি। নীরবে সে অগ্রসর হয়ে আসে—কখনো যূথীর মাল্য, কখনও সহস্রদলের মালিকা সশ্রদ্ধে নামিয়ে রাখে ভিক্ষুর চরণমূলে, ধাতব পাত্রে। যেন সে অর্ঘ্য তথাগতের জন্য নয়, তথাগতের সেবকের। কুণ্ঠিত হন নিত্য ভিক্ষু বুদ্ধযশা সে অর্ঘ্য গ্রহণে।

তারপর একদিন। সেদিন সকাল থেকেই তুষারপাত হচ্ছিল। শ্যামল শস্যভূমির উপর প্রায় বিঘৎপ্রমাণ তুষার সঞ্চিত হয়েছে। তদুপরি দুর্মদ বায়ুবেগ। সেদিন আশ্রমবাসীর কেহই সমবেত হতে পারেননি সন্ধ্যারতির লগ্নে। ভিক্ষু বুদ্ধযশা একাকী প্রার্থনায় উপবেশনের আয়োজন করছিলেন, সহসা চৈত্যদ্বারের রুদ্ধ কপাটে করাঘাত হল। তুরন্ত তুষারমিশ্রিত বায়ুবেগের জন্য ভিক্ষু চৈত্যদ্বার আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে এসে দ্বার উন্মোচন করে দিয়েই দেখলেন, ঐ তুষারঝটিকা অগ্রাহ্য করে দুইজন ভক্ত সমবেত হয়েছেন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—রাজকন্যা অক্ষমতী এবং তাঁর বয়স্যা শ্রবণা। তাঁদের অঙ্গাবরণে তুষারের প্রলেপ। কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন ভিক্ষু। বলেন, এই দুর্যোগে আপনারা আজ না এলেই পারতেন।

মুখরা শ্রবণা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, এই দুর্যোগে আপনি ঘণ্টাধ্বনি না করলেই পারতেন!

সে কথা সত্য। পূজারতির পূর্বে ধাতবঘণ্টার নিনাদ প্রতিহত হতে থাকে। প্রথামাফিক বুদ্ধযশা সেদিনও যথারীতি ধাতব-সঙ্কেত ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত করেছেন : সন্ধ্যা বন্দনার সময় সমাগত। সংস্কৃত কাব্য পাঠ করা ছিল ভিক্ষুর। তাঁর মনে হল বৃন্দাবনের গোপনারীরা যেমন বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র সংসারের যাবতীয় কার্য বিস্মৃত হতেন, এঁরাও তেমনি ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনে ছুটে এসেছেন গৃহকেন্দ্রাতীত বিকর্ষণে। কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার সে অভিসারের মূলে কী ছিল? কৃষ্ণলাভের বাসনা তো বটেই। কিন্তু কী ভাবে? সে কি ইন্দ্রিয়াতীত ভগবৎ প্রেম, নাকি দেহের প্রতি রোমকূপে আত্মদানের অভীপ্সা?

ভিক্ষু বলেন, আপনাদের উভয়ের পরিচ্ছদই তুষারপাতে সিক্ত। আমি বরং একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করি।

এবারও শ্রবণা বলেছিল, মহাভাগ! শীতে অবশতনু আমার প্রিয়সখী বর্তমানে উত্তাপের কাঙাল; পরন্তু অগ্নির উত্তাপে তাঁর পরিচ্ছদে সঞ্চিত তুষার দ্রবীভূত হবে এবং তাঁকে সিক্ত করে দেবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পূজারতির আয়োজন করুন বরং।

শ্রবণার বক্তব্যে যেন কিছু গূঢ় ব্যঞ্জনা ছিল। সুতরাং ভিক্ষু সন্ধ্যারতির কার্যেই মনোনিবেশ করেন। অনতিদূরে উপবেশন করে ওরা দুইজন। শ্রবণাই পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কতদিন পূর্বে কাশ্মীর ত্যাগ করে এ রাজ্যে এসেছেন ভদন্ত?

—কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর।

—আপনিও তো কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষু কুমারায়ণের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়। তিনি মহাথের কুমারজীবের পিতৃদেব। বস্তুত তিনি আমার পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সে সম্পর্কে মহাথের আমার খুল্লতাত।

—কাশ্মীরে আপনার আত্মীয় পরিজন কে কে আছেন?

ভিক্ষু ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর প্রশান্ত ললাটে দীপালোকে ভ্রূকুঞ্চনটা স্পষ্ট। লক্ষ্য করে দেখেন—শ্রবণা প্রশ্নটি পেশ করে ঊর্ধ্বমুখে প্রতীক্ষা করছে, পরন্তু তার সখী মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি নতমুখী। একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুর পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ।

কিন্তু তর্কপটু শ্রবণা অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। তৎক্ষণাৎ বলে, মূঢ়মতীর প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন ভদন্ত, আমার ধারণা ছিল ঐ নিয়ম সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই প্রযোজ্য। উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষু গার্হস্থ্যাশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত; তখন তাঁর 'পূর্বাশ্রমে'র অর্থ গুরুগৃহের জীবন। আমি কিন্তু আপনার গুরু-গুর্বীর পরিচয় জানতে ও প্রশ্ন করিনি।

একটু উদ্ধত শোনায় ভিক্ষুর প্রতিপ্রশ্নটি, তবে কার পরিচয় জানতে চাইছেন?

—আপনার সহধর্মিণীরও নয়, যেহেতু জেনেছি আপনি অকৃতদার। আপনার পিতৃপরিচয়ই—

—আমার পিতৃপরিচয়ে আপনাদের প্রয়োজন?

একবচন এতক্ষণে দ্বিবচনে পরিণত হওয়ায় মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী আর নীরব শ্রোতার অভিনয় করতে পারে না। বয়স্যাকে বলে, কেন ওঁকে বিরক্ত করছিস শ্রবণা? সন্ধ্যারতির বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

শ্রবণা নীরব হল। ভিক্ষু পূজায় বসলেন। ধূপ দীপ পুষ্পার্ঘ্য। কিন্তু নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সন্ধ্যাবন্দনায় আজ যেন সম্পূর্ণ নূতন সুর লেগেছে। ভিক্ষু যখন বর্ণগুণমণ্ডিত কুসুমার্ঘ্য প্রদান করলেন বুদ্ধের চরণমূলে তখন সহসা দুই সখী যুক্তকণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়ে ওঠেন :

"বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্তভিং
পূজায়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরহে।।"

মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভিক্ষু। সুগন্ধ সম্ভারযুক্ত ধূপদান নিয়ে যখন পূজা ভাজন লোকুত্তমকে আরতি করতে থাকেন তখন দুই সখী গাইলেন :

"গন্ধ-সম্ভার-যুক্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা।
পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমম্‌।।"

স্বর্গীয় সঙ্গীতমাধুর্যে রোমাঞ্চিত হল ভিক্ষুর সর্বাবয়ব। তুলে নিলেন পঞ্চপ্রদীপ। আহ্বান করলেন তরুণীদ্বয়কে স্তূপ-পরিক্রমায়, তাঁর অনুগমন করতে। তিনজনে ধীরে ধীরে স্তূপকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন সুবর্ণপ্রদীপ হস্তে। সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত সেই রুদ্ধদ্বার পাষাণকক্ষের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে :

"ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তকধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।।"

যেন স্তূপপরিক্রমা নয়, সপ্তপদীর চক্রাবর্তন! পূজান্তে তিনজন সমবেত কণ্ঠে গাইলেন :

"মহাকারুণিকো নাথ হিতায় সব্বপাণিনং।
পূরেত্বা পারমি সব্বা পত্তোসম্বোধিমুত্তমম্‌।।"

বাইরে তখনও অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। তবু ভিক্ষু ওদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন না, নির্মমহস্তে উন্মুক্ত করে দিলেন চৈত্যের নির্গমন-দ্বার। শ্রবণা বলে, ভদন্ত, আর একটি নিবেদন আছে। আপনি যে শীতবস্ত্রে দেহ আবৃত করেন, সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে। পিয়সখি এজন্য আপনার ব্যবহারের নিমিত্ত একটি পশমের উত্তরীয় বয়ন করেছেন। এটি আপনি গ্রহণ করলে আমরা উভয়েই কৃতকৃতার্থ হই।

অঞ্চলতল থেকে অক্ষুমতী সুচারু সূচীকর্ম শোভিত পশমের একটি উত্তরীয় বার করে আনে। মিনতিপূর্ণ দুটি কজ্জল-লাঞ্ছিত নয়নে নীরবে সে প্রতীক্ষারতা।

মার! রতি-রঙ্গ-তন্থ!

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত ঋজু ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হলেন বৌদ্ধভিক্ষু। অক্ষুমতী নয়, শ্রবণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌদ্ধভিক্ষুর বিলাসও নিষিদ্ধ, আয়ুষ্মতি! তোমার প্রিয়সখীকে বল, এ জীর্ণ উত্তরীয়ে আমার কোনও অসুবিধা নাই।

তর্কপটু শ্রবণা স্তম্ভিতা। সে যে মর্মে মর্মে জানে, ঐ কারুকার্যখচিত পশমের উত্তরীয়টি সূচীশিল্পে

অলঙ্কৃত করতে তার প্রিয়সখী কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। ওই পশমের রক্তমুখী অম্বুজ যে রাজনন্দিনীর শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতির দ্যোতক। এতক্ষণে অক্ষমতী সরাসরি সম্বোধন করেন ভিক্ষুকে। অবমানিতা রাজদুহিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, প্রগল্ভতা মার্জনা করবেন ভদন্ত। আমাদের ধারণা ছিল—ভক্তের দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার কোনও ভিক্ষাজীবী বৌদ্ধভিক্ষুর নাই। প্রদত্ত বস্তু ব্যবহারে যদি তাঁর রুচি না থাকে, সেক্ষেত্রে অনায়াসে তিনি তা কোনও দীনদরিদ্রকে পুনরায় দান করতে পারেন। সঙ্ঘকে প্রদান করতে পারেন।

সেই প্রথম বুদ্ধযশার সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করলেন অক্ষমতী। বুদ্ধযশা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বলেন, আপনি যথার্থই বলেছেন কল্যাণি। আপনার শ্রদ্ধার দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নাই—

গ্রহণের মুদ্রায় দুটি হাত প্রসারিত করে দেন বুদ্ধযশা। কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির করেছে অক্ষমতী। বলে, মার্জনা করবেন। কীটদষ্ট অর্ঘ্যপুষ্পের মতো এ প্রত্যাখ্যাত অর্ঘ্য এখন দানের অযোগ্য। তাছাড়া আশঙ্কা হয় এই দুর্যোগ সন্ধ্যার স্মৃতি ভিক্ষু বুদ্ধযশা বিস্মৃত হতেই আগ্রহী। সুতরাং এ প্রত্যাখ্যাত দীন উপহার আমার কাছেই থাক।

চৈত্যদ্বার খুলে তুষারঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে পথে নেমেছিল অবমানিতা রাজকন্যা।

ওখানেই যদি শেষ হত ওঁদের অনুরাগ-বিরাগের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা, তাহলে নিশ্চয় আজ অক্ষমতী চিন্তা করত না—'তিনি কি আসবেন'?

ঐ ঘটনার পরেও এই এক বৎসরে ঘটেছে আরও অনেক ঘটনা এবং দুর্ঘটনা।

সেই বৎসরাধিককাল মহাস্থবির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ভিক্ষু সূর্যসোম, সূর্যভদ্র এবং বুদ্ধযশার সঙ্গে—শতশাস্ত্র, মধ্যমক শাস্ত্র, দীর্ঘআগম। বস্তুত সমগ্র অভিধম্মপিটক। বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সাড়ম্বরে গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটির পূজাও উদ্‌যাপিত হল। ওঁর তিনজন শিষ্যই উপসম্পদা গ্রহণের কামনা জ্ঞাপন করেছিলেন। মহাঅর্হৎ বলেছিলেন, এখনও সময় হয়নি। সূর্যসোম ও সূর্যভদ্রকে তিনি কী বলেছিলেন জানা যায় না, বুদ্ধযশাকে বলেছিলেন, আমার মনে হয় আপনার অন্তঃকরণ এখনও এ জন্য প্রস্তুত নয়।

সলজ্জে স্বীকার করেছিলেন বুদ্ধযশা। বলেছিলেন, প্রভু আপনি নির্দেশ দিন, কীভাবে আমি পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি!

কুমারজীব বলেছিলেন, আমি নূতন কথা কী বলব আপনাকে? এর নির্দেশ তো অভিধম্মেই রয়েছে। এর প্রত্যুত্তর আপনার অন্তঃকরণই দিতে সক্ষম। আপনার সম্মুখে পথ দ্বিধাবিভক্ত। হয় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে সমাজবদ্ধজীবের যাবতীয় কর্তব্য সমাপনান্তে তৃপ্ত অন্তঃকরণে তথাগতের স্মরণ নিতে হবে, অন্যথায় কৃচ্ছ্র সাধনায় ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

বিস্মিত বুদ্ধযশা বলেছিলেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে! আপনি কি আমাকে সেই নির্দেশই দিচ্ছেন মহাথের?

—না। আমি শুধু বলতে চাই পার্থিব কামনা-বাসনার উত্তরণ ভিন্ন উপসম্পদা গ্রহণ ব্যর্থ। এবং তা উত্তরণের দুইটি মার্গ। দ্বিধাবিভক্ত পথের কোনটি অনুসরণীয় তা শুধুমাত্র আপনার বিবেচ্য। "আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্য শরণোভব"—নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালুন, সেই প্রদীপের আলোকে বিবেকনির্দেশে জীবনপথে অগ্রসর হন। অপরের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

—বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা থাকলে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষু হব কেন?

—পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করা সহজ। ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করা কঠিনতর। ত্যাগ করবেন কি তৃপ্ত করবেন তা শুধু আপনার সিদ্ধান্তনির্ভর। তবে ভিক্ষু বুদ্ধযশা! এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি—বিবাহিত জীবনকে অত ঘৃণার চক্ষে দেখবেন না। স্বয়ং মহাকারুণিক তথাগত বিবাহিত জীবনের

উত্তরণেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, নিব্বাণলাভ করেছিলেন। মহাজনকের অপেক্ষা সীবলীর তপস্যাকে কোন কারণেই হেয় করা চলে না।

বোধিসত্ত্ব মহাজনক ছিলেন মিথিলার নৃপতি। রাজমহিষী সীবলীকে ত্যাগ করে যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তখন অবমানিতা পরিত্যক্তা পট্টমহিষীও কঠিন তপস্যায় বৃতা হয়েছিলেন। অভিমানিনী রাজমহিষীর তপশ্চারণের একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিল—সন্ন্যাসী মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা! মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন—ফলে তাঁর সন্তান হওয়ার অর্থ তাঁর ব্রতচ্যুতি, ধর্মচ্যুতি; কিন্তু রাজমহিষীর বক্তব্যও ছিল সহজ সরল : সন্তানবতী হওয়াও নারীর ধর্ম—তাঁর ধর্মাচরণে বাধাসৃষ্টির অধিকারও নেই মহাসন্ন্যাসী বোধিসত্ত্বের। আশ্চর্য কাহিনী! সাধনায় উভয়ে সফলকাম হন। সেজন্মে নয়, বহুতর পরজন্মে। মহাজনক জন্মগ্রহণ করেন কপিলবস্তুতে, শাক্যকুলে, শাক্যসিংহরূপে। সীবলী সে জন্মে আবির্ভূতা হলেন সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরার মূর্তি পরিগ্রহ করে। এই নবজন্মে মহাজনক গৌতম-বুদ্ধরূপে মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন বটে, কিন্তু মাতৃস্বরূপিনী সীবলীর মাতৃত্বের দাবি পুরোপুরি মিটিয়ে দেবার পূর্বে নয়। মহাভিক্ষু রাহুল মহাভিক্ষুণী সীবলীর তপস্যার ফলশ্রুতি!

অক্ষুমতীর উপহারটি প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে ভিক্ষু বুদ্ধযশা নিরন্তর অন্তরবেদনায় পীড়িত। এর পরেও অক্ষুমতী ও শ্রবণা যথারীতি উপস্থিত হত সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায়; কিন্তু অক্ষুমতী ভিক্ষুকে সম্বোধন করে আর কোনদিন কোন কথা বলেনি। এজন্যও মর্মাহত হয়েছিলেন বুদ্ধযশা।

এরপর কুমারজীব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কুমারজীবকে বিদায় জানাতে এল কাশগড়ের আপামর জনসাধারণ। স্বয়ং মহারাজ ভদ্দদেব এবং কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্ত। এই সময় সহসা বুদ্ধযশা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনিও ওঁদের অনুগমন করবেন। ভিক্ষুর পক্ষে একস্থলে দীর্ঘদিন অবস্থান করা বাঞ্ছনীয় নয়—তাতে স্থানীয় মমত্ববোধ জন্মে, ভিক্ষু পরিব্রাজককে নিরাসক্ত থাকতে হয়। বুদ্ধযশা দুই বৎসর আছেন শৈলদেশে, সুতরাং তাঁর এই সংকল্পকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করলেন শৈলদেশরাজ ভদ্দদেব। মহাসমারোহে তাঁদের বিদায় জ্ঞাপন করে গেল শৈলদেশবাসীরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত অনুগমন করে।

এই প্রত্যাবর্তনের পথে—চৈনিকসূত্রে-প্রাপ্ত ইতিহাসে জানা যায়, কুমারজীব প্রথমে 'ওয়েন-সু'-র রাজ্যে উপনীত হন। 'ওয়েন-সু'-র সংস্কৃত নাম 'উচ্চ-তুরফান'। এখানে কুমারজীব তাও-পন্থী এক চৈনিক মহাপণ্ডিতকে তর্কে পরাভূত করে তাঁকে স্বধর্মে ও সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন বলেও চৈনিক ইতিহাসে লিখিত আছে। কুচীরাজ পো-সাঙ স্বয়ং এই তর্ক মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভান্তে অর্হৎ কুমারজীবকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তার পূর্বে এই প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু ঘটনা ঘটে, যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, অথচ যা আমাদের কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য :

প্রত্যাবর্তনের পথেও দুইটি পল্যঙ্কিকা ছিল—ভিক্ষুণী জীবা ও শ্রবণার জন্য। এবার অশ্বারোহী তিনজন। বুদ্ধযশাও অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন এ পথ। কুমারজীব সর্বক্ষণই জননীর পল্যঙ্কিকার সন্নিধানে ধীরগতিতে অশ্বচালনা করতেন; অপর পক্ষে প্রতিদিনই অপর দুইজন অশ্বারোহী ক্রমশই পদাতিকদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতেন। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জন পার্বত্য-পথে দুজনের মধ্যে কথোপকথন অপরিহার্য এবং প্রত্যাশিত হয়ে পড়ে। মুক্ত প্রকৃতিরও একটি মোহজাল বিস্তারের ক্ষমতা আছে—বদ্ধপ্রাচীরের চতুঃসীমায় যে সঙ্কীর্ণতা মানুষের মনটাকে শম্বুকবৃত্তিতে প্ররোচিত করে—ধ্যানগম্ভীর তুষারমৌলী পর্বতের ভুজঙ্গপ্রয়াত-পথে নিঃসীম নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে মনের সেই অর্গল আপনিই উম্মোচিত হয়ে যায়। প্রথম সুযোগেই তাই বুদ্ধযশা সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। প্রথম দিন আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলাম আমি। আমাকে মার্জনা করবেন।

ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা অক্ষুমতী বলে, একথা কেন বলছেন ভদন্ত ?

—আপনি সেদিন যথার্থ কথাই বলেছিলেন। ভিক্ষু হিসাবে দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নেই, ছিল না।

অক্ষুমতী নীরবে অশ্বচালনা করতে থাকে। বুদ্ধযশা পুনরায় বলেন, আপনি কি আমাকে মার্জনা করতে পারেন না?

—বারম্বার মার্জনার প্রসঙ্গ তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি সব দিক থেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন। এতে আমার অপরাধ হয়।

—তাহলে আপনি যে সেদিনের সেই তিক্ত স্মৃতিটুকু স্মরণে রাখেননি, তার প্রমাণস্বরূপ সেই পশমোত্তরীয়টি আমাকে দান করুন। আপনার সে শ্রদ্ধার দান—

দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী অস্ফুটে বলে, মার্জনা করবেন মহাভাগ। তা হবার নয়, হয়তো আপনিই সেদিন যথার্থ কথা বলেছিলেন। দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আপনার যেমন ছিল না, তেমনি দান করবার অধিকারও ছিল না আমার।

বিস্মিত ভিক্ষু বলেন, এ কথা কেন বলছেন রাজনন্দিনী?

—মহাভিক্ষুকে দান করতে হলে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তেই তা করতে হয়।

—আমাকে কি আপনি শ্রদ্ধা করতে পারছেন না? সেটাই কি বাধা?

একটু নীরব থাকেন অক্ষুমতী। তারপর বলেন, না, অনৃতভাষণ করতে পারব না। হয়তো শ্রদ্ধার অতিরিক্ত আর কিছু সেদিন আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল আপনার জন্য ঐ কারুকার্যখচিত উত্তরীয়টি রচনায়। বাধা যে কোথায় তা আমি ব্যক্ত করতে পারব না। সে কথা প্রকাশে বাধা আছে। মহাভাগ, আমাকে মার্জনা করবেন।

মূক হয়ে যেতে হয়েছিল ভিক্ষুকে।

কিন্তু মূক হয়ে তো প্রতিদিন পথ অতিক্রম করা যায় না। তাই এ প্রসঙ্গ সুকৌশলে এড়িয়ে দুজনেই অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। নানান গল্প—বাল্যের, কৈশোরের, নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। অবশিষ্ট যাত্রীদল অধিক দূরে পিছিয়ে পড়েছে মনে হলে ওঁরা পথপার্শ্বে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসেন। অশ্ব দুটিকে বন্ধনমুক্ত করে অপেক্ষা করেন। একদিন সেইরকম মধ্যাহ্ন অবকাশে অক্ষুমতী তার পৃষ্ঠে আবদ্ধ পেটিকা থেকে কয়েকটি খর্জুর ও পৌলিক-পিষ্টক বাহির করে দিতে গেল ভিক্ষুকে। বুদ্ধযশা হেসে বললেন, এই জনমানবহীন দেশে পৌলিক-পিষ্টক কোথায় পেলেন?

কটাক্ষ করে অক্ষুমতী বলে, প্রশ্নটা অবৈধ—'রাজারা মাণিক্য কোথায় পায়' এ প্রশ্নের মতো।

ভিক্ষু বলেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক হতে পারেন, কিন্তু এজাতীয় রাজভোগ্য বস্তুতে আমি ক্রমশ না অভ্যস্ত হয়ে যাই, আশঙ্কা সেটাই।

অক্ষুমতী বলে, অভ্যস্ত হলেই বা ক্ষতি কী? সামান্য কয়েকটি পৌলিক-পিষ্টক প্রতিদিন আপনার সেবায় অর্পণ করার মতো ক্ষমতা আছে কুচীরাজনন্দিনীর। যতদিন কুচীতে থাকবেন, ততদিন না হয় এ দায়িত্ব আমিই নিলাম।

—কিন্তু কুচী নগরীতে চিরস্থায়ী বসবাসের কোন বাসনা তো আমার নেই!

—থাকলেই বা ক্ষতি কী? কুচী এক অপরূপ শৈলনগরী। একজন্ম বাসে তার মাধুর্য ম্লান হওয়ার নয়।

ভিক্ষু বলেন, সেটাই তো আমার আশঙ্কা রাজকুমারী। আমিও না শেষ পর্যন্ত আমার পিতামহ কুমারায়ণের মতো কুচীতেই বন্দী হয়ে পড়ি।

অক্ষুমতী বলে, এখানে কিন্তু ভুল হল আপনার। ভিক্ষু কুমারায়ণ কুচীতে আদৌ বন্দী হননি—এখানে এসে তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন।

—কিন্তু উপসম্পদা নেওয়া হয়নি তাঁর!

—তাতে কি ? লক্ষ ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন—ইতিহাস তাঁদের স্মরণে রাখবে না; কিন্তু ভিক্ষু কুমারায়ণ চিরজীবী হয়ে থাকবেন ইতিহাসে—নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিভায় তো বটেই তদ্ভিন্ন শুধুমাত্র মহাস্থবির 'কুমারজীবের জনক' এই পরিচয়ে।

—কিন্তু ইতিহাসে শাশ্বত আসনলাভই তো মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয় কুমার ভট্টারিকা। পরম লক্ষ্য 'নিব্বাণ', তথাগতের আশীর্বাদলাভ।

অক্ষুমতী বলে, রাজা শুদ্ধোদন উপসম্পদা গ্রহণ করেননি, তবু অন্তিমকালে গোতম দিব্যদেহে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশীর্বাদে ধন্য করেছিলেন তাঁকে। তথাগতের গর্ভধারিণী মায়া দেবী ভিক্ষুণী ছিলেন না, তবু তাঁকে সদ্ধম্মের বাণী শোনাতে গোতমকে জীবদ্দশায় সশরীরে ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে যেতে হয়েছিল, নয় কি ?

ভিক্ষু বলেন, আপনার সঙ্গে তর্কে জয়লাভ সম্ভবপর নয়, কুমার ভট্টারিকা।

অক্ষুমতী সলজ্জে বলে, আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

সহসা চমকিত হন ভিক্ষু। আত্মস্থ হন। বলেন, মার্জনা করবেন রাজকন্যা, সে আমি পারব না।

অক্ষুমতী জানতে চায় তার হেতুটা; কিন্তু তৎপূর্বেই পর্বতান্তরালের পথে দেখা গেল পল্যঙ্কিকাবাহীরা আবির্ভূত হয়েছে।

তারপর একদিন। সেদিনও প্রত্যূষে ওঁরা দুজন অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছেন। বেলা দ্বিপ্রহর। খাদ্যদ্রব্যাদি পশ্চাৎবর্তীদের নিকট গচ্ছিত আছে। অগত্যা ওঁরা দুইজন সেই জনশূন্য পথের প্রান্তে বসে পড়েন—যথেষ্ট দূরত্ব রচনা করে। অশ্বদুটিকে যথারীতি বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন। ক্লান্তদেহে দুজনে প্রস্তরশয্যায় উপবেশন করেছেন কি করেননি—প্রবলবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠল ভূলোক-দ্যুলোক। পরমুহূর্তেই দিগন্ত প্রকম্পিত করে এক প্রচণ্ড সিংহনাদ শ্রুত হল—যেন পর্বতের আত্মা মথিত করে লক্ষকোটি প্রেতযোনি শতাব্দীর রুদ্ধ হাহাকারকে মুহূর্তে মুক্তি দিল। বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড সশব্দে পর্বতচূড়া থেকে ভীমবেগে নিম্নগামী। ভূকম্পন! অক্ষুমতী দণ্ডায়মান হবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করে। ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে সবেগে লুটিয়ে পড়ছিল খাদে, কালবিলম্ব না করে ভিক্ষু বুদ্ধযশা উঠে দাঁড়ালেন এবং সবলে আলিঙ্গন করে ধরলেন বেপথুমান নারীদেহ। বললেন, দাঁড়াবার চেষ্টা করো না অক্ষুমতী। ভূমিকম্প হচ্ছে।

অক্ষুমতীর সমস্ত মুখাবয়বে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। প্রকৃতির এই ভীষণারূপ সে কখনও দেখে নাই। নিশ্ছিদ্র পাষাণগাত্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভীমবেগে প্রস্তরচূর্ণ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পরমুহূর্তেই পাতালস্পর্শী খাদের দিকে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে। কর্ণপটাহবিদারী ভয়ঙ্করী শব্দে সমস্ত আকাশবাতাস দলিত-মথিত। যেন পাতালবাসী বন্ধনমুক্ত লক্ষ-শীর্ষ নাগিনী তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ধেয়ে আসছে।

সময়ের পরিমাপ নিশ্চিহ্ন। সম্বিৎ ফিরে এল যখন, তখন অক্ষুমতী অনুভব করল সে ভিক্ষু বুদ্ধযশার কবাটবক্ষে দৃঢ়আবদ্ধ। মুহূর্তের তাণ্ডবনৃত্য সমাপ্ত করে উন্মাদিনী পৃথিবী আবার শান্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বুদ্ধযশা ওকে শুইয়ে দেন ভূশয্যায়। বলেন, তোমার আঘাত লাগেনি তো কোনও?

কী প্রত্যুত্তর করবে অক্ষুমতী? দেহে তার কোন আঘাত লাগেনি—কিন্তু হৃদয়ে? মুহূর্তমধ্যে এ কী কাণ্ড হয়ে গেল!

ভিক্ষু চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, সমস্ত ভূ-প্রকৃতিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পার্বত্য পথটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তাই তো! তাহলে কুমারজীব কেমন করে এখানে এসে পৌঁছাবেন? পথরেখা যদি না থাকে তাহলে কেমন করে ওঁরা মিলিত হবেন অবশিষ্ট দলের সঙ্গে? দুরন্ত ভয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন অক্ষুমতী। ভিক্ষু এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। বলেন, আপনি বিচলিতা হবেন না রাজকুমারী। আমি তো রয়েছি। ব্যবস্থা কিছু হবেই। কুচী নগরী এখান থেকে এক দিনের পথ মাত্র। আমরা কল্য সন্ধ্যাকালের মধ্যে সেখানে নিশ্চয়ই উপনীত হব। ওঁরাও কোনও ঘুরপথে সেখানে উপনীত হবেন। আসুন, দিবাভাগে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়—

অশ্ব দুটি ? তাদের চিহ্নমাত্র নাই। বন্ধনমুক্ত অশ্বদ্বয় যে স্থানে বিচরণ করছিল সে স্থানটায় একটা অতলস্পর্শী গহ্বর।

কাহিনী দীর্ঘতর করা নিষ্প্রয়োজন। সেই উপলবন্ধুর পার্বত্যপথে ভিক্ষু বুদ্ধযশা অগ্রসর হতে থাকেন তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে। নারীদেহ স্পর্শ করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা ছিল অনায়াসে বিসর্জন দিলেন তা। দুরতিক্রম্য বহুস্থানে সযত্নে অক্ষুমতীর পদ্মকোরকতুল্য হস্তধারণপূর্বক অগসর হতে থাকেন।

ক্রমে ঘনীভূত হল সন্ধ্যার অন্ধকার। ভিক্ষু বললেন, এখন কৃষ্ণপক্ষ। তাছাড়া রাত্রে দুরন্ত শীত পড়বে। তুষারপাতও হতে পারে। সূর্যালোক স্তিমিত হওয়ার পূর্বেই রাত্রের জন্য কোন নিরাপদ পার্বত্যগুম্ফা অন্বেষণ করে নেওয়া ভাল।

সূর্যাস্তের পূর্বেই অমন একটি পার্বত্যগুম্ফা পাওয়া গেল। আশ্চর্য! সে গুহার ভিতর মনুষ্যবাসের চিহ্ন বিদ্যমান। ভিতরে একটি হরিণচর্মের অজিনাসন, একটি কমণ্ডলু, যষ্টি এবং দু'একটি মৃত্তিকা নির্মিত তৈজস—এক পার্শ্বে একটি নাতিবৃহৎ মৃৎপাত্রে পানীয় জল পর্যন্ত সঞ্চিত—এমন কি একটি অগ্নিকুণ্ডে স্তিমিত অগ্নির চিহ্নও বর্তমান। গৃহস্বামী অনুপস্থিত। ভিক্ষু বুদ্ধযশা বলেন, তথাগতের অসীম করুণা। এ গুহা সন্দেহাতীতরূপে কোন নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—কোন্ ধর্মাবলম্বী জানি না, কিন্তু অতিথি সৎকারে তিনি পরাঙ্মুখও হবেন না নিশ্চয়।

তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব-সম্ভাবনায় অক্ষুমতীও উৎফুল্ল হয়। বস্তুত সম্পূর্ণ নির্জনে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে একই গুম্ফায় রাত্রিযাপনে সে সাহস পাচ্ছিল না। সীবলীই কি তৃপ্ত হত সেজন্মে ব্রাত্য-সন্ন্যাসী মহাজনকের সন্তান গর্ভে ধারণে সক্ষম হলে?

বুদ্ধাযশা কিছু শুষ্ককাঠ সংগ্রহ করে আনেন—রাত্রে শীত রোধের আয়োজন।

ইতিমধ্যে অক্ষুমতী অজ্ঞাত গৃহস্থের রত্নভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করে দেখেছে। উদ্ধার করেছে কয়েকমুষ্টি চণক, গোধুম ও চিপিটক, গুটিদশেক শুষ্ক খর্জুর। লুণ্ঠিত সম্পদ সে নিয়ে আসে বুদ্ধযশার সম্মুখে। বলে, মহাভাগ, মূঢ়মতী নারী আপনার নিকট শাস্ত্রীয় বিধান সন্ধানে সমাগত। বিধান দিন, গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার্ত অতিথির পক্ষে কি তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করার অধিকার ন্যায়সঙ্গত?

ভিক্ষু বলেন, ন্যায়সঙ্গত। অতিথি যদি নারী হয়। বিশেষ, যদি রাজনন্দিনী হয়।

কিন্তু সেই রাজনন্দিনী যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে, তার সঙ্গীকে ক্ষুধার্ত রেখে সে একাকী কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে না?

হাসেন ভিক্ষু। বলেন, সেক্ষেত্রে গৃহস্থের জন্য কিছু আহার্য অবশিষ্ট রেখে অতিথিরা আত্মসৎকার করতে পারে। রাজধানী এস্থল থেকে এক দিবসের পথ। যে ঋণ আমরা গ্রহণ করছি তা কল্যই পরিশোধ করতে পারব।

সুতরাং সম্পূর্ণ উপবাস করতে হল না। ভিক্ষু বললেন, একটা কথা। এস্থলে বন্যজন্তু আছে। দেখুন, সন্ন্যাসী গুহামুখ বন্ধ করার জন্য একটি কপাটও নির্মাণ করেছেন।

অক্ষুমতী বলে, হয়তো শীত নিবারণের জন্যই এ আয়োজন।

—সম্ভবত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ কবাটটি ভিতর হতে অর্গলবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকত না। এ সন্ন্যাসীর গৃহে এমন কিছু নেই যে, তস্করাদির জন্য এ সাবধানতা অবলম্বন করবেন তিনি।

ঘনীভূত হল রাত্রি। বাহিরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু নির্মেঘ আকাশে অতন্দ্র প্রহরায় লক্ষ লক্ষ তারকা। যেন এ কোন পার্বত্য গুম্ফা নয়—এ কোন নির্জন বাসর-শয্যা। নায়ক ও নায়িকা কীভাবে তাদের প্রথম পুষ্পহীন ফুলশয্যা-রাত্রি উৎযাপন করে, সেই বারতার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দিব্যাঙ্গনা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষারতা। স্বাতী, শ্রবণা, চিত্রা, রেবতী, অরুন্ধতী—সব্বাই!

অক্ষুমতী নানা ক্ষাত্রবিদ্যায় অভ্যস্তা, তবু আজকের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

ভিক্ষু বললেন, রাজকুমারী, আমার আশঙ্কা হচ্ছে সন্ন্যাসী ভূকম্পনের সময়ে বাহিরে ছিলেন এবং তিনি দুর্ঘটনায় নিহত। নাহলে এই শীতে এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত তিনি বাহিরে থাকতেন না।

এ আশঙ্কা অক্ষুমতীরও হয়েছিল। বললে, এই অন্ধকারে তাঁর অন্বেষণ করবার চেষ্টা নিরর্থক। নিশাবসানে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে। এবার আমরা বরং শয়নের আয়োজন করি। আমার পৃষ্ঠসংলগ্ন পেটিকায় সেই উত্তরীয়টি আছে। আমি সেইটি প্রস্তরশয্যায় বিছিয়ে নিই; আপনি সন্ন্যাসীর ঐ মৃগচর্মটি গ্রহণ করুন।

বুদ্ধযশা অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাষ্ঠ নিক্ষেপণে ব্যস্ত ছিলেন। অক্ষুমতীর দিকে দৃকপাত না করে বলেন, না। এ গুহার ভিতর আপনি একাকীই শয়ন করবেন। আমি গুহামুখে ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকব।

—সে কি ! ওখানে শয়নের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থানই তো নাই।

—না থাক, উপবেশনের পক্ষে প্রকোষ্ঠটি যথেষ্ট।

—কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনি গুহামধ্যে রাত্রিবাস করলে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

ভিক্ষু নীরবে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করে চলেন। প্রত্যুত্তর করেন না। অক্ষুমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকে ভিক্ষুকে। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, মহাভাগ, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন—জানি, নারী নরকের দ্বার, কিন্তু নারী হলেও আমি মানুষ! শপথ করছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার গাত্রস্পর্শ করব না।

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ভিক্ষু বুদ্ধযশা। বলেন, ক্ষান্ত হও অক্ষুমতী। এভাবে অপমান করো না আমাকে !

—অপমান! আমি? আপনাকে ? কী বলছেন আপনি?

—তুমি কি করে ভাবতে পারলে—আমি তোমাকে অত নীচ ভাবি?

—তাহলে গুম্ফার ভিতর রাত্রিযাপনে আপনার আপত্তি কোথায়?

অধোবদন হন বুদ্ধযশা। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুটে বলেন, তোমাকে নয় অক্ষুমতী, আমি নিজেকেই আজ বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণটা ঐ একই। ভিক্ষু হলেও আমি মানুষ।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে ভূশয্যায় বসে পড়ে অক্ষুমতী। এর কী প্রত্যুত্তর?

লাজকুণ্ঠিতা ঐ অপরূপ রূপবতীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভিক্ষু। সান্ত্বনা দিতে ওর মস্তকে হাতখানি রাখতেও সাহস পান না। আত্মগতভাবে অস্ফুটে বলেন, আমাকে মার্জনা কর, অক্ষুমতী। আমাকে বাহিরেই রাত্রিযাপন করতে হবে। নাহলে হয়তো ভিক্ষু কুমারায়ণের মতো আমাকেও .....

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি দ্রুতগতি গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

পাষাণচত্বরে লুটিয়ে পড়ে মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী। উচ্ছ্বসিত রোদনে সিক্ত হয়ে যায় সে পাষাণ-কুট্টিম। তারপর উঠে বসে। উপায় নেই। এ কথার পর সে নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ করে দেয় পার্বত্যগুম্ফার একমাত্র দ্বার।

একদণ্ড পূর্বে ক্লান্তিতে তার আঁখিপল্লব নিমীলিত হয়ে আসছিল। এখন কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা এল না। অগ্নিকুণ্ডের সান্নিধ্যে উষ্ণ গুহাভ্যন্তরে সে নিশ্চিন্ত, অথচ দুরন্ত শীতে ঐ মুমুক্ষু একা বসে আছেন গুহাদ্বারে। অনেক রাত্রে সে গুহাদ্বার উন্মোচন করে বাহিরে আসে। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রহর গণনা করছে। গুহাদ্বারের এক প্রান্তে পাষাণগাত্রে দেহভার ন্যস্ত করে আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় ভিক্ষু বুদ্ধযশা গাঢ় নিদ্রাভিভূত। করুণায়, মমতায় আপ্লুত হয়ে গেল অক্ষুমতীর অন্তঃকরণ। আর দ্বিধা নাই; অসঙ্কোচে সে একটি রক্তশতদলখচিত পশম উত্তরীয় জড়িয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষটির অঙ্গে। আর কিসের সঙ্কোচ ? উনি তো নিজমুখেই স্বীকার করেছেন—উনি শুধু ভিক্ষু নন, উনি মানুষ। অস্ফুটে

মন্ত্রোচ্চারণের মত অক্ষুমতী মনে মনে বলে, ঘুমাও তরুণ তাপস! এ হৃদয় যদি শতছিন্ন হয়ে যায় তবু মালিন্য লাগতে দেব না তোমার সংযমে। আমি ডাকব না তোমাকে, শুধু প্রতীক্ষা করব।

তারপর ফিরে আসে গুহাভ্যন্তরে। কটিবন্ধের তরবারিটি খুলে ফেলে। উন্মুক্ত করে বক্ষাবরণ লৌহজালিক। শয়নের পূর্বে সে সচরাচর উন্মুক্ত করে দেয় রেশমের বক্ষাবরণ কঞ্চুকগ্রন্থী, কিন্তু আজ করল না। মৃগচর্মটি অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে এনে শয়ন করে প্রস্তর-শয্যায়।....

এ সকল কথাই অক্ষুমতী অকপটে বর্ণনা করেছিল তার প্রিয়সখী শ্রবণার নিকট, কুচী নগরীতে পুনর্মিলনের পরে। সব, সব কথা। শুধু তাই নয়—সে-রাত্রে যে অদ্ভুত অবৈধ স্বপ্নটা দেখেছিল, সবিস্তারে সেকথাও বর্ণনা করেছিল। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন অবৈধ, অশালীন হলে স্বপ্নদ্রষ্টার অপরাধ কোথায়? গ্রহাচার্যকে প্রশ্ন করলে তিনি হয়তো এ স্বপ্নমঙ্গলের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? এ স্বপ্ন যে নিতান্ত অশ্লীল। বস্তুত স্বপ্নকাহিনীর একটি পর্যায় সে তার প্রিয় সখীকেও ব্যক্ত করতে পারেনি। তার কার্যকারণ সম্পর্ক সে যে নিজেই অনুধাবন করতে পারেনি। স্বপ্ন কি এভাবে বাস্তব প্রমাণ রেখে যেতে পারে?

অক্ষুমতী সেরাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল—গভীর রাত্রে কে যেন তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্মম বাহুবন্ধের নিষ্পেষণে ওর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। স্বপ্ন যদিচ, তবু ওর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রথমটায় তার বিশ্বাসই হয়নি—যার দৃঢ় আলিঙ্গনে সে আশ্লেষশয়নে আবদ্ধ, তিনি—তিনিই! কিন্তু পরমুহূর্তেই কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে সে সন্দেহাতীতরূপে শনাক্ত করে ফেলে তাঁকে—সেই ঘননীল চক্ষুদ্বয়, উন্নত নাসা, মুণ্ডিতমস্তক, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। সেই তিনি—যিনি নিজমুখে স্বীকার করেছিলেন, তিনি শুধু ভিক্ষু নন, তিনি মানুষ।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কী একটা কথা বলতে যায় অক্ষুমতী। পারে না। কারণ পরমুহূর্তেই —কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! তিনি ওর মুখচুম্বন করলেন। সে যেন অনন্তকাল ... বক্ষপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হতে চায় ..... বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে বসতে গেল। পারল না। পরমুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তা অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! কল্পনাতীত ! তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধযশা নির্মমহস্তে উন্মোচন করে দিলেন ওর বক্ষবন্ধনী। গ্রন্থিমুক্ত হল অনুরাগরক্তিম রেশম কঞ্চুলিকা! তখনও পূর্ণ জ্ঞান আছে অক্ষুমতীর। নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ঈষদালোকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল—ভিক্ষু বুদ্ধযশা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন তার নিরাবরণ চন্দনকুম্‌কুম্‌চর্চিত বক্ষের দিকে। থর থর কর কেঁপে উঠল রত্যাতুরা অক্ষুমতী! সে আনন্দশিহরণে ভূকম্পনস্পন্দিত যুগল ভূধরের ন্যায় বেপথুমান হল ওর তনুতে অতনুর যুগ্মজয়স্তূপ! সেই মুহূর্তেই জ্ঞান হারালো রাজনন্দিনী।

নিঃসন্দেহে এ এক অবৈধ, অশালীন, অশ্লীল স্বপ্ন। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধযশার পক্ষে নিদ্রাভিভূতা অসহায়া এক অনাঘ্রাতা ষোড়শীকে আক্রমণ করা অসম্ভব! তদুপরি তার মুখচুম্বন করা, তাকে বিবস্ত্রা করা দুঃস্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু স্বপ্ন যদি দুঃস্বপ্ন না হয়! পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে অক্ষুমতী দেখেছিল—সে যথারীতি মৃগচর্মাসনে একাকী শায়িতা। গুহাদ্বারের কপাট উন্মুক্ত নয় এবং ভিক্ষু বুদ্ধযশা বাহিরের পাষাণচত্বরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সুতরাং দুঃস্বপ্নই হোক আর বঞ্চিতা নারীর সুখস্বপ্নই হোক, এ শুধু স্বপ্নই—মায়া, মতিভ্রম, উপেক্ষিতা পূর্ণযৌবনা রমণীর অন্তর-কামনার এক তির্যক পরিতৃপ্তি। ওর জাগরমন যে চিন্তাটিকে অস্বীকার করতে চায়, অবচেতনের বিদ্রোহে স্বপ্নরাজ্যে এ বোধ করি তার এক বঙ্কিম পরিতুষ্টি। শুধু অক্ষুমতী নয়, প্রিয়সখীর কাছে স্বপ্নমঙ্গলকথা আদ্যন্ত শ্রবণ করে শ্রবণাও সেই সিদ্ধান্তে এসেছিল।

কিন্তু!

যেকথা 'পিয়সহি'র নিকটেও স্বীকার করতে পারেনি অক্ষুমতী, তার কী অর্থ? কী তার ব্যাখ্যা? সে যে এক পরম বিস্ময়। চরম রহস্যঘন। স্বপ্ন কখনও এমন বাস্তব প্রমাণের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়?

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে অক্ষুমতী দেখেছিল—তার উন্মোচিতগ্রন্থি রেশমবস্ত্রের বক্ষাবরণ কঞ্চুকটি নিদারুণ লজ্জায় ওর চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিতা।

তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত!

মদনোৎসবের প্রমত্ত কলকোলাহলকে পিছনে রেখে অপরাহ্নবেলায় একজন তরুণবয়স্ক অশ্বারোহী আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে নির্জন পার্বত্যপথে অশ্বারোহণে চলেছিলেন উত্তরাভিমুখে। অশ্বারোহীর অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, বক্ষে লৌহজালিক, পৃষ্ঠে তূণীর, বামস্কন্ধে রণশার্ঙ্গ, মস্তকে উষ্ণীষ—কিন্তু মুখাবয়বের উপর একটি মুখোশ। পথচারীরা এজন্য আদৌ বিস্মিত নয়; কারণ আজ মদনোৎসব—বাসন্তী পূর্ণিমা। এ উৎসবে কী পুরুষ কী নারী সকলেই উষ্ট্রচর্ম-নির্মিত মুখোশে একদিনের জন্য আত্মগোপন করে। সূর্যোদয়ে উৎসবের আরম্ভ, সূর্যাস্তে পরিসমাপ্তি। সমস্ত দিনমান কুম্‌কুমে-ফাগে, আবীরে-গুলালে পরস্পরকে ওরা রাঙায়; কিন্তু পরস্পরের পরিচয় পায় না। এ রীতি বোধকরি রোমক সভ্যতার নিকট থেকে মধ্য এশিয়ার পথে এই পার্বত্য জনপদে সমাগত। মদনোৎসবের রতিরঙ্গে উচ্চনীচ ভেদ নাই—অনূঢ়া, বিবাহিতা এবং বিধবাদিগের এ উৎসবে যোগদানের সমান সামাজিক অধিকার—প্রাপ্তযৌবনই এ রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। অনুরূপভাবে পুরুষদিগেরও ঐ একই ছাড়পত্র—কুমার, বিবাহিত অথবা মৃতপত্নী। পরস্পরের পরিচয়দান যদিও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তবু দুর্জনে বলে—গোপন প্রেমিক-প্রেমিকা এই একটি দিবসে অবৈধ প্রেমের আসরে পরস্পরকে পূর্বেই বেশবাসের সঙ্কেত জানায়, কোথায় কোন দণ্ডে প্রতীক্ষায় থাকবে তা জ্ঞাপন করে। রাজাবরোধের বিবাহিত বহু সম্ভ্রান্ত পুরললনাও তাদের প্রাক্‌বিবাহজীবনের প্রেমাস্পদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে—একটি দিন অতীত স্মৃতির রোমন্থনে অতিবাহিত করে। সমাজ ওদের অবদমিত কামের ক্ষণিক তৃপ্তি স্বীকার করে নেয়। দিবাবসানে যে যার চিহ্নিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্য, অদ্ভুত উৎসব!

পাকদণ্ডী পথে আমরা যে তরুণ অশ্বারোহীকে দেখছি, মুখোশের জন্য তাঁকে শনাক্ত করা যায় না বটে, তবে জনান্তিকে পাঠককে জানিয়ে রাখতে পারি, তিনি এ কাহিনীর নায়িকা—ছদ্মবেশী রাজনন্দিনী অক্ষুমতী। মদনমন্দির প্রাঙ্গণের নৃত্যগীত উৎসবে মন্দভাগিনী তৃপ্ত হতে পারেনি। অনুষ্ঠানে নানা দেশের সুপুরুষ তরুণ সমাগত—কুঞ্জে কুঞ্জে বিতানে বিতানে যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা; মদনমন্দির কুট্টিমে নৃত্যগীতের নিরবচ্ছিন্ন আসর। মদিরার স্রোতে মন্দির-সোপান পিচ্ছিল। বাতাসে ভাসমান অনুরাগরক্তিম আবীর। কিন্তু এ আনন্দ উৎসবে অক্ষুমতী অন্তর থেকে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর গুপ্তচর গোপনে সংবাদ এনেছে—'তিনি' এ উৎসবে আদৌ আসেননি!

রাজপুত্রী ইচ্ছা করেই পুরুষের ছদ্মবেশে মদনোৎসবে এসেছিলেন—যাতে অপরিচিত কোনও রসলোভী ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বেশ অনুভব করেন—প্রতিযোগী রাজপুত্রেরা রাজনন্দিনীর সন্ধানে সারা দিনমান কিভাবে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল।

অপরাহ্নবেলায় শ্রবণার কর্ণমূলে রাজকন্যা নিবেদন করলেন—গোপনে তিনি মদনোৎসব প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে যাচ্ছেন।

শ্রবণা অস্ফুটে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে পিহ্‌সহি? তিনি কোথায় জেনেছ?

—জেনেছি। মহাথের-এর সঙ্গে তিনি অতি প্রত্যূষে অশ্বারোহণে খ্যিজিল সঙ্ঘারামে যাত্রা করেছেন।

—খ্যিজিল সঙ্ঘারাম! মহাস্থবিরের সঙ্গে? সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই বা কী বলবে?

—কিছু বলব না। শুধু তাঁর পদপ্রান্তে একমুঠো আবীর নামিয়ে দেব।

—যদি তিনি প্রশ্ন করেন—এর অর্থ কী?

—বলব—তিনি ভিক্ষু হলেও মানুষ!

খ্যিজিল সঙ্ঘারাম কুচী নগরীর এক যোজন উত্তরে। বিগত শতাব্দীতে অধ্যাপক স্টাইন যে খ্যিজিল সঙ্ঘারাম আবিষ্কার করেছেন সেটি তখনও অজাত। সেই অপূর্ব পার্বত্যগুম্ফার ভাস্কর্য-স্থাপত্য এবং অজন্তা শৈলীর অনুকরণে বিচিত্র প্রাচীরচিত্র তখনও জন্মলাভ করেনি। সেখানে প্রথম গুহামন্দিরটি কুচীরাজ্যের অর্থানুকূল্যে এবং মহাস্থবির কুমারজীবের শিল্পনির্দেশে সবেমাত্র উৎকীর্ণ করা হয়েছে। একটিমাত্র গুহাচৈত্য, যার স্তূপটি উৎকীর্ণ, বহির্দ্বারের কারুকার্য অসম্পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি—শতাধিক বৌদ্ধ শিল্পী ও ভাস্কর নিরলস পরিশ্রমে সেটি রূপায়িত করেছেন। মহাস্থবির সপ্তাহে একদিন সে কার্য পরিদর্শনে যান। যেমন আজ গিয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা সমভিব্যাহারে।

ক্রমে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মদনোৎসবের কলকোলাহল। কুচী নগরীর হর্ম্যরাজি। নির্জন গিরিসংকটে কদাচিৎ দু-একটি মেষচারক। ওরা এ জনপদের অন্তেবাসী। তারপর সম্পূর্ণ জনহীন পথ—শুধুমাত্র তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ অন্তরালে রেখেছে দিগন্তকে। খ্যিজিল সঙ্ঘারামের প্রবেশদ্বারে যখন উপনীত হলেন তখন সূর্য পশ্চিম পর্বতশৃঙ্গের পরপারে অবলুপ্ত। দু-একটি কৌতূহলী তারকা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। বৌদ্ধ ভাস্করের দল সমস্ত দিবসের কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত; বিশ্রাম নিয়েছেন তাঁরা। তবু একক অশ্বারোহীকে অগ্রসর হতে দেখে গুহাদ্বারে বহির্গত হয়ে আসেন পীতবসনধারী একজন বৃদ্ধ শ্রমণ। মুণ্ডিতমস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখাবয়বে প্রশান্ত বৈরাগ্যের আলিম্পন। অক্ষুমতী অশ্ব হতে অবতরণ করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণতি জানায়। বৃদ্ধ দুই হাত উত্তোলন করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

—আর্য, আমি কুচী নগরী থেকে আসছি, মহাস্থবির কুমারজীব এবং তাঁর সঙ্গী ভিক্ষু বুদ্ধযশা এখানে এসেছেন শুনলাম .....

—তাঁরা উভয়েই এখানে উপস্থিত। অদ্য রাত্রিতে এখানেই তাঁরা থাকবেন। তোমার পরিচয়?

—মার্জনা করবেন ভদন্ত ! পরিচয় প্রদানে আমি অসমর্থ!

বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মুখ মুখোশে আবৃত। সম্ভবত তুমি কুচী নগরীর মদনোৎসব প্রাঙ্গণ থেকে আসছ। সত্য কি ?

—সত্য, ভদন্ত। আমি সেই স্থান থেকেই আসছি বটে।

—কিন্তু সে উৎসবে বহু বিজাতীয় রাজপুরুষ যোগদান করেছেন বলে শুনেছি। তোমার পরিচয় না জেনে আমি কী-ভাবে—

বৃদ্ধের বাক্যটি সমাপ্ত হয় না। কারণ তৎপূর্বেই অক্ষুমতী তাঁর অনামিকা থেকে রাজ-অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি মুক্ত করে বৃদ্ধের চরণপ্রান্তে রাখে। সেটি পরীক্ষা করে বৃদ্ধ বললেন, তুমি ভিতরে যেতে পার আয়ুষ্মন।—অঙ্গুরীয়টি তিনি প্রত্যর্পণ করেন।

অশ্বটিকে উন্মুক্তস্থানে রেখে অক্ষুমতী সোপানাবলী অতিক্রম করে অলিন্দের উপর উপনীত হয়। গুহাভ্যন্তর ঈষদালোকিত। স্তম্ভের ওপ্রান্তে পিত্তলের দীপদণ্ডে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোকে গুহার অভ্যন্তরভাগ রহস্যময়। দুইজন বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখা যায়—তাঁরা মুখোমুখি বসে আছেন পদ্মাসনে। একজন বৃদ্ধ—ঈষদুচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে আছেন—সমংকায়শিরগ্রীব ভঙ্গিমায়। অক্ষুমতী তাঁকে চিনতে পারে—মহাস্থবির কুমারজীব। তাঁর সম্মুখে জোড়হস্তে যিনি সারঙ্গচর্মাসনে উপবিষ্ট তিনি ভিক্ষু বুদ্ধযশা। মহাস্থবিরের সম্মুখে একটি পুঁথি—তিনি তা থেকে কিছু পাঠ করছেন। অক্ষুমতী চতুর্দিকে দৃক্‌পাত করে। কক্ষে আর কেহ নাই। অতি সন্তর্পণে সে পাষাণগাত্রের সন্নিকট দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়। একটি স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করে। শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন দুটি মুমুক্ষুকে সে এ সময় বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক। পাঠ সমাপ্ত হলে সে আত্মঘোষণা করবে। তার বাম হস্তে একটি উষ্ট্রচর্মের থলিকা—আবীরচূর্ণে পূর্ণ।

পাঠ শেষ হল। মহাস্থবিরের দৃষ্টি এবার শ্রোতার মুখের উপর বর্ষিত হল। তিনি বললেন, হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশা! আপনার নিকট নিদান হইতে অধিকরণ শপথ পর্যন্ত অধ্যায় পাঠান্তে পারাজিক সঙ্ঘাদিবিশেষ ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে প্রথানুসারে প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ

করিয়া থাকেন স্বীকার করুন। আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ থাকেন, তবে মৌন থাকুন।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষু ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। অপাপবিদ্ধ শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি মহাস্থবিরের মুখের উপর রেখে যুক্তকরে অচঞ্চলভাবে বললেন, থের! আমি নীরব থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি পাপ করেছি কি না তা-ও জানি না। কী পাপ, কী পুণ্য তা আমার বুদ্ধিতে মূল্যায়ন করতে পারছি না। নিরন্তর আমি প্রার্থনা করছি—হে শাক্যশ্রেষ্ঠ, হে লোকজ্যেষ্ঠ, তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন কর, আমার অজ্ঞান তমসা বিদূরিত কর, সম্যক দৃষ্টি প্রদান কর—আমাকে বলে দাও, আমি পাপী কি না! কিন্তু হে ভদন্ত! আমি আজও আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাই নাই। আমি জানি না, কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে কি না!

মহাস্থবির কুমারজীব বিস্মিত, কিন্তু নির্বাক।

ভিক্ষু বুদ্ধযশা পুনরায় বলেন, মহাথের! আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি। আপনি বিধান দিন। যদি আমি পাপ করে থাকি, তবে পাতিমোক্ষ-বিধানে আমাকে কঠিনতম শাস্তি দিন! আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।

মহাস্থবির বলেন, আপনি শান্ত হন মাননীয় ভিক্ষু। আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত। যে ঘটনার জন্য আপনি অনুতাপে বিদ্ধ হচ্ছেন, তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করুন। শ্রবণান্তে আমি বিধান দেব। আমি অতঃপর কর্ণময়।

আশ্বস্ত হলেন বুদ্ধযশা। যে দুর্বহভার এতদিন একাকী বহন করছিলেন আজ তা গুরুর পদপ্রান্তে নামিয়ে দেবার অনুমতি পেয়েছেন। আর তাঁর দায় নেই। এখন মহাস্থবির যা বিধান দেন তা তিনি নতমস্তকে স্বীকার করে নেবেন।

একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করতে থাকেন উদাসীন নির্লিপ্ততায়। সে কাহিনীর শুরু কুমারজীবের কাশগড় আগমনে। সেই যেখানে তিনি রাজনন্দিনী অক্ষুমতীকে প্রথম দেখেন। নিজ চিত্তচাঞ্চল্যের কথা অকপটে স্বীকার করলেন বুদ্ধযশা। স্বীকার করলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় তাঁর মন কী-ভাবে প্রতীক্ষায় উন্মনা হয়ে যেত। বর্ণনা করলেন সেই তুষারঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত সন্ধ্যাটির কথা—কী-ভাবে তিনি সূচীশিল্পচিত্রিত উত্তরীয়টি প্রত্যাখ্যান করে বিড়ম্বিত হন—তবু তুষারপাত অস্বীকার করে অতিথিকে চৈত্যগৃহ থেকে পথে বিতাড়ন করেন। তারপর শৈলদেশ থেকে কুচী নগরীতে প্রত্যাবর্তনের বিস্তারিত দিনপঞ্জিকা। আশ্চর্য! প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে স্মৃতিপটে। অক্ষুমতীর নিকট সেই উত্তরীয়টি পুনরায় ভিক্ষা করা....অক্ষুমতীর প্রত্যাখ্যান। রাজকন্যা তাঁকে অনুরোধ করেন নাম ধরে ডাকতে ... ভিক্ষু বুদ্ধযশার প্রত্যাখ্যান! কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—বর্ণনা করলেন নিদারুণ ভূমিকম্পে অক্ষুমতী যখন অতলস্পর্শী খাদে পতিত হতে যাচ্ছিল, তখন কী-ভাবে তিনি তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, ভিক্ষু অকপটে স্বীকার করলেন—'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই খণ্ডমুহূর্তে রাজকুমারীকে বাহুবন্ধের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে আমি....হ্যাঁ স্বীকার করছি.... এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলাম। জানি না, সে আনন্দ একটি নারীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করায়, অথবা তাতে গিরিমেখলবাহুনের কোন কৌতুক মিশ্রিত ছিল কি না।

সেই ঘটনার পর থেকে আমার প্রতিনিয়ত মনে হচ্ছে—

অনিক্কসাবো কাসাবং যে বত্থং পরিদহেস্সতি।
অপতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।।[2]

পাষাণচত্বরে ঝরে পড়ল মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষুর দুই ফোঁটা অশ্রু। তিনি নীরব হলেন।

মহাস্থবির বলেন, আপনি বলে যান মাননীয় ভিক্ষু। আমি কর্ণময়।

বুদ্ধযশা এরপর বর্ণনা করেন, দিবাবসানে পার্বত্যগুহায় তাঁদের আশ্রয় নেবার কথা। অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর সঞ্চিত চণক ও চিপিটক অপহরণ করে কৌতুকময়ীর সঙ্গে তাঁর কী জাতের রসালাপ

হয়েছিল সে কথাও অকপটে বললেন। বর্ণনা করলেন, রাত্রিযাপনের পূর্বে তাঁদের কী ধরনের কথোপকথন হয়েছিল। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কথা—কেন তিনি সেই গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে স্বীকৃত হতে পারলেন না।

—অন্ধকারে লজ্জায় অনুশোচনায় মাটিতে মিশে গেল অক্ষুমতী।

—তারপর?

এরপর তরুণ ভিক্ষু যা বললেন তা আরও অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। বজ্রাহত হয়ে গেল অক্ষুমতী!

—গভীর রাত্রে একটা অস্ফুট গোঙানি শুনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। প্রথমটা কিছুই স্মরণ হল না। প্রচণ্ড শীতে এবং তুষারপাতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সহসা মনে হল, যন্ত্রণাসূচক শব্দটা গুহাভ্যন্তর থেকে আসছে। রাজকন্যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। গুহাকপাট উন্মুক্ত করে ভিতরে পদার্পণ করেই বুঝতে পারি—কী হয়েছে। নীরন্ধ্র গুহাভ্যন্তরে বায়ু গমনাগমনের দ্বিতীয় ছিদ্রপথ নেই,—আমরা তদুপরি সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করাতেই এই সর্বনাশ হয়েছে। ভূশয্যালীন রাজকন্যার নিকটস্থ হয়ে আমার নিজেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। দেখলাম—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উনি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। বাতাসের অভাবে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছে, তবু জ্বলন্ত অঙ্গারপিণ্ডে গুহাভ্যন্তর পরিদৃশ্যমান—কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয়ও হয়েছিল। রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম, গতি অতি ক্ষীণ। এক মুষ্টি বিশুদ্ধ বাতাস! নাহলে ঐ মুমূর্ষু রোগিণীর অচিরে জীবননাশ অবধারিত। তাঁকে গুহার বাহিরে আনা যায়, কিন্তু গুহাভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং বাহিরে তখন তুষারপাত শুরু হয়েছে। অমন একটি মুমূর্ষু রোগিণীকে সে অবস্থায় এ-জাতীয় উত্তাপের পরিবর্তনে নিয়ে আসাও বিপদজনক। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে ফেলে—

ভিক্ষু নীরব হলেন। মহাস্থবির যেন প্রস্তরমূর্তি। অন্তরালে অক্ষুমতীও কাষ্ঠপুত্তলী।

—অকপটে সব কথা স্বীকার করতে আমি বদ্ধপরিকর। মহাথের! আমি সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীর অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করে নিজমুখ সেস্থলে স্থাপন করলাম! ফুৎকারে তাঁর মুখমধ্যে প্রাণবায়ু সিঞ্চন করলাম। ভূকম্পনস্পন্দিত মেদিনীর মত রোগিণীর সর্বাবয়ব বেপথুমান হল। লক্ষ্য করে দেখলাম—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুকে তাঁর বক্ষ বিস্ফারিত হতে পারছে না। আমি... আমি পরমুহূর্তেই তাঁর রেশমকঞ্চুকের বন্ধনগ্রন্থি উন্মোচিত করে দিলাম....

দুই হাতে আনন আবৃত করে ভিক্ষু বুদ্ধযশা আর্তনাদ করে ওঠেন।

—তারপর?

—না। তারপর আর তাঁকে স্পর্শ করিনি। কিন্তু সে উত্তপ্ত গুহাভ্যন্তর পরিত্যাগ করে বাহিরেও আসিনি। রোগিণীর শিয়রে যাবৎপ্রভাত অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর তাঁর জীবনের আশংকা নাই, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে অনুধাবন করে আমি বাহিরে আসি এবং নিদ্রাভিভূত হই।

পুনরায় নীরব হলেন ভিক্ষু। মহাস্থবির তখনও নিরুত্তর। স্তম্ভের অন্তরালে অক্ষুমতী শুধু চোখের জলে ভাসছে। অর্থী ভিক্ষুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ মহাথের, এক্ষণে বলুন, আমি কি পাপী? পাতিমোক্ষমতে আমি কী দণ্ডগ্রহণ করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?

ধ্যানভঙ্গ হল মহাস্থবিরের। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু! আপনাকে কোন পাপ স্পর্শ করে নাই। একটি মৃত্যুপথযাত্রিণীকে প্রাণদানের নিমিত্ত আপনি যা কিছু করেছেন তার প্রেরণা করুণার উৎসমুখে। এতে কোন অন্যায় নাই, পাপ নাই।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, কিন্তু.... কিন্তু .....

—বলুন?

এবার দীপালোকে অত্যন্ত করুণ দেখালো তাঁকে। তবু মহাথেরের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে দৃকপাত করে বুদ্ধযশা বললেন, আমি যে স্থিরনিশ্চয় হতে পারছি না মহাথের—কিসের প্রেরণায় আমি যাবৎ প্রভাত সেই গুহাভ্যন্তরে অপেক্ষা করলাম! সে কি গুহামুখের তুষারপাতের বিকর্ষণে কিম্বা উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের আকর্ষণে! অথবা....?

—না। আপনি ব্রাত্য নন! আপনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এক্ষণে মনস্থির করে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনি আপনার জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা! বলুন—কী আপনার অভিলাষ? কুচীরাজদুহিতাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণান্তে গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করতে চান? ভবিষ্যৎ কুচীজনপদ-অধিনায়ক হতে ইচ্ছুক? অথবা আমার নিকট উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী?

—উপসম্পদা! আপনি কি এই অবস্থায় সে দুর্লভ সম্পদ আমাকে প্রদানে স্বীকৃত!

—হ্যাঁ, মাননীয় ভিক্ষু। এক্ষণে আপনি সে অধিকার অর্জন করেছেন।

—তবে সেই মহাসম্পদই আমাকে দান করে আমার জন্ম সার্থক করুন, প্রভু!

—তথাস্তু!

সাষ্টাঙ্গে মহাস্থবিরকে প্রণাম করলেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা।

নিমীলিত নেত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন কুমারজীব :

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
শনে আসনে ঠানে গমনে চাপি সর্বদা।[3]

ওঁরা জানতেও পারলেন না—নীরবে একটি ছায়ামূর্তি বহিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সেই খ্যিজিল সঙ্ঘারামের অর্ধসমাপ্ত চৈত্যগুহার গর্ভ থেকে। যেন এক স্বপ্ন-ছায়ামূর্তি। সুখস্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? জানি না। শুধু স্বপ্নের এক বাস্তব প্রমাণের মত স্তম্ভমূলে পড়ে রইল অনাদৃত একটি থলিকা। কেউই লক্ষ্য করল না,—সে থলিকার গ্রন্থি উন্মোচন করলে দেখা যেত তার অন্ধকোটরে লজ্জায় লাল হয়ে মুখ লুকিয়েছে একমুষ্টি অনুরাগরক্তিম কুমকুমচূর্ণ!

সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ পো-সাঙ!

অতি প্রত্যূষেই সন্নিধাতা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে এ দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেছে। উৎসবের দিনটির সূত্রপাত হয়েছে ঐ দুঃসংবাদে। কুচীরাজ প্রাতঃকৃত্যাদির সময়ও পাননি। তৎক্ষণাৎ আহ্বান করেছিলেন রাজাবরোধের কঞ্চুকীকে, রাজান্তঃপুরিকার রক্ষক বৃদ্ধ কঞ্চুকী নতমস্তকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বীকার করেছেন ঘটনার সত্যতা—গতকল্য রাত্রিতে কুমারভট্টারিকা অক্ষুমতী যোদ্ধৃবেশে একাকী অশ্বারোহণে প্রাসাদ-কুড্যের বাহিরে গিয়েছিলেন। রাজনন্দিনী এভাবে ইতিপূর্বে বহুবার গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গিয়েছেন—তিনি ক্ষাত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিতা, আত্মরক্ষায় সমর্থা; তদ্ভিন্ন আরক্ষা-অধিকারিকের সুব্যবস্থায় জনপদ পরিসীমার ভিতর তস্করাদির উপদ্রবও নাই। তাই রাজকন্যার এই চপলতায় এতাবৎকাল কঞ্চুকীমহাশয় আপত্তিও করেননি। কিন্তু গতকাল রাত্রিতে প্রাসাদ ত্যাগের পর রাজকন্যা আর প্রত্যাগমন করেননি।

পো-সাঙ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আজই কুমারভট্টারিকার স্বয়ম্বর সভার দিন ধার্য হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার অনবদ্য শ্লোকগুলি তখনও রচিত হয়নি। উজ্জয়িনীর কালিদাস আমাদের কাহিনীর কালে নাবালক মাত্র। কুচী নগরী কিছু পাটলীপুত্র, উজ্জয়িনী, বিদিশা, অবন্তী নয়—অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনপদ। স্বয়ম্বর সভায় সহস্রাধিক অভ্যাগতের উপস্থিতির সম্ভাবনা। কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদভবনে অত মানুষের সমবেত হওয়ার মতো মিলনকক্ষ নাই। তাই রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভার সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে। একটি দেবদারু কাষ্ঠনির্মিত উচ্চবেদি, তার উপর উষ্ট্রচর্মের চন্দ্রাতপ। দুই পার্শ্বে সুচিত্রিত মঙ্গলকলস এবং চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে পতাকা-শোভিত দণ্ড। মঞ্চের সম্মুখভাগে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রার্থী ও সম্ভ্রান্ত দর্শকদিগের কাষ্ঠাসন। পশ্চাদ্ভাগে পর্বতগাত্রে কৃত্রিম সোপানশ্রেণী উৎকীর্ণ—সাধারণ প্রজাদিগের আসন।

আয়োজন সম্পূর্ণ। দুইদণ্ড বেলা হলেই স্বয়ম্বর সভায় যোগদানেচ্ছু রাজন্যবর্গ ও কুমারগণ উপস্থিত হবেন। তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনার আয়োজনও সুসম্পন্ন। সন্নিহিত রাজপ্রহরীগণ শূলহস্তে পাহারা দিচ্ছে, কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থাদি করছে। অথচ যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিরাট আয়োজন তিনিই গতরাত্রি থেকে নিরুদ্দিষ্টা।

পো-সাঙ বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে আদেশ করলেন—নগর-কোট্টাল ও নগর-শান্তি-রক্ষককে অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ করতে। তাঁরা যেন বিনা কালহরণে রাজসমীপে আসেন। বললেন, এ দুঃসংবাদ যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে। আরও বললেন, রাজান্তঃপুর থেকে অমাত্য শিবমিশ্রের কন্যা শ্রবণাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করতে। শ্রবণা অনতিবিলম্বেই এসে উপস্থিত হল। কুচীরাজকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে নতনেত্রে বদ্ধাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

—কুমারভট্টারিকা গতকাল রাত্রে কোথায় গিয়েছেন জান? তোমাকে কিছু বলে গেছেন?

শ্রবণার দুই চক্ষু রক্তাভ। শিরশ্চালনে সে নেতিবাচক প্রত্যুত্তর করে।

কিয়ৎকাল ইতস্তত করে রাজা বলেন, তুমি তার প্রিয়তমা বয়স্যা। তুমি জান, আজ স্বয়ম্বর-সভায় কার বরমাল্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল?

শ্রবণা প্রস্তরমূর্তির ন্যায় স্থাণু। এ কথার কী প্রত্যুত্তর করবে সে?

পো-সাঙ বলেন, শ্রবণা! সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি এ অশোভন প্রশ্ন করতাম না। কিন্তু রাজকন্যা শুধু আমার আত্মজা নয়—সে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ-নৃপতির রাজমহিষী। অন্তত রাজ্যের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে তুমি অসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য জানাতে পার।

শ্রবণা বললে, মহাভাগ, এ সংবাদ সম্বন্ধে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে বলে আমিও বিশ্বাস করি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি সেই ভাগ্যবানের নাম, যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারলে আজ রাজকন্যা কৃতকৃতার্থ হতেন। কিন্তু মহারাজ! তা হবার নয়—আজকের স্বয়ম্বর সভায় সেই যুবাপুরুষ উপস্থিত থাকবেন না। তিনি পিয়সহিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ। এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ-মহিষী, সর্ববিদ্যাপারঙ্গমা অনিন্দ্যকান্তি অক্ষুমতী প্রত্যাখ্যাতা! স্বয়ং শচীপতি আখণ্ডল যাঁর বরমাল্য পেলে ধন্য হয়ে যান তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কে? গম্ভীরস্বরে বলেন, কে সেই যুবাপুরুষ? রাজনন্দিনীকে প্রত্যাখ্যান করার হেতু কী?

—তিনি কাশ্মীরী ভিক্ষু বুদ্ধযশা। গতকাল যিনি মহাথেরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়েছেন।

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন হতভাগ্য মহারাজ। বললেন, তা হলে তো অক্ষুমতীর এ গৃহত্যাগ কোন গোপন অভিসার নয়! সে কোথায় গিয়েছে অনুমান করতে পার?

আর্দ্র দুটি কজ্জললাঞ্ছিত নয়ন মেলে শ্রবণা প্রত্যুত্তর দিতে গেল। পারল না। উচ্ছ্বসিত রোদনে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়। তবু তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা প্রণিধান করলেন কুচীরাজ। দুই হাত সম্প্রসারিত করে বললেন—ক্ষান্ত হও শ্রবণা! না না— ও কথা বল না। সে কেন আত্মঘাতিনী হতে যাবে?

তবু কথাটা সূচীমুখ কণ্টকের মতো বিদ্ধ হল রাজবক্ষে। অক্ষুমতী আদরের দুলালী। প্রার্থনার পূর্বেই তার বাসনার পূরণ হয়—এতেই সে আবাল্য অভ্যস্তা। সপ্তদশবর্ষের জীবনে ভাগ্যদেবতা তাকে ক্রমাগত অকুণ্ঠ প্রসাদ বিতরণ করেছেন—রাজকূলে জন্ম, যৌবরাজে অধিকার, জনপদকল্যাণীর মতো রূপ, প্রজ্ঞা-পারমিতার মতো বিদ্যা, শক্র-মহিষী পৌলমীর মত ভাগ্য। শুধু একটি দ্রব্যের স্বাদ সে পায় নাই—বঞ্চনা। আজ প্রথম আঘাতেই কি সে একেবারে ভেঙে পড়েছে! কুচীরাজ গোপনে নিয়োগ করলেন গুপ্তচর। অশ্বারোহণে একরাত্রে সে কতদূর যেতে পারে? যদি জীবিতা থাকে তবে সন্ধ্যাকালের মধ্যেই আরক্ষা-অধিকারিক তাকে উদ্ধার করে আনবে। আর যদি সেই প্রত্যাখ্যাতা রাজনন্দিনী গভীর রাত্রে কোনও পর্বতচূড়ায় আরোহণ করে অতলস্পর্শী সমতলভূমে—?

সূর্য মধ্যগগনে উপনীত। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। একে একে সমবেত হয়েছেন দূর-দেশাগত প্রার্থীগণ। শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্র, চক্কুকরাজের দুই পুত্র সূর্যসোম ও সূর্যভদ্র; অগ্নিদেশ, পুরুষপুর, মীরান, তুরফান, নিয়ার রাজন্যবর্গ ও রাজকুমার—বিভিন্ন জনপদের শ্রেষ্ঠীতনয়। সন্নিধাতা বারম্বার এসে তাগাদা দিচ্ছেন—আর বিলম্ব করা অনুচিত। অবিলম্বে রাজকন্যাকে সভায় উপস্থিত করার প্রয়োজন। সভাস্থ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

এই সময়ে সবাদ এল মহাস্থবির কুমারজীব মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। শ্রবণমাত্র মহারাজ চঞ্চল হয়ে ওঠেন—কী আশ্চর্য! মহাথের-এর কথা এতক্ষণ কী-করে বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি? এমন বিপদে তাঁকেই তো সর্বাগ্রে সংবাদ পাঠানো উচিত ছিল। তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অনতিবিলম্বেই রাজসকাশে উপনীত হলেন মহাস্থবির। মহারাজ আসন ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধানিবেদন করলেন। কুমারজীব স্বস্তিবাচন করে উপবেশন করলে রাজা বসলেন একটি নিম্নাসনে। বললেন, মহাথের, আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসায় আমি ধন্য। বস্তুত আমি আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করতে যাচ্ছিলাম। অদ্য প্রাতে আমি একটি মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

কুমারজীব বললেন, রাজন্, আপনি যে বার্তা জ্ঞাপন করতে উদ্যত তা আমার অজ্ঞাত নহে। বস্তুত আমিও ঐ একই উদ্দেশ্যে এখানে সমাগত। চিন্তার কোন কারণ নাই—কল্যাণময়ী অক্ষুমতীর সংবাদ মঙ্গল।

—সে জীবিতা! তার সংবাদ আপনি জানেন?

—রাজকুমারী জীবিতা। সে আমার সঙ্ঘারামে আছে। বস্তুত তাকে একটি পল্যঙ্কিকায় এখানে আনয়নের ব্যবস্থা করেই আমি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

—সে কি অসুস্থা?

—ছিল। বর্তমানে সে রোগমুক্তা। সে সম্পূর্ণ 'আরোগ্য'-লাভ করেছে।

—শাক্যমুনির অসীম করুণা। সে কি তাহলে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হতে পারবে?

—পারবে, মহারাজ। সেজন্যই তাকে পল্যঙ্কিকায় এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। আপনি প্রার্থীদিগের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজকন্যা স্বয়ম্বর-সভায় আজ সমুপস্থিত না হলে কুচীরাজের অপমান। কন্যার কর্তব্য সে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে আপনাকে উদ্ধার করা। শুধু সেজন্যই অক্ষুমতী এ স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতে স্বীকৃতা।

—তাহলে অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ করি। অক্ষুমতীকে বধূবেশে সজ্জিত করার আয়োজন....

—কোন প্রয়োজন নেই মহারাজ। প্রিয় ভগ্নীকে স্বয়ম্বর-সভার উপযুক্ত বেশে সজ্জিতা করেই প্রেরণ করা হয়েছে। সে সরাসরি সভামণ্ডপে আসবে। পরন্তু একটি কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি। অক্ষুমতী বস্তুত গতকাল শেষরাত্রেই স্বয়ম্বরা হয়েছেন। নূতন কোন প্রার্থীকে ধন্য করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। সভায় তিনি একথাই ঘোষণা করবেন মাত্র।

কুচীরাজ কী প্রত্যুত্তর করবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। অবশেষে বলেন, কিন্তু সেকথা আমি কেমন করে ঘোষণা করব?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না, মহারাজ। স্বয়ম্বর-সভায় কুচীরাজের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন গার্হস্থ্যাশ্রমের পরিচয়ে যে ছিল তাঁর ভাগিনেয়—বর্তমান কুচী সঙ্ঘারামের 'থের'। দায়-দায়িত্ব সমস্তই আমার।

নিশ্চিন্ত হলেন মহারাজ পো-সাঙ।

অতঃপর ওঁরা দুইজন উপস্থিত হলেন সভামণ্ডপে। সভামঞ্চে পাশাপাশি দুটি উচ্চাসন। তার পশ্চাদ্ভাগে স্তম্ভের উপর স্ফটিক-প্রস্তরে নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি—ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধ্যানস্তিমিত তথাগত। মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে একটি স্বর্ণদণ্ডশীর্ষে ধর্মচক্র ও তদুপরি ত্রিরত্ন। সভায় কুচীরাজের প্রবেশ-

মুহূর্তে রাজপণ্ডিত স্বস্তিবাচন করলেন। সমবেতভাবে তূর্যধ্বনি হল। অতঃপর উষ্ট্রচর্মপটাহনিনাদে সভারম্ভ ঘোষিত হল। মহারাজ আসন গ্রহণ করেন। মহাস্থবির কুমারজীব মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, সুস্বাগতম্! পরম ভট্টারক শ্রীমান্ মহারাজ কুচী-অধিপতির অনুজ্ঞানুসারে আমি, তাঁর হয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা বহুদূর জনপদ থেকে অসীম শ্রমস্বীকার করে কুচীরাজ্যের বাৎসরিক আনন্দ-উৎসবে যোগদান করে আমাদের কৃত-কৃতার্থ করেছেন। আজিকার এ সভার আয়োজন কেন সে বিষয়ে আপনারা সবিশেষ অবগত। কুচী-জনপদ-অধিপতি পরম ভট্টারক পো-সাঙ ঘোষণা করেছিলেন—আর্যাবর্তের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা চিরায়ুষ্মতী কল্যাণী অক্ষুমতীকে এ সভায় স্বয়ম্বরা হওয়ার জন্য উপস্থাপিত করবেন। কুমারভট্টারিকা অক্ষুমতী সপ্তদশবর্ষীয়া, প্রাপ্তবয়স্কা। বস্তুত আর্যরীতি অনুসারে স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন স্বীকার করে নিতে কুচীরাজ প্রতিশ্রুত! আপনারাও এখানে সেই প্রতিশ্রুতিমতেই প্রতিযোগীরূপে অবতীর্ণ—অর্থাৎ স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে প্রয়াসী। এইটুকু ভূমিকা করে আমি ঘোষণা করছি—পরমকল্যাণীয়া অক্ষুমতী গতকাল রাত্রের শেষযামে তাঁর গোপন মনোগত বাসনা আমাকে জনান্তিকে জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচন আমি কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'—অনুমোদন করেছি। তিনি যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দান করবার সঙ্কল্প করেছেন, তিনিও এ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। সুতরাং ভাটগণের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগীর গুণকীর্তন এ-ক্ষেত্রে বাহুল্য হবে। আপনারা অনুমতি করলে রাজনন্দিনীকে আমি সভায় উপস্থিত করি।

সভামণ্ডপে একটি গুঞ্জন ওঠে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। সম্ভবত প্রতিটি প্রতিযোগী অন্তরে যে ক্ষীণ আশা পোষণ করে সমবেত হয়েছিলেন তা নির্মূল হল—সকলেই অনুমান করেছেন, রাজকুমারী কোন একজন ভাগ্যবানের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। শুধু অনুধাবন করা গেল না—সে-ক্ষেত্রে রাজকন্যা কেন প্রকাশ্য সভাতেই তার কণ্ঠে বরমাল্য দুলিয়ে দিলেন না, কেন মহাস্থবিরকে স্বয়ম্বর-সভার পূর্বরাত্রে গোপনে সেই প্রেমিকের নাম জ্ঞাপন করলেন। সভাস্থ সকলের মুখপাত্রস্বরূপ শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্ত দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, মহাথের যেমন অনুজ্ঞা করলেন তাই হোক। রাজনন্দিনীকে প্রকাশ্য সভায় আনয়ন করা হোক। তিনি সর্বসমক্ষে সেই ভাগ্যবানের কণ্ঠে বরমাল্য দিলেই আমরা আনন্দিত হব।

কুমারজীবের ইঙ্গিতে প্রবেশদ্বার দিয়ে আটজন পল্যঙ্কিকা-বাহক সভামণ্ডপে প্রবেশ করল। মঞ্চের পাদদেশে উপনীত হয়ে তারা সেটিকে ভূতলে নামিয়ে রাখে। মহাস্থবির স্বয়ং অগ্রসর হয়ে আসেন। পল্যঙ্কিকার প্রবেশপথের উশীরসদৃশ সূক্ষ্ম-জালিকা উন্মোচন করে বলেন, নেমে এস অক্ষুমতী! অভ্যাগতগণ তোমাকে দর্শন করতে চান। তোমার নির্বাচন ঘোষণা কর।

ধীরপদে বাহির হয়ে আসে অক্ষুমতী। তার দক্ষিণ হস্তে একটি ঘননিবদ্ধ পুষ্পমাল্য। ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করে সে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়। প্রথমে বুদ্ধমূর্তি, পরে রাজা এবং তৎপরে সভাস্থ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে যুক্তকরে নতি জানায়।

একটা বিস্ময়মিশ্রিত হাহাকার সভার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ভেসে যায়।

রাজনন্দিনীর বধূবেশ নয়। তাঁর অঙ্গে ত্রি-চীবর; তাঁর আষাঢ়সঘন জলদসম্ভারের মতো কুন্তল নিশ্চিহ্ন—মুণ্ডিত-মস্তক তিনি। বরমাল্য ছাড়াও তাঁর হস্তে যষ্টি ও ভিক্ষাপাত্র। দেববাঞ্ছিতা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সর্বাঙ্গে এক স্বর্গীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ।

রাজকন্যা অক্ষুমতী আজ সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষুণী। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, গতকাল নিশীথ রাত্রে।

বিস্ময়-বিমূঢ় জনতার দিকে পিছন ফিরে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসেন সিংহাসনের দিকে। মহারাজ দণ্ডায়মান হয়েছেন। তিনি যেন বজ্রাহত। কুমারভট্টারিকা তাঁকে অতিক্রম করে বুদ্ধমূর্তির সমীপস্থ হলেন। প্রণামান্তে তিনি বরমাল্যটি নামিয়ে রাখেন তথাগত বুদ্ধের চরণমূলে।

মহাস্থবির তখন মন্ত্রোচ্চারণ করছেন ঃ

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।।[4]

দীর্ঘ দশ বৎসর পরের কথা।

এ দশ বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। অনুমান করতে পারি, ঘটনা চলেছে ধীর মন্থর গতিতে—রেশম সড়কবাহী সার্থবাহের উষ্ট্রের সারির মতো। কুমারজীবের মাতা দীর্ঘদিন পূর্বেই কুচী নগরী ত্যাগ করে গিয়েছেন। শেষ জীবনটুকু তিনি তাঁর স্বামীর দেশে অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই কুচীরাজের ব্যবস্থাপনায় তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। সেখানকার সঙ্ঘারামে কবে কী-ভাবে তাঁর নিব্বাণলাভ হল ইতিহাস তা লিখে রাখতে ভুলেছে। ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন কুচী নগরীর সর্বপ্রধান সন্ন্যাসিনী-আশ্রম 'আ-লী' বিহারের 'অগ্‌গবিনতা'। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ভিক্ষুণীদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—'অগ্রসেবিকা,' পালীতে যা 'অগ্‌গসেবিকা'। সে সম্মান, যতদূর জানি, শাস্ত্রমতে মাত্র দুইজন লাভ করেছিলেন—ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা ও কাশীমহিষী ক্ষেমাদেবী। সুতরাং নূতন কোন ভিক্ষুণী 'অগ্রসেবিকা'-আখ্যায় ভূষিতা হতে পারেন না। এতদঞ্চলে ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘারামে সর্বোচ্চ অধিকারিকার সংজ্ঞা 'অগ্‌গবিনতা', অথবা অগ্রবিনতা। অর্থাৎ পূজারতির সময় প্রথম প্রণাম নিবেদনের অধিকারিণী। ভিক্ষুণী জীবার প্রস্থানের পরে আ-লী-বিহারে অগ্রবিনতা হয়েছেন ভিক্ষুণী অক্ষমতী।

বৃদ্ধ পো-সাঙের উত্তরাধিকারী অনির্দিষ্ট। তিনি এখনও কুচীরাজ।

মহাস্থবির কুমারজীবের বয়ঃক্রম একষষ্টি বৎসর। এখনও তিনি জরাগ্রস্ত নন। অর্হৎ বুদ্ধযশা শৈলদেশের সঙ্ঘারামে সাধনরত। অক্ষমতীর সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কাশগড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কুচীজনপদের সন্নিকটস্থ খ্যিজিল সঙ্ঘারামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুহামন্দির সমাপ্তির পথে।

কালের মাপে আমরা বর্তমানে ৩০৪ শকাব্দে, যাবনিক বিচারে যা নাকি ৩৮২ খ্রিস্টাব্দ। মধ্য এশিয়ার এই অখ্যাত জনপদে সংবাদ পৌঁছায়নি কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল সমাপ্ত। মগধাধিপতি রাজচক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের আট বৎসর অতিক্রান্ত। ভট্ট কালিদাস নামক এক অখ্যাতনামা উদীয়মান কবির বাচালতায় নাকি উজ্জয়িনীর প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিরক্ত, যদিচ নবীনেরা ক্রমে এই আধুনিক কবির ভক্ত হয়ে উঠছে। আহিওলে শ্রীদুর্গার একটি মন্দির ইতোমধ্যেই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক নূতন যুগের সূচনা করেছে।

এই সময়ে কুচীজনপদের নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল কালবৈশাখীর আভাস। ইতিমধ্যে মহাস্থবিরের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রসারিত হয়েছে। বহু দূরাগত হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং তাও-পন্থী পণ্ডিতগণ মীমাংসার সন্ধানে আসেন কুচী সঙ্ঘারামে। তক্ষশীলা, পুরুষপুর, এমন কি কাশী, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেও পণ্ডিতেরা সমবেত হন ঐ শৈলরাজ্যে—এদিকে তুরফান, মীরান, তুনহুয়ান অঞ্চলের থেরবাদী বৌদ্ধরাও সমাগত হন। বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতও আসতেন। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। চীনখণ্ডে এতদিন যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তা থেরবাদী বা হীনযানী মত। কুমারজীব মহাযানী। ফলে স্বতই মীমাংসার প্রয়োজন হত।

এইস্থানে 'হীনযান' ও 'মহাযান' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বোধকরি কিছু ইতিহাস আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে—

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনিব্বাণের অব্যবহিত পরে মগধের রাজধানী রাজগৃহে নাকি একটি মহা বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়। সঙ্ঘোত্তম কাশ্যপ সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং গৌতমের প্রত্যক্ষ শিষ্য উপালী সে সভায় 'বিনয় পিটক' আবৃত্তি করে শোনান। গৌতমের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ পাঠ করেন 'সুত্ত পিটক'। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত এ-তথ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, কারণ ইতিহাস অনুমান করে বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশ সঙ্কলিত হয়ে পিটকগুলি লিপিবদ্ধ হয় অনেক পরে। বস্তুতপক্ষে এই শাস্ত্রগুলি ভারত ভূখণ্ড থেকে কালে অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ অর্হতেরা অনেক পরবর্তীকালে সিংহলী ভাষা থেকে পালিতে সেগুলি পুনরায় অনুবাদ করে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনেন।

সে যাই হোক, কথিত আছে বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৈশালীতে, অর্হৎ রেবতের সভাপতিত্বে। সম্ভবত মহাপরিনিব্বাণের শতবর্ষ পরে। এই সভাতেই দেখা গেল বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সঙ্ঘ অতঃপর দুইটি পৃথক চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে গেল : প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদী এবং নবীনপন্থী মহাসংঘিকা দল।

তৃতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল মগধের তদানীন্তন রাজধানী পাটলীপুত্রে, স্বয়ং সম্রাট অশোকের আহ্বানে। কথিত আছে, এই সভাতেই ত্রিপিটকের শেষাংশ— 'অভিধম্ম পিটক' সঙ্কলিত হয়। মতপার্থক্য সত্ত্বেও আরও প্রায় তিনশ' বৎসরকাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি পৃথক শাখা জন্মগ্রহণ করেনি। সেটা ঘটল চতুর্থ সম্মেলনের পর, দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে। এই শেষ বৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন কুশানরাজ সম্রাট কনিষ্ক; সম্মেলনের স্থান পাঞ্জাবের জলন্ধর, এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহাঅর্হৎ অশ্বঘোষ। এই সভায় নবীনপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলেন। তাঁরাই জয়ী হলেন, নিজেদের বললেন—'মহাযানী' এবং প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদীদের 'হীনযানী' নামে অমর্যাদাসূচক অভিধায় চিহ্নিত করলেন। বলা বাহুল্য স্থবিরবাদীরা নিজেদের 'হীনযানী' মনে করেন না; তাঁরা নিজেদের বলেন, 'স্থবিরবাদী, বা 'থেরবাদী'।

অতঃপর থেরবাদীদের চিন্তাধারা বহির্ভারতে প্রসারলাভ করতে থাকে—সিংহলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের ঐ 'থেরবাদী' বা তথাকথিত হীনযানী মতবাদ বিকশিত হতে থাকে। থেরবাদীরা বিনয়, শীল এবং চারিত্রিক শুচিতার দিকেই বেশি জোর দিতেন—মূর্তিপূজার দিকে নয়। তাঁরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করাতেন না—বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন চিহ্নের পূজা করা হত। স্তূপ, পদচিহ্ন, শূন্য-সিংহাসন, ধর্মচক্র, ত্রিরত্ন, বোধিদ্রুম প্রভৃতি।

চীনখণ্ডে স্থবিরবাদী বা 'থেরবাদী' বৌদ্ধধর্মের ভগীরথ বস্তুত কাশ্যপমাতঙ্গ এবং তাঁর সমসাময়িক ধর্মরত্ন। আমাদের কাহিনীর কালের প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে তাঁরা অভিধম্ম প্রচারে চীনদেশে যাত্রা করেন। কাশ্যপমাতঙ্গ চীনা ভাষায় রচনা করেছিলেন এক অমূল্য গ্রন্থ : দ্বাচল্লিশ সুত্ত। কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নয়, থেরবাদী ধর্মের মূল বক্তব্যটুকু দ্বা-চল্লিশসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন তিনি। হান সম্রাটের তদানীন্তন রাজধানী 'লো-য়াঙ'-এ ওঁদের জীবিতকালেই গড়ে ওঠে এক সঙ্ঘারাম, চীনখণ্ডে সদ্ধম্মের প্রথম কেন্দ্র, 'পাই-মাৎ-জ্' বা 'শ্বেতাশ্ব সঙ্ঘারাম'। কথিত আছে—দুই পরিব্রাজক কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন যে অশ্বপৃষ্ঠে আদি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি চীনদেশে নিয়ে যান তার বর্ণ ছিল শ্বেত—তাই ঐ নাম।

সে যাই হোক, আমাদের কাহিনীর কালে চীনে মহাযান ধর্ম অনুপ্রবেশ করেনি। চীনের তদানীন্তন রাজধানী হোয়াং-হো তীরে 'চাঙ-য়াঙে'। চীনসম্রাট ফু কিয়েন ছিলেন পরম থেরবাদী বৌদ্ধ। তিনি শুনলেন—তথাগত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—সে ধর্মের নাম মহাযান। সম্রাট এ বিষয়ে অবহিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পণ্ডিতেরা বললেন, মধ্য এশিয়া তথা ভারত ভূখণ্ডে এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হচ্ছেন কুচী-সঙ্ঘারামের মহাস্থবির কুমারজীব। সুতরাং চীনসম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—এই পণ্ডিতকে তাঁর অবিলম্বে চাই। তাঁকেই তিনি 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু) করবেন। তাঁকে সসম্মানে চীনদেশে আনয়নের ব্যবস্থা করা হোক।

মহামান্য চীনসম্রাটের দূত এল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনপদনায়ক কুচীরাজের দরবারে। সবিনয়ে পো-সাঙ

জানালেন—মহাস্থবির কুমারজীব বৃদ্ধ, দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমি উত্তরণ এ বয়সে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তদুপরি তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়। চীনসম্রাট যেন তাঁকে মার্জনা করেন।

বৌদ্ধ হলে কি হয়, চীনসম্রাটের ধমনীতে সহস্রাব্দীর আভিজাত্যের অভিমান। অপমানিত বোধ করলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন—যেমন করেই হোক কুমারজীবকে নিয়ে যেতে হবে চীন রাজধানীতে। ঠিক কী ভাষায় তিনি আদেশটা জারী করেছিলেন ইতিহাসে সে কথা নেই। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় হেনরি যেমন একদিন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিলেন—'আমার অনুচরদলের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে ঐ টমাস বেকেটের ঔদ্ধত্য থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে?' হয়তো চীনসম্রাটও তেমনি কিছু বলে থাকবেন উত্তেজনার মুহূর্তে। ফল হল মারাত্মক। দুর্ধর্ষ চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুসুন এক বিপুলবাহিনী নিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন, হয়তো চীন সম্রাটের অজ্ঞাতসারেই—কুমারজীবকে ছিনিয়ে আনতে।

অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতি! একদিকে মহাচীনের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুচীরাজ! তবু ক্ষাত্রধর্মে আঘাত লাগল পো-সাঙ-এর। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন তিনি। কুমারজীব বারম্বার অনুরোধ করলেন মাতুলকে—কিন্তু পো-সাঙ দৃঢ়সংকল্প। দুর্গ-কুড্য সংস্কার করা হল, নূতন পরিখা খনন করা হল। পর্বতশীর্ষগুলিতে নূতন মঞ্চ নির্মাণ করে নিত্যপ্রহরার ব্যবস্থা হল। শস্ত্র-কর্মকারগণ দীর্ঘদিন পরে স্ব-স্ব অঙ্গারচুল্লী প্রজ্বলিত করে। প্রসবযন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে থাকে চর্ম-প্রসেবিকা ভস্ত্রা; সদ্যোজাত শূল, ভল্ল, বাণ, খড়্গ শস্ত্র-শিল্পীর সূতিকাগারে সজ্জিত হতে থাকে।

দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছেন কুমারজীব। চৈনিক সৈন্যবাহিনী রেশম-সড়ক ধরে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়ে আসছে। দ্রুতগামী বার্তাবহের মাধ্যমে যে সংবাদ পাওয়া গেল তা ভয়াবহ। চীনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক অক্ষৌহিণী, কুচীরাজের সামরিক শক্তি মাত্র দুই অনীকিনী—অর্থাৎ চীনাবাহিনীর শক্তি প্রায় পাঁচগুণ। চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুসূন জাতিতে হুণ—তার নৃশংসতা তুলনাহীন। সে বৌদ্ধ নয়। হুণ জাতির প্রকৃষ্ট পরিচয় তখনও ভারতবর্ষ পায়নি। মধ্য এশিয়াতেও সে তথ্য অপরিজ্ঞাত। হুণশক্তির প্রথম বিষোদ্গার হুণরাজ 'অ্যাটিলা'র জন্ম আলোচ্য সময়কালের পরে, শতাব্দীর প্রায় একপাদ পরে। তবু সার্থবাহ বণিকদের মাধ্যমে হুণজাতির নির্দয়তার কিছু কিছু পরিচয় ওঁরা পেয়েছেন। কুমারজীবের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ আছে; তিনি নিরন্তর প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি করে যাচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা—এই রণতাণ্ডবে তাঁর সঙ্ঘারামে রক্ষিত অমূল্য গ্রন্থগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই অনুলিপি রেখে একে একে মূল গ্রন্থগুলি তিনি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশাকে প্রেরণ করছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন— শৈলদেশও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখলে অর্হৎ বুদ্ধযশা যেন মূল পুঁথিগুলি পুরুষপুর অথবা তক্ষশীলার সঙ্ঘারামে সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।

অতঃপর একদিন মধ্যরাত্রে সিদ্ধান্তে এলেন কুমারজীব।

সন্ধ্যাকাল থেকেই সঙ্ঘারামের অলিন্দে পদচারণা করছিলেন আর মনে মনে বলছিলেন ঃ 'হে লোকজ্যেষ্ঠ ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও। কীভাবে এই অনিবার্য রক্তপাত বন্ধ করতে পারি আমি?' পূর্বদিন সংবাদ এসেছে—চৈনিক সৈন্য পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে স্কন্ধাবার স্থাপন করেছে। কুচী পর্বতচূড়ায় উঠে তিনি গভীর রাত্রে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন—পূর্ব দিগ্বলয়ে অসংখ্য আলোকবিন্দু। দিবাভাগে দেখা যায়, সেস্থলে দূর নীলাকাশে গণনাতীত ক্রমাগত সঞ্চরমান বিন্দু। খাদ্যসন্ধানী চিল্ল-শকুনী-গৃধিনীর পঙ্গপাল!

রাত্রি তৃতীয় যাম। নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করলেন মহাস্থবির। সিদ্ধান্তে এসেছেন এতক্ষণে। এ ছাড়া উপায় নাই। প্রথমেই তাঁর প্রিয় গ্রন্থগুলির ভিতর সুনির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থ একটি পেটিকায় বেঁধে নিলেন। মান্দুরা থেকে প্রিয় অশ্বটিকে নিয়ে সঙ্ঘারাম ত্যাগ করে একাকী নিষ্ক্রান্ত হলেন পথে।

এক আকাশ নক্ষত্র। কিন্তু সে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই। এ বঙ্গভূমের নৈশাকাশে অরোরা-বোরিয়ালিস্-এর মতো সেই তাকলামাকান মরুভূমির একান্তে অবস্থিত কুচী নগরীর আকাশে মেঘও দুর্লভ বস্তু। ধূলিহীন, জলীয়বাষ্পহীন সে আকাশে নক্ষত্রের দ্যুতি অনির্বচনীয়। সে নক্ষত্রের আলোয় অমাবস্যা রাত্রিও নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়।

প্রায় অর্ধদণ্ডকাল গিরিসঙ্কটের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করে মহাস্থবির উপনীত হলেন আ-লী বিহারের প্রবেশদ্বারে। দুই-তিনবার করাঘাতের পরে কাষ্ঠ-নির্মিত প্রবেশদ্বার একটি চারি অঙ্গুলিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গবাক্ষ দৃষ্ট হল। ভিতর থেকে প্রশ্ন হল : কে আপনি? রাত্রি শেষযামে এ সঙ্ঘারামের শান্তি বিনষ্ট করছেন কেন?

কুমারজীব বললেন, আমি কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'। দ্বার উন্মোচন কর বুদ্ধক্ষেমা।

তৎক্ষণাৎ বিহারকুড্যের ঊর্ধ্বে একটি মশাল জ্বলে ওঠে। প্রহরারতা ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা দ্বার উন্মোচন করে সবিস্ময়ে বলে, ভগবন্! আপনি?

—হ্যাঁ। দ্বার রুদ্ধ কর। আমার এ আগমন সংবাদ যেন গোপন থাকে। অগ্‌গবিনতাকে জাগরিত কর। অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী কিছু গুহ্যতত্ত্ব তাঁকে এই দণ্ডেই জ্ঞাপন করতে চাই।

ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা বলে, মহাভাগ! আপনি আমার অনুগমন করুন। ভদন্তিকা অগ্‌গবিনতা জাগরিতাই আছেন। কিয়ৎকাল পূর্বে আমি তাঁকে শাস্ত্রপাঠরতা দেখেছি।

অক্ষুমতীও নিরতিশয় বিস্মিত হল রাত্রির তৃতীয়যামে মহাস্থবিরের আকস্মিক আবির্ভাবে। অক্ষুমতীর বয়ঃক্রম ঊনত্রিংশতিবর্ষ। অঙ্গে ত্রিচীবর, মস্তক মুণ্ডিত, সর্বাঙ্গে তিলমাত্র আভরণ নাই। তবু এখনও অপূর্ব রূপবতী তিনি। সে রূপে ঘূর্ণ্যমান হীরকখণ্ডের চকিত আলোকবিচ্ছুরণ নাই, আছে নীরন্ধ্র পরিবেশে ঘৃতপ্রদীপের অচঞ্চল দীপ্তি। উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণকায়া, তৎসত্ত্বেও তাঁর কমনীয় সৌন্দর্য এক অপার্থিব স্বর্গীয় দ্যুতিতে পরিমণ্ডিত। অগ্‌গবিনতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সঙ্ঘারামের অর্হৎ প্রধানকে।

কুমারজীব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন, অগ্‌গবিনতা, আমি এক মহাসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; সঙ্ঘারামের কুশল চিন্তা করে আমি সে সিদ্ধান্তের কথা গোপনে আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

—আদেশ করুন, মহাভাগ?

নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে মহাস্থবির সহসা অন্তরঙ্গ হলেন। বললেন, অক্ষুমতী! প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এক নিশীথ রাত্রে ঠিক এইভাবে তুমি আমার পরিবেশে উপস্থিত হয়েছিলে। সেদিন তুমিও এক মহাসিদ্ধান্তে কৃতসংকল্প ছিলে। মনে আছে?

—আছে মহাথের।

—সেদিন তোমার সঙ্গে আমার কী কথোপকথন হয়েছিল মনে পড়ে?

—পড়ে মহাথের। আমি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে আদিকবি যেমন করুণার উৎসমুখে স্বত-উৎসারিত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে আপনি মুখে মুখে রচনা করে আমাকে একটি অপূর্ব শ্লোক শুনিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ধম্মপদ থেকে বহু মন্ত্রগাথা শুনিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—জীবনের কোনও পর্যায়েই মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে নেই। বলেছিলেন,

"যথা বুব্‌লুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চু রাজা ন পস্‌সতি।।[5]

আরও বলেছিলেন,

"সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স্ নত্থি মমায়িতং।
অসতা চ ন সৌচতি স বে ভিখ্‌খু'তি বুচ্ চতি।।"[6]

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে কুমারজীবের কণ্ঠস্বর। বলেন, ধম্মপদের শ্লোকগুলি স্মরণে আছে। কিন্তু পালি নয়, সংস্কৃতে যে শ্লোকটা তখন মুখে মুখে রচনা করেছিলাম সেটি কী?

— আপনি আবৃত্তি করেছিলেন—

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।

ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।[7]

প্রশান্ত জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহাস্থবিরের আনন। যেন তপশ্চারণক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর নির্মোক ভেদ করে অতীতের এক রাজকুমারের পুনর্জন্ম হল : যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর অনুজার নিকট শেষ বিদায় নিতে এসেছেন। ভিক্ষুণীর যুক্তকর নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে কুমারজীব বললেন, অক্ষুমতী, ঐ শ্লোকটা আজ কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। তোর মুখে ওটা শুনতেই তাই এসেছি।

বিস্মিতা অক্ষুমতী বলে, শুধু এই জন্য?

—না। ওটা তো বীজমন্ত্র। অতঃপর ব্যাখ্যা। আমি সিদ্ধান্তে এসেছি অক্ষুমতী—

মহাস্থবিরের সিদ্ধান্তের কথা শুনে বিস্মিতা হল না অক্ষুমতী। বোধ করি এমনই কিছু সে আশঙ্কা করেছিল। শান্তস্বরে বললে, সম্ভবত এ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু আপনি কি এই দণ্ডেই সঙ্ঘারাম ত্যাগ করছেন?

—হ্যাঁ। আশা করি আগামীকাল অপরাহ্নের পূর্বেই চৈনিক স্কন্ধাবারে উপনীত হতে পারব। আমারই জন্য এ সমরায়োজন। আমি গোপনে চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধের প্রয়োজনও শেষ হবে। কুচীরাজের ক্ষাত্র অভিমানেও আঘাত লাগবে না।

—কিন্তু মহাথের! চীনদেশ শুনেছি এক বৎসরের পথ। আর কি কোনদিন এ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন?

—সম্ভবত নয়। এই হয়তো তোর আমার শেষ সাক্ষাৎ। কিন্তু সেজন্য দুঃখ কিসের অক্ষুমতী? 'চু-কালান' এবং 'চিয়া-য়েহ-মোর্ৎয়েঙ'ও তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে আসেননি।

—ওঁরা দুজন কে? আমি কোনদিন তাঁদের নাম শুনিনি।

—'চু-কালান' হচ্ছেন অর্হৎ ধম্মরত্ন; আর 'চিয়া-য়েহ-মোর্ৎয়েঙ' হচ্ছেন মহাজ্ঞানী কাশ্যপমাতঙ্গ। দুজনেই মধ্যভারতীয় পণ্ডিত। চীনখণ্ডে স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্মের ভগীরথ। চীনা ইতিহাসে তাঁদের নাম ঐ অভিধায়। সম্ভবত আমিও চীনখণ্ডে নূতন নাম-রূপ পরিগ্রহ করব।

শুধু ভিক্ষুণী আর মহাথের নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যেও অনেক কথা হল। শেষে কুমারজীব বললেন, অক্ষুমতী, আমি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশাকে এই সঙ্ঘারামে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি; বলেছি আমার অবর্তমানে তিনি যেন এ সঙ্ঘারামের মহাস্থবিররূপে অধিষ্ঠিত হন। তুমি অগ্‌গবিনতা হওয়ায় অতঃপর তাঁরই আজ্ঞাবহ হিসাবে—

বাধা দিয়ে ভিক্ষুণী বলেন, মার্জনা করবেন মহাথের! সেটা কি আদৌ বাঞ্ছনীয়? আপনি তো সকল তথ্যই অবগত আছেন। উনি এ সঙ্ঘারামে অধিষ্ঠিত হলে আমার কি অন্যত্র প্রস্থান করাই সমুচিত হবে না?

—না, অক্ষুমতী। আমি যে সকল কথাই অবগত আছি। আমি যে বিশ্বাস করি—আত্মহনন নয়, আত্মনিবেদনই তোমাদের দুজনের চরম লক্ষ্য! তোমরা দুজনেই 'নামরূপ'-বন্ধন অতিক্রম করেছ!

স্থবিরের পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা হয় প্রাক্তন রাজকন্যা। বলে, আশীর্বাদ করুন মহাভাগ। ঐ মন্ত্র যেন সার্থক হয় আমার জীবনে।

মহাস্থবির নীমিলিতনেত্রে যুক্তকরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন —

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।"

চৈনিক স্কন্ধাবারে সেনাপতির সম্মুখে যখন উপনীত হলেন তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। বিপুল সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থিত সেনাপতির শিবিরে উপনীত হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল তাঁকে; তবু 'কুচীরাজের দূত' এই পরিচয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় সেনাপতি-সমীপে আনা হল। উষ্ট্রচর্ম নির্মিত প্রকাণ্ড শিবির। সিংহাসনাদির কোন আয়োজন নাই। ভূমির উপরে স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত। তদুপরি সেনাপতির জন্য উচ্চগদির শয্যা। হূণ সেনাপতি হো-লুসূন একটি উপাধানে কফোনি স্থাপিত করে অর্ধশায়িত অবস্থায় আল্‌বোলা সেবন করছেন। গঞ্জিকা, সম্বিদা অথবা তামাকু—কী, তা বোঝা যায় না; পরন্তু সেনাপতির চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। একজন সম্বাহক তাঁর পদসেবা করছে, একজন সুদর্শনা যৌবনবতী যবনী চামর-ব্যজন করছে। সেনাপতির সম্মুখে পানপাত্র এবং ভৃঙ্গার। একটি সুবর্ণপাত্রে কিছু শূল্যপক্ক মাংস। দুই পার্শ্বে দুইজন সন্নদ্ধ দেহরক্ষী মুক্ত কৃপাণহস্তে প্রহরারত।

শিবিরদ্বারের চীনাংশুক অবরোধ উত্তোলিত করে প্রহরীবেষ্টিত কুমারজীব কক্ষমধ্যে পদার্পণ মাত্র অট্টহাস্য করে ওঠেন চীনা সেনাপতি। কুমারজীব বিস্মিত হন, অট্টহাস্যের হেতুটা প্রণিধান করে উঠতে পারেন না। প্রহরী তাঁর কর্ণমূলে বলে, অভিবাদন কর্‌ মূর্খ!

তা ঠিক। এতাবৎকাল যখনই কোন সেনাপতি বা নৃপতির সম্মুখস্থ হয়েছেন, প্রণাম পেয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কুমারজীব অনভ্যস্ত নতিস্বীকার করলেন।

সেনাপতির অট্টহাস্যের হেতুটা বোঝা গেল তাঁর প্রথম সম্ভাষণেই : তোর রাজার কি এই অবস্থা? দৌত্যগিরি করবার মতো উপযুক্ত পোশাকও তোকে দিতে পারেনি?

পরিষ্কার পালিভাষা। চীনা নয়। অর্থ গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না কুমারজীবের। বস্তুত কোন চীনা সমরনায়ক যখন মধ্য-এশিয়ার রণাঙ্গণে প্রেরিত হতেন তখন পালিভাষাজ্ঞান তাঁর আবশ্যিক গুণ বলে বিবেচিত হত। সে জন্যই এই সৈন্যাধ্যক্ষ কুমারজীবের বোধগম্য ভাষায় বাক্যালাপে সমর্থ; কিন্তু বোঝা গেল মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ অর্হৎ-এর সম্মান সম্বন্ধে সেনাপতির কোন ধারণা নেই। শুধু মধ্য-এশিয়া কেন—ঐতিহাসিক এইচ. সরকার বলেছেন, "ৎসিন যুগেই (২০০ - ৩১৭ খ্রিস্টাব্দে) চীন-ভূখণ্ডে অন্যূন সতের হাজার হীনযানী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম গড়ে উঠেছিল।" কিন্তু হূণ সেনাপতি তো বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য পালিভাষা শেখেননি, নিতান্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে এ ভাষা আয়ত্ত করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর জীবন কেটেছে—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ত্রি-চীবর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

কুমারজীব সবিনয়ে বললেন, হে মহান চৈনিক সেনাপতি! আমি শ্রীমন্‌ মহারাজ পরম ভট্টারক কুচী অধিপতির দূত নই। আমি এখানকার সঙ্ঘারামের মহাস্থবির মাত্র; আমি—

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুসূন, তবে কোন্‌ সাহসে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আমার কাছে এসেছিস্‌?

—যেহেতু শুনেছি আপনি আমারই সন্ধানে এসেছেন। আমার নাম—কুমারজীব!

ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করেন সেনাপতি। তাঁর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়। বিরলকেশ ভ্রূযুগলে জাগে কুঞ্চন। হনুর অস্থি দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে বলেন, এ কথা সত্য?

—বৌদ্ধ অর্হৎ মিথ্যা বলে না মহা-সেনাপতি।

—কিন্তু তুই ছদ্মবেশী গুপ্তচর কি না তাই বা বুঝব কি করে? প্রমাণ দিতে পারিস—যে তুই সেই 'কুমারজীব', যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য এ সমরায়োজন?

—না মহাভাগ। কিন্তু আমি যে অনৃতভাষণ করছি না এ সত্য আপনি সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন। আমার একান্ত অনুরোধ—যে উদ্দেশ্যে আপনার আগমন তা যখন সিদ্ধ হল তখন কুচী নগরের দিকে নয়—চীনখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করুন। আমি মহামহিম চীন সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

চীনা সেনাপতি বাহুবদ্ধবক্ষে শিবিরের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্তে অশান্তভাবে পদচারণা করলেন কিয়ৎকাল। তারপর সন্নিধাতাকে সম্বোধন করে বললেন, গতকাল খ্যিজিল সঙ্ঘারামে ধৃত দুইজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম—তারা কি জীবিত?

যুক্তকরে সবিনয়ে সন্নিধাতা প্রত্যুত্তর করে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপতি। অদ্য সন্ধ্যাকালে তাদের শূলদণ্ডে উপস্থাপিত করার কথা। তারা জীবিত।

—সেই দুইজন বন্দীকে অবিলম্বে এই শিবিরে আনয়ন কর।

অনতিবিলম্বেই শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই বন্দীকে শিবিরে আনা হল। শিহরিত হয়ে ওঠেন কুমারজীব। বন্দীদ্বয় আর কেহ নয়—অর্হৎ পূণ্যক এবং বিধূরক্ষেম; অর্থাৎ খ্যিজিল সঙ্ঘারামের দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাঁরা দুইজনেও চমকিত হলেন কুমারজীবকে দেখে। শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় জোড় করার উপায় নেই। তাই লুটিয়ে পড়েন ভূতলে। বলেন, মহাথের! আপনি এখানে?

হো-লুসূন গর্জন করে ওঠেন, বাচালতার স্থান এ শিবির নয়। যা প্রশ্ন করছি তার প্রত্যুত্তর কর্। এঁকে তোরা শনাক্ত করতে পারিস্?

বিধূরক্ষেম বলেন, মধ্য-এশিয়ায় এঁকে না চেনে কে? ইনি কুচী সঙ্ঘারামের মহাস্থবির অর্হৎ কুমারজীব—যাঁকে সসম্মানে চীন সম্রাটের দরবারে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই আপনার আগমন।

—যথেষ্ট! এদের নিয়ে যাও।

প্রহরীগণ বন্দী দুজনকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই কুমারজীব বলেন, মহাসেনাপতি! এঁদের আপনি বন্দী করেছেন কেন? কী এঁদের অপরাধ?

—গতকাল চীনা সৈন্যরা যখন খ্যিজিল রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনে যায় তখন ঐ দুই বর্বর তাদের বাধা দিয়েছিল। তাই ওদের শূলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছি।

আর্তনাদ করে ওঠেন মহাস্থবির—না, না, না। এমন দুষ্কর্ম করবেন না মহা-সেনাপতি! এঁরা পরম ধার্মিক, বৌদ্ধ শ্রমণ; এঁদের অনিষ্ট হলে চীন সম্রাট আপনাকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

হো-লুসূন বলেন, তুই মহামহিম চীন সম্রাটকে চিনিস? চোখে দেখেছিস?

—না। কিন্তু শুনেছি তিনি পরম বৌদ্ধ। কোনও বৌদ্ধশ্রমণের উপর অত্যাচার করলে—

বাক্যটা তাঁর সমাপ্ত হয় না, তৎপূর্বেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে হুণ সমরনায়কের।

প্রথম মুষ্ট্যাঘাতেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন বৃদ্ধ। দৈহিক আঘাতের অপেক্ষা ব্যথা পেয়েছিলেন অন্তরে। বৌদ্ধ চীন সম্রাটের সেনাপতির নিকট এ-জাতীয় সম্বর্ধনা তাঁর কল্পনাতীত। সমগ্র মধ্য-এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাস্থবির ধীরে ধীরে ভূতল থেকে উত্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর খড়্গনাসা থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। নতজানু অবস্থাতে বললেন, সেনাপতি! আমি পুনরায় অনুরোধ করছি—ঐ শ্রমণদ্বয়কে মুক্তি দিন।

এবার ওঁর উদরদেশে প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন হো-লুসূন। নাসিকা নয়, এবার মুখবিবর থেকে নির্গত হয়ে এল এক ঝলক রক্ত। সমস্ত শিবিরটা দুলতে থাকে—ক্রমে ক্রমে চেতনা অবলুপ্ত হয়ে আসছে মহাস্থবিরের। রক্তাক্ত মুখে তিনি অস্ফুটে কী যেন বললেন—বোঝা গেল না। হয়তো ওঁর অন্তর্যামী শুনতে পেলেন। না, কোন অভিশাপ নয়, সংজ্ঞা হারানোর পূর্বমুহূর্তে বৃদ্ধ বলেছিলেন ঃ "অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে...."[৪]

দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো চিকিৎসা হলে, জলসিঞ্চন হলে, তার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে আসত; কিন্তু তা আসেনি। জ্ঞান হল যখন তখন কুমারজীব দেখলেন তিনি এক পর্বতচূড়ায় একটি বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। উন্মুক্ত জনহীন পর্বতশীর্ষে। কিছুদূরে কয়েকটি প্রহরী শুষ্কশাখায় অগ্নিসংযোগ করে হস্তপদাদি উত্তপ্ত করছিল। সন্ধ্যা সমাগত। চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করলেন কুমারজীব। সহসা একটি মর্মান্তিক দৃশ্যে হাহাকার করে ওঠেন। পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দূরে পাশাপাশি দুটি শূলদণ্ডে বিদ্ধ দুটি নগ্নপ্রায় মৃতদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্তি বিনষ্ট হয়েছে। তাঁরা দুইজন হচ্ছেন খ্যিজিল সঙ্ঘারামের দুইজন অর্হৎ—বিধূরক্ষেম এবং পূণ্যক!

বহুক্ষণ কুমারজীব মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ করছিলেন। মর্মবিদারক দৃশ্যটি না দেখলে হয়তো তিনি প্রহরীদের কাছে পানীয় জল ভিক্ষা করতেন। এখন তাও পারলেন না।

এখানেই যদি যন্ত্রণার শেষ হত, তাহলেও হয়তো শান্ত হতেন মহাস্থবির—কিন্তু তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল পার্বত্য উপত্যকার পরপারে। এ পর্বতশিখর থেকে কুচী নগরীর হর্ম্যরাজি পরিদৃশ্যমান। কুমারজীব দেখলেন—সমগ্র কুচী জনপদ এক ভীষণা বহ্নুৎসবে অবলুপ্ত। রাজপ্রাসাদ, মহা-সঙ্ঘারাম, আ-লী বিহার প্রভৃতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না—কিন্তু এক দিগন্তব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে কুচী জনপদ অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে! হুণ সেনাপতি জীবিতাবস্থায় কুমারজীবকে এভাবে গ্রেপ্তার করতে না পারলে বোধকরি ঐভাবে নির্বিচারে প্রতিটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করত না।

হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ : হে লোকজ্যেষ্ঠ ! হে শাক্যনন্দন! এ তুমি কী করলে!

* * *

এই স্থলে কিছু স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করছি। কুজ্মটিকাচ্ছন্ন কুমারজীবের যেটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে হুণ সেনাপতির হস্তে তাঁর দৈহিক নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ নাই। অগ্নিদগ্ধ কুচী নগরীর দিকে দৃক্‌পাত করে সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধ শ্রমণের গণ্ডে রক্তধারা অশ্রুর প্লাবনে ধৌত হয়েছিল কি না—ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। এ শুধু ঔপন্যাসিকের কল্পনা। তবু বিশ্বাস করি—পাঠক এ বিষয়ে কথাসাহিত্যের অপেক্ষা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি বেশি আগ্রহান্বিত। তাই বলি—ইতিহাস শুধু বলেছে "বন্দী-জীবনের প্রথমাংশে কুমারজীব চীনা সেনাপতির নিকট নিদারুণভাবে নিগৃহীত হন; তারপর নানা কারণে তিনি চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।" ঐটুকু তথ্যের ভিত্তিতে 'নিদারুণ নিগ্রহে'র আলেখ্য এঁকেছি; এবার আপনারা অনুমতি করলে 'নানা কারণে' কী ভাবে তিনি 'চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন' তার কল্পিত চিত্র আঁকতে পারি :

* * *

প্রায় তিন মাস পরের কথা। মকররাশিস্থ ভাস্কর এখন পুনরায় মেষরাশিস্থ হয়েছেন। এ তিন মাস কাল চীনা অক্ষৌহিণীর সঙ্গে কুমারজীব ক্রমাগত চলেছেন পূর্বাভিমুখে। প্রথম-প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে পল্যঙ্কিকায় বহন করা হত। এক্ষণে তাঁকে একটি অশ্ব দেওয়া হয়েছে। দিবাভাগে তাঁর হস্তপদাদিও শৃঙ্খলিত করা হয় না। সন্ধ্যা সমাগমে ভারপ্রাপ্ত প্রহরী প্রথামাফিক তাঁকে নৈশ শিবিরের কেন্দ্রস্থ স্তম্ভের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। সাত বৎসর বয়সে যিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, এ তিন মাসে তিনি যে কথ্য চীনভাষায় প্রাথমিক কথোপকথনে অভ্যস্ত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বন্দীর পলায়নের কোনও উদ্যোগ যে নেই এ তথ্যটা সকলেই অনুধাবন করেছে। তদ্ভিন্ন পলায়নের পথও নাই সে বিজন গিরিসঙ্কটে। বিরাট বাহিনী এতদিনে অগ্নিদেশের (কারাহ্শর) মরূদ্যান অতিক্রম করেছে, তুরফান মরুজনপদও অতিক্রান্ত। পরবর্তী বৃহৎ জনপদ—চীনের সিংহদ্বার ঃ তুন-হুয়ান। অর্থাৎ—এক্ষণে দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমির দক্ষিণাংশ অতিক্রম করতে হবে। সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে যাত্রাকালে কখনও কখনও সৈন্যবাহিনী দশ ক্রোশ দীর্ঘ হয়ে যায়। তখন পুরোভাগের কোন সংবাদ পশ্চাদভাগে প্রেরণ করতে সমস্ত দিনমান সময় লাগে। কুমারজীব আছেন বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশে। বস্তুত খাদ্য, ধনভাণ্ডার, বন্দী ও লুণ্ঠিত সম্পদ সর্বক্ষণই এই মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। সমরনায়ক হো-লুসুনের শিবিরও বাহিনীর এই অংশে অবস্থিত অবস্থাতেই নিত্য সঞ্চরমান। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে কুমারজীবের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই—এ বিষয়ে সেনাপতির কঠিন নিষেধ ছিল। কিন্তু এই তিন মাসে কুমারজীব তাঁর চতুষ্পার্শ্বের প্রহরীদিগের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনটি কারণে। প্রথমত, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক ব্যবহার—করুণা, মৈত্রী ও অহিংসার ফলশ্রুতি। দ্বিতীয়ত, চীনা বাহিনীতে কিছু

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও ছিল। সেনাপতি না প্রণিধান করলেও তারা তাঁর মূল্য কিছুটা বুঝেছিল। মহাস্থবিরের প্রার্থনাসভায় তারা নিত্য উপস্থিত হত। তৃতীয়ত, কুমারজীব ছিলেন ভেষগাচার্যও—চরক-শুশ্রূত পাঠই শুধু নয়, পার্বত্য অঞ্চলের লতাগুল্ম নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা জাতের ওষধী প্রস্তুত করতেন। সে ঔষধ নাকি ছিল অব্যর্থ। বস্তুত তাঁর একান্ত-প্রহরী—যার ব্যক্তিগত প্রহরায় তিনি চীনখণ্ডে নীত হচ্ছেন সেই চিয়াঙ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিল ঐ কারণেই। দীর্ঘদিনের ব্যাধি থেকে কুমারজীব তাকে ঔষধ প্রয়োগে সুস্থ করে তোলেন।

সেদিন রাত্রে মহাস্থবিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে করতে চিয়াঙ বললে, মহাথের! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আদেশের দাস। আমি জানি—আপনি পলায়ন করবেন না, তবু....

বাধা দিয়ে কুমারজীব বললেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ভাই? তুমি তো তোমার কর্তব্য কর্ম করছ শুধু। প্রতিটি সৈনিককে সেনাপতির আদেশ বিনাবিচারে পালন করতে হয়।

চিয়াঙ বলে, প্রভু, আপনি উদরপীড়ার কোনও ঔষধ জানেন? আমাদের বাহিনীর একজন উদরদেশে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছে। কোনও ঔষধ প্রয়োগেই তাঁর আরাম হচ্ছে না—অসহ্য যন্ত্রণা...

এবারও বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, আমাকে রোগীর সন্নিধানে নিয়ে যেও। তাকে না দেখে কেমন করে ঔষধ প্রয়োগ করব?

চিয়াঙ সলজ্জে বলে, তাঁকে দেখলে অথবা পরিচয় জানতে পারলে আপনি আর ঔষধ প্রদান করতে পারবেন না—এ জন্যই তাঁর পরিচয় গোপন রাখছি।

—একথা কেন বলছ চিয়াঙ?

অসঙ্কোচেই বলল চিয়াঙ, তিনি আমাদের মহান সেনাপতি হো-লুসূন স্বয়ং। যিনি অপনাকে মুষ্ট্যাঘাত করেছিলেন, পদাঘাত করেছিলেন।

স্মিত হাসলেন কুমারজীব। বললেন, তুমি কেমনতর বৌদ্ধ চিয়াঙ? তিনি একদিন আমাকে আঘাত করেছিলেন বলে আমি তাঁর চিকিৎসা করব না! কী বলছ তুমি? শোননি এ মন্ত্র?—

"অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসিবে
যে চ তং উপন্যহন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি।।"[9]

তাই ধম্মপদ বলছেন :

ননহ বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
আবেরন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনাতন।।[10]

চিয়াঙ বিস্মিত। বলে, তবে একটু অপেক্ষা করুন প্রভু! আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসি। আজ সন্ধ্যাকাল থেকে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। যদি সম্ভব হয়, তবে আজ রাত্রেই আপনি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখুন।

সেই রাত্রেই চিয়াঙ কুমারজীবকে নিয়ে গেল সেনাপতির শিবিরে। সেনাপতির চৈনিক চিকিৎসক সর্বপ্রকারের ব্যবস্থাদি দিয়েও ওঁর যন্ত্রণার কোন উপশম করতে পারেনি। একজন মধ্য-এশিয়ার চিকিৎসকের ঔষধে রোগী উপকৃত হলে তার অবমাননা। তাই সে কিছুতেই স্বীকৃত হল-না। কিন্তু রোগীর জ্ঞান ছিল। বামহস্তে উদরদেশ ধারণ করে শয্যার উপর তিনি এতক্ষণ আর্তনাদ করছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি, চোপরাও উল্লুক! নিজে কিছুই করতে পারছিস্ না—অথচ আর কোনও চিকিৎসককেও আসতে দিবি না! তোকে শূলে দেব আমি। অ্যাই কে আছিস? সেই বৌদ্ধ সাধুব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়!

অনতিবিলম্বেই কুমারজীব উপস্থিত হলেন হো-লুসূনের শিবিরে। সেই একই পরিবেশ, একই শিবির—যদিও সেই প্রথমদৃষ্ট শিবিরের ভৌগোলিক দূরত্ব অসংখ্য যোজন পশ্চিমে। সেনাপতি তাঁর শয্যায় কাতরাচ্ছেন। তিন-চারজন সেবিকা তাঁকে নানাভাবে পরিচর্যা করছে। কুমারজীব এ তিনমাসকাল লু-সূনের সম্মুখে দ্বিতীয়বার আসেননি। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়েন রোগীর

শয্যাপ্রান্তে। তাঁকে পরীক্ষা করেন। উত্তমরূপে পরীক্ষার পর বললেন, মহা-সেনাপতি, এ রোগের অর্বথ্য ঔষধ আমি জানি। সে ঔষধও আছে আমার কাছে। কিন্তু ....

—কিন্তু কী? ঔষধ যদি আছে তবে দিচ্ছিস্ না কেন?

—সে ঔষধ তীব্র বিষ! পরিমাণের তারতম্য হলে আপনার মৃত্যু হতে পারে।

হো-লুসূন ভাষা খুঁজে পায় না। সন্নিধাতা বলেন, ঔষধের পরিমাণমাত্রা আপনি জানেন না?

—জানি। এ ঔষধ সেবন করাতে হলে আমাকেই এখানে রাত্রিবাস করতে হবে। প্রতি অর্ধদণ্ডে একমাত্রা ঔষধ প্রযোজ্য। অন্য কোন ব্যক্তির উপর আমি নির্ভর করতে পারব না।

—তবে এখানেই তোকে থাকতে হবে সারারাত।

কুমারজীব অতঃপর তাঁর পেটিকা থেকে সেই উদ্ভিদজ ঔষধ নিয়ে এলেন। বললেন, মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধ সহযোগে এ ঔষধ সেব্য। পৃথক পৃথক পাত্রে আমাকে ঐ দুইটি অনুপান এনে দিন।

সন্নিধাতার আদেশে শিবিরান্তরাল থেকে একজন কিঙ্করী দুই হস্তে দুইটি রৌপ্যাধারে অনুপানদ্বয় ধারণ করে শিবিরে প্রবেশ করল। তাকে দর্শনমাত্র জ্যামুক্ত ধনুকের মত দণ্ডায়মান হলেন কুমারজীব : তুমি!

দুই হস্তে দুই পাত্র ধারণ করে মৃন্ময়ী প্রতিমার মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ্করী। তার দুইচক্ষে দর-বিগলিত ধারা।

না। তার অঙ্গে ত্রি-চীবর নয়, রক্ত চীনাংশুক। আভরণবিমুক্তা নয় সে, সর্বাঙ্গে মণিমাণিক্যের দীপ্তি। মুণ্ডিতমস্তক নয়, এই তিন মাসে তার মস্তকে কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধ স্পর্শ করছে। তার কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে শতনরী, নিতম্বে মেখলা, চরণে অলক্তকরাগ, ভ্রূমধ্যে কুমকুম চিহ্ন। বাসকশয্যা!

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুসূন, তুই চিনিস্ একে? এ হচ্ছে তোদের রাজকন্যা! ওর নাম অ-খু-মো-তি !

কুমারজীব ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পান। অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু উনি শুধু রাজকন্যা নন, উনি আ-লী সঙ্ঘারামের মহামান্যা অগ্‌গবিনতা! এঁকে কেন ধরে এনেছেন?

—ও আমার প্রধানা রক্ষিতা!

—রক্ষিতা! দুই হস্তে আনন আবৃত করে ভূমিতলে উপবেশন করেন কুমারজীব।

এতক্ষণে প্রথম কথা বলেন অক্ষুমতী, অনুপান নিয়ে এসেছি ভেষগাচার্য।

আর্তনাদ করে ওঠেন কুমারজীব, এ আপনি কী করেছেন সেনাপতি ?ও যে আমার ভগ্নী!

—ভগ্নী! ও তোর ভগ্নী? এবার উৎসাহে উঠে বসে লুসূন। বলে, এতক্ষণে সমাধান হয়েছে। শোন্ বর্বর! তোর ভগ্নী অত্যন্ত সুন্দরী। তাকে আমার মনে ধরেছিল। তাই এতদিন তাকে শুধুমাত্র আমার উপপত্নীরূপে আবদ্ধ রেখেছিলাম। সর্বজনভোগ্যা বারবনিতা করিনি। এখন....

সন্নিধাতার দিকে ফিরে বলে, শোন আমার আদেশ। এই নারীই আমাকে ওর নির্দেশমত ঔষধ প্রয়োগ করবে। চিকিৎসক শত্রুপক্ষের বন্দী—সে বিষপ্রয়োগে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা যদি করে তবে আমার মৃত্যুর পর ঐ বন্দীর সম্মুখে এই নারীকে উলঙ্গ করে তোমরা যৌথভাবে বলাৎকার করবে। আমার বাহিনীতে এত সৈন্য আছে যে, আশা করি শুধুমাত্র ঐ পদ্ধতিতেই ওর ভগ্নীটিকে হত্যা করতে পারবে তোমরা। তারপর, এ দৃশ্য দু-চোখ মেলে দেখার পর ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুটাকে তোমরা শূলে দেবে। বুঝলে?

সন্নিধাতা শিরশ্চালনে স্বীকার করে পৈশাচিক আয়োজনটার মর্মার্থ তার গ্রহণ হয়েছে।

লুসূন এবার কুমারজীবের দিকে ফিরে বললে, এবার দে কী তোর ঔষধ আছে!

দীর্ঘদিন পরের কথা। সূর্য মকররাশিতে উপনীত হলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হবে। অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ। সপ্তদশবর্ষ অতিক্রান্ত। মহাস্থবির কুমারজীব এখন আর শালপ্রাংশু নন, জরাক্রান্ত

অষ্টসপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ। চীনখণ্ডে আছেন দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ কাল। রাজধানী চীন-য়াঙে নন, চীন প্রবেশদ্বারের এক অখ্যাত সঙ্ঘারামে—কাংসুতে। ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। বৎসরাধিককাল ধরে মধ্য-এশিয়ার গিরিসঙ্কট এবং গোবি মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্ত উত্তরণে যখন তিনি কাংসুতে উপনীত হলেন তখন সংবাদ পাওয়া গেল বৌদ্ধ চীনা সম্রাট তাঁর রাজধানী চাং-য়াঙে আততায়ীর ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে ইতিপূর্বেই নিহত হয়েছেন। তাঁর শূন্য সিংহাসনে যিনি অধিরূঢ় হয়েছেন সেই নবীন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নন। ফলে কুমারজীবের পক্ষে রাজধানীতে আগমন নিরর্থক। ততদিনে হো-লুসূন কুমারজীবকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। বস্তুত কুমারজীবের অদ্ভুত চিকিৎসাতেই নিরাময় হয়েছিলেন তিনি—মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন। তাই হুণ সেনাপতি ঐ বৌদ্ধ ভেষগাচার্যের কাছে উপকৃত। সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করে ভিক্ষুকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এখন আপনি কী করতে চান? এই দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করা এ বয়সে আপনার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়েই বা কী করবেন?

কুমারজীব বলেছিলেন, না, রাজধানীতে যাব না। একাকী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা করলেও পথে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। আমি এই কাংসু সঙ্ঘারামেই অবস্থান করব।

অগত্যা তাঁকে সেই অখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে রেখে বিপুল বাহিনী নিয়ে হো-লুসূন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর রক্ষিতা বাহিনী এবং নবলব্ধ অক্ষুমতী সমেত।

কাংসুর এই ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা নগণ্য। সেনাপতির ব্যবস্থাপনায় কুমারজীবের জন্য প্রচুর চীনা ধর্মগ্রন্থ সেস্থলে প্রেরিত হল। কুমারজীব ইতিমধ্যে চীনাভাষা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিখে ফেলেছেন। তিনি একে একে পালিভাষায় লিখিত স্থবিরবাদী ধর্মের গ্রন্থগুলি চীনাভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। অনেক চীনা পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন অর্হৎ সেং-চাও। গুরুর বাণী ও জীবনকথা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন—অনেকটা শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের মতো। (বস্তুত তারই ইংরাজী অনুবাদ আমার এ গ্রন্থের অন্যতম মূল উপাদান।) কথাপ্রসঙ্গে সেংচাও লিখছেন, 'একদিন গুরুদেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনি ক্রমাগত অনুবাদই করে যাচ্ছেন, মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করছেন না কেন?' তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বৎস সেং-চাও! এখানে আমার মৌলিক রচনার পাঠক কোথায়? স্বদেশে থাকলে সে কার্য সার্থক হত—এখানে আমি পক্ষহীন পক্ষিশাবক—পিঞ্জরের ভিতরে বসে মহাকাশের স্বপ্ন দেখা বৃথা।'

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার অবকাশে মাঝে মাঝে অতীত জীবনকথা স্মরণ করতেন। সমস্ত জীবনে অসংখ্যবার তিনি মহা-মহা পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছেন। বহু বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোথাও পরাজিত হননি। তাঁর মত, তাঁর নির্দেশ কেউ কোথাও কখনো খণ্ডন করতে পারেনি। চির-অপরাজেয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য তিনি।

নাঃ, ভুল হল। জীবনে একবার তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। নতমস্তকে নিজ ভ্রান্তি স্বীকার করেছিলেন। দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ পূর্বেকার কথা। তবু স্পষ্ট মনে আছে ওঁর। তুন-হুয়ানের পথে সেই শিবিরে—যেদিন হুণ সেনাপতি হো-লুসূনের চিকিৎসা করেছিলেন তার ঠিক পরদিন।

সমস্ত রাত্রি কুমারজীব এবং অক্ষুমতী চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন সেনাপতির। সন্নিধাতাও উপস্থিত ছিল। মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধের অনুপানে মিশ্রিত করে প্রতি অর্ধদণ্ডের ব্যবধানে তীব্র হলাহল পান করানো হচ্ছিল রোগীকে। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী এবং সন্নিধাতার উপস্থিতিতে মহাস্থবির অক্ষুমতীকে কোন সম্ভাষণ করেননি। অক্ষুমতীও নীরবে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিল অভিজ্ঞ সেবিকার মতো।

সেরাত্রে কুমারজীব যে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছিলেন তা তুলনাহীন। অক্ষুমতী তাঁর অতি প্রিয় ভগ্নী। শৈশবাবস্থা থেকেই সে তাঁর কাছে মানুষ। অক্ষুমতী অপেক্ষা তিনি একত্রিশ বৎসরের অগ্রজ—সুতরাং সম্পর্কে ভগ্নী হলেও তিনি তাকে কন্যার মতো স্নেহ করতেন। ভিক্ষু বুদ্ধযশা সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর হতভাগিনী আত্মঘাতিনী হওয়ার সংকল্প করে। অশ্বারোহণে সেই উদ্দেশ্যেই স্বয়ম্বর সভার পূর্বরাত্রে সে গৃহত্যাগ করে; কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম না করে এ পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিতে পারে

না। গভীর রাত্রে সে উপস্থিত হয়েছিল কুচীসঙ্ঘারামে মহাস্থবিরের পরিবেশে। অন্তর্যামীর মতো তার উদ্দেশ্যের কথা অনুধাবন করেছিলেন কুমারজীব। সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন ভগ্নীকে। অনৃতভাষণ করতে পারেনি অক্ষুমতী। তখন তিনি অক্ষুমতীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'সদ্ধম্মের' কথা। মৃত্যুর কাছে নতিস্বীকার করে কোন সমাধানে পৌঁছানো যায় না। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতলাভই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এ জগৎ-প্রপঞ্চ মানুষকে নানাভাবে লুব্ধ করে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ষড়রিপু তাকে নিরন্তর ভ্রমাত্মক পথে নিয়ে যেতে চায়। সকল অবস্থাতেই দৈহিক পীড়নকে অস্বীকার করাই ভিক্ষুর সাধনা। দেহ কিছু নয়—দেহকে অতিক্রম করে নিব্বাণের পথে আত্মার উত্তরণ। শুনিয়েছিলেন অক্ষুমতীকে নামরূপ উত্তরণের সেই অপূর্ব স্বরচিত মন্ত্রটি। অক্ষুমতী স্বীকার করে নিয়েছিল। দেহের অবমাননায়, দৈহিক নিপীড়নে, দেহজ কামনা-বাসনায় অথবা নির্যাতনে সে আর কোনদিন বিচলিত হবে না এই প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেই রাত্রেই অক্ষুমতীকে উপসম্পদা দান করেছিলেন কুমারজীব।

রাজকন্যা অক্ষুমতী হয়েছিল অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী।

তাই সেরাত্রে সেনাপতির জন্য পাত্রে ঔষধ ঢালতে ঢালতে তাঁর বার বার মনে হয়েছিল—অক্ষুমতীর এই মরণান্তিক ঘৃণিত জীবনের জন্য দায়ী তো তিনিই। সেদিন যদি তিনি অক্ষুমতীকে আত্মঘাতিনী হতে দিতেন তাহলে এই বর্বর হূণটা তার অনাঘ্রাত যৌবনকে, তার দেবীপ্রতিমার মতো দেহকে এভাবে মরণান্তিক নির্যাতনে দলিতমথিত করতে পারত না। ছিল কুমার ভট্টারিকা রাজনন্দিনী, হল অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী; আর আজ সে এই বর্বর হূণটার পাশবিক কামনা চরিতার্থ করবার যন্ত্রণাময় একটা জৈবিক যন্ত্র! কেমন অনায়াসে পিশাচটা বলল—'অ-খু-ম-তি' তার প্রধানা রক্ষিতা। তার উপপত্নী।

শেষরাত্রে যখন রোগী যন্ত্রণার পূর্ণ উপশমে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হল তখন মনস্থির করলেন মহাস্থবির। সন্নিধাতাকে বললেন, এবার আমি বিশ্রাম নেব। আপনি ভূর্জপত্র, মস্যাধার আর লেখনী নিয়ে আসুন। সেবিকাকে পরবর্তী নির্দেশ দিয়ে আমি শয্যাগ্রহণ করব।

সন্দেহের কোন কারণ নেই। অনুজ্ঞামতো ভূর্জপত্রাদি নিয়ে আসা হল। মহাস্থবির জানেন, এরা খরৌষ্ঠী লিপি কেউ পড়তে পারবে না। অথচ অক্ষুমতী তার পাঠোদ্ধারে সমর্থা। তাই পরবর্তী শুশ্রূষার নির্দেশদানের অছিলায় কুমারজীব ভূর্জপত্রে লিখে দিলেন, "কল্যাণীয়া অক্ষুমতী, তোমার এই চরম সর্বনাশের জন্য আমিই দায়ী। আমিই সেদিন তোমাকে আত্মঘাতিনী হইতে দিই নাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এই সঙ্গে যে পুরিয়া রাখিয়া গেলাম তাহা সেবন করিও। এই বর্বরের রক্ষিতা হিসাবে জীবনধারণের গ্লানি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইবে। আমার অন্তিম আশীর্বাদ রহিল।"

তার পরদিন সেনাপতির শিবিরে অক্ষুমতীকে দেখতে পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন কুমারজীব। উনি শিবিরে প্রবেশ করামাত্র অক্ষুমতী অগ্রসর হয়ে এসেছিল। ওঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রেখেছিল ঔষধের পুরিয়া এবং সেই ভূর্জপত্রটি। স্তম্ভিত কুমারজীব পত্রটি গ্রহণ করে দেখেন, তার বিপরীত দিকে খরৌষ্ঠী হরফে শুধু লেখা আছে ঃ

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।'

গুরুকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র!

রুদ্রদেবের বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে গ্রহণ করার মন্ত্র!

পত্রপাঠান্তে মুখ তুলে দেখেন কখন অলক্ষ্যে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে অক্ষুমতী। আর কখনও তাকে দেখেননি।

কুমারজীবের জীবনে সেই একটিমাত্র পরাজয় কাহিনী। তাঁর কন্যাপ্রতিম ভগ্নী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—দেহ কিছু নয়; দেহের অবমাননা অস্বীকার করে দেহাতীত সাধনায় নিব্বাণের পথে আত্মার উত্তরণই হচ্ছে মানবদেহধারী মুমুক্ষুর সাধনা।

—গুরুদেব!

তন্ময়তা ছিন্ন হয় বৃদ্ধ মহাস্থবিরের। বলেন, কী সংবাদ সেং-চাও?

—অর্হৎ কুঙ্গ নামে একজন চৈনিক শ্রমণ শাক্যসিংহের লীলাভূমি দর্শনে গমনেচ্ছু। তিনি আপনাকে প্রণাম করতে এ সঙ্ঘারামে এসেছেন। আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—আমার সৌভাগ্য। সসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে এস বৎস।

অনতিবিলম্বে সেং-চাও একজন শ্রমণ সমভিব্যাহারে মহাস্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাস্থবিরকে। কুমারজীব দুই হস্ত তুলে বললেন, আরোগ্য।

পরিব্রাজকের নাম অর্হৎ কুঙ্গ। বয়ঃক্রম আটষট্টি—কুমারজীবের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের অনুজ। শানসী প্রদেশে জন্ম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ভগবান তথাগতের জন্মভূমি পরিদর্শন করে ভারতের বিবিধ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রাদির সম্যক পরিচয় লাভ ও বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শন মানসে তিনি ভারত ভূখণ্ডে যাত্রা করতে মনস্থ করেছেন।

মহাসমাদরে ওঁকে নিয়ে বসলেন কুমারজীব। যে পথে এসেছেন তার বর্ণনা দিলেন। পথে কোথায় কোথায় মরূদ্যান আছে, সঙ্ঘারাম আছে ইত্যাদি জ্ঞাত করালেন। বৌদ্ধতীর্থগুলির নাম, পরিচয়, গমনাগমনের সুবিধা এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পরিচয় দিলেন। যাত্রা শুভ হ'ক, এই কামনা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, কবে যাত্রা করবেন?

—এই বৎসরই। বর্তমানে আমি রাজধানী চাং-য়াঙে যাচ্ছি। দুই মাস পরে সেই স্থান থেকে যাত্রা করব। এই পথেই যাব আমরা। সুতরাং দুই মাস পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। আমার সঙ্গে আরও চারিজন ভিক্ষু যাবেন। তাঁরা বর্তমানে রাজধানীতে আছেন। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেই যাচ্ছি আমি।

—তাঁদের নাম ও পরিচয়!

—পরিচয় তাঁরা বৌদ্ধভিক্ষু। তথাগতের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছু। আর তাঁদের নাম ভিক্ষু পুই-চিং, তাও-চিং, হুই-হিং এবং হুই-ওয়েই।

কুমারজীব বললেন, আপনি এসেছেন, আমি এজন্য ধন্য। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে যান।

কুঙ্গ বললেন, অমন কথা বলবেন না। বরং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমারই জন্ম সার্থক হল। আমাদের সম্রাট আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার —

বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, ওকথা থাক।

কুঙ্গ বলেন, থাক। কিন্তু আমি তো চাৎ-য়াঙে যাচ্ছি, প্রত্যাবর্তনের সময় আপনার জন্য কোন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতে পারি কি?

কিয়ৎকাল নীরব থাকেন কুমারজীব। তৎপরে বলেন, আমার একটি মাত্র বস্তুরই প্রয়োজন ছিল—ধর্মগ্রন্থ। রাজধানীতে যা কিছু পাওয়া যায় সেনাপতি হো-লুসূন তা অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে একটি সংবাদ যদি রাজধানী থেকে এনে দিতে পারেন কৃতার্থ হই।

—আদেশ করুন মহাভাগ।

—সেনাপতি হো-লুসূনের অবরোধে তাঁর প্রধানা উপপত্নী অ-খু-মো-তি নামের একটি হতভাগিনী নারী আজও জীবিতা আছে কিনা সম্ভব হলে এই সংবাদটি নিয়ে আসবেন। এখন তার বয়ঃক্রম ছয়চল্লিশ। যৌবনোত্তীর্ণা সে। হয়তো সেনাপতি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তা করে থাকলে বর্তমানে সে কোথায় আছে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন?

ভিক্ষু কুঙ্গ বিস্মিত হয়ে বলেন, সেনাপতির উপপত্নীর প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন ভদন্ত? সে কি আপনার পরিচিতা?

—সে ছিল কুচীনগরীর আ-লী বিহারের অগ্‌গবিনতা। মহাধার্মিক ভিক্ষুণী। পূর্বাশ্রমে সে ছিল কুচীরাজ্যের কুমার ভট্টারিকা, রাজনন্দিনী, বস্তুত আমার ভগ্নী সে।

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন ভিক্ষু কুঙ্গ। বলেন, ক্ষান্ত হন ভদন্ত। আমি সহ্য করতে পারছি না।

সহাস্যে কুমারজীব বলেন, সে কিন্তু সহ্য করেছিল! আপনার যদি ক্লান্তি না আসে তবে তার পূর্ণ উপাখ্যান আমি আপনাকে জ্ঞাত করতে চাই। সে পুণ্যশ্লোকা মহাভিক্ষুণী। তার জীবনকথা আলোচনাতেও পুণ্য।

—আপনি বলুন মহাভাগ। আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

কুমারজীব অতঃপর একেবারে শৈশবকাল থেকে অক্ষুমতীর জীবনকথা বিবৃত করলেন ভিক্ষু কুঙ্গকে। শুধুমাত্র অক্ষুমতীর প্রেমাস্পদের নাম গোপন করলেন—কারণ মহাস্থবির বুদ্ধযশা এখনও জীবিত—কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান তিনি। ভারত আগমনের সময় অর্হৎ কুঙ্গ কুচীনগরী হয়েই যাবেন। অহেতুক বুদ্ধযশাকে বিড়ম্বিত করা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করে ভিক্ষু কুঙ্গ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহাভাগ। এই মহিয়সী নারী সেনাপতির অবরোধেই থাকুন অথবা শহরের গণিকালয়েই থাকুন—এঁকে আমি উদ্ধার করবই।

—সে যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তাকে সসম্মানে নিয়ে আসবেন। সে যদি না আসতে চায় তাহলে বাকি জীবন সে যাতে ভদ্রভাবে—

বাধা দিয়ে কুঙ্গ বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ভদন্ত।

তিন মাস পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সেই চৈনিক পরিব্রাজক, তাঁর চারজন সঙ্গীসহ। মহাস্থবিরের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা পশ্চিমাভিমুখে পদযাত্রা করবেন। যাত্রার পূর্বে ভিক্ষু কুঙ্গ কুমারজীবকে পুনরায় নিশ্চিন্ত করে গেলেন। সংবাদ জানিয়ে গেলেন—দুই বৎসর পূর্বেই চাং-য়াঙে চিরশান্তির দেশে মহাপ্রয়াণ করেছেন ভিক্ষুণী অ-খু-মো-তি। তাঁর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে।

'হাংশী'-র প্রথম বৎসরে (৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে) এক শুভ প্রভাতে তাঁর উপরোক্ত চারজন সঙ্গীসহ অর্হৎ কুঙ্গ চ্যাং-য়ান থেকে সুদূর বুদ্ধভূমির দিকে যাত্রা করলেন। লংচো পর্বতমালাকে পশ্চাতে ফেলে পরিব্রাজকের দল যখন কিংকুই রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হলেন তখন গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসান। বর্ষাকালে বিহারের অভ্যন্তরে সাধনভজনের ব্যবস্থা শাক্যমুনির আমল থেকেই প্রচলিত। এ সময় ভিক্ষুদের ভিক্ষার্থে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এদেশের রাজা তূয়ান ইয়ে তীর্থযাত্রীদের বহুল পরিমাণে সাহায্য করেন। এখানে অবস্থানকালেই এঁরা চীন থেকে আগত অপর একটি তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরাও ভারতবর্ষ দর্শনে চলেছেন। সংখ্যায় তাঁরাও পাঁচজন। সমস্ত দলটি অতঃপর উপনীত হলেন চীনের সিংহদ্বার তুন-হুয়ান-এ। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের দক্ষিণ প্রান্তে এই প্রখ্যাত গুহামন্দির সমন্বিত শহরটির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আশী লী এবং উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ লী। এখানে মাসাধিককাল অবস্থান করে অর্হৎ কুঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গীরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন; দ্বিতীয় দলটি কিন্তু সেখানেই রয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের দুর্গম পথযাত্রা শুরু হল এখান থেকেই, কারণ এবার তাঁদের যাত্রাপথ দুস্তর গোবি মরুভূমির উপর দিয়ে। পরিব্রাজক তাঁর দিনপঞ্জিকায় এই অংশে যা লিখে গেছেন তা ভ্রমণ-সাহিত্যে শাশ্বত ইতিহাস রচনা করবার দাবী রাখে। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা প্রথমে একজন পথ-প্রদর্শকের সন্ধান করেছিলাম। পাইনি। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রথমত, যে মহান সঙ্কল্প নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তা থেকে নিবৃত্ত হবার মতো বাধা গোবি মরুভূমি উপস্থাপিত করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, এই বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে কোনও পথের চিহ্ন না থাকলেও পূর্বসুরীদের সঙ্কেত ছিল—অগণিত পথিকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল। সেই অস্থিরেখা ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা।"

সেন-সেন, খোটান, গোমতী বিহার অতিক্রম করে অগ্নিদেশে বা কারাহ্শরকে পিছনে ফেলে ভিক্ষুদল অবশেষে উপনীত হলেন কুমারজীবের জন্মভূমি কুচীনগরীতে।

দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরে ভস্মীভূত কুচীনগরী পুনর্জীবন লাভ করেছে। পো-সাঙ মৃত। সম্মুখযুদ্ধেই নিহত হয়েছিলেন তিনি। রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল, পুনরায় নির্মিত হয়েছে। মহাসঙ্ঘারামও তাই। সেখানে মহাস্থবির হচ্ছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা। কুমারজীবের অনুরোধে তিনি কাশগড় ত্যাগ করে এখানে এসেই অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আ-লী বিহার অবস্থিত ছিল পর্বতের চূড়ায়। সেখান থেকে অল্পবয়স্ক ভিক্ষুণীদের অপহরণ ও বয়স্কাদের হত্যা করে হুণসৈন্য প্রত্যাবর্তন করেছিল। কাষ্ঠনির্মিত বিহারে অগ্নিসংযোগ করেনি। অর্হৎ কুঙ্গ একদিন এসে উপনীত হলেন কুমারজীবের স্মৃতিবিজড়িত সেই কুচী সঙ্ঘারামে।

চৈনিক পরিব্রাজকদের আগমন সংবাদে মহাস্থবির স্বয়ং এগিয়ে এলেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে। কুশল ও সৌজন্য বিনিময়াস্তে অর্হৎ কুঙ্গ বললেন, মহাথের! আপনার নামই তো ভিক্ষু বুদ্ধযশা?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

—আমি আপনার জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছি।

অঙ্গরাখা থেকে সযত্ন-রক্ষিত একটি ভূর্জপত্র বার করে দেন চৈনিক ভিক্ষু। বুদ্ধযশা সবিস্ময়ে সেটি নিয়ে আদ্যন্ত পাঠ করে চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁর গুরু মহাথের কুমারজীবের হস্তাক্ষর। তিনি লিখেছেন;

"মহাকারুণিকের পদপ্রান্তে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন।। অতঃপর হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশা, মহাচীন এক উর্বর অকর্ষিত ক্ষেত্র।'। অগ্নিদেশ, শৈলদেশ, ভূস্বর্গ ও ভারত-ভূখণ্ডে অগণিত বৌদ্ধ ধর্মাচার্য বর্তমান, যাঁরা সদ্ধম্মের প্রচারের যথোচিত ব্যবস্থাদি করণে সক্ষম।। পরন্তু চীনখণ্ডে প্রচারকের এবং প্রবক্তার একান্ত অভাব। আমি বৃদ্ধ।। বিদায়গ্রহণের কাল সমাগত।। কুচী সঙ্ঘারামে একদিন আপনি আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছিলেন। চীনখণ্ডে আপনি আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়া আমাকে ধন্য করিবেন কি? যদি আমার শেষ ইচ্ছা পূরণে উৎসাহী হয়েন তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি সমভিব্যাহারে আসিবেন।।"

দীর্ঘতালিকার উপর চক্ষু বুলিয়ে বুদ্ধযশা বলেন, ভিক্ষু কুঙ্গ, আপনি এ পত্রের মর্ম সম্বন্ধে অবহিত?

—আদৌ নয়। কেন, কী আছে ওতে?

বুদ্ধযশা আদ্যন্ত পত্রটি পাঠ করে শোনালেন। চৈনিক ভিক্ষু বললেন, মহাস্থবির যথার্থ কথাই বলেছেন। চীনখণ্ড আপনাকে আহ্বান করছে। সমগ্র চীনবাসীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠেন বুদ্ধযশা। এ আহ্বান কেমন করে প্রত্যাখ্যান করেন? চীনে আছেন মহাস্থবির কুমারজীব—তাঁর গুরু, তাঁর পথপ্রদর্শক, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। কে জানে, হয়তো এখনও জীবিতা আছে আরও একজন হতভাগিনী!

সপ্তাহকাল চৈনিক ভিক্ষুরা অবস্থান করলেন সেই সঙ্ঘারামে। তারপর একদিন ভিক্ষু কুঙ্গ বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, এইস্থলে ভিক্ষুণীদিগের জন্য একটি বিহার ছিল। তার নাম আ-লী। সেটি কোথায়?

—আ-লী বিহার? আপনি তাঁর নাম শুনলেন কোথায়?

—শুনেছি মহাস্থবির কুমারজীবের জননী ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন এই আ-লী বিহারে অগ্‌গবিনতা। সে তো প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর তীর্থস্থান।

—ঠিকই শুনেছেন আপনি। আমি স্বয়ং আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।

পরদিন প্রত্যুষে ওঁরা দুইজনে অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন আ-লী পর্বতচূড়ায়। অপরাপর চৈনিক

পরিব্রাজকেরা সেদিন গেলেন খ্যিজিল সঙ্ঘারাম দর্শনে। আ-লী বিহারে উপনীত হলে বর্তমান কালের অগ্গবিনতা ভিক্ষুণী এসে মহাস্থবির এবং চৈনিক পরিব্রাজকের চরণবন্দনা করল। পাদ্যর্ঘ্য এনে স্বয়ং ধৌত করে দিল অতিথির চরণ। সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল প্রথমেই বিহারের কেন্দ্রস্থ চৈত্যগৃহে। চৈনিক শ্রমণ স্তূপপদমূলে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিছুক্ষণ প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মাননীয় অগ্গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী জীবাদেবীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

অগ্গবিনতা পথ প্রদর্শন করে মাননীয় অতিথিকে নিয়ে আসে প্রাক্তন অগ্গবিনতার পরিবেণে। সে কক্ষটি এখন ব্যবহৃত হয় না। ভিক্ষুণী জীবার ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি ত্রি-চীবর ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন সেখানে সযত্নে রক্ষিত। এক পুরুষেই জীবাদেবীর উপর প্রায় দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে। চৈনিক শ্রমণ সেখানে প্রণাম নিবেদন করে কিছু কালাগুরু চূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন পুণ্যশ্লোকা জীবার স্মৃতিতে। তারপর বললেন, মাননীয় অগ্গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী অক্ষমতীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধযশা সবিস্ময়ে বলেন, অক্ষমতী! আপনি তাকে চিনলেন কেমন করে?

চৈনিক শ্রমণ তাঁর কথার প্রত্যুত্তর না করে অগ্গবিনতাকেই বলেন, আপনার পূর্বে যিনি এ বিহারে অগ্গবিনতা ছিলেন, তিনি কি প্রাক্তন কুচীরাজকন্যা অক্ষমতী নন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। আসুন ভদন্ত। তাঁর পরিবেণটিও অব্যবহৃত। তাঁর ব্যবহৃত যষ্টি, তাঁর পরিধেয় চীবর এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্র সেখানে সসম্মানে সংরক্ষিত। তিনি পুণ্যশ্লোকা।

চৈনিক শ্রমণ সেই পরিবেণের প্রবেশদ্বারেও কিছু কালাগুরুচূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন।

অতঃপর বিহারের সকল ভিক্ষুণী চৈত্যগৃহে সমবেত হলেন। বুদ্ধযশার পরিচালনায় সকলে সমবেতভাবে প্রার্থনাসঙ্গীত করলেন। চৈনিক শ্রমণও যোগ দিলেন সে প্রার্থনায়।

প্রত্যাবর্তনের পথে বুদ্ধযশা আর কৌতূহল দমন করতে পারেন না। বলেন, ভদন্ত! এক্ষণে বলুন অক্ষমতীর নাম আপনি কোথায় শুনেছেন?

চৈনিক পরিব্রাজক অপাঙ্গে একবার সহযাত্রী অশ্বারোহীর দিকে দৃক্‌পাত করেন। রহস্য করে বলেন, চীন দেশে নানান ভোজবিদ্যা প্রচলিত, আপনি শোনেননি?

বুদ্ধযশা কাতরভাবে বলেন, তাহলে একটা কথা বলুন। সে হতভাগিনী কি আজও জীবিতা?

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পর্শের মতো একটা সম্ভাবনার কথা উদয় হল চৈনিক শ্রমণের অন্তরে। তিনি অশ্বকে গতিরুদ্ধ করেন। বলেন, বলছি। তৎপূর্বে আমার কয়েকটি প্রতিপ্রশ্নের উত্তর দিন?

—বলুন?

আপনি বলেছিলেন, আপনি মহাথের কুমারজীবের নিকটেই উপসম্পদা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেটা কি ভিক্ষুণী অক্ষমতীর সন্ন্যাসগ্রহণের ঠিক পূর্ব দিবসে?

বুদ্ধযশা বলেন, আপনি কি অন্তর্যামী? হ্যাঁ, তাই বটে।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—মহাথের তাঁর জননী এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতীকে নিয়ে কাশগড় থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কি আপনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন?

—আশ্চর্য! হ্যাঁ, ছিলাম।

—পথে কি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়? আপনি এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতী দলচ্যুত হয়ে কি একটি নির্জন গুহায়—

চিৎকার করে ওঠেন বুদ্ধযশা; বলুন আপনি কে ? আপনি ভিক্ষু কুঙ্গ নন! আপনি অন্তর্যামী! বলুন কী আপনার সত্য পরিচয়?

—বলছি। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন ভদন্ত। আমার নাম কুঙ্গ নয়। ও নামে চীনখণ্ডে কেউ আমাকে চিনবে না। যেমন 'কুমারজীব' এ নামে আপনার গুরুকেও সেখানে কেউ চিনবে না।

বুদ্ধযশাও অশ্বের গতি সম্বরণ করেছিলেন। চৈনিক ভিক্ষুর শেষ কথাটা তাঁর কানে যায়নি। তিনি যেন সহসা আত্মস্থ হয়ে গেছেন। দূর দিগন্তে—যেখানে তুষারধবল পর্বতচূড়া ঘননীল আকাশের

চালচিত্রের সম্মুখে ধ্যনমগ্ন, তিনি যেন সেখানেই কোন অতীতদিনের স্মৃতির শিলালেখ সন্ধানে স্তিমিতদৃষ্টি। কেমন যেন ভাবাবিষ্ট। শান্তস্বরে বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, আপনি যখন এত সংবাদ অবগত আছেন, তখন কি জানেন না—সেই হৃতভাগিনী এই আ-লী বিহার থেকে অপহৃতা হয়েছিল?

—জানি ভদন্ত। এজন্য আপনারই মতো অনুশোচনায় আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বুদ্ধযশা ক্ষণকাল অপেক্ষা করেন। তারপর মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করেন, তার সেই গ্লানিকর কদর্য জীবনের কি আজও অবসান হয়নি?

চৈনিক পরিব্রাজক শান্তস্বরে প্রত্যুত্তর করেন, তথাগতের অসীম করুণা! ভিক্ষুণী অক্ষুমতী নিব্বাণলাভ করেছেন। এ সংবাদ মহাস্থবির কুমারজীবকে জানিয়েছিলাম। আজ আপনাকেও জানালাম।

বুদ্ধযশা অবনত মস্তকে আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন, তথাগতের অশেষ করুণা। চলুন এবার ফেরা যাক।

সেই রাত্রেই বুদ্ধযশা চৈনিক শ্রমণকে বললেন, 'ভদন্ত, আপনি তখন বলেছিলেন, মহাঅর্হৎ কুমারজীবকে চীনখণ্ডে 'কুমারজীব' নামে কেউ চিনবে না। একথা কেন বলেছিলেন?

—সেখানে তাঁর নামরূপের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষণে তিনি স্থবির, জরাগ্রস্ত। চীনখণ্ডে তাঁর নাম 'চিয়ু-মো-লো-শিহ্'।[11]

—আপনি আরও বলেছিলেন 'কুঙ্গ' আপনার নাম নয়! আপনার প্রকৃত পরিচয় কী?

—'কুঙ্গ' আমারই নাম। পিতৃদত্ত নাম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে আমার দীক্ষা হয়। সন্ন্যাসজীবনে আমাকে উপাধি দান করা হয় 'সি'। চীনভাষায় 'সি' শব্দের অর্থ 'শাক্যনন্দন', সেটি তথাগতের নামান্তর। বলুন, সে নাম কি স্বীকার করা যায়? কিন্তু সেটা উপাধি, নাম নয়। সন্ন্যাসজীবনের সঙ্ঘ আমাকে যে নামে চিহ্নিত করে দিলেন, চীনাভাষায় তার অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি' বা 'মূর্ত বিনয়'। বলুন ভদন্ত, দুর্বিনীতের মতো সে নামটাই বা নিজ পরিচয় হিসাবে প্রদান করি কি করে?

বুদ্ধযশা বলেন, তা হ'ক। সন্ন্যাসজীবনে আপনার যা নাম সে নামেই আপনি পরিচিত হবেন। ভারত ভূখণ্ডে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক হিসাবে আপনার সেই অভিধাই ভারত-ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মাননীয় ভিক্ষু, বলুন সে নামটি কী?

চৈনিক শ্রমণ সলজ্জে বলেন, সন্ন্যাস জীবনে আমার নাম : ফা-হিয়েন।

*　　　　*　　　　*

সে রাত্রে কুচী মহাসঙ্ঘারামে রাত্রের তৃতীয়যামে আশ্রমিকরা যখন গভীর নিদ্রায় সুসুপ্ত তখনও মাত্র দুইজন বৌদ্ধশ্রমণ শয্যাগ্রহণ করেননি। পাশাপাশি দুইটি পাষাণ-প্রকোষ্ঠে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে দুইজনই প্রার্থনায় বসেছেন। উভয়েই চিত্তচাঞ্চল্যে উদ্বিগ্ন। অন্তরের উৎকণ্ঠা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তথাগতের চরণমূলে নিবেদন করে শান্তির সন্ধান করছেন একান্ত-উপাসনায়। অথচ আশ্চর্য—তাঁরা যদি পরস্পরের আন্তর-বিষাদের তথ্য অবগত হতে পারতেন, তবে হয়তো নিজেরাই সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

নির্জন পরিবেশে অজীনাসনে সমংকায়শিরগ্রীব ভঙ্গিতে উপাসনায় বসেছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা। অর্হৎ ফা-হিয়েন-এর কাছে অক্ষুমতীর শেষ সংবাদ শ্রবণ করে তিনি অপরিসীম মনোবেদনায় কাতর। অবশ্য এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারত? অগ্‌গসেবিকা পরিনিব্বাণ লাভ করেছেন, তাঁর ক্লেদাক্ত জীবনের অবসান ঘটেছে—এ তো আনন্দেরই সংবাদ। না, সেজন্য নয়, মৃত্যুর জন্য কোনও আক্ষেপ নাই—কিন্তু সেই মহিমময়ী ভিক্ষুণী যে এভাবে অবজ্ঞাত, অনাদৃত, প্রিয় পরিজন-পরিত্যক্ত ঘৃণ্য পরিবেশে এই পঠবিং (পৃথিবী) থেকে বিদায় নিলেন এই তথ্যটাই ভিক্ষুর মর্মমূলে বিদ্ধ হচ্ছিল। পরিবেশের একান্ত পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে যুক্তকরে প্রার্থনা করছিলেন তিনি : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু। এভাবে কেন আমাকে রক্ষা করলেন।

অতীত জীবনের স্মৃতি—অক্ষুমতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং অনুরাগঘন কথোপকথন এতদিন তিনি বিস্মৃত হতেই সচেষ্ট ছিলেন। সেগুলি ছিল তাঁর সাধনার পথে অন্তরায়। কাশগড়ের চৈত্যে প্রদীপহস্তে স্তূপ পরিক্রমা, যৌথ প্রার্থনাসঙ্গীত, অক্ষুমতীর উপহার এবং তাঁর প্রত্যাখ্যান, তারপর কাশগড় থেকে কুচী প্রত্যাগমনের পথে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা—প্রলয়মুহূর্তে একটি বেপথুমানা নারীদেহকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করা, নির্জন গুহায় রুদ্ধশ্বাসরমণীর বিম্বাধর উন্মুক্ত করে—না! এসব চিন্তা অশুচি, অকল্যাণকর! তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের নির্দেশ আছে তার সপ্তম নির্দেশ : সম্মাসতি! সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি। নির্জনগুহার সেই স্মৃতি সৎচিন্তা নয়। তাকে অন্তরের অবচেতনে নির্বাসনে পাঠাতেই হবে। তাই পাঠিয়েছিলেন এতদিন।

মহাথের কুমারজীব যখন চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন একটি পত্রবাহকের হস্তে তিনি কাশগড়ের সঙ্ঘারাম থেকে বুদ্ধযশাকে কুচীনগরীতে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহাথের বুদ্ধযশাকে আদেশ করেছিলেন কুচীসঙ্ঘারামের মহাস্থবিরের পদ অলঙ্কৃত করতে। মনে আছে, সেই পত্রখানি হাতে নিয়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধযশা। কী তাঁর করণীয় বুঝে উঠতে পারেননি। কুচী সঙ্ঘারামের দায়িত্ব গ্রহণ করলে অনিবার্যভাবে গ্রহণ করতে হয় আ-লী বিহারের অগ্‌গবিনতা অক্ষুমতীর দায়িত্ব। শঙ্কা ছিল সেখানেই। সম্মাবায়ামোর (সৎ যৌগিক উদ্যোগে) মাধ্যমে অন্তরের তন্‌হা (তৃষ্ণা)-কে, ছত্তিসংসতি সোতা-(ছত্রিশ প্রকারের জাগতিক কামনা-বাসনা)-কে অবদমিত করেছিলেন, আশঙ্কা ছিল অক্ষুমতীর সমীপবর্তী হলে গিরিমেখলবাহন তাঁর অন্তর-রাজ্য পুনরায় দখল করতে চাইবে। অথচ দীক্ষাগুরুর আদেশও অমান্য করতে পারেননি। তাই সেদিন তিনি এমনই ভাবে তথাগতের মূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা করেছিলেন : 'এই পরীক্ষাতে আমাকে সসম্মানে উত্তীর্ণ কর প্রভু! আমি যেন 'অনুপাদিয়ানো' (আসক্তিহীন) নিষ্ঠায় অভিঞ্‌ঞা (উচ্চতর জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি) লাভ করি। আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে তন্‌হাকে তিরোহিত কর।' তাই করেছিলেন তথাগত। তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন্। কাশগড় থেকে কুচীনগরীতে এসে বুদ্ধযশা দেখতে পেয়েছিলেন—তাঁর সম্ভাব্য চিত্তচাঞ্চল্যের মূল উপকরণটি বিদূরিত। আ-লী বিহার থেকে অগ্‌গসেবিকা অক্ষুমতী অপহৃতা! সারাজীবনে সেই মূর্তিমতী তন্‌হার সম্মুখে আর তাঁকে কোনদিন দণ্ডায়মান হতে হবে না। তথাগতের এই কারুণ্যে তুষ্ট হতে পারেননি বুদ্ধযশা। সেদিনও তিনি আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু!

পাশের প্রকোষ্ঠেই প্রার্থনারত চৈনিক ভিক্ষু ঠিক তখনই আপনমনে বলছিলেন, হে লোকজ্যেষ্ঠ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও! তোমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের নির্দেশ আছে তার তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে : সম্মা-বাচা (সত্য-বাক্য)। আমি অনৃতের আশ্রয় নিয়েছি, মিথ্যার অনুসরণ করেছি! তুমি আমাকে বলে দাও : সত্য কী? জাগতিক সত্য যদি মঙ্গলময় না হয় তাহলে কোনটি বরণীয়—নিষ্ঠুর সত্য না মঙ্গলকারী অসত্য?

অন্তর-দহনে তিনিও দগ্ধ হচ্ছিলেন। মহাথের কুমারজীবের অনুরোধে তিনি চৈনিক সেনাপতি হো লু-সুনের স্কন্ধাবারে স্বয়ং গিয়েছিলেন। চৈনিক অবরোধে অক্ষুমতীর সঙ্গে ফা-হিয়েনের সাক্ষাতও ঘটেছিল। সেই অনিন্দ্যকান্তি রমণীই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কথা রটনা করতে। হো লু-সুনের অবরোধ থেকে তাঁর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। কিন্তু অহেতুক ভিক্ষু কুমারজীবকে কষ্ট দেওয়াতেই বা কী লাভ? ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদেই তৃপ্ত হবেন তিনি, তাঁর সাধনার পথ নিষ্কণ্টক হবে। ফা-হিয়েন উপলব্ধি করেছিলেন সেই মহীয়সী মহিলার যুক্তি। সত্যই তো! কী লাভ কুমারজীবকে জানিয়ে যে, অক্ষুমতী আজও ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই নরপিশাচের অবরোধে? তাই প্রত্যাবর্তনের পথে ফা-হিয়েন কুমারজীবকে জানিয়ে এসেছিলেন—অক্ষুমতীর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে। আজ পুনরায় একই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু বুদ্ধযশাকে সান্ত্বনা দিতে অষ্টমুখী সত্যমার্গের তৃতীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন ফা-হিয়েন। 'সম্মা-বাচা' নির্দেশ সজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। পার্শ্ববর্তী

পরিবেশে তাই তিনিও প্রার্থনারত : হে শাক্যনন্দন, হে তথাগত ! তুমি বলে দাও—আমি কি পতিত ?

শৈলদেশ-উড্ডিয়ান-নগরহার-গান্ধার-পুরুষপুর।

ফা-হিয়েন চলেছেন গাঙ্গেয় ভারতবর্ষে—তথাগত বুদ্ধের জীবন-লীলাক্ষেত্র পরিদর্শনে। তাঁর চারজন সহযাত্রীর ভিতর দুইজন—লুই-ওয়েই এবং লুই-হিং পথিমধ্যে পথের ক্লেশ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হতভাগ্য লুই-চিং পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুধুমাত্র ভিক্ষু তাও-চিং আছেন তাঁর সঙ্গে। ফা-হিয়েন অতি শৈশবেই সদ্ধর্মে দীক্ষিত—বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে তিনি শিক্ষিত, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষকে। অপরপক্ষে তাও-চিং পরিণত বয়সে দীক্ষা নেন; পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন অধ্যাপক, ছিলেন কবি। চীনাভাষায় তাঁর গীতিকবিতা আছে। তিনি কোনও দিনপঞ্জিকা রেখেছিলেন কি না জানা যায় না; রাখলে তা আরও আকর্ষণীয় হত। ভারতখণ্ডে প্রবেশকালে ফা-হিয়েন আটষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, প্রাক্তন অধ্যাপক তাও-চিং পঞ্চাশ বৎসরের ভিক্ষু। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল ধরে ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থে ফা-হিয়েন বিরাশী[12] বৎসর বয়সে সমুদ্রপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসর ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'ফো-কিউ-কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। অপরপক্ষে তাও-চিং এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ করে ও দেশবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিফলন দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি পাটলিপুত্র পর্যন্ত ফা-হিয়েনের সঙ্গে আসেন। ফা-হিয়েন যখন পাটলিপুত্র ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাও-চিং তাঁকে বলেছিলেন, 'ভদন্ত, আমি এ-দেশেই বাকি জীবন অতিবাহিত করব বলে স্থির করেছি।'

এরপর ফা-হিয়েনের কোনও ভ্রমণসঙ্গী ছিল না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

পুরুষপুর-নগরহিলোত্র-ভিদা-মথুরা।

ফা-হিয়েনের দিনপঞ্জিকায় মথুরার নিকটবর্তী যমুনা-তীরবর্তী রাজ্যের নাম দেখছি : মধ্যরাজ্য। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা অনুসারে—"এ অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, এখানে তুষারপাত বা বালুকাঝড় হয় না। এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এরা কোনও কর দেয় না বা সম্পত্তির কোন হিসাবও দেয় না। এ দেশের অধিবাসীরা যখন খুশি এবং যেখানে খুশি যেতে পারেন। রাজা মৃত্যুদণ্ড ব্যতিরেকেই রাজ্যশাসন করেন। ..... একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত কেহই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না। ..... এদেশের বাজারে কোন মদের দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নাই।"

ফা-হিয়েনের এ ভারত-বিবরণ ছাত্রাবস্থায় পাঠ করেছি, পরীক্ষার খাতায় লিখেছি। কিন্তু এ পরিণত বয়সে আশঙ্কা হয়, সরল প্রকৃতির সাধু পরিব্রাজকটি সম্ভবত তদানীন্তন ভারতবর্ষের নিচের তলার স্বরূপটা দেখতে পাননি। তিনি ক্রমাগত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে আতিথ্য নিয়েছেন—আশঙ্কা হয়, সেই সব সঙ্ঘারামের বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁকে যে পথে পরিচালিত করেছেন তা আজকের দিনের ভাষায় 'কন্ডাকটেড্ টুর'। গুপ্তযুগের সমসাময়িক সাহিত্য পাঠে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, বাজারে তখন শৌণ্ডিকাপণ ছিল না, মাংসের বিপণী ছিল না। বোধ করি সাহিত্যের অধ্যাপক তাও-চিং ভ্রমণকাহিনী লিখলে আরও বাস্তবচিত্র পেতাম আমরা।

মথুরা—সাংস্যসেঙ (কনৌজ-এর পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে একটি গ্রাম)— অগ্নিদগ্ধবিহার—কান্যকুব্জ —কোশল—শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে পরিব্রাজক লিখছেন, "এই নগরীর প্রাক্তন-গরিমা অস্তমিত। বুদ্ধের সমসময়ে এই শ্রাবস্তীতেই ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী। এ স্থানেই ছিল মহাপ্রজাপতি ও জেতবন বিহার এবং এই পুণ্যভূমি অর্হৎ অঙ্গুলিমাল ও অনাথপিণ্ডৎ-এর স্মৃতি বিজড়িত। এখন এখানে মাত্র দুইশত ঘর মানুষের বাস। স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামবিশেষ।"

শ্রাবস্তী—জেতবনবিহার—তাদওয়ানগর—কপিলবস্তু।

"কপিলবস্তু নগরীতে অসংখ্য স্তূপ আছে, তার মধ্যে শুদ্ধোদন-প্রাসাদে মায়াদেবীর গর্ভধারণের পূর্বে শ্বেতহস্তীরূপে তথাগতের স্বপ্ন-আবির্ভাব, রাজপুত্রের নগর পরিক্রমাকালে চারিটি দৃশ্য দর্শন, ন্যগ্রোধারাম বিহারে বুদ্ধত্বলাভের পরে পিতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎস্থল, ... প্রভৃতি পুণ্যস্থান চিহ্নিত করে স্তূপ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু হায়! পরমকারুণিকের জীবনস্মৃতি বিজড়িত যে কপিলবস্তু নগরী এককালে দিবারাত্র কলমুখরিত থাকত—এখন তা মূক, বধির। নগরী জনশূন্য বললেই হয়। বিশাল প্রাক্তন-নগরীর ধ্বংসস্তূপের ভিতরে মাত্র দুই-এক ঘর পরিবার এখানে বাস করেন। আর আছেন সাধারণ কিছু বৌদ্ধভিক্ষু।"

লুম্বিনী—রামগ্রাম—বৈশালী।

লিচ্ছবী রাজগণের রাজধানী বৈশালীর উত্তর-সীমান্তে বনভূমির মধ্যে অবস্থিত আম্রবন-বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন পরিব্রাজক। অম্বপালী বা আম্রপালী ছিলেন রাজনটী। তিনি যেন ভিক্ষুণী অক্ষুমতীর বিপ্রতীপ রূপ। অক্ষুমতী হয়েছিলেন ভিক্ষুণী থেকে বর্বর হুণ সেনাপতির উপপত্নী; আর রাজনটী আম্রপালীর উত্তরণ হয়েছিল রাজ্যের জনপদকল্যাণীর পদ থেকে অর্হৎ ভিক্ষুণীতে! এই নগরনটীর গর্ভে স্বয়ং বিম্বিসারের ঔরসে জন্মলাভ করেছিল এক জারজপুত্র—জীবক। ভেষগাচার্য হয়েছিলেন তিনি পরবর্তীকালে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গৌতমবুদ্ধ কুশীনগর যাওয়ার পথে এই রূপোপজীবিনীর অতিথি হন। মহাপুরুষের সেই ক্ষণিক সান্নিধ্যে নটীর জীবনে এল যুগান্তর। আজীবনের সঞ্চয় দান করে তিনি শরণ নিয়েছিলেন—বুদ্ধের, ধর্মের, সঙ্ঘের।

অবশেষে মগধ রাজধানী পাটলীপুত্র।

"মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলীপুত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্য প্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করা হয়। দরিদ্র অনাথ আতুরদের আহারাদি ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকেরা বেশ যত্নসহকারেই তাদের পরীক্ষা করে ঔষধপথ্যাদি প্রদান করেন এবং সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসালয়ে রাখেন।"

পাটলীপুত্রের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এটুকুই লিপিবদ্ধ। বাদবাকি শুধু বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিবরণ। ফা-হিয়েন যে সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্রে বাস করেন তখন গুপ্তসংস্কৃতির সূর্য মধ্যগগনে। অথচ কী আশ্চর্য—সে-কথার ইঙ্গিতমাত্র তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে কোথাও নেই। যে পথে তিনি ভারত পরিক্রমা করেন তার বারো আনাই ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—সমস্ত অংশের একচ্ছত্র অধিপতি মহারাজ-চক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য—অথচ তাঁর দিনলিপিতে 'গুপ্তসাম্রাজ্য' অথবা 'গুপ্তসম্রাটের' কোনও উল্লেখ নেই। সমসাময়িক অসীম প্রতিভাধর যে সব ব্যক্তি তখন মগধ রাজধানী পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করতে বাধে না—অমরসিংহ, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, কালিদাস, বেতালভট্ট, আর্যভট্ট, শূদ্রক প্রভৃতি কেউই স্থান পাননি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। ঐ সব যুগান্তকারী ব্যক্তিরা যে সমসাময়িক, তাঁরা যে সে সময় পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন একথার সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই; কিন্তু গুপ্তযুগের ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য নাটক-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিকাশ যে পাটলীপুত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান ছিল একথা সন্দেহ করারও কোন কারণ নেই। বৌদ্ধভিক্ষু সেসবদিকে সম্ভবত আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি; করে থাকলেও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে তার প্রতিফলন হয়নি।

*　　　*　　　*

পাঠক-পাঠিকা! এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ফা-হিয়েনের বিষয়ে নিছক ইতিহাস। এবার অনুমতি করুন —কল্পনায় কাহিনীর জাল বুনি—

*　　　　*　　　　*

ফা-হিয়েন এবং তাও-চিং আজ মাসাধিককাল আছেন পাটলীপুত্রের মহাসঙ্ঘারামে। কবি প্রকৃতির ভিক্ষু তাও-চিং মুগ্ধ হয়ে গেছেন এ নগরীর বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রায়। সর্বত্রই প্রাচুর্যের লক্ষণ। নগরবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ—শৈব উপাসকও বড় কম নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায় ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। নগরী প্রায় প্রত্যহই উৎসব মুখরিত। সকলে সর্বসময়েই যেন উৎফুল্ল। রঙ্গরস নগরীর পথে-ঘাটে।

কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ—ত্রিভূমিক; পাষাণনির্মিত। অগণিত কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, বিচিত্রিত কক্ষ, প্রাসাদশীর্ষে মঙ্গল-কলস ও তদুপরি ধ্বজা। দুর্গের আকারে সুউচ্চ প্রাচীরে রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত। প্রাকারশীর্ষে সারি সারি ইন্দ্রকোষ—সেখানে অতন্দ্রপ্রহরায় ধানুকী। ওই প্রাচীরের বহির্দিকে প্রশস্ত পরিখা। একটি মাত্র সিংহদ্বার। যার ভিতর দিয়ে হাওদা-সহ রাজহস্তী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। সিংহদ্বারের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত একটি সেতু—কপিকলের সাহায্যে তা উঠানো-নামানো যায়। রাত্রের প্রথম প্রহরে কালসূচিকা যবনী প্রহরিণী ধাতব ঘণ্টাধ্বনির সঙ্কেত করলে সেই কাষ্ঠনির্মিত সেতু অপসারিত হয়, ব্রাহ্মমুহূর্তে বৈতালিকদল রামকেলীতে মাঙ্গলিকী শুরু করলে সেতু যথাস্থানে অবনমিত হয়। সিংহদ্বারের সরাসরি রাজপথ উন্মুক্ত প্রান্তর ভেদ করে এসে পড়েছে এক শোভাস্তম্ভ-শোভিত উদ্যানে। স্তম্ভটি বস্তুত একটি প্রকাণ্ড সূর্যঘড়ি—আর্যভট্টের নির্দেশে নির্মিত। তার ছায়াপাত নগরবাসীকে দিবাভাগে সময় নির্দেশ করে। ঐ স্তম্ভকে কেন্দ্র করে একটি চতুর্মহাপথ। তার ধারে ধারে অধিকরণসমূহ—মহাক্ষ-পটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষের অধিকরণ, শুল্কাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতি প্রভৃতির অধিকরণ। চতুর্মহাপথের একটি বাহু পণ্যকেন্দ্রের দিকে প্রসারিত। সেখানে পথপার্শ্বে অজস্র পণ্যবিপণী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপণী, সৌণ্ডিকাপণ। শেষোক্ত স্থানটি মদ্যপদিগের বেলেল্লাপনার স্থান নয়, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মাল্য-চন্দন-সৌগন্ধ্যির আয়োজন। একক পানের ব্যবস্থা। কোথাও বা দীর্ঘায়তন কক্ষে যৌথপানের আয়োজন। সেখানে দিবসান্তে সমবেত হন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ—শ্রেষ্ঠী, সওদাগর, রাজপুরুষেরা। আসেন শিল্পী, ভাস্কর, কবি, নাট্যকার। অক্ষবাটের পাষ্টির পার্শ্বপরিবর্তনে সেখানে শ্রেষ্ঠী ও অকিঞ্চন ভাগ্য বিনিময় করে। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এবং ভৃঙ্গারবাহিনী সুতনুকা পরিচারিকার দল বিলোল কটাক্ষের অনুপানসহ সরবরাহ করে চলে শূল্যপক্ব মেষমাংস এবং নানা জাতের মদিরা—গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধবক, আম্রশীধু, প্রসন্না, আসব, অবিষ্ঠ, মধ শ্বেতসুরা, বারুণী, সোমরসিকা। ইদানীংকালের আসব-প্রেমিক 'আধারকার' যেমন এক এক পরিবেশে এক-এক পানীয়ের বিধান দেন, গুপ্তযুগের মদিরা-বিশেষজ্ঞও তেমনি এক-এক ঋতুতে এক এক মধু-আস্বাদনের বিধান দিতেন : গৌড়ী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্টী হেমন্তবর্ষয়ে/ শরৎগ্রীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্যা চ নান্যথা।।

পাটলীপুত্রের এই আনন্দঘন আয়োজন সম্বন্ধে অবশ্য ভিক্ষু তাও-চিং কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি—তিনি আজন্ম সংযমী। প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালে ত্রিশরণ অবলম্বন মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "সুরা-মেরেয়-মেজ্জ-পমাদউঠানো বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি" ("সুরা-মেরেয়-মদ্যাদি প্রমাদ কারণ হতে আজন্ম বিরতির ব্রত গ্রহণ করিলাম;) ফলে তিনি মদ্যপান করেন না। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান শ্রুতি-নির্ভর। এই মহাসঙ্ঘারামের তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র এ বিষয়ে তাঁকে পরোক্ষজ্ঞান সরবরাহ করেছিল মাত্র। বুদ্ধভদ্র সম্প্রতি উপসম্পদা নিয়েছে, এ সঙ্ঘারামেরই আবাসিক। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষ। তার জন্ম এক ধনবান শাক্যবংশে, বস্তুত স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের বংশেই তাঁর জন্ম। কৈশোরে এবং তারুণ্যের প্রথম পর্যায়ে পাটলীপুত্র আসবাগারে তার যাতায়াত ছিল।

শুধু আসব নয়, এ মহানগরীর যোষিতেরাও অতি বিচিত্রা। শেন্‌সি, হোনান, চাং-য়ান—বস্তুত সমগ্র হান-সাম্রাজ্যে তাও-চিং যে রমণীদিগকে দেখেছেন তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি ও প্রকৃতিতে। এরা কৃত্রিম কাষ্ঠপাদুকায় চরণদ্বয়ের বৃদ্ধিনাশে আদৌ উৎসাহী নয়, বরং রক্তবর্ণের আলিম্পনে বিচিত্রিত করে যুগলচরণ, তার উপরে পরিধান করে সপ্তস্বরনি : স্বনমধুর আভরণ—তার নাম নূপুর। অভিসার রাত্রিতে আবার নাকি খুলে রাখে সে আভরণ। এদের আননে লোধ্ররেণুর মৃদুপ্রলেপ, নয়নে কজ্জল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম-ইঙ্গুদীতৈলের বর্ণিকাভঙ্গ; কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা। হান-রমণীর ন্যায় এদের গণ্ডদ্বয় চেরীপুষ্পের মতো রক্তাভ নয়, অনিন্দ্য-আননে আষাঢ়-সঘন বুদ্ধভূমি-সুলভ শ্যামলিমার স্নিগ্ধছায়া। হান-কুমারীর মত এরা নিত্যলাজনম্রনয়না নয়—ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা নাগরিকার দল ক্ষণেক্ষণেই কলহংসনিঃস্বনমুখরা; এরা মদালসা, নিপুণিকা, চতুরিকা, কৌতুকপরায়ণা রসিকার দল।

না, মাধ্বীর ন্যায় পাটলীপুত্রী মধুমিতাগণের বিষয়েও আজন্ম-ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিং কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি; প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে এ বিষয়েও তাঁর প্রতিজ্ঞা করা আছে—"নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদম্সনা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি, অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং মমাদিয়ামি" ("নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং কৌতুকাদিদর্শন হতে বিরতি, অব্রহ্মবর্য হতে বিরতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম)—ফলে এ বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা পরোক্ষ, শ্রুতি-নির্ভর। তরুণ-বয়স্ক ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সদ্যত্যক্ত সংসারাশ্রমের স্মৃতিকথা।

কিন্তু তৃতীয় একটি বিষয়ে কবি তাও-চিং গুপ্তযুগের মধু রসাস্বাদন প্রত্যক্ষভাবে করেছেন। সাহিত্য-কাব্য-নাটক। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র তাঁকে সরবরাহ করত সদ্যলিখিত কাব্যের অনুলিপি। সে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর—চীনা কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা গুপ্তযুগের সংস্কৃত কাব্য সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। কৌতুক বোধ করতেন ভিক্ষু তাও-চিং। তিনি তর্ক করতেন ঐ ভারত ঐতিহ্যাভিমানী তরুণের সঙ্গে। বলতেন, না, গুপ্তকবিরা যে মন্দ লেখেন একথা বলা চলে না, তবে চৈনিক কবিকুলের সমকক্ষ হওয়ার এখনও অনেক বাকি।

ক্ষুব্ধ হত বুদ্ধভদ্র। মর্মাহত হত। সবিনয়ে বলত, হয়তো তার হেতু সংস্কৃত ভাষাটা আপনার ঠিকমত আয়ত্ত হয়নি, তাই—

—সে কথা অস্বীকার করি না; তবু তুলনামূলক বিচারে বলব, ভাষার অতিরিক্ত ভাবের রাজ্যেও চৈনিক কাব্যের মাধুর্য অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। ধর না কেন, যে কাব্যগ্রন্থটি তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে—সেই বিবাহিত গোপবালার সঙ্গে বংশীবাদক গোপালকের অবৈধ প্রেম-কাহিনী। এই বিষয় নিয়ে দ্বিশতাধিকবর্ষ পূর্বে জনৈক চৈনিক কবি লিখেছিলেন "গোপালক ও তন্তুবায়-কুমারীর কাব্য"; তফাৎ এই যে, চীনা নায়কও রাখাল বটে, কিন্তু চীনা-নায়িকা তন্তুবায় পরিবারের কুমারী-কন্যা। সেখানেও নায়িকা ঐ রাখাল নায়কের বংশীধ্বনি শুনে ঘর ছেড়ে পথে নামতেন। আরও প্রভেদ আছে; চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পথে মূল বাধাটা শাশুড়ী-ননদিনী বা সমাজ নয়; সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার—পূরুবীয়া হান-যুগের সামাজিক অবস্থাটা সেখানে অনেক ভালভাবে ফুটেছে—

বুদ্ধভদ্র বলে, প্রেম যেখানে উপজীব্য সেখানে সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হল কি হল না সেটা গৌণ। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বিরহের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। এমন কিছু কি চীনা সাহিত্যে আছে?

—আছে। কবি চিন-চিয়ার কথা বলি। রাজাদেশে কবিকে দূরদেশে যেতে হল। সেখান থেকে প্রেয়সীকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে বিরহের যে চিত্র পাই তা অকৃত্রিম। কবি বিদেশ থেকে লিখছেন—

"পুরুষ মানুষের সৌভাগ্য—যেন ভোর বেলাকার শিশির,
দুর্ভাগ্য তার নিত্যসঙ্গী, বিরহবেদনা তার নিত্যসহচর।
মিলন-মধুর মুহূর্ত ? সে তো সুদুর্লভ প্রাপ্তি।

আদেশ পেলেম—রাজাদেশে যেতে হবে ভিন্‌দেশে;
দূরে আরও দূরে, তোমার সঙ্গে ব্যবধান দীর্ঘায়ত করে।
পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার রথ
যাবার আগে একবার তোমাকে দেখব বলে।
গেল শূন্যগর্ভ, ফিরেও এল রিক্ত-শকট।
রিক্ত নয়, এল তোমার অন্তর্-নিঙরানো আর্তি।
আহারে আজ রুচি নাই,
একা পড়ে আছি শূন্য মন্দিরে।
ত্রিযামা যামিনী যায় বিনিদ্র যন্ত্রণায়;
উপাধানটা নিষ্পেষিত, বিপর্যস্ত।
বেদনা যেন বৃত্তাকার : তার চক্রবর্তন অন্তহীন।
মাদুরের মত তাকে গুটিয়ে শেষ করা যায় না।"

সহজ সরল বক্তব্য। শেষ কয়টি পংক্তিতে কবি লিখছেন—

"পড়ে আছে মাথার কাঁটাগুলি,
যারা একদিন মুখ লুকাতো তোমার খোঁপায়।
পড়ে আছে অনাদৃত দর্পণ,
যা একদিন ছবি আঁকত একটি অনিন্দ্য আননের।
অমূল্য সম্পদ এরা নয়,
তবু এরা নয় অকিঞ্চন।
এদের মধ্যেই আছে তোমার স্মৃতি
আর আমার আকিঞ্চন।।[13]

বুদ্ধভদ্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়—এ গীতিকবিতাও অনবদ্য।

তাও-চিং বলেন, তফাৎ আরও আছে। আমাদের কবিপ্রিয়াও ছিলেন স্বয়ং কবি। প্রোষিতভর্তৃকা কবি-প্রিয়া এ পত্রের যে ছন্দোবদ্ধ প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি—না, বুদ্ধভদ্র, তেমন কোন কবিতাও আমি সংস্কৃত সাহিত্যে পাইনি ঃ

"তোমার মুখখানা মনে পড়ছে ক্রমাগত
জাগরণে-নিদ্রায়-স্বপ্নে।
বারম্বার মনে পড়ছে : তুমি চলে গেছ!
সে বুঝি কোন যুগ যুগান্তর অতীতের কথা।
যদি ডানা থাকত এক জোড়া
মেঘের মতন ভেসে যেতাম তোমার কাছে।
এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলেই আমার সান্ত্বনা।[14]

লক্ষ্য করে দেখ বুদ্ধভদ্র—কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। কালো তমালবৃক্ষ দেখে উদ্বন্ধনে অথবা কালো যমুনার জল দেখে জলমগ্ন হয়ে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ নেই। সহজ-সরল বক্তব্য।

বুদ্ধভদ্র বলে, আশ্চর্য! মেঘের মতন?

—হ্যাঁ, মেঘের মতন। এতে অবাক হওয়ার কী আছে!

বুদ্ধভদ্র বলে, ভদন্ত, ঐ 'মেঘের মতন' শুনে আমার আর একটি সম্প্রতিলিখিত কাব্যের কথা মনে পড়ল। আপনি সেটি বরং পড়ে দেখুন—

উৎসাহী তরুণ অতঃপর তাঁকে এনে দিয়েছিল একটি সাম্প্রতিক কাব্য। উজ্জয়িনীর এক উদীয়মান কবির সদ্যসমাপ্ত কাব্য। জনৈক শাপগ্রস্ত যক্ষ তার প্রেয়সীর নিকট মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছে।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপকটি। এ কী অপূর্ব কাব্য! শব্দ প্রয়োগের কী বিচিত্র মুনশিয়ানা, মন্দাক্রান্তা ছন্দের কী জলদগম্ভীর ব্যবহার, অক্ষরে-গাঁথা কী অক্ষয় চিত্র! স্থানে স্থানে অবশ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে অর্থগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছিল; তবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু তাও-চিং। কবির মেঘ যে পথে যাত্রা করেছে উজান পথে তিনি যে সেই সব দেশ দেখতে দেখতেই এসেছেন। মানস সরোবর নয়, তারও উত্তরে অবস্থিত ইশ্‌ক্-কুল হ্রদে তিনি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন স্বচ্ছশীতল জলে গণনাতীত প্রস্ফুটিত পদ্ম, আর সেই বনে সপার্ষদ গজরাজের জলকেলী—"হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ কুর্বন্ কাম ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিমৈরাবতস্য।" কে এই অখ্যাতনামা কবি? উজ্জয়িনীর ভট্ট কালিদাস? বুদ্ধভদ্র বলেছে—মাত্র সপ্তবিংশতি বৎসরের এই ব্রাহ্মণ কবি উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ রত্ন; বর্তমানে তিনি নাকি রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় এই পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। ভিক্ষু তাও-চিং ভিন্ন পথের পথিক; তবু তিনি নিজেও যে একসময়ে চীনা ভাষায় গীতিকবিতা রচনা করেছেন। স্থির করেন, পাটলীপুত্র ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে ঐ উদীয়মান কবির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু সেকথা স্বীকার করলে বুদ্ধভদ্রের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়। কৌতুকপ্রিয় ভিক্ষু তাই এক তির্যকপন্থা অবলম্বন করলেন।

দিন কতক পরে বুদ্ধভদ্র যখন এসে প্রশ্ন করে, 'মেঘদূতম্ আপনার কেমন লাগল?' তখন তাও-চিং কোন উৎসাহ না দেখিয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, মন্দ নয়। তবে কাব্যের মুখবন্ধে কবি যদি চৈনিক কবিদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেন তাহলেই শোভন হত।

বুদ্ধভদ্র বলে, কী বলছেন আপনি ভদন্ত ! তার অর্থ?

—এ তো কোন মৌলিক কাব্য নয়। মেঘকে দূত হিসাবে কল্পনা করার যে ব্যঞ্জনা সেটি তো কবি স্পষ্টতই চীনা সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন—

—ঐ চিন-চিয়ার একটি পংক্তির উল্লেখ থেকে?

—না। অসংখ্যবার ঐ প্রতীকটি চীনা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

—কিন্তু কবি কালিদাস চীনা কাব্য কোথায় পাবেন?

—সম্ভবত কোনও পর্যটক অথবা সার্থবাহের কাছে।

—কিন্তু তিনি ঐ চীনাকাব্য পাঠ করবেন কি করে?

—সেকথা কবিই বলতে পারেন। আমি নই।

অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে বুদ্ধভদ্র। সে স্পষ্টতই মর্মাহত। তারপর বলে, ভদন্ত, সাহিত্যে আমার অধিকার সামান্যই; কিন্তু এতবড় অভিযোগ যখন আপনি এনেছেন, তখন এ প্রতর্কের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আমি কল্য সন্ধ্যায় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিয়ে আসব। আপনি তাঁকে প্রমাণ দিন 'মেঘদূতম্' মৌলিক কাব্য নয়।

কৌতুকপ্রিয় তাও-চিং বলেন, বিতর্কের কী প্রয়োজন বুদ্ধভদ্র! তোমাদের কবি তো শুনেছি বর্তমানে পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। তাঁকেই বরং জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সর্বসমক্ষে নয়—

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বুদ্ধভদ্র বলে, তাঁকে তো বলবই। হ্যাঁ, আমি তাঁর ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপও আছে। সে যা হোক, কাল সন্ধ্যায় আমি আসব।

পরদিন সন্ধ্যায় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র একজন তরুণ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে। অপরাহ্নকাল। ভিক্ষু তাও-চিং সঙ্ঘারামের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের একপ্রান্তে একটি সপ্তপর্ণী বৃক্ষছায়ায় কী একটা গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। আগন্তুককে নিয়ে বুদ্ধভদ্র তাঁর নিকটস্থ হতেই তিনি চোখ তুলে চাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম আনুমানিক ত্রিংশতিবর্ষ। গাত্রবর্ণ চম্পকগৌর নয়, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের আকাশের মতো দীর্ঘ সন্নত শ্যামকান্তি যুবাপুরুষ। ঋজু শালবৃক্ষের মতো সতেজ। প্রশস্ত ললাট, শুকচঞ্চু নাসা, কম্পুগ্রীব। ঊর্ধ্বাঙ্গে চীনাংশুক উত্তরীয় এবং শ্রীফলরস-সম্মার্জিত শুভ্র উপবীত। কণ্ঠে একটি যূথিমাল্য। মস্তক মুণ্ডিত, পশ্চাদ্ভাগে অর্কশিখায় একটি রক্তকরবী অনুবিদ্ধ। ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের মাঙ্গলিকী। সর্বাবয়বে প্রতিভার স্বাক্ষর। তাও-চিং দর্শনমাত্র অনুভব করেন—আগন্তুক নিঃসন্দেহে কবি কালিদাস স্বয়ং।

বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধশ্রমণের সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানিয়ে আগন্তুক দণ্ডায়মান হলেন।

তাও-চিং আসন ত্যাগ করে দুই হস্ত উত্তোলন করে বললেন, আরোগ্য।

বুদ্ধভদ্রের দিকে ফিরে বললেন, অতিথির জন্য একটি মৃগচর্মাসন নিয়ে এস বৎস।

আগন্তুক বলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না ভদন্ত। এ আশ্রমের পবিত্র ধূলিস্পর্শ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তাছাড়া স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেছেন, ভূমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসন।

উভয়েই উপবেশন করেন। আগন্তুক বলেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য। ইতিপূর্বে চীন দেশের কোন মানুষ আমি দেখিনি। আপনি তো সুন্দর সংস্কৃত বলেন।

তাও-চিং বলেন, মহাশয়ের পরিচয়?

—উল্লেখযোগ্য কিছুই নই। আমি একজন ভারতীয় দীন কবি। ব্রাহ্মণ। উজ্জয়িনীর কবি ভট্ট কালিদাস আমার অভিন্নহৃদয়। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রও তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর কাছে শুনলাম, আপনি কালিদাসের একটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি পাঠ করেছেন—'মেঘদূতম'। আপনার মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবহিত হলে কবিকে জ্ঞাপন করতে পারি।

'অভিন্নহৃদয়' স্বীকারোক্তি থেকেই তাও-চিং নিঃসন্দেহ হলেন—আগন্তুক স্বয়ং কালিদাস। বললেন, আমার মতামত তো ইতিপূর্বেই ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রকে জ্ঞাপন করেছি। সে কিছু বলেনি?

—বলেছে। আপনি নাকি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, কালিদাস কোনও চীনাকাব্য অনুকরণে এ কাব্যটি রচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের দুরন্ত কৌতূহল। চীনা কাব্যেও কি বিরহী নায়ক মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিল?

—পরিকল্পনাটা একই রকম, যদিচ তার বিস্তারটা বিভিন্ন। বারিদকে দূত হিসাবে প্রেরণ করার যে চিত্রকল্প সেটি একাধিক চীনা কবিতায় আছে। প্রথম উদাহরণ চু-য়াং-এর একটি ছোট্ট গীতি-কবিতা। 'বিরহ' তার নাম। কবি বলছেন ঃ

"নির্জনে বসি বিরহবিধুর সুরে
গাহি গান, চাহি অসীম দূর আকাশে,
কোথা পাব দূত গৃহ হতে অতি দূরে
কেমনে পাঠাব বার্তা প্রিয়ার পাশে?

....

'পুষ্করমেঘে বৃথা তোষামোদ করি
যাচ্ঞা আমার মোঘা হে নিঠুর মেঘ।
দূর হতে ঐ বিহগে যখন স্মরি
হেসে ভেসে যায় ওরা বিদ্যুৎবেগ।।"[15]

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলেন, আশ্চর্য! জড়বস্তু মেঘকে প্রাণবন্ত বলে কল্পনা করে কোন চৈনিক কবি যে তাকে দূত হিসাবে প্রেরণের কথা ভেবেছেন তা তো আমার জানা ছিল না।

তাও-চিং পরিস্থিতিটা উপভোগ করছেন। কৌতুকপ্রিয় চীনা কবি হাস্য গোপন করে বলেন, আপনার হয়তো জানা ছিল না। আমার ধারণা আপনার অভিন্নহৃদয় বয়স্যের হয়তো ছিল। অবশ্য 'অভিন্নহৃদয়' শব্দটা হয়তো এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হচ্ছে না। তারপর দেখুন, চু-য়াং-এর পরবর্তী যুগের

বিখ্যাত কবি লি-সাও একটি দীর্ঘায়ত গীতি কবিতায় একই চিত্রকল্প ব্যবহার করছেন। এবারে কবি বলছেন—

"পূর্বাচলে গিয়েছিলেম মরকতের পুরে
হরিৎ-শোভায় খুঁজেছিলাম প্রিয়ার কণ্ঠহার,
বলেছিলেম, 'ঝরাপাতার দিনের আগেই তোরা
অনিন্দ্য সে তন্বী-তনু সাজিয়ে তুলিস্ তার।'
মেঘরাজে বলি, 'খুঁজে দেখুন গগনপথে
মন্দাকিনীর কোন্ বাঁকেতে অপ্সরী মোর আছে।'
পান্নাগাঁথা কোমরবন্ধ দিয়েছিলেন খুলে
দৌত্যকাজে অস্বীকৃত হয় যদি সে পাছে।
খেয়ালী ঐ মেঘের মতো চপলচরণ প্রিয়া
খেয়ালখুশির পাগলামি যার নাইক অবশেষ—
সাঁঝের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে কোন্ পাহাড়ের কোলে
ভোরবেলা ফের ঝরনাধারে ঝাড়ে চিকুর কেশ।।"[16]

বিস্ময়-বিমূঢ় আগন্তুক আপনার অজ্ঞাতসারেই আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন। বলেন, বিশ্বাস করুন, মহাভাগ! 'মেঘদূতম্' রচনার পূর্বে এসকল কাব্য আমি পাঠ করিনি।

তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হন বৃদ্ধ তাও-চিং। কবিকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, বিশ্বাস করেছি, কবি। কারণ এতক্ষণে যে তুমি ধরা দিয়েছ ভাই! আমি সন্ন্যাসী, ভিন্ন পথের পথিক, তবু তোমার কাব্যপাঠে আমি এতটা অভিভূত যে এই 'বক্রঃপন্থায়' তোমাকে উদ্ধার করলাম।

কবি নিরতিশয় লজ্জিত। উত্তেজনা-মুহূর্তে তিনি আত্মপরিচয় ঘোষণা করে বসে আছেন!

তাও-চিং বলেন—মেঘকে তুমি বলেছিলে 'বক্রঃপন্থায়' উজ্জয়িনী সন্দর্শন করে যেতে, নাহলে তার নয়নই নাকি বৃথা। পড়ে মনে হল সেই উজ্জয়িনীর বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোলাপাঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ যাঁকে কবীন্দ্র আখ্যায় ভূষিত করেছেন, বুদ্ধভূমিতে এসেও যদি তাঁকে দেখে না যাই তবে আমিও 'লোচনৈর্বঞ্চিতোহস্মি'!

কবি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, মহাভাগ! এমন করে বলবেন না।

—নিশ্চয় বলব। আমিই তো বলব। এতাবৎকাল তুমি স্বদেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু কবি! এ তো শুধু ভারতবর্ষের নয়, এ কাব্য যে বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। তাই বিদেশবাসী হিসাবে আমি যদি তোমাকে অভিনন্দিত না করি তবে আমার জীবনই মোঘা!

কবি যুক্তকরে নিমীলিত নেত্রে সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

তাও-চিং বলেন, কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। একই চিত্রকল্প ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে দুই ভিন্ন কবিকে অনুপ্রাণিত করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি কৌতুক করছিলাম মাত্র।[17]

মেঘদূত-কবির মনের মেঘ এতক্ষণে সরে যায়।

অস্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষু বলেন, প্রার্থনার সময় সমাগত। তুমিও কি আসবে আমাদের প্রার্থনা সভায়?

কালিদাস বলেন, নিশ্চয়ই। আপনাদের সঙ্গে একত্রে মহামানব তথাগতকে প্রণাম করা তো সৌভাগ্য।

তিনজনে অতঃপর সঙ্ঘারামের কেন্দ্রস্থ চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ভিক্ষু প্রার্থনা-সভায় ইতিমধ্যেই সমাগত হয়েছেন। মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। প্রস্থে বিশ হাত। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের কেন্দ্রস্থ প্রার্থনাস্থল ভক্তে পরিপূর্ণ। সকলেই মুণ্ডিত মস্তক, সকলেরই পীতবসন। মন্দিরের পশ্চাদভাগ বৃত্তাকার; সেই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে স্তূপটি নির্মিত—তার চারিদিকে

প্রদক্ষিণ পথ। স্তূপমধ্যে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধ—গুপ্তযুগের অনবদ্য ভাস্কর্য। বুদ্ধমূর্তির উপরে অণ্ড, তদুপরি ছত্রাবলীর সপ্তপর্ণী ও ত্রিরত্ন। স্তূপের দুই প্রান্তে দুটি একাদশমুখী দীপাধার। উজ্জ্বল আলোয় চৈত্যস্তূপ আলোকিত। ধূপের গন্ধে চৈত্যমন্দির আমোদিত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন প্রার্থনাসভা পরিচালনা করছেন। আগন্তুক তিনজন ভক্তসমাবেশের একান্তে আসন গ্রহণ করেন।

মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল। শ্রমণেরা সমবেতভাবে প্রণাম করলেন। পূজান্তে অন্যান্য ভিক্ষুরা নিজ নিজ পরিবেণে প্রত্যাগমন করলেন। চৈত্যমন্দির জনশূন্য হয়ে এলে তাও-চিং কবিকে নিয়ে এলেন ফা-হিয়েনের সন্নিকটে। পরিচয় করিয়ে দিলেন উভয়ের। কালিদাস প্রণাম করলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে। পরিব্রাজক বললেন, আপনার নাম শুনেছি। প্রীত হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তবে আমি ভিন্ন পথের পথিক। কাব্য পাঠ করি না। তা হোক, আমার সঙ্গী তাও-চিং কাব্যসাহিত্যের একজন বোদ্ধা।

কথা বলতে বলতে ওঁরা মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হলেন। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে শান্ত আশ্রম-উদ্যান এক রূপালী উত্তরীয়ে আবৃত। মৃদুমন্দসমীরে উদ্যান-পুষ্পের সৌগন্ধ্য কালাগুরু সৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কালিদাস বৃদ্ধ পরিব্রাজককে প্রশ্ন করেন, ভগবন, আপনি অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, কৈলাসশিখরের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে এদেশে এসেছেন। দুর্লভ আপনার অভিজ্ঞতা—পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় পর্বত, সিন্ধু-গঙ্গার ন্যায় নদ-নদী, গোবির ন্যায় মৃত্যুস্বরূপিণী মরুভূমি অতিক্রম করেছেন। অনুগ্রহ করে বলুন, কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আপনি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছেন?

বৃদ্ধ বললেন, কবি, আমি তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিনি—আমি যে অপ্রাকৃতের সন্ধানে এ তীর্থযাত্রায় এসেছি!

অধোবদন হলেন কবি। বোধ করি ব্যথিত হলেন। পরিব্রাজক তখনও বলছেন, আমি এসেছিলাম মহাকারুণিকের লীলাক্ষেত্র দর্শন করে ধন্য হতে। আমি ধন্য। তবে 'অভিভূত' হওয়ার প্রসঙ্গই যখন উঠল তখন বলি—এই দীর্ঘ পদযাত্রায় দুইবার আমি অত্যন্ত অভিভূত হই। প্রথমত, বৈশালী নগরপ্রান্তে আম্রপালীর জনমানবহীন অরণ্যে এবং দ্বিতীয়ত, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতচূড়ায় এক নির্জন রাত্রে। শেষোক্ত স্থানে আমি সমস্ত রাত্রি সম্পূর্ণ একাকী সুরঙ্গম 'সূত্র' গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করেছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক এবং সঙ্গীরা নিষেধ করেছিল—জনমানবহীন অরণ্যে একাকী রাত্রিবাস তারা অনুমোদন করেনি। আমি তাদের নিষেধ শুনিনি। সেই রাত্রেই আমার পরম প্রাপ্তি ঘটেছে। সে যে কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমি ভাষায় ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

—*আর বৈশালী নগরপ্রান্তে সেই আম্রপালী কাননে?*

—সে অভিজ্ঞতাও ব্যাখ্যার অতীত। মহাভিক্ষুণী আম্রপালীর কাহিনী মিলনান্তক। ঘৃণিত জীবন থেকে, নগরনটীর পদ থেকে তাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে—মহাকারুণিকের আশীর্বাদে। অথচ আশ্চর্য! তাঁর নামাঙ্কিত বিহারের ধ্বংসস্তূপের একান্তে বসে আমি সেদিন অকারণ অশ্রুপাত করেছিলাম। অহৈতুকী দুর্মনস্যতায় আমি কেমন যে অভিভূত হয়েছিলাম তাও ব্যাখ্যার অতীত।

বৃদ্ধ নীরব হলেন। নৈঃশব্দ ঘনিয়ে আসে। ও প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা অশোভন হবে বিবেচনা করে কবি প্রসঙ্গান্তরে আসেন। যেন বিশেষ করে ভিক্ষু তাও-চিংকে উদ্দেশ্য করেই বলেন, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দিন। আমি বর্তমানে যে কাব্যটি রচনা করছি তার নাম 'কুমারসম্ভবম্'। স্বয়ং মহাদেব এ কাব্যের নায়ক, পার্বতী তথা উমা নায়িকা। কাব্যের বিষয়বস্তু এই রকম—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ দেবগণ ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহেশ্বরের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে এক অমিতবিক্রম পুত্রের জন্ম হবে—সেই পুত্র, 'স্কন্দ', তারকাসুরকে সংহার করবেন। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব তখন ধ্যানমগ্ন, এদিকে সতী হিমালয়দুহিতা উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্তা হওয়ার পরে যখন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ হল না তখন দেবগণ মদনকে প্রেরণ করলেন। মদনের প্রচেষ্টায় মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ

হল বটে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হরের তৃতীয়নয়নজাত বহ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। মহাদেব যখন তপোভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন আশাহতা উমা কঠিন তপশ্চর্যা শুরু করলেন। পরিশেষে উমার তপস্যায় প্রীত হয়ে মহেশ্বর তাঁর সমীপবর্তী হলেন। নায়ক-নায়িকার বিবাহ হল।

দীর্ঘ কাব্যের চুম্বকসার ব্যক্ত করে কবি নীরব হলেন।

তাও-চিং বললেন, সমস্যা তো একটি মাত্র দেখা যাচ্ছে .... কন্দর্প যদি ভস্মীভূত হয়ে থাকেন তাহলে 'কুমারসম্ভব' হয় কী প্রকারে?

কবি বলেন, আজ্ঞে না। সমস্যা সেটা নয়। সপ্তম সর্গে আমি হর ও পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা করেছি এবং জানিয়েছি যে, মদনপত্নী রতির বিলাপে মর্মাহত মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

ফা-হিয়েনের মুখাকৃতি দেখে আশংকা হয়—তিনি এ সংবাদে মর্মাহত।

তাও-চিং বলেন, তাহলে আপনার সমস্যা কিসের? প্রশ্নটা কী?

—আমার প্রশ্ন—কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে আমার কাব্য কি শেষ হয়েছে?

—অবশ্যই হয়েছে!

—কিন্তু এ-কাব্যে নাম-ভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথা তিনি যে এখনও অনাগত।

—অনাগত হলেও তিনি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম কথা, আপনার নায়ক এবং নায়িকা হিন্দুদিগের জগৎপিতা ও জগন্মাতা—তাঁদের দাম্পত্য-জীবন-বর্ণনা গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে; দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সর্গ বাগ্‌বাহুল্যদুষ্ট হবে। কাব্য কিছু আভাস, কিছু ইঙ্গিতেই শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি বলেছেন—নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের অনুরক্ত, বলেছেন কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত এবং নায়ক ও নায়িকাকে এই অবস্থায় আপনি নির্জন বাসরঘরে প্রেরণ করেছেন। এর অনিবার্য পরিণাম সহজবোধ্য।

কবি কিছু বলার পূর্বেই ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলে ওঠেন, মার্জনা করবেন আপনারা, আমি কিন্তু একমত হতে পারলাম না। আমি অবশ্য কাব্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ—হয়তো সেজন্যেই আমি ঐ অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারিনি।

কবি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মহাঅর্হৎ ফা-হিয়েন আজন্ম-ব্রহ্মচারী, সমাজবদ্ধ লৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এ-ক্ষেত্রে 'অনিবার্য পরিণাম' শব্দের যে ব্যঞ্জনা, তা তাঁর বোধগম্য না হতে পারে। ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলেন, কবি, আপনার গল্পটি শুনলাম। এবার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ কাহিনী বলি। বাস্তব ঘটনা।

—বলুন মহাভাগ?

—আমার কাহিনীর নায়ক একজন মুমুক্ষু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, যিনি সদ্ধর্ম গ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার পথে যাত্রা করেছেন, নায়িকা মধ্য এশিয়ার এক জনপদের অনিন্দ্যকান্তি কুমারভট্টারিকা। তুলনা করে বলা চলে—আমার নায়কও মদনকে ভস্ম করেছেন, আমার নায়িকাও হিমালয়দুহিতা রাজকন্যা।

এরপর কথাকোবিদের দক্ষতায় বৌদ্ধভিক্ষু বর্ণনা করতে থাকেন বুদ্ধযশা এবং অক্ষুমতীর অনুরাগঘন কাহিনী—তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, শৈলদেশবিহারে বুদ্ধযশ-এর উত্তরীয় প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। প্রত্যাবর্তনের পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে থাকেন—যেন কুমারজীবের কথিত কাহিনীর তিনি শ্রুতিধর। এরপর ভূমিকম্প এবং নির্জনগুহায় নায়ক-নায়িকার রাত্রিবাসের আয়োজন। বুদ্ধযশা সলজ্জে স্বীকার করলেন অক্ষুমতীর কাছে—একই শয্যায় নির্জন গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে তাঁর সাহস নেই। তুষারপাত অগ্রাহ্য করে প্রহরায় রইলেন গুহামুখে। তারপর মধ্যরাত্রে গুহাভ্যন্তরে আর্ত গুম্‌রানি শুনে তিনি প্রবেশ করলেন সেই বায়ুশূন্য অন্ধকূপে। দেখলেন—বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে রাজকন্যা মৃতপ্রায়। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রমণ নিরুপায় হয়ে রাজকন্যার অধরোষ্ঠ বিমুক্ত করে নিজ মুখ প্রবিষ্ট করালেন—ফুৎকারে প্রাণবায়ু দান করলেন। লক্ষ্য করলেন—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুলিকার জন্য মূর্ছাভিভূতা অনাঘ্রাতা ষোড়শীর বক্ষ বিস্ফারিত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনায়াসে তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন তার বক্ষাবরণ, চীনাংশুক কঞ্চুলিকা। জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলেন পূর্ণযৌবনা নারীর কুঙ্কুম-চন্দনচর্চিত

যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিত হয়ে উঠলেন বৌদ্ধভিক্ষু।

স্তব্ধ হলেন মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন। জ্যোৎস্নালোকিত উদ্যানভূমিতে নেমে এল নৈঃশব্দ।

কালিদাস অধীর হয়ে বললেন, তারপর?

—তারপর তো আর নেই কবি। আমার কাহিনী তো এখানেই শেষ।

—সে কি! এস্থলে কাহিনী কী করে শেষ হবে?

—কেন হবে না? আমি অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি করেছি, নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, বলেছি গিরিমেখলবাহন পুনরুজ্জীবিত, বলেছি সেই রাত্রির তৃতীয় যামে নির্জন পার্বত্যগুহার ত্রিসীমানায় কোন মর-মানুষ নেই। এরপর কিছু বলা কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে বাগ্ বাহুল্যদোষে দুষ্ট হবে না কি?

কবি এবং তাও-চিং দীর্ঘ সময় নীরব রইলেন। অবশেষে কবি বললেন, আপনার বক্তব্য প্রণিধান করেছি প্রভু। অতঃপর কাহিনীটি সমাপ্ত করুন।

মৃদু হাসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, শুনুন।

আদ্যন্ত সমস্ত কিছুই বর্ণনা করলেন। বুদ্ধযশ ও অক্ষুমতীর উপসম্পদা গ্রহণ, অক্ষুমতীর অপহরণ, হূণ সেনাপতির দ্বারা ধর্ষণ এবং তার উপপত্নী হিসাবে ঘৃণিত জীবনের উপাখ্যান। স্বীকার করলেন—কীভাবে অক্ষুমতী বিষপানে আত্মহত্যা করতে অস্বীকার করেন। অবশেষে জানালেন—কীভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ভারতবর্ষে এসে কাহিনীর নায়ককে জানিয়েছেন। এখানেই দ্বিতীয়বার কথ্যকাব্য শেষ হল।

জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির দিকে দৃষ্টি মেলে কবি কালিদাস উদাসীনভাবে বসে রইলেন। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। অক্ষুমতী ও বুদ্ধযশার ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর বেদনা তাঁর অনুভূতিপ্রবণ অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মার্জনা করে বললেন, অনুমতি করুন মহাভাগ। রাত্রি গভীর হয়েছে।

ভিক্ষু তাও-চিংও কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ ছিল জ্যোৎস্নালোকিত দূর দিগন্তে। কবির কথা বোধকরি তাঁর কর্ণগোচর হল না। অন্যমনস্কের মত বললেন, কোন্‌টা বরণীয়? কাব্যের সত্য, না জীবনের সত্য?

কবি বললেন, জীবনের জন্যই কাব্য, কাব্যের জন্য জীবন নয়।

কাহিনী সমাপ্ত করে ফা-হিয়েনও আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এসব কথোপকথন হয়তো তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি। সহসা অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা বলে উঠলেন তিনি, কবি! এবার আপনি আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দেবেন?

কবি বলেন, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য কবি। আমি কী-ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি প্রভু?

—আপনার কবির দৃষ্টি নিয়ে। আপনি বলতে পারেন—অকল্যাণকারী সত্য এবং কল্যাণকারী মিথ্যা—এর মধ্যে কোন্‌টি বরণীয়?

—কল্যাণ ও অকল্যাণ শব্দদ্বয় আপেক্ষিক—সত্য ও মিথ্যা তা নয়।

—অর্থাৎ?

—সত্য কখনও অকল্যাণকারী হতে পারে না—দৃষ্টিবিভ্রমে মিথ্যা মরীচিকাকে কল্যাণকারী বলে ভ্রম হয়। সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

সে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে চারজনই সিদ্ধান্তে এলেন। ব্যক্তিগত জীবনের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

ভিক্ষু তাও-চিং সিদ্ধান্তে এলেন—এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতেই বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না। তিনি ভারতীয় হয়ে যাবেন।

বুদ্ধভদ্র সিদ্ধান্তে এলেন—সদ্ধর্ম প্রচারে এই পরিব্রাজকদের মতো তিনিও মহাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন—ফা-হিয়েনের সঙ্গে যাত্রা করবেন চীনের উদ্দেশে।

ফা-হিয়েন শয্যাগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনা করলেন : হে লোকজ্যেষ্ঠ! তোমার স্বদেশবাসী কবির কণ্ঠে তুমি সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছ। যে অন্যায় করেছি মহাজ্ঞানী কুমারজীব এবং মহাস্থবির বুদ্ধযশার প্রতি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আমাকে দিও। কবির কণ্ঠে তোমারই কণ্ঠস্বর আজ শুনেছি : সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

শুধু সেই চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত চতুর্থ ব্যক্তিটি আদৌ শয্যাগ্রহণ করলেন না। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি অতিক্রম করে যখন নিজ আবাসে উপনীত হলেন তখন মহাকালের মন্দিরে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে। রজনী নিস্তব্ধ। পাটলিপুত্র নগরী সুষুপ্ত, শুধু অতন্দ্র প্রহরায় জেগে আছে শুক্লচন্দ্র। কবি দেখলেন, পরিচারক তাঁর আহার্য সাজিয়ে রেখে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আহার্যে তাঁর রুচি ছিল না। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তিনি তাঁর চিহ্নিত আসনে বসলেন। প্রদীপদণ্ডটি নিকটতর করলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা আমাকে মার্জনা কর। আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম—তারকাসুর এখনও এ ধরাধামে একছত্র—এখনও সে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে! হূণ সেনাপতিরূপে তাকে আজ প্রত্যক্ষ করেছি। তার নিধনের আয়োজন না করে আমার মুক্তি নাই। মহাসন্ন্যাসীর মাধ্যমে তোমার নির্দেশ পেয়েছি প্রভু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে কবি লিখতে শুরু করলেন ঃ

অষ্টমঃ সর্গঃ।।

'পাণিপীড়নবিধেরণন্তরম্ শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি—'

পাটলিপুত্র-অটবীবিহার-পারাবতবিহার-বারাণসী!

মহাযান-বিহারে ফা-হিয়েন ছয় সহস্র শ্লোক-সমন্বিত 'সংযুক্তাভিধর্ম হৃদয় শাস্ত্রী' এবং তা ছাড়া নির্বাণ সূত্র, বৈপুল্য পরিনির্বাণ সূত্র, মহাসংঘিকাভিধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পান। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তিনি ঐ সব অমূল্য গ্রন্থের একটি করে অনুলিপি প্রণয়ন করেন—স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাও-চিং ভারতবর্ষেই তাঁর শেষ জীবনযাবনের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ফা-হিয়েন একাকীই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করেন।

পাটলিপুত্র-বুদ্ধগয়া-চম্পানগর-তাম্রলিপ্ত।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রবর্তী সমতটের এক বৃহৎ বন্দর। মধুকর-সপ্তডিঙা-মকরমুখী-ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোতে বন্দর আকীর্ণ। ফা-হিয়েন এখানে দ্বাবিংশটি বিহার প্রত্যক্ষ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানেও তিনি দুই বৎসর কাল নানা সূত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং অগণিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিকৃতি করিয়ে নেন।

তারপর বর্ষা-অন্তে এক শারদপ্রাতে বিরাট এক সওদাগরী অর্ণবপোতে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন—সাত শত যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করে একপক্ষকাল পরে উপনীত হলেন ভারতচরণ-চুম্বনরত সিংহল দ্বীপে। এখানেই অনুরাধাপুরে থুপারাম স্তূপ। সিংহলে পরিব্রাজক দীর্ঘ তিন বৎসর কাল বসবাস করেন। বিনয় পিটকের দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম ও সন্নিপাতসূত্রের অনুলিপি করে একদিন যাত্রা করলেন পূর্ব দিকে—শ্রীবিজয়ের পথে। শ্রীবিজয় অর্থে যবদ্বীপ। তিন মাস পরে উপনীত হলেন যবদ্বীপে।

পাঁচ মাস সেখানে অবস্থানের পর একদিন চীনযাত্রী এক সওদাগরী জাহাজে রওনা হলেন।

এই সমুদ্রযাত্রায় তিনি প্রচণ্ড ঝটিকার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভার-লাঘবের উদ্দেশ্যে নাবিকেরা যাত্রীদিগের যাবতীয় মালপত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফা-হিয়েন তাঁর বহু ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে থাকেন। প্রধান নাবিক যখন ফা-হিয়েনের অমূল্য গ্রন্থগুলি নিক্ষেপের

জন্য অগ্রসর হল তখন বৃদ্ধ তার হাত দুটি ধরে বলেছিলেন—ওগুলির পরিবর্তে আমি স্বয়ং সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ছি। এ অর্ণবপোত চীনে যদি আদৌ উপনীত হয় তাহলে ঐ গ্রন্থগুলি চাংয়ান মহাবিহারে প্রেরণ করবেন।

সৌভাগ্যবশত ফা-হিয়েনকে আত্মদান করতে হয়নি। তাঁর অমূল্য সম্পদও অক্ষত ছিল। দিকভ্রান্ত জাহাজ অবশেষে তীরের সন্ধান পেল। অজ্ঞাত উপকূলে অবতরণ করে তাঁরা জানতে পারলেন—এ দেশ মহাচীনই। অদূরে বিখ্যাত চৈনিক বন্দর লাওসান।

সমুদ্র অতিক্রম করে একজন অশীতিপর বৌদ্ধভিক্ষু তথাগতের জন্মভূমি থেকে সদ্য এসেছেন এ সংবাদ বন্দরে প্রচারিত হতে দেরি হল না। নিকটবর্তী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষুরা দল বেঁধে এলেন তাঁর সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থাদি এবং বুদ্ধমূর্তি দেখতে। অচিরে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কর্ণগোচর হল এ সংবাদ। তিনি স্বয়ং ফা-হিয়েনকে সম্বর্ধনা জানালেন। দ্রুতগামী সন্দেশবহ মারফত তিনি রাজধানীতে এ আনন্দ সংবাদ জানালেন এবং সসম্মানে ঐ বৌদ্ধ পরিব্রাজককে রাজধানী চাংয়ান অভিমুখে প্রেরণের জন্য একটি নৌকা প্রস্তুত করলেন। হোয়াং-হো নদীপথে পরিব্রাজক চললেন রাজধানীতে।

ইতিমধ্যে চীনের রাজনীতিতেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমরা মহাথের কুমারজীবকে শেষ দেখেছি কাংসিতে। হুণ সেনাপতির বন্দী হিসাবে তিনি যখন চীনের প্রবেশদ্বার ঐ কাংসিতে উপনীত হন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম তেষট্টি। সেটা ছিল ৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ। সেখানেই মহাথের সংবাদ পান, যে বৌদ্ধ চীনাসম্রাট তাঁকে আনয়নের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তিনি গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত। তাই মহাস্থবির কাংসু বিহারেই অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজধানীতে তাঁর আগমন হত নিরর্থক—কারণ নূতন চীনসম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নাকি আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

সেসব ঘটনা দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর পূর্বেকার। ফা-হিয়েন যখন চাংয়ানে এসে উপনীত হলেন, তখন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ। মহাস্থবির কুমারজীবের বয়স এখন একানব্বই। তিনি এখন আর কাংসুতে নেই—অধিষ্ঠান করছেন রাজধানী চাংয়ানের সর্ববৃহৎ সঙ্ঘারামে। ইতিমধ্যে চীনের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন আবার একজন নূতন সম্রাট এবং তিনি পুনরায় পরম বৌদ্ধ। দুই পুরুষ পূর্বে মধ্যরাজ্য থেকে এক মহাপুরুষ চীনখণ্ডে এসে কাংসুর অখ্যাত বিহারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছেন শুনে তিনি সসম্মানে একটি স্বর্ণমণ্ডিত পল্যঙ্কিকা প্রেরণ করেছিলেন কাংসুতে। সাড়ম্বরে মহাস্থবিরকে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাস্থবির যখন রাজসভায় উপনীত হলেন তখন সিংহাসন থেকে অবতরণ করে চীনাসম্রাট তাঁর পদতলে প্রণত হলেন। বললেন, মহাথের আপনি আমার 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু)। বলুন কীভাবে আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারি?

ম্লান হেসেছিলেন মহাস্থবির। প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, সম্রাট মহানুভব। আমাকে আপনার বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তকের গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত করে দিন। কিছু ভূর্জপত্র, মসী ও লেখনীর আয়োজন করুন। আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই।

বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে—চীনদেশে কুমারজীব একা-হাতে একশত ছাব্বিশখানি মহাযান ধর্মপুস্তক চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তার ভিতর ছাপ্পান্নখানি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্হৎ 'চিয়-মো-লো-শিহ' অমর হয়ে আছে চীনের গ্রন্থাগারে। ইতোমধ্যে ভারত ও মধ্যরাজ্য থেকে এসেছেন আরও অনেক পণ্ডিত—কুচীসঙ্ঘারামের মহাথের বুদ্ধযশা, পাটলিপুত্রের গৌতমবুদ্ধের বংশে জাত ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিলেন সেন-চাও প্রমুখ অসংখ্য চৈনিক পণ্ডিত। সেও যেন এক নবরত্নসভা!

পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যে বৎসর চীনের রাজধানী চাংয়ানে উপনীত হন—সেই ৪১৩ খ্রিস্টাব্দেই পরিনির্বাণ লাভ করেন এই শতাব্দীর সূর্য। এটুকুই ইতিহাস—বাকিটা ঔপন্যাসিক সত্য —

*　　　*　　　*

হোয়াং-হোতে উজান বেয়ে ড্রাগনমুখী সপ্তডিঙা যখন চাংয়ান বন্দরে ভিড়ল তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। নৌকার সম্মুখভাগে যুক্তকরে তিনি দণ্ডায়মান—দেখলেন নদীতীরের ঘাট যেন এক জনারণ্য। হাজারে হাজারে চাংয়ানবাসী সমবেত হয়েছে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে। নদীতীরবর্তী হর্ম্যশীর্ষে নিশান, ঘাটের উপর প্রকাণ্ড একটি পুষ্পতোরণ। ঘাটের সোপানাবলীতে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু—গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্রধারী চৈনিক শ্রমণদল। অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা করছে। পীতধ্বজা-চিহ্নিত নৌকাটি দর্শনমাত্র সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। রাজ-নিয়োজিত বাদকের দল তূর্যধ্বনি করতে থাকে।

বিনয়ের অবতার ফা-হিয়েন নৌকার সম্মুখভাগে বদ্ধাঞ্জলিপুটে তখন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন :

মেলো যথা একঘণো বাতেন না সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।।[14]

নিজমনে শুধু বলছেন—'ফা-হিয়েন, ভুল করো না। এ সম্মান তোমার প্রাপ্য নয়। যে সম্পদ তুমি নিয়ে এসেছ তথাগতের জন্মভূমি থেকে—এ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।'

পুষ্পমাল্য-আলিঙ্গন-প্রণাম-আশীর্বাদ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই নৌকা থেকে অবতরণ করে তিনি উপনীত হলেন সম্রাট-প্রেরিত শকটে। সম্রাট স্বয়ং তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ মহাসভায়। সেখানে নির্মিত হয়েছে সুউচ্চ মঞ্চ। আপামর জনসাধারণকে দর্শন দেবেন পরিব্রাজক। তথাগতের জন্মভূমির কথা বলবেন। আশীর্বাদ করবেন সকলকে।

দেখা হল পরিচিত অনেকের সঙ্গে। বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, ভিক্ষু তাও-চিং প্রভৃতি। বুদ্ধযশাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন ফা-হিয়েন। তাঁকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে বলেন, আপনি তাহলে আমাদের আমন্ত্রণে চীনখণ্ডে এসেছেন?

—এসেছি বন্ধু। আমি আপনাকে একটি বিশেষ সংবাদ জানাতে এসেছি। মহাস্থবির কুমারজীব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অনতিবিলম্বে।

—তিনি আজও জীবিত? কোথায়? কাংসুতে?

—না। এখানকার মহাসঙ্ঘারামে। তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ—না হলে, স্বয়ং আসতেন।

—অবশ্যই যাব। আজই সন্ধ্যায়। আপনি মহাথেরকে বলে রাখবেন।

সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল অনুভবই করতে পারলেন না ফা-হিয়েন। কিন্তু সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারের কথা তিনি আদৌ বিস্মৃত হননি।

চাংয়ান শহরের এক প্রান্তে, নাগরিক কোলাহলের বাহিরে হোয়াং-হো তীরে এই শান্ত সঙ্ঘারাম। অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে আশ্রমের আয়োজন। মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক প্যাগোডা বা চৈত্যগৃহ। অর্ধচন্দ্রাকারে আবাসিকদের বিহার। চৈত্যসংলগ্ন একটি নির্জন পরিবেণ। কুমারজীব এই সঙ্ঘারামের মহাস্থবির; তিনি 'কুয়োশী'—রাজগুরু।

ফা-হিয়েনের শকট যখন এই সঙ্ঘারামের সমীপস্থ হল, তখন দেখা গেল সঙ্ঘারামের সকল ভিক্ষুই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সমবেত হয়েছেন। প্রবেশ-তোরণের ভিতর শকটের প্রবেশে কোন অন্তরায় ছিল না, কিন্তু পরিব্রাজক রাজপথেই রথ রক্ষা করতে বললেন। পদব্রজেই উদ্যানপথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন চৈত্য-সংলগ্ন মহাস্থবিরের পরিবেণে।

ভূশয্যার উপর কম্বলাসনে একটি উপাধানে দেহভার ন্যস্ত করে একানব্বই বৎসরের স্থবির কুমারজীব অর্ধশায়িত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা যে শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহীকে দেখেছিলাম—তাঁকে চিহ্নিত করার মতো অভিজ্ঞান শুধু তাঁর অনির্বাণ জ্যোতিতে। দেহচর্ম লোল, মুখ বলিরেখাঙ্কিত। দুই হস্ত উত্তোলন করে মহাস্থবির আহ্বান করলেন ফা-হিয়েনকে।

সেই সন্ধ্যাটি চাংয়ান মহাসঙ্ঘারামে অবিস্মরণীয়। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণকথা বহুবার বহুলোককে বলেছেন। পুনরায় বিবৃত করলেন। আনুপূর্বিক। নিমীলিত নেত্রে মহাস্থবির যেন প্রত্যক্ষ করতে থাকেন সেই সব মহাতীর্থ—লুম্বিনীকাননে বুদ্ধজন্ম, কপিলবস্তুতে গৃহত্যাগ, আড়াঢ় কলম-উদ্দক রামপুত্তের আশ্রম,

রাজগৃহের বেণুবন বিহার, উরুবিল্ব, ঋষিপতন! কত স্মৃতি, কত কাহিনী, কত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত একাধিকবার পাঠ করেছেন কুমারজীব, কণ্ঠস্থ আছে আদ্যোপান্ত—তবু প্রত্যক্ষদর্শীর এ বিবরণে যেন তাঁর প্রাপ্ত-প্রাপ্তি ঘটল। দীর্ঘ কাহিনী সমাপ্ত হল কুশীনগরে—গণ্ডক নদীতীর সন্নিকটে শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে শায়িত বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণে।

মহাস্থবির যুক্তকরে নমস্কার করলেন। তাঁর পরিনির্বাণও আসন্ন। তিনি প্রহর গুনছেন শুধু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করেন —

"উপনীতবয়ো চ দানি'সিম্
সম্পয়াতো'সি যমস্স সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নত্থি অন্তরা
পাত্যেয়ম্ পি চ তে ন বিজ্জতি।
সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং
বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্বন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন
জাতিজরং উপোহিসি।।[19]

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু, ভ্রমণকালে বহুস্থানে বহু বিভ্রান্তিকর কাহিনী শুনেছি, যার অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য হয়নি; উপযুক্ত গুরুরও সন্ধান পাইনি, যিনি আমার সন্দেহ নিরাকরণ করতে সক্ষম।

—যথা?

—গৃধ্রকূট পর্বতচূড়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'কারণ্ড বেণুবন' প্রান্তরে আমি দুটি পাশাপাশি পার্বত্যগুম্ফা দেখেছিলাম—'পিপ্পলগুহা' এবং 'সপ্তপর্ণীগুহা'। স্থানীয় বৌদ্ধশ্রমণেরা আমাকে জানালেন, "গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অব্যবহিত পরে সেই স্থলে পাঁচশতজন প্রধান বৌদ্ধ অর্হৎ বৌদ্ধসূত্রগুলি সঙ্কলন করার নিমিত্ত সম্মিলিত হন। সেই ধর্মমহাসভায় সভাপতিত্ব করেন অর্হৎ মহাকাশ্যপ স্বয়ং। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্গল্ল্যায়নও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শুধু ভিক্ষু আনন্দ গুহাদ্বারেই অবস্থান করেছিলেন—কারণ মহাসভায় প্রবেশে তিনি অনুমতি পান নাই।"[20] —এখন আমার প্রশ্ন, মহাঅর্হৎ ভিক্ষু আনন্দকে কেন এ সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হল না?

কুমারজীব বললেন, এ সকল কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্গল্ল্যায়নের পরিনির্বাণ গৌতমের পূর্বে হয়েছিল কি পরে হয়েছিল এ বিষয়েই সন্দেহ আছে আমার। তাছাড়া আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, ভিক্ষু আনন্দ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য। তিনি ছিলেন শাক্যমুনির প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র; এবং তথাগতের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মুহূর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অপরাপর অর্হৎদিগের মতো ইনি জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না—আনন্দ ছিলেন আনন্দস্বরূপ। অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধের বোধিসত্ত্ব যেমন অবলোকিতেশ্বর,—ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধগণের বোধিসত্ত্ব যেমন যথাক্রমে শকমঙ্গল, কনকরাজ এবং ধর্মধারা তেমনই বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহ তাঁর অগণিত শিষ্যের ভিতর ঐ ভিক্ষু আনন্দকেই নির্বাচন করেছেন স্বীয় বোধিসত্ত্বরূপে। মহাপরিনির্বাণকালে তাঁকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন—তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি দান করে যান। আপনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তাতে বোধকরি ইঙ্গিত রয়েছে—সেজন্য অন্যান্য অর্হতেরা আনন্দের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। আমার তা আদৌ বিশ্বাস হয় না।

ফা-হিয়েন কৌতুক করে বলেন, শাক্যসিংহের প্রত্যক্ষ-শিষ্যরা নিশ্চয় নির্লোভ ছিলেন, কিন্তু মার্জনা করবেন মহাথের—আমরা অতটা নির্লোভ নই। জনান্তিকে তাই জানাই—আপনার ঐ আখরোট কাঠের ভিক্ষাপাত্রটি পবিত্র স্মৃতি হিসাবে লাভ করার বাসনা আমরা সকলেই অন্তরে পোষণ করি—আপনার প্রিয়শিষ্য বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, তাও-চিং, সেন-চাও এবং আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজেও!

প্রশান্ত হাসলেন কুমারজীব। প্রসঙ্গান্তরে এলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, ভদন্ত, শুনেছি বুদ্ধভূমি থেকে আপনি বহু সংখ্যক ধর্মগ্রন্থাদি অনুলিপি করে এনেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেগুলি এই মহাবিহারে

আনয়ন করুন। সেগুলি অবিলম্বে চীনাভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। আমার অবশ্য দৃষ্টিশক্তি নাই— বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, সেন-চাও প্রভৃতিরা আছেন—

ফা-হিয়েন বলেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি নিজেও আছি—

ঃ না ভদন্ত, সে কাজ আপনার নয়। চীনা ও সংস্কৃত দুই ভাষায় যুগপৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন শ্রমণের অভাব নাই এখানে। আপনার ক্ষেত্র ভিন্ন। আপনি একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করুন। তথাগতের লীলাক্ষেত্রের আপনি প্রত্যক্ষদর্শী; এইমাত্র আপনি স্বীকার করলেন—নানা প্রক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁর জীবনীতে প্রবেশ করেছে ইতোমধ্যেই। না, না, এ হতে পারে না। আপনি যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন—ভারতভূমির ধর্ম-কর্ম-জীবনযাত্রার যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আপনি লাভ করেছেন সেটা লিপিবদ্ধ করাই আপনার ব্রত। ভবিষ্যৎ কাল আপনার কাছে সেটাই প্রত্যাশা করছে। সে গ্রন্থের নাম হবে 'ফো-কু-কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ'। অনাগত কাল আপনার গ্রন্থের ভিতরেই পাবে আমাদের কালের পরিচয়।

—যথা আজ্ঞা মহাথের।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু ! আর একটি নিবেদন আছে; সেটি কিন্তু গোপন কথা। শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে ইচ্ছুক।

শ্রবণমাত্র অন্যান্য ভিক্ষুদল মহাথেরকে প্রণাম করে পরিবেণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু! আমি পাপী। একটি পাপকার্য করেছি আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। 'মিথ্যাই কল্যাণকর'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় মিথ্যাচার করেছিলাম। কিন্তু ভারত ভ্রমণকালে এক তরুণবয়স্ক কবির কথায় আমি বুঝতে পারি—আমি অন্যায় করেছিলাম। একথা এতদিন গোপন রেখেছি—আজ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার চরণমূলে নিবেদন করে মিথ্যাভাষণের অপরাধে পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি বিধান দিন।

কুমারজীব বলেন, তৎপূর্বে বলুন, কী সেই ভারতীয় কবির পরিচয় এবং কী বলেছিলেন তিনি?

—তিনি একজন তরুণবয়স্ক অখ্যাত ব্রাহ্মণ। নাম ভট্ট কালিদাস। তিনি বলেছিলেন,—'মিথ্যা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না', বলেছিলেন, 'সত্য সর্বদা শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।'

কুমারজীব বললেন, তরুণবয়স্ক হলেও তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। এক্ষণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলুন। পাতিমোক্ষমতে আমি বিধান দেব। মাননীয় ভিক্ষু, আমি কর্ণময়!

ফা-হিয়েন আদ্যন্ত ঘটনাটি বিবৃত করার পর ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, এক্ষণে বলুন ভদন্ত, আপনি কেন সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন?

যুক্তকরে ফা-হিয়েন প্রত্যুত্তর করলেন, আমার উদ্দেশ্যের কথা ইতিপূর্বেই নিবেদন করেছি প্রভু। স্বয়ং তথাগত বলেছেন, "তমেব বাচং ভাসেয্য যায়ত্তানাং ন তাপয়ে/ পরে চ ন বিহিং সেব্য সা বে বাবা সুভাসিতা।" (যে বাক্য উচ্চারণে নিজে পীড়িত হতে হয় না সেরূপ বাক্যই বলিবে, যে বাক্য অপরকে কষ্ট দেয় না সেই বাক্যই উত্তম)। তিনি আরও বলেছেন, "পিয়বাচমেব ভাসয্য যা বাচা পাটনাক্রিতা/যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিয়ং।।" (যে বাক্য সকলকে আনন্দ দেয় সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিবে—যে বাক্য অপরের অনিষ্টদায়ক না হইয়া প্রিয় হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে।)

কুমারজীব বললেন, কিন্তু ভদন্ত ! এই মিথ্যাভাষণে আপনি নিজেই পীড়িত হয়েছেন—নিরন্তর ত্রিশ বৎসরকাল আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছেন।

—তা হয়েছি। তবু একটি সান্ত্বনা আমার ছিল—'যং অনাদায় পাপানি পরেমং ভাসতি পিয়ং'—আমার ঐ মিথ্যাচার কারও অনিষ্টসাধন করেনি, পরন্তু আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

অমলিন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কুমারজীবের বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু ফা-হিয়েন, এক্ষণে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে যে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে উচ্চারিত আপনার সেই মিথ্যা স্তোকবাক্য আমাকে আদৌ কোনও সান্ত্বনা দেয়নি। পরন্তু আমাকে শুধু পীড়িতই করেছিল।

—কেমন করে প্রভু ?

—আমিও যে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে অন্তর্দাহে দগ্ধ হচ্ছি আপনার মিথ্যাচারে। আমি যে সেই মুহূর্তেই

অনুভব করেছিলাম—আপনি আমাকে সান্ত্বনা দানের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন! অক্ষুমতী যে জীবিতা তা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। তখনই তা জানতাম আমি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু ফা-হিয়েন। বললেন, কেমন করে প্রভু ? কোনও অলৌকিক ক্ষমতার বলে?

—না। আজীবন যে মহাভিক্ষু মিথ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁর পক্ষে জীবনে প্রথম মিথ্যাভাষণের সময় যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটুকু অনুভব করার মতো সাধারণ জ্ঞানও কি আমার নেই?

অধোবদনে ভিক্ষু ফা-হিয়েন বললেন, প্রভু ! তাহলে তখনই আমাকে বলেননি কেন? কেন আমাকে মিথ্যাচার-পরিশুদ্ধ করে তোলেননি?

কুমারজীব প্রত্যুত্তরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন ঃ

"অত্তান'ব কর্তং পাপং অত্তনা সংকিলিস্সতি,
অত্তনা অকতং পাপং আত্তনা'ব যিমুজ্ঝতি,
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্‌ঞা অঞ্‌-ঞং বিসোধয়ে।।"

[নিজের কৃত পাপে নিজেই সংক্লিষ্ট হয়। নিজে পাপ না করিলে নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। কেহ কাহাকেও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।]

ফা-হিয়েন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন মহাস্থবিরের চরণমূলে।

পরদিন সম্পূর্ণ একাকী একটি নৌকাযোগে ভিক্ষু ফা-হিয়েন চাংয়ান শহরের পশ্চিমে হোয়াং-হো তীরবর্তী একটি শান্ত গ্রামে উপনীত হলেন। শহর থেকে দশ 'লী' উজানে। বুদ্ধভদ্র তাঁর সঙ্গে আসতে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সম্মত হননি চৈনিক পরিব্রাজক। বলেছিলেন, পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি বন্ধু। এ পথ একলা চলার।

হোয়াং-হো তীরে এক নির্জন ঘাটে তরী তীরসংলগ্ন হল। বিহঙ্গ-কূজিত শান্ত গ্রাম্যপথ। দূরে ক্ষেতে-খামারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কৃষক ভূমিকর্ষণরত। মনুষ্যচালিত লাঙল। ক্রীতদাস। পীত উত্তরীয়ধারী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রমণ ধীরপদে সেই গ্রাম্যসরণী অতিক্রম করে অবশেষে উপনীত হলেন টিলার উপরে দুর্গাকারে নির্মিত এক দ্বিভূমিক জীর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে। প্রাচীর-বেষ্টিত একটি উদ্যানগৃহ। অতীতকালের কোন ধনবান রাজপুরুষের বিলাসভবন। এককালে সুরা ও নারীর প্রাচুর্যে সে উদ্যানবাটিকা কলমুখরিত থাকত। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ। জীর্ণ প্রাসাদের একাংশ বিধ্বস্ত—অপরাংশের আকৃতি বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রীর মতো। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মর্মর প্রস্রবণ, কণ্টকগুল্মাবৃত কুঞ্জবিতান, ক্ষতচিহ্ন-আকীর্ণ উদ্যান-পথে ভূশয্যালীন নগ্ন নারীর মর্মর মূর্তি। দ্বিতল বাটির চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু পর্ণকুটীর—গৃহাভ্যন্তর থেকে উত্থিত হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন শব্দ। পরিচিত শব্দ। তন্তুবায় তাঁত পরিচালনা করছে। গবাক্ষ-পথে দুই একজনকে দেখাও যায়। তারা সকলেই নারী, পুরুষ নয়—সকলেই প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা।

একটি পুষ্পপত্রহীন বিশুষ্ক চেরীবৃক্ষতলে পাঁচ-সাতজন রমণী—তাঁরাও পঞ্চাশোর্ধ্বা—জীবনকার্যে নিযুক্তা ছিলেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে পীতবসনধারী ভিক্ষুকে অগ্রসর হতে দেখে সকলেই দণ্ডায়মানা হন। বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানান। ফা-হিয়েন আশীর্বাদ করে বলেন, এইটাই কি লি-চিয়াঙ গ্রামের মাতৃকাসদন?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, থের। অনুগ্রহ করে আমার অনুগমন করুন। আপনি পথশ্রান্ত, আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

ফা-হিয়েন বললেন, আমি পথশ্রান্ত অতিথি নই মা, আমি বিশেষ কারণে এ আশ্রমে সমাগত। আমি আশ্রমমাতৃকার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

—আসুন মহাভাগ। তিনি চৈত্য-মন্দিরে আছেন।

চৈত্য অবশ্য গৌরবে। প্রাসাদ-ধ্বংসস্তূপ-সংলগ্ন একটি ভগ্নপ্রায় কক্ষ। সে কক্ষে কোন বিগ্রহ নাই, শুধু কেন্দ্রস্থলে মৃত্তিকা-নির্মিত একটি স্তূপের অক্ষম প্রয়াস। তার গঠন-সৌকর্য দেখে আশঙ্কা হয় আশ্রমিক মহিলাবৃন্দ অপটুহস্তে সেটি নির্মাণ করেছেন। ফা-হিয়েন সেই মৃত্তিকাস্তূপের সম্মুখে প্রণত হলেন। কক্ষাভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। আনুমানিক ষাট বৎসর বয়ঃক্রম তাঁর। নিরাভরণ দেহ, অঙ্গে একটি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র—পীত বা গৈরিক নয়। তাঁর মস্তকও মুণ্ডিত নয়, অযত্নবিন্যস্ত ফেনশুভ্রকেশরাশি স্কন্ধের উপর কুণ্ডলায়িত। মুখে বলিরেখা চিহ্নের আভাস—তবু তাঁর চম্পকগৌর বর্ণ অম্লান। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

পথপ্রদর্শিকা বললেন, মা, ইনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।—চলে গেলেন পথপ্রদর্শিকা।

আগন্তুক ভিক্ষুকে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। ভিক্ষু বললেন, আরোগ্য।

বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধা পূর্বসঞ্চিত এক পাত্র কূপোদক নিয়ে আসেন।

অতিথির পদপ্রক্ষালনান্তে স্বীয় অঞ্চলে তাঁর চরণদ্বয় বিশুষ্ক করে বললেন, আসন গ্রহণ করুন মহাভাগ। একটি মৃগচর্মাসন বিছিয়ে দেন কাষ্ঠাসনে।

আসন গ্রহণ করে ললিতাসনে বসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, আপনিই এই মাতৃকাসদনের আশ্রমমাতা—অ-খু-মো-তি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ভদন্ত। আজ্ঞা করুন?

—আমি ভিক্ষু ফা-হিয়েন।

বিদুৎস্পৃষ্টার মত সচকিত আশ্রমমাতৃকা বলেন, ভিক্ষু ফা-হিয়েন! অর্থাৎ আপনিই কি সেই বিখ্যাত পরিব্রাজক যিনি বুদ্ধভূমি প্রত্যক্ষ করে পরশ্ব সন্ধ্যায় জীবিত প্রত্যাবর্তন করেছেন?

—হ্যাঁ আশ্রমমাতা। আমিই সেই পরম সৌভাগ্যবান!

—আমার এ পর্ণকুটীর আজ ধন্য। কিন্তু ..... কিন্তু এই নগণ্য গ্রামে কেন এসেছেন ভদন্ত ?

—আমি আপনার কাছেই এসেছি আশ্রমমাতৃকা।

—কিন্তু কেন? কেন এভাবে সম্মানিত করলেন আমাকে ? কোন্ পুণ্যে?

—আমি ভিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি তোমার কাছে —

ফা-হিয়েন দুই হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি উপস্থাপিত করেন। শিহরিতা হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে বলেন, এমন কথা বলবেন না মহাভাগ। আমি পাপী, আমি সামান্যা। আমি কী ভিক্ষা দেব আপনাকে ?

—তোমার সর্বস্ব দিতে হবে অ-খু-মো-তি !

ধীরে ধীরে মুখ হতে হস্তদ্বয় অপসারিত হয়। বৃদ্ধা বলেন, আমি এখনও প্রণিধান করতে পারছি না মহাথের, আপনি এভাবে আমার কাছে কেন এসেছেন?

—তুমি কি ইতিপূর্বে আমাকে কখনও দেখেছ?

—না। আপনি যে তথাগতের জন্মভূমি পরিক্রমায় গিয়েছিলেন তাও অজ্ঞাত ছিল আমার। বস্তুত মাত্র গত পরশু আপনার নাম ও ভ্রমণের কথা জেনেছি।

—ভুল করছ আশ্রমমাতৃকা। আমি তোমার পূর্বপরিচিত। সে পরিচয় এখনই প্রদান করছি। তার পূর্বে বল—এ আশ্রমে কতজন ভিক্ষুণী আছেন?

—ভিক্ষুণী একজনও নাই ভদন্ত। এঁরা সকলেই পতিতা, সমাজত্যক্তা। যতদিন যৌবন ছিল এঁরা দেহ দিয়ে সমাজসেবা করেছেন—এখন এঁরা উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা।

—এ আশ্রমভূমি কার সম্পত্তি ? তোমার?

—না। স্বর্গত হূণ সেনাপতি হো লু-সুনের। বর্তমানে তাঁর পুত্রের। এ উদ্যানবাটিকা হূণ সেনাপতির প্রমোদভবন ছিল—এক্ষণে পরিত্যক্ত। আমাদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

—তুমি তো মহাযানী; তাহলে এ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠা না করে স্তূপপূজা করছ কেন?

বৃদ্ধা বললেন, ভগবন, আমি মহাযানী নই, বস্তুত আমি বৌদ্ধই নই। পাতিমোক্ষমতে আমার মৃত্যুদণ্ড

দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমি সে দণ্ডাদেশ অনুসারে আত্মহত্যা করতে পারিনি। শাস্ত্রমতে আমি বোধ করি জীবিতা নই, আমি এক জীবন্ত প্রেতিনী।

—না, অ-খু-মো-তি ! মহাথের তোমাকে তো শুধু মৃত্যুদণ্ডই প্রদান করেননি, ঐ সঙ্গে দিয়েছিলেন আর একটি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র। 'নামরূপ'কে অস্বীকার করে মৃত্যুকে উত্তরণের মন্ত্রও তো তিনিই দিয়েছিলেন—তাই নয়? রুদ্রদেবের সেই বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে নেবার শিক্ষাও তো তাঁরই?

বৃদ্ধা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী?

—না। এ ভ্রম অবশ্য তোমারই প্রথম হল না। ইতিপূর্বে আরও একজন ঐ প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। তিনিও তোমার পরিচিত। তিনি কুচীনগরীর মহাস্থবির : বুদ্ধযশা।

বৃদ্ধা বজ্রাহত !

ফা-হিয়েন বলেন, আশ্রমমাতৃকা! তুমি আম্রপালীর কাহিনী জান?

আশ্রমমাতৃকা তখনও প্রকৃতিস্থা হতে পারেননি। ফা-হিয়েন বলে চলেন ভিক্ষুণী আম্রপালীর বিচিত্র কাহিনী। রাজা বিম্বিসারের উপপত্নী থেকে যাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে। উপসংহারে বলেন, বৈশালী নগরীর ধ্বংসস্তূপে সেই আম্রপালী কাননে অঝোরধারায় আমি একদিন অশ্রুপাত করেছিলাম। কেন বলতে পার আশ্রমমাতৃকা?

—না। কেন?

—আমার অবচেতন মন জানতে চাইছিল—বিম্বিসারের উপপত্নী যদি ভিক্ষুণী আম্রপালী হতে পারেন, তাহলে অ-খু-মো-তি কেন পুনরায় অগ্গবিনতা অক্ষুমতী হতে পারবে না?

অক্ষুমতী অধোবদনে বলে, জানি না কেমন করে আপনি আমার পূর্বজীবন-কথা জেনেছেন। মনে হচ্ছে আমি যেন পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করেছি। তথাগতের মতো জাতিস্মর হয়ে বিস্মৃত অতীত-জীবনকে প্রত্যক্ষ করছি।

ফা-হিয়েন বলেন, অতীতেই দৃষ্টিপাত কর আশ্রমমাতৃকা। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে হূণ সেনাপতি হো লু-সূনের অবরোধে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তুমি আমাকে প্ররোচিত করেছিলে মহাস্থবির কুমারজীবকে তোমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ নিবেদন করতে। পাপ আমিও করেছি—সেই মিথ্যাকেই কল্যাণকর বিবেচনা করে আমি মিথ্যাচরণ করেছিলাম। তখনও আমার জানা ছিল না—একমাত্র 'সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সংপৃক্ত'।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী বলে, মনে পড়েছে। আপনিই যে সেই ভিক্ষু তা আমি অনুমান করতে পারিনি।

ফা-হিয়েন তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি প্রসারিত করে বলেন : এবার আমাকে ভিক্ষা দাও অক্ষুমতী। তোমার সর্বস্ব।

—কেমন করে দেব প্রভু? কীটদষ্ট কুসুমে কি অর্ঘ্য হয়?

—সে কথাই তো বলে গেছেন আম্রপালী—কীটের অপরাধে কুসুম অপবিত্র হতে পারে না।

—কিন্তু মহাস্থবির কুমারজীব যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন?

—সে লীলার কৈফিয়ত একমাত্র মহাস্থবিরই দিতে পারেন। বোধকরি 'ইতিগজ'র অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ দেয় যুধিষ্ঠির পুরোপুরি দেবতা নন, তিনি মর-মানুষ, তেমনি তোমার হাতে বিষের পুরিয়া তুলে দিয়ে মহাস্থবির প্রমাণ রেখে গেলেন—তিনি পূর্ণবুদ্ধ নন, রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষরূপী অবতার। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে সেই মহাস্থবিরের কাছে। তিনি তোমার প্রতীক্ষারত। তিনি মৃত্যুশয্যায়।

—তিনি কি জানেন আমি জীবিতা?

—জানেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। জেনেছেন আরও একজন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বুদ্ধযশা।

—বুদ্ধযশা! তিনি চাঙ য়ানে? চীন দেশে?

—হ্যাঁ। আজ দশ বৎসরকাল। তাঁরা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন অক্ষুমতী। সঙ্ঘ তোমাকে ডাকছে।

শুনতে পাচ্ছ না?

দূর দিগন্তের দিকে কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন অক্ষুমতী। তারপর বলেন, হ্যাঁ ভদন্ত, শুনতে পাচ্ছি।

চাঙ-য়ান শহরতলিতে মহাসঙ্ঘারামে ওঁরা দুজন যখন এসে উপনীত হলেন তখন সে মহাতীর্থ জনারণ্যে পরিণত। সমস্ত নগরবাসী বৌদ্ধ সমাগত হয়েছেন তাঁদের মহাস্থবিরকে শেষ বিদায় জানাতে। শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন। এসেছেন স্বয়ং চীন সম্রাট—তাঁর কুয়োশীকে শেষ প্রণাম নিবেদনে।

অতি প্রত্যূষেই লক্ষিত হয়েছে মহাস্থবির চিয়ু-মো-লো-শিহ্ তাঁর মরজীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। জ্ঞান আছে কিন্তু সম্পূর্ণ।

সোপানাবলী অতিক্রম করে ভিক্ষু ফা-হিয়েন প্রবেশ করলেন বিরাট কক্ষে। তাঁর অনুগমন করলেন এক নতমুখী বৃদ্ধা। প্রকাণ্ড কক্ষে শতাধিক বৌদ্ধশ্রমণ—কিন্তু সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মহাস্থবির ভূ-শয্যালীন। তাঁর পদতলে চীন সম্রাট। বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, বিমলাক্ষ, তাও-চিং, সেন-চাও প্রভৃতি প্রধান অর্হতেরা তাঁকে ঘিরে আছেন।

ফা-হিয়েন তাঁর পদতলে উপবেশন করলেন। চরণস্পর্শ করলেন। নিমীলিত চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হল। ফা-হিয়েন বললেন, অগ্‌গবিনতা অক্ষুমতী এসেছেন প্রভু। তিনি বলছেন, বিদায় নেবার পূর্বে আপনি পাতিমোক্ষমতে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে যান।

মহাস্থবিরের চক্ষু-তারকায় প্রতিবিম্বিত হল শুভ্রবসনা এক নতমুখী বৃদ্ধার প্রতিমূর্তি। জাগতিক বন্ধন ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু অন্তিম মুহূর্তে চিনতে পারলেন সেই মহিমময়ী নির্যাতিতাকে। ম্লান হাসলেন। কিন্তু বাক্‌রোধ হয়ে গেছে মৃত্যুপথযাত্রীর। কোন কথা বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তটি সম্প্রসারিত করে দিলেন। তিনি যেন শয্যাপার্শ্বে কিছু খুঁজছেন। কী খুঁজছেন তিনি? সহসা প্রসারিত করাঙ্গুলি স্পর্শ করল তাঁর একমাত্র পার্থিব সম্পদ—আবাল্য-সহচর আখরোট কাঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। কম্পিতহস্তে নির্বাক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্রটি সম্প্রসারিত করে দিলেন আগন্তুক বৃদ্ধার দিকে।

তার অর্থ কী?

চিন্তিত হয়ে পড়েন ফা-হিয়েন। যুক্তি দিয়ে এ আচরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না যে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে আজ কী ভিক্ষা চাইতে পারেন মহাজ্ঞানী কুমারজীব—ঐ নতমুখী সর্বহারার কাছে! মার্জনা? করুণা? ক্ষমা?

অক্ষুমতীও বিহ্বলা। বুঝে উঠতে পারে না—এ আচরণের কী ব্যঞ্জনা! কী দেবে সে ঐ ভিক্ষাপাত্রে? পশ্চিমদিগন্তলীন দৃপ্ত সূর্য এই শেষ বিদায় মুহূর্তে কেন অমনভাবে রাঙিয়ে উঠেছেন?

সহসা দৈববাণীর মত ধ্বনিত হল : অগ্‌গবিনতা অক্ষুমতী! মহাস্থবির তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছেন না। তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকেই উপহার দিচ্ছেন। যে সম্মান আমি পেলাম না, মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন পেলেন না, মহাঅর্হৎ বুদ্ধভদ্র পেলেন না, মহাভিক্ষু সেন-চাও পেলেন না—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রহণ করে ধন্যা হও অগ্‌গবিনতা। তুমি আজ ঃ 'আনন্দ'-স্বরূপিণী!

অক্ষুমতী বক্তার দিকে ফিরে তাকান। সপ্ততি-বৎসরের এক সৌম্য ভিক্ষু।

কুচীরাজ্যের প্রাক্তন মহাস্থবির : বুদ্ধযশা!

দুই হাত সম্প্রসারিত করে সেই অমূল্য ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করেন—'আনন্দ'-স্বরূপিণী।

অগ্রসেবক সারিপুত্ত নন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন নন, আনন্দ-স্বরূপিণী বৃদ্ধা। মুখ লুকোলেন ভিক্ষাপাত্রে।

ঝর ঝর করে তাতে ঝরে পড়ে তাঁর চোখ থেকে স্বাতীর মুক্তাবিন্দু!

অশ্রুর অর্ঘ্য!

নির্দেশিকা

ক্রম/পৃষ্ঠা	ব্যাখ্যা
(1) পৃঃ ৭৩	তিন 'লী'তে প্রায় এক মাইল
(2) পৃঃ ৮৮	'যে ব্যক্তি কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক কাষায় বস্ত্রের অনুপযুক্ত।' [ধম্মপদ ১।৯]
(3) পৃঃ ৯০	'গমনকালে, উপবেশনকালে, শয়নকালে কায়মনোবাক্যে যেন সর্বদা একমাত্র তথাগতকেই বন্দনা করি।'
(4) পৃঃ ৯৪	বরবোধিবৃক্ষমূলে যে অনন্তজ্ঞানী সসৈন্য 'মার'কে পরাজিত করে সম্বোধি লাভ করেছিলেন সেই লোকুত্তম বুদ্ধকে প্রণতি জানাই।
(5) পৃঃ ৯৭	'যে ব্যক্তি জগতকে বুদ্‌বুদ ও মরীচিকার ন্যায় ভঙ্গুর ও অসার বলে জানেন তিনি মৃত্যুরাজ্যের অধিকার-বহির্ভূত হয়ে যান।' [ধম্মপদ ১৭০]
(6) পৃঃ ৯৭	নামরূপময় সর্ববস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ নাই—'আমার নাম, আমার রূপ' এ চিন্তার ঊর্ধ্বে যিনি উঠেছেন—নামরূপের অপমানে অথবা বিনাশে যিনি শোকাভিভূত হন না তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। [ধম্মপদ ৩৬৭]
(7) পৃঃ ৯৮	হে রুদ্র! তুমি আমাকে পরীক্ষা করতেই এ-বেশে এসেছ—তাতে আমি ভয় পাব না! তোমার ঐ বজ্র তো করুণারই নামান্তর—তাই চিরদিন বুক পেতে প্রতীক্ষা করব ঐ বজ্র-আশীর্বাদের ('দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে নাহি ডরিব হে/ যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে।' রবীন্দ্রনাথের ঐ বাণীর ভাবার্থ নিয়ে এই সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করে আমাকে অনুগৃহীত করেছিলেন দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীঅনন্তলাল দেবশর্মা (ঠাকুর)]
(8) পৃঃ ১০০	'মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে জয় কর, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে'—
(9) পৃঃ ১০২	'আমার প্রতি আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, অথবা জয় করল, কিংবা আমার সর্বস্ব হরণ করল—যারা এই জাতীয় চিন্তা করে তাদের শত্রুতার উপশম হয় না।' [ধম্মপদ ৩]
(10) পৃঃ ১০২	'জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়—সনাতন ধর্মের এই হল নির্দেশ। [ধম্মপদ ৫]
(11) পৃঃ ১১০	চীনা উচ্চারণ বাঙলা হরফে কীভাবে লিখিত হবে জানা নেই। রোমান হরফে চীনে প্রচলিত কুমারজীবের নাম ইংরাজী গ্রন্থে দেখছি : Chio-mo-lo-shih.
(12) পৃঃ ১১২	বহু প্রামাণিক গ্রন্থে দেখছি লেখা আছে ফা-হিয়েন ৭৯ বৎসর বয়সে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। আমার ধারণা সেটা ৮২ হবে। এই ভ্রান্তিটা হচ্ছে এ জন্য যে, বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের (৩ বৎসর বয়সে) সময় থেকেই বয়সটা গণনা করেছেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের তিন বৎসর বাদ দিয়ে। কারণ ফা-হিয়েনের জন্ম ৩৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে।
(13) পৃঃ ১১৬	'*To My Wife, by Chin Chia* (mid-second century A. D.), Translated into English by Yu-tai hsin-yung, edited by World Book Co., 1935, p. 17.

(14) পৃঃ ১১৬ . Ibid, p. 20

(15) পৃঃ ১১৮ চীনা সাহিত্যে বর্তমান লেখকের বুৎপত্তি অগ্রজ সাহিত্যিক বৈকুণ্ঠের (বৈকুণ্ঠের খাতা) সঙ্গে তুলনীয়। অনুবাদ কতটা বাস্তবানুগ হল তার মূল্যায়ন করতে চীনা-কবিতার ইংরাজী অনুবাদটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ

"Lovely loving for my Love,
I gaze afar in Distress,
Far from Home and go-between,
How shall I my Grief express?
....
Clouds I seek as Messengers
My petitions they deny ;
Swallows would swift Envoys make
Heedless they have flown on high."

Li Sao & other poems of Chu Ynan : translated into English by Yang Hsion-yi and Gladys Yang [Foreign Language Press, Peking, 1953, p. 55]. লক্ষণীয়—ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহারে কবি বিরহ, দুঃখ, দূত শব্দকে প্রাণবন্ত বলে কল্পনা করেছেন।

(16) পৃঃ ১১৯ 'I Wander eastward to the Palace green,
And Pendants sought where Jasper Boughs were seen,
And vowed that they, before their Splendour fade,
As Gifts should go to grace the loveliest Maid.
The Lord of Clouds I then bade mount the Sky,
To seek the Stream where once the Nymph did lie,
As pledge I gave my Belt of splendid Sheen,
My Counsellor appointed Go-between.
Fleeting and wilful like Capricious Cloud
Her Obstinacy swift no Chance allowed.
At Dusk retired she to the Crag withdrawn,
Her Hair beside the Stream she washed at Dawn.'

—Ibid, page 10-11

(17) পৃঃ ১১৯ দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের Ivanhoe পাঠ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করে ডক্টরেট করেন তাঁদের জ্ঞাত্যর্থে জানাই—মেঘদূতের ঐ চিত্রকল্পের সঙ্গে চীনা কাব্যের সাদৃশ্য, যতদূর জানি, প্রথম নজরে পড়ে ভাষাবিদ হরিনাথ দে-র (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে)। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কালিদাসের উপর লিখিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় হরিনাথ এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দেন। পরে মস্কো শহরে ১৯৬০ সালে ভাষণ দান কালে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারও বলেন ঃ "Kalidasa lived about 400 A. D., in the first flush of Gupta grandeur, and that was the time when Fa-Hsien also came to India. I would not insist upon it, but it seems to me that in the story frame-work of the Meghaduta there is also Chinese influence... It may be that Kalidasa was not at all indebted to any one, and much less to Chinese literature for this. But the fact remains that sending or asking the cloud to act as a Messenger to one's Beloved is a common enough motif in ancient Chinese poetry .... A pretty or a great idea easily passes from writer to writer and from literature to literature."

[Vide paper read by Suniti Kumar Chatterji before the Joint Session of the Indian Sub-Section of the 25th International Congress of Orientalists in 'Moscow, U.S.S.R., on Aug, 9th 1960—Journal of the Asiatic Soc. Vol. I,. No. I, 1959

(18) পৃঃ ১২৫ "কঠিন পর্বত যেমন বায়ুদ্বারা প্রকম্পিত হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিগণও তেমনই নিন্দা-প্রশংসাতে অবিচলিত থাকেন।"

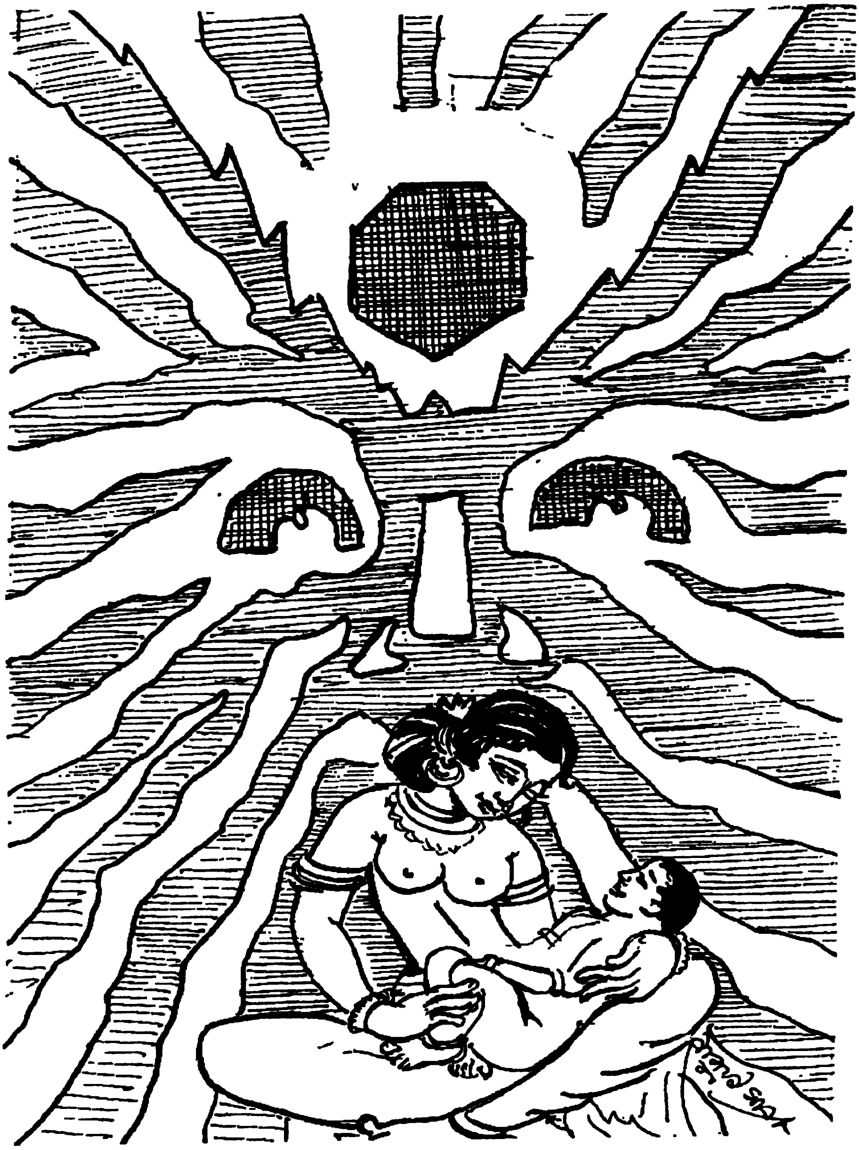
(19) পৃঃ ১২৬ 'এখন তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তুমি মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীত, পথে তোমার কোনও বিশ্রামস্থান নাই এবং পাথেয় কিছু সঞ্চয় করা হয় নাই। এমতাবস্থায় তুমি নিজের জন্য পুণ্যদ্বীপ গঠন কর, সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও—নির্মল ও কামজয়ী হও—তাহলেই জন্মজরার হস্তে পুনরায় নিগৃহীত হবে না।'—(ধম্মপদ ২৩৭)

(20) পৃঃ ১২৬ ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাহিনী দ্রষ্টব্য ঃ Vide translation 'Fo-Ku-Ki' into English by Li-yung-hsi on the Buddhas 2500 Anniversary at Tsan-Si-Monastery, 1957 [মাসিক 'প্রবাসী', ১৩৬৩ সাল, ভাদ্র-কার্তিক দ্রষ্টব্য]

সুতনুকা

কবীন্দ্র কালিদাস, গুপ্তযুগ

[403—422 খ্রিস্টাব্দ]



তথ্যসূত্র ও নির্দেশ :

(1) পৃঃ ১৩৭ তাও-চিঙ্ ঐতিহাসিক চরিত্র। ফা-হিয়েন-এর সঙ্গে ভারত পরিক্রমায় আসেন। প্রাকসন্ন্যাস জীবনে তিনি অধ্যাপক ছিলেন।

(2) পৃঃ ১৩৭ আর্যভট্ট—অনেকের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের পূর্বযুগের বৈজ্ঞানিক। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁকে 'নবরত্নে'র অন্যতম হিসাবে কালিদাসের বন্ধু বলে ধরা হয়েছে।

(3) পৃঃ ১৩৭ "নৃত্যগীতরত রমণীকুলের আকর্ষণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করব"—**ধম্মপদ**।

(4) পৃঃ ১৩৭ ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণ কাহিনীতে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত প্রখ্যাত তুন্‌হুয়াম সঙ্ঘারামে বিশ্রামগ্রহণের প্রসঙ্গ আছে।

(5) পৃঃ ১৩৮ 'লাজহরণ' নৃত্য এবং 'কালবৈশাখী'-র নির্দেশরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তা ঔপন্যাসিক-সত্য মাত্র। এমন কোনও প্রথা বা উৎসবের কথা আমি কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শনে পাইনি। তবে এ জাতীয় উৎসব ধর্মের মোড়কে দর্শকদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা অবান্তর না-ও হতে পারে।

(6) পৃঃ ১৩৮ ভুবনেশ্বরে 'লিঙ্গরাজ' মন্দিরের গাইড পাণ্ডা আমাকে বলেছিলেন—দীপান্বিতার রাত্রে প্রতি বৎসর মন্দিরের এক বেতনভুক অন্ধ বৃদ্ধ মন্দিরশীর্ষে উঠে যায় এবং 'কলস'-এর উপর একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে। অপর একজন পাণ্ডাও এ-কথার সমর্থন করেছিলেন। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী যদি এই তথ্যের সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

(7) পৃঃ ১৩৯ **মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক—৫৪**

(8) পৃঃ ১৪১ সাঁচী-তোরণের বিখ্যাত যক্ষিণী-মূর্তি' ব্যাখ্যা এই অনুচ্ছেদে দেওয়া হল—সেটি মথুরা-শৈলীর, দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে নির্মিত— কালিদাসের সমকালে নয়—এটি কাহিনীকারের সজ্ঞান 'অ্যানাক্রনিজম'।

(9) পৃঃ ১৪৩ 'মহৎ ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা ব্যর্থ হলেও সেটা কাম্য, অধমের কাছে প্রার্থনা সার্থক হওয়ার চেয়ে।" **মেঘদূত**, কালিদাস।

(10) পৃঃ ১৪৪ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ **'থেরীগাথার'** প্রথম স্তবটি মাতা আম্রপালীর নামে রচিত ও উৎসর্গীকৃত।

(11) পৃঃ ১৪৪ প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে ফা-হিয়েন-এর নাম ছিল 'কুঙ্গ'। লেখকের কল্পনায় মাতা আম্রপালী সেই নামে সম্বোধনের মাধ্যমেই ফা-হিয়েনকে ভর্ৎসনা করছেন।

(12) পৃঃ ১৪৪ "হে চক্রবাহী! নিশাবসান সমাগতপ্রায়, তৎপর হও।"—কালিদাস (প্রাকৃত ভাষার কথোপকথন)

(13) পৃঃ ১৪৫ **কুমারসম্ভবম্** কাব্যের অষ্টমসর্গের প্রথম পংক্তি, কালিদাস

মহানগরী পাটলীপুত্র। অগ্‌গবিনতা ও রূপদক্ষের মৌর্যযুগীয় যে কাহিনীটি আমরা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি, তারপর অন্যূন সাত শতাব্দী অতিক্রান্ত। আর্যাবর্তের সবকিছুই জঙ্গম। স্থাবর শুধু ঐ মহাকালের মন্দির এবং তার নাট-মন্দিরে দেবদাসীদের ভাগ্য।

পাটলীপুত্রের কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতির আকাশচুম্বী ত্রিভূমক রাজপ্রাসাদ। দুর্গপ্রতিম সুউচ্চ প্রাসাদ প্রাকারে সারি সারি ইন্দ্রকোষ। সেখানে অতন্দ্রপ্রহরায় ধানুকী। সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথ চতুর্মুখী। তার চতুষ্পার্শে নাগরিক জীবনের নানা উপকরণ। মহাক্ষ-পাটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতির ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ। চতুর্মহাপথের অন্যান্য বাহুতে অজস্র পণ্যবিপণী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপণী, সমাপানকক্ষ।

পথে বিচিত্র নরনারী। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, যানবাহন। চতুর্মহাপথের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান এক বিদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্য করছিলেন আর্যাবর্তের রাজধানীর জীবনযাত্রা। এ মহানগরীর যোষিদ্‌বৃন্দও অতি বিচিত্রা। শেন্‌সি, হোনান, চাঙয়ান—বস্তুত সমগ্র হানসাম্রাজ্যে যে রমণীদের দেখে এসেছেন আজীবন, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। এদের আননে লোধ্ররেণুর মৃদু প্রলেপ, নয়নে কজ্জল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম ও ইঙ্গুদি-তৈলের বর্ণিকাভঙ্গ, কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা।

আজন্ম ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিঙ্ জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু প্রাক্‌সন্ন্যাসজীবনে তিনি ছিলেন চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-দর্শনের অধ্যাপক।[1] সেটা পেশায়, নেশায় তিনি ছিলেন কবি। ফলে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তাঁর লক্ষ্য হলেও তিনি সুন্দরের পূজারী। এবং সেজন্য পাটলীপুত্রে উপস্থিত হয়ে রীতিমতো সন্ধান করে বন্ধুত্বে বরণ করেছেন ভারতভূখণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিবরকে। ঘটনাচক্রে কবি তখন উজ্জয়িনীবাসী নন, আছেন পাটলীপুত্রে। বয়সের বাধা হয়নি। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণকবি এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব বৌদ্ধভিক্ষু পরস্পরের বন্ধু। অনতিবিলম্বে যাঁর প্রতীক্ষায় কালহরণ করছিলেন, সেই বয়স্যের আবির্ভাব ঘটল। শ্যামাঙ্গ, মুণ্ডিত মস্তক, স্কন্ধে দীর্ঘ উপবীত, ললাটে শ্বেতচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। সন্ধ্যাসমাগমের স্বল্পালোকেও তাঁর শুকচঞ্চুনাসা এবং আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় পরিদৃশ্যমান। বৌদ্ধভিক্ষুর সমীপবর্তী হয়ে কবি যুক্তকরে ক্ষমা চাইলেন, বললেন পথে আমার এক বিদগ্ধ বন্ধু[2] সূর্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে এমন দুর্বোধ্য আলোচনা শুরু করলেন—

বাধা দিয়ে তাও-চিঙ বলেন, সূর্যরশ্মিবিদগ্ধ আপনার বন্ধুর সিদ্ধান্ত যাই হোক সূর্যদেব এখনও অস্তমিত হননি। এমন কিছু বিলম্ব হয়নি।

অতঃপর উভয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মহাকালের হিন্দু মন্দিরটি দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন আগন্তুক। কবি পথপ্রদর্শক মাত্র। দু'একটি ভদ্রাসনে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠেছে। শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যাদেবীর আগমনী। কবি বললেন, গোধূলিলগ্নই মন্দির-দর্শনের উপযুক্ত সময়। তখন উদ্ভিন্নযৌবনা অনিন্দ্যকান্তি দেবদাসীর দল....

সহসা গতি সংবরণ করেন ভিক্ষু। কবি বলেন, কী হল?

তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন বৃদ্ধ। বলেন, না, কিছু নয়, চলুন।

—দেবদাসীর প্রসঙ্গেই কি আপনার....?

—হ্যাঁ। প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে প্রতিজ্ঞা করতে হয় : "নচ্চগীতবাদিত বিসূকদস্‌সনা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।"[3] কিন্তু কবিবর! এ বিষয়ে আমি আমার গুরুদেবের মতো কঠোরব্রতী নই। তুনহুয়ান গুহা মন্দিরে একদল নর্তকী দেখেছিলাম লোকুত্তমকে শ্রদ্ধা জানাতে।[4] কই, তাদের তো অশ্রদ্ধেয় মনে হয়নি।

অপ্রীতিকর আলোচনা—অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের আপাতবিরোধটি পরিহার করে কবি বললেন, আপনার গুরুদেব কে? কোথায় আছেন তিনি?

—যাঁর সঙ্গে সেই সুদূর চীনখণ্ড থেকে বুদ্ধভূমিতে এসেছি। মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন!

—তিনি বর্তমানে কোথায়?

—আপনি জানেন না? স্থানীয় মহাসঙ্ঘারামে। পাটলীপুত্রের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নাই। শুধুমাত্র যেটুকু মহাকারুণিকের স্মৃতিধন্য, তাতেই তাঁর আগ্রহ।

মহাকাল মন্দিরের সম্মুখে প্রচণ্ড জনসমাবেশ। সন্ধ্যারতির শুভলগ্ন সমাগত। এ-সময় প্রত্যহই যাত্রীদের ভিড় হয়। কিন্তু এ যে জনসমুদ্র। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। জনশ্রুতি, মহাকাল মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী রুদ্রাণীর অদ্য শেষ নৃত্যারতি। অতঃপর যতদিন না নতুন কোনও দেবদাসী ঐ রুদ্রাণীর শূন্যপদে অভিষিক্তা হচ্ছেন, ততদিন একক নৃত্যের আয়োজন বন্ধ থাকবে। বর্তমান রুদ্রাণীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চত্রিংশতিবর্ষ—অবসর গ্রহণের বয়স তাঁর হয়নি, রূপযৌবনও কানায় কানায়; কিন্তু তাঁকে অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে শূলপাণির 'কালবৈশাখী' নির্দেশে।

হয়তো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মহাকালের অন্যূন শতজন দেবদাসী আছেন—ভৃত্যা-দত্তা-হৃতা-ভক্তাশ্রেণীর। অলঙ্কারা একজনই, তিনি রুদ্রাণী। দীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পূর্বে 'লাজহরণ নৃত্যে'[5] অভিষেক-অন্তে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। অভিষেক রাত্রে সর্বালঙ্কারে ভূষিতা ষোড়শী উপস্থিত হয় নাটমন্দিরে, একবস্ত্রে। তার কণ্ঠে একটি অনতিদীর্ঘ শ্বেতমালিকা—'লাজমালিকা'; শুধু খই দিয়ে গাঁথা এবং অলঙ্কারের যতই বাহুল্য থাক, সেই বিশেষ রাত্রে সে একবস্ত্রা। দর্শকসমাকীর্ণ নাটমন্দিরে ঐ একবস্ত্রা নর্তকীকে মৃদঙ্গের তালে তালে নাচতে হবে, তার দেহসুষমা বিকশিত হবে, কিন্তু প্রকাশিত হয়ে পড়বে না। সে বড় কঠিন নৃত্য! তেহাই-এর তালে তালে দ্রুতচ্ছন্দ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে নাচতে হবে; আস্বচ্ছ রক্তচীনাংশুকের ভিতর দিয়ে তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গের হিন্দোল শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে অনুভূত হবে। তার যৌবন শুধু বিকশিত হবে, প্রকটিত হবে না। তারপর শেষ-সমের মাথায় যখন মৃদঙ্গ 'ধা' বলবে, তখন সে লুটিয়ে পড়বে সাষ্টাঙ্গে। প্রণতি জানাবে দেবাদিদেবকে, প্রধান পুরোহিতকে, দর্শকদের। স্বেদস্নাত নর্তকী অতঃপর ধীর পদে উঠে যাবে গর্ভগৃহে—নিজ কণ্ঠের লাজমালিকা পরিয়ে দেবে শিবলিঙ্গে। তারপর রুদ্ধ করে দেবে দ্বার—গর্ভগৃহ এবং অন্তরালের মধ্যবর্তী কবাট। বেরিয়ে আসবে একটি কাঁকনপরা হাত—তাতে তার শেষ লজ্জাবস্ত্র!

প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে সেই রক্তচীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তটি কর্তন করে তা দিয়ে একটি নিশান নির্মিত হবে। মন্দিরের বেতনভুক এক অন্ধ সেই নিশানটি নিয়ে উঠে যাবে বিমানশীর্ষে।[6] বাড়-গণ্ডী-মস্তক পার হয়ে, খাপুরী-আমলক-ঘণ্টা উত্তরণে উপনীত হবে মন্দির-শীর্ষে। নিশানটিকে অনুবিদ্ধ করবে ধ্বজাদণ্ডে!

চীনাংশুকের খণ্ড-বিখণ্ড দর্শকেরা সংগ্রহ করবে পুণ্যস্মৃতি হিসাবে। মাদুলি বন্ধনের উপযুক্ত সেই বস্ত্রখণ্ড। যাত্রী ও দর্শকদল বিদায় হলে পুরোহিত একাকী ফিরে আসবেন মন্দিরে। সমগ্র মন্দির-চত্বর তখন নিস্তব্ধ। অন্তরালের এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রধান পুবোহিত আহ্বান করবেন : তোমার নৃত্যপূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি রুদ্রাণি। দ্বার খোল!

দ্বার খুলে যাবে। ঘৃত প্রদীপের স্তিমিত আলোকে সম্পূর্ণ নিরাবরণা দেবদাসী তার কৌমার্যের পশরাটুকু সম্বল করে নির্গত হয়ে আসবে অভিষিক্ত হতে।

যতদিন ধ্বজাদণ্ডে ঐ নিশানটি অক্ষত থাকবে, ততদিন সেই রুদ্রাণীই থাকবে মন্দিরের 'অলঙ্কার'। তারপর বছরে বছরে যেমন সেই প্রধানা দেবদাসীর যৌবন তিল তিল করে ক্ষয়িত হবে, তেমনি বছরে বছরে জীর্ণ হতে থাকবে কলসদণ্ডের সেই ধ্বজানিশান।

এরপর একদিন! কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে মহাকাল স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন রুদ্রাণীর অবসর গ্রহণের কাল সমাগত! ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে সকলে অবাক হয়ে দেখবে নিশানটি অপহৃত! রুদ্রাণীর কাল শেষ। শেষ নৃত্যে একবার প্রণতি জানিয়ে সে বিদায় নেবে।

এগিয়ে আসবে নতুন কালের নতুন রুদ্রাণী। সালঙ্কারা। একবস্ত্রা। কণ্ঠে দুগ্ধশুভ্র লাজমালিকা। লাজহরণ-নৃত্যের নূতন নর্তকী!

আজিকার এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির কথা জানা ছিল কবির। তিনি বিপন্ন বোধ করেন। এই জনারণ্যে তিনি কেমন করে ঐ বিশিষ্ট বিদেশীকে নিয়ে নাটমন্দিরে প্রবেশ করবেন? সহসা একটি প্রৌঢ়া ভৃত্যাশ্রেণীর দাসী অগ্রসর হয়ে আসে। কপোতহস্তে কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলে, স্বাগত ভট্ট। এদিকে আসুন।

কবি আশ্বস্ত হলেন। প্রৌঢ়া তাঁকে শনাক্ত করেছে। বিদেশী বন্ধুর করগ্রহণপূর্বক তিনি দাসীর অনুগমন করেন। চলে আসেন নাটমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে। সেটি পূর্বমুখী মন্দিরের পশ্চিমাংশ। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিপ্রভায় সেখানে এখনও কনে-দেখা-আলো। কবি সবিস্ময়ে দেখলেন একটি শোভাস্তম্ভের পাদমূলে এক অনিন্দ্যকান্তি পঞ্চদশী। সে কার উপমা? বহু কাব্যে ঐ মূর্তিটির বর্ণনা কবি নিজেই করেছেন। বোধ করি কল্পনায় এমন একটি নারীমূর্তিকে দর্শন করেই তাঁর লেখনী রচনা করেছিল ঃ সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ!

প্রায়-কিশোরীটি তাঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে স্পর্শ বাঁচানো একটি সলজ্জ প্রণাম। ভিক্ষু তাও-চিঙকে প্রণাম করে। তারপর করজোড়ে নিবেদন করে, আপনারা এই পিছনের দ্বার দিয়ে নাটমন্দিরে প্রবেশ করুন নচেৎ—

কবি প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে চেন?

সলজ্জে কৌতুকময়ী প্রতিপ্রশ্নটি নিবেদন করে, কবিবরের কি ধারণা শুধুমাত্র "বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈঃ"[7] উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনা ভিন্ন আর কোন সামান্যা সাধারণী তাঁকে চেনে না?

কবি সকৌতুকে বলেন, দেবদাসীদলে তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না। সেটাও কি তুমি সামান্যা সাধারণী বলে?

মেয়েটি বলে, আমি নৃত্যের অধিকার লাভ করিনি আজও। আমার নাম সুতনুকা।

—সেটাও একটা বিস্ময়। জন্মমুহূর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে নিশ্চয়ই, কিন্তু সুতনুকা হয়েছো অনেক পরে। তবু তোমার পিতামাতা—

কনে-দেখা-আলোতেই মেয়েটিকে এবার ম্লান দেখালো। বললে, জন্মকালে আমার কী নামকরণ হয়েছিল জানি না। আমি—হৃতা। এ-নাম মন্দিরের দেওয়া।

কবিও ম্লান হয়ে গেলেন। অজ্ঞাতভাবে মেয়েটির একটি সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করে ফেলেছেন। মেয়েটি কিন্তু সেদিকে গেল না, পূর্বপ্রশ্নের বাকিটার উত্তরদান করে সে, নৃত্যের অধিকার এতদিন ছিল না, তাই আমাকে কখনও দেখেননি। তবে এবার সে অধিকার আমি পাব। আগামী পূর্ণিমা রাত্রে। সেদিন আপনার আমন্ত্রণ রইল, কবিবর।

—নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ!

—আমাকে সরাসরি রুদ্রাণীপদে উন্নীত করা হবে সেদিন। পূর্ণিমারাত্রে আমার অভিষেক।

কবির সংবেদনশীল অন্তরে এবার মেয়েটি যেন এক তীক্ষ্ণশলাকা বিদ্ধ করে দিল। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন—সহস্র দর্শকের সম্মুখে ঐ উদ্ভিন্নযৌবনা পঞ্চদশী নৃত্যরতা—একবস্ত্রা সে—প্রতি পদক্ষেপেই সে সচকিতা হয়ে উঠছে! তারপর? লাজহরণ-নৃত্যের শেষ পর্যায়ে ঐ কাঁকনপরা হাতখানি শুধু বার হয়ে এসেছে রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে! কিন্তু তারপর? তৎক্ষণাৎ কবির মানসপটে উদিত হল—মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের কদাকার দেহটি। পঞ্চাশোর্ধ্ব লালসাজর্জর যে বৃদ্ধটি এই দেবদাসীদের সর্বময় কর্তা! ধর্মের নির্দেশে যে বর্বর অসংখ্য দেবদাসীর কৌমার্য হরণ করে এসেছে এতাবৎকাল।

সুতনুকা প্রশ্ন করে, ভট্ট কবি! আপনাকে প্রণাম করলাম, কই আপনি তো আশীর্বাদ করলেন না?

কবি তখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি। 'ধর্মের নির্দেশে', না 'ধর্মের অজুহাতে'? না-না-না! এ হতে

পারে না। মহাকালের প্রতিভূ সহস্রাক্ষ ! সহস্রাব্দকালের এ-বিধান কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আশীর্বাদ করেছি, মনে মনে—

—কী সেই আশীর্বাদ? 'মা ভু দেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ?'

ভ্রূকুঞ্চন হল কবির। মেয়েটিকে একটু প্রগল্‌ভ মনে হল। একটু কঠিন শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর, তাই যদি হয়, ক্ষতি কী? তুমি তো দেবতার নির্দেশে দেবদাসী! আগামী পূর্ণিমায় রুদ্রাণী হতে চলেছ—তোমার স্বামী তো জগৎপিতা পরমেশ্বর মহাদেব।

—আপনি ঠিক জানেন?

কবির ঐ কথাটা নিয়ে সুতনুকা পরে চিন্তা করেছে—'জন্মমুহূর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে, সুতনুকা ছিলে না নিশ্চয়?'—তা ঠিক। জন্মকালে তার কী নামকরণ হয়েছিল সুতনুকা জানে না। এটুকু শুধু শুনেছে অতি শৈশবকালে সে হৃতা। জানে না, এই প্রকাণ্ড আর্যাবর্তের কোন্ প্রান্তে, কার ঘরে সে ভূমিষ্ঠা হয়েছিল। সে কি অবন্তী, কাঞ্চি, পৌণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি? তার সেই অজানা-অচেনা জননী কি এই পঞ্চদশবর্ষ পরেও সেই অপহৃতা কন্যাটির কথা ভাবে? রাতে কাঁদে?

জ্ঞান হবার পর থেকে সে প্রত্যক্ষ করেছে এই মন্দিরের পরিবেশ। রুদ্রাণীকে পেয়েছে মায়ের মতো। কিন্তু যতই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে, ততই যেন রুদ্রাণীর সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্কটা তিক্ততর হয়েছে। ইদানীং তো সে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভিন্ন আর কিছু ভাবে না।

সুতনুকা যে পরবর্তী রুদ্রাণী এটা সকলেই জানত। সুতনুকাও! সেজন্য তাকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা হয়েছে আবাল্য। পুষ্পমাল্য রচনা, পূজাবিধি, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও অন্যান্য চারুকলায়। অসামান্যা রূপসী সে; আর সেজন্য তাকে একটি ইতিহাস রচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে—যে ঘটনা এই মন্দির-ইতিহাসে কখনই ঘটেনি ইতিপূর্বে। কোনও দেবদাসীই কখনও 'অভিষেক রাত্রে' সরাসরি নিযুক্তা হয়নি রুদ্রাণীর পদে। এ যেন সৈন্যদলে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করা। কিন্তু সহস্রাক্ষের সেটাই ছিল পরিকল্পনা। আগামী পূর্ণিমারাত্রে ঐ উর্বশী-বিনিন্দিতা পঞ্চদশীকে অভিষিক্ত করবে সরাসরি রুদ্রাণী-পদে।

বাল্যে ও কৈশোরে এটাকে সে মহাসৌভাগ্যের দ্যোতক বলে মনে করত। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল! বয়ঃসন্ধিকালে ওর জীবনে ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল তার চিন্তাধারায়। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা মহান সত্যকে সে আবিষ্কার করে বসল। নিজেকে আবিষ্কার করল একটি মুগ্ধ তরুণের দৃষ্টির দর্পণে!

তক্ষশীলা থেকে এসেছিল এক প্রখ্যাত ভাস্কর। প্রখ্যাত, কিন্তু তরুণ। সে আজ দুই বৎসর পূর্বেকার কথা। সহস্রাক্ষ তাকে নিয়োগ করলেন মন্দিরগাত্রে কিছু মূর্তি উৎকীর্ণ করার কাজে। একের পর এক মূর্তি গড়ে যেতে থাকে ভাস্কর। তার সম্মুখে দেবদাসীদের উপস্থিত হতে হয় পর্যায়ক্রমে। শিল্পীর নির্দেশে বিচিত্র ঠামে দাঁড়াতে হয়। দেখে দেখে ভাস্কর মূর্তি গড়ে। সুতনুকা তাদের মুখে শোনে ভাস্করের কথা। কৌতূহল হয় তার। কিন্তু সে আইনানুগ দেবদাসী নয়। তার অভিষেক হয়নি, তাই পরপুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হবার অধিকার তার নাই। সহস্রাক্ষ সম্মতি দেননি। তারপর একদিন। ভোগ-মণ্ডপের গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে সে দেখল রূপদক্ষকে। আর তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দেহে যেন এক তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। ইচ্ছে হল—না! আজ আর তার মনে পড়ে না, সেই খণ্ডমুহূর্তে তার কী ইচ্ছা জেগেছিল। তবে তারপর থেকেই বারে বারে সে গোপনে লক্ষ্য করেছে উদাসীন ভাস্করকে। কটিমাত্র বস্ত্র পরিধান করে ঘর্মস্নাত রূপদক্ষ ক্রমাগত পাথরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

আশ্চর্য! সেই পরুষ আঘাতে কেমন করে প্রস্ফুটিত হয় পাষাণীবক্ষে এই কমনীয় সুষমা?

তারপর একদিন সহস্রাক্ষ অনুমতি দিলেন। জনশ্রুতি, রূপদক্ষ এবার তক্ষশীলায় প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। দুই বৎসরের পারিশ্রমিক সে দাবি করেছে সহস্রাক্ষের নিকট। এতদিন সে ঐ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল প্রধান পুরোহিতের কোষাগারে। সহস্রাক্ষ নাকি তাকে বলেন, মন্দিরের প্রধান প্রবেশতোরণে

সুতনুকার একটি মূর্তি উৎকীর্ণ করলেই তিনি রূপদক্ষর সকল অর্থ এককালীন মিটিয়ে দেবেন। দুর্জনে আরও বলে—সহস্রাক্ষ কুশীদজীবী। তিনি ঐভাবে কিছু কালহরণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

তখনই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন। পঞ্চদশী সুতনুকা আর বিংশতিবর্ষীয় রূপদক্ষ দেবদিন্ন।

পুরোহিতের নির্দেশে রূপদক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন দাঁড়াতে হয়। মালতী থাকে পাহারায়। দেবদিন্ন মুগ্ধ। প্রথম দিন সে শুধু নয়নভরে ওকে দেখল। সম্মুখ থেকে, পাশ থেকে, পশ্চাৎ থেকে। সুতনুকা কৌতুক বোধ করে। কথা বলে না। ক্রমে দেবদিন্ন একটি প্রকাণ্ড কষ্টিপাথর নির্বাচন করল। কিন্তু মূর্তিগড়া শুরু করল না। ক্রমাগত পাষাণপটে ওর আলেখ্য এঁকে চলে। আঁকে আর মোছে। আঁকে আর মোছে। একমাস এইভাবেই অতিবাহিত হয়।

আর ধৈর্য থাকে না সুতনুকার। বলে, তুমি মূর্তি খোদাইয়ের কাজ শুরু করছ না কেন?

—ধ্যানে তোমার মূর্তিটা ধরতে পারছি না বলে।

—ধ্যান? ধ্যান কেন? আমি তো স্বয়ংই রয়েছি তোমার চর্মচক্ষুর সম্মুখে।

—তুমি জান না সুতনুকে! তোমাকে উপলক্ষ করে আমি যে মূর্তিটি সৃজন করব, তা সহস্র বৎসর পরেও দর্শককে মুগ্ধ করবে! আমার সে-মূর্তি আভাসে-ইঙ্গিতে সেকথাই বলবে, যা বলবার জন্য জগৎপিতা তোমার প্রতিটি অঙ্গ এমন কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন!

সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনলে—বিশেষ করে তরুণবয়স্ক শিল্পীর মুখে—কোন পঞ্চদশী না খুশিয়াল হয়ে উঠে? সুতনুকা সকৌতুকে জানতে চায়, কী বলবে সে মূর্তি?

—বলবে, এই মরণশীল জগতে আমি মৃত্যুক অতিক্রম করার মন্ত্রটি পেয়েছি।

কৌতূহলী মেয়েটি বলে, তা কেমন করে সম্ভব?

রূপদক্ষ তখন বুঝিয়ে বলতে থাকে তার শিল্প-পরিকল্পনার মর্মার্থ।

সুতনুকাকে আদর্শ করে সৃষ্টি করবে এক যক্ষিণীর মর্মরমূর্তি। তার পদতলে মৃত্যু-অসুর পিষ্ট হচ্ছে—যক্ষিণী মৃত্যুঞ্জয়ী। না ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুকে সে জয় করেনি—সেও তোমার-আমার মতই মরণশীলা। লক্ষ্য করে দেখ না ওর চরণের অলঙ্কারটিকে! ওটা তো একজোড়া নূপুর নয়—ওটা শৃঙ্খল! পরাজিত মৃত্যু-অসুর ওকে স্থাবর করে রেখে তবে প্রাণ দিয়েছে। যাতে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে না পারে। তা হোক, তবু দার্শনিক বার্গসঁ যাকে বলেছেন, জীববিবর্তনের পথে 'অমৃত'—Elan Vital, সেই অমৃতের অধিকারিণী হয়েছে ঐ চলচ্ছক্তিহীনা শৃঙ্খলিতা মুক্তা মেয়েটি। ব্যক্তিগত নয়, প্রজাতিগত জীবনে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। তুমি-আমি মরব, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নূতন জীবনও যাব সৃষ্টি করে। মৃত্যুর কাছে প্রজাতিগতভাবে মানুষ হার মানবে না। যৌবনের সিংহদ্বারে তাই ঐ সুতনুকা ঘোষণা করছে নন্দনতত্ত্বের মূল কথা,—প্রজনন তত্ত্বের কথা! মৃত্যু যদি হয় মরণশীল দুনিয়ার শেষ কথা, তবে সে ঘোষণা করবে নন্দনতত্ত্বে প্রজাতিগত শেষতর কথা! ওর দক্ষিণ হস্তে থাকবে একটি পিঞ্জর—কিন্তু মৃত্যু যেভাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শৃঙ্খলিত করেছে, সে সেভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ করবে না তার দয়িতকে। ও জানে পিঞ্জর নিষ্প্রয়োজন—প্রেমের অচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধনে ওর পোষা শুকপাখি ওকে সোহাগ জানাবেই। মৃত্যু যদি হয় মরজীবনের অন্তরস, তবে ঐ রসিকা সন্ধান দেবে অমরজীবনের আদিরসের।

না, এ ভাষায় বলেনি। এ ব্যাখ্যাও দেয়নি।[8] সে কি বলেছিল আর সুতনুকা কী বুঝেছিল তাও জানি না। তবে এটুকু সুতনুকা উপলব্ধি করেছিল—সে ঐ রূপদক্ষকে ভালবেসে ফেলেছে। বিহ্বলভাবে সে শুধু জানতে চায়, তাহলে সে মূর্তি নির্মাণ শুরু করছ না কেন?

—কেমন করে করব সুতনুকে? তোমার সেই বাধাবন্ধনহীন মৃত্যুঞ্জয়ী মূর্তিটা যে আমার ধ্যানে ধরা দিচ্ছে না।

—বাধাবন্ধনহীন?—প্রশ্ন নয়; এটা সুতনুকার কণ্ঠনিঃসৃত একটি আত্মজিজ্ঞাসা। কিন্তু দেবদিন্ন মনে করল এটি প্রশ্নবোধক। তাই ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ লাজহরণনৃত্যান্তে যে দৃশ্যটা সহস্রাক্ষ তার সহস্র নয়ন মেলে দেখবে, আমাকে যে সেটাই দেখতে হবে,—ধ্যানে।

এর পরের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বেদনাবহ। সুতনুকা আজও জানে না কেন সে অমন দুঃসাহসিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রূপদক্ষকে। সে কি শিল্পের অনুরোধে? একটি মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণায়? নাকি শিল্পীকে তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে? অথবা—স্বীকার করতে লজ্জা হয়, সেকি নিজেই চেয়েছিল একটি মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির সম্মুখে নিরাবরণা ফোটা কদমের মতো আনন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চিততনু হতে। কিন্তু পারেনি! সহস্রাক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হতভাগিনী চরম মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়!

প্রাক্-অভিষেক দেবদাসীর অসূর্যম্পশ্যা অনাঘ্রাতা সৌন্দর্য মর-মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হওয়া শুধু অপরাধ নয়, পাপ! সে দেবতার সম্পত্তি! যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রের বঙ্কিম পথে সে-তীর্থে উপনীত হওয়ার একমাত্র অধিকারী প্রধান পুরোহিত। সহস্রাক্ষের ধারণায় পুরোহিত তন্ত্রের এই নির্দেশ। যে নির্দেশ স্বয়ং রাজা অবনতমস্তকে স্বীকার করেন। দেবদিন্নকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়ন করল সহস্রাক্ষ। বলা বাহুল্য, তার প্রাপ্য অর্থ বাজেয়াপ্ত করে। দুর্জনে এও বলে যে, সমস্ত ঘটনাপরম্পরাই সহস্রাক্ষের সুচতুর পরিকল্পনা অনুযায়ী!

বন্দিনী হয়ে রইল সুতনুকা লাজহরণ-নৃত্যের প্রতীক্ষায়!

সুতনুকার ঐ কথাটা নিয়ে কবিও পরে চিন্তা করেছেন?—'আপনি ঠিক জানেন?'

না, কবি জানেন না। স্বীকার্য, এই ব্যবস্থাটা সহস্রাব্দিকাল সমাজ মেনে এসেছে। মেনে এসেছেন রাজেন্দ্রবর্গ, মেনে এসেছে 'গণ', মেনেছে পঞ্চায়েত, 'সভা', 'সমিতি'। এবং আজ পর্যন্ত কোনও জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত এ নিয়ে প্রতিবাদ করেনি। ঋষি ভার্গব, মনু, বাৎস্যায়ন, ভরত, কেউই বলেননি—কোন্ যুক্তিতে ঐ অনাঘ্রাতাকে বলি দিতে হবে তার পিতার বয়সী এক কামার্ত বৃদ্ধের লালসা-যূপকাষ্ঠে?

এমনিতেই পক্ষকাল ধরে একটি মর্মপীড়াদায়ক চিন্তা তাঁর রাত্রের নিদ্রা হরণ করছে। তাঁর সদ্যসমাপ্ত কাব্যটি শ্রবণ করে মগধাধিপতি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন—কাব্যটি সুসমাপ্ত নয়। নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিয়েছেন তিনি সপ্তম সর্গে। কিন্তু মহারাজ বলেছেন, কাব্যে নামভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হবার কথা তিনিই তো এখনও অনাগত! বিবাহেই কখনও শেষ হতে পারে মিলনান্তক কাব্য? তার পরের অধ্যায়? কবিকে 'অষ্টম সর্গ' রচনা করতে হবেই।

কবি বিভ্রান্ত। জগৎপিতা এবং জগন্মাতার দৈহিক সঙ্গম কি সন্তান বর্ণনা করতে পারে? তাঁরা যে বাগর্থের মতো সর্বদাই সম্পৃক্ত!

মস্যাধার ও ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিয়ে কবি দ্বিপ্রহরেই বসেছেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। একটি প্রহর সমংকায়শিরগ্রিব হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন—একটিমাত্র পংক্তিও রচনা করা হয়নি। মনের দ্বন্দ্ব অপনোদিত হচ্ছে না! রাজাদেশে তিনি প্রাণ দিতে পারেন—কিন্তু কাব্যসরস্বতীকে লাজহরণ-নৃত্যের আসরে নামাতে পারেন না! এই মানসিক অবস্থায় সুতনুকার ঐ মারাত্মক প্রশ্নটি তাঁকে ব্যাকুলতর করে তুলল : 'আপনি ঠিক জানেন?'

সন্ধ্যা সমাগতা। দূর থেকে ভেসে আসছে মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির রেশ। দিবালোক মিলিয়ে আসছে। রচনা করতে হলে এইবার ওঁকে গাত্রোত্থান করতে হয়—ঘৃত প্রদীপটি প্রজ্বলিত করতে হয়।

কবি গাত্রোত্থান করেই সচকিত হয়ে ওঠেন। উন্মুক্ত দ্বারপথে একজন পূর্ণযৌবনা রূপসী পূর্বমুহূর্তেই প্রবেশ করেছেন সেই নির্জন গৃহে। কবির দিকে পিছন ফিরে তিনি গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করতে উদ্যতা। কবি স্তম্ভিত। পরমুহূর্তে রমণী কবির মুখোমুখি হলেন। অবগুণ্ঠন অপসারিত করে বলেন, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, ভট্ট। আমি আপনার শরণাগতা, সাহায্যভিক্ষার্থিনী।

—আপনি তো.... আপনি তো মহাকাল মন্দিরের রুদ্রাণী?

—ছিলাম। গতকল্য পর্যন্ত সেটাই ছিল আমার সামাজিক পরিচয়। কিন্তু কবির কাছে আমি আজ আর একটু স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছুক। আমি মায়ের জাত।

কবি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এই নির্জন রুদ্ধদ্বারকক্ষে নৈশ অভিসারিকাকে কী-ই বা বলা

যায়? ইতস্তত করে শুধু বলেন, এখানে আমি একাকী থাকি—কল্য প্রাতে আমি যদি মন্দিরে উপস্থিত হই?

—না! সর্বত্রই সহস্রাক্ষের চর! এখানেই! এই মুহূর্তেই.....

বিনা আপ্যায়নেই আগন্তুকা ভূমিতলে উপবিষ্টা হন। সময় অল্প, পরিবেশও অনুকূল নয়, তবু স্বল্পভাষে রুদ্রাণী উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁর মাতৃহৃদয়।

রুদ্রাণী আজ দুই দশক মহাকাল মন্দিরের 'অলঙ্কারা', শ্রেষ্ঠা নটী। তার পূর্বে আরও এক-দশক তিনি বন্দিনী ছিলেন শিক্ষার্থীরূপে। দেহ মনের নিদারুণ অপমানে তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জেনেছেন—দেবদাসী-জীবনের অভিশাপকে। বহুভোগ্যার বিড়ম্বিত জীবনের সে কী নিদারুণ তিক্ততা!—ওরা স্বামী পায় না, সন্তান পায় না, শুধু ধর্মের অজুহাতে অযুত অজানা পুরুষকে দেহদান করে যায়। পুরোহিত-শ্রেষ্ঠী-বণিক-রাজা! প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি জেনেছেন—দেবতা দেবদাসীর সেবা আদৌ চান না; এ শুধু একদল কামার্ত ষড়যন্ত্রকারীর যৌথ প্রচেষ্টায় নারীদেহরিরংসার আয়োজন! পুরোহিততন্ত্র আর রাজতন্ত্র পরস্পরের সহায়। সমাজ নির্বাক। সাশ্রুনয়নে বললেন, কবি, সুতনুকাকে আমি গর্ভে ধারণ করিনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তার মা! অথচ কী পঙ্কিল পরিবেশ দেখুন—সে ইদানীং আমাকে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ভূমিকায় দেখে!

কবি সচকিত হয়ে বলেন, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

—দেবদিন্ন কোথায় আত্মগোপন করে আছে আমি জানি! সহস্রাক্ষের লালসাবহ্নি থেকে আমি এই অপাপবিদ্ধাকে উদ্ধার করতে চাই। কবি, সমস্ত জীবন ধর্মের নামে পাপাচার করেছি, আজ অধর্মের নামে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে চাই। তাই এসেছি আপনার কাছে।

—কিন্তু আমি দীন কবি, আমার কাছে কেন?

—'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা!'[৭]

একথার জবাব নেই। কবি চিন্তান্বিত হলেন। রুদ্রাণী বলে চলেন, শুনেছি ভিক্ষু ফা-হিয়েন আজ নিশাবসানে পাটলীপুত্র ত্যাগ করে তাম্রলিপ্তির পথে যাত্রা করবেন। ভিক্ষু তাও-চিঙ্ আপনার বন্ধু। পলাতক কপোত-কপোতিকে যাতে ওঁদের অর্ণবপোতে আশ্রয় দেওয়া যায়, সেটুকু আপনাকে করে দিতে হবে। রাত্রের শেষযামে আমি স্বয়ং ওদের নৌকায় পৌঁছে দেব। সহস্রাক্ষ সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করবে। কিন্তু মহাভিক্ষু ফা-হিয়েনের অর্ণবপোতে সে তল্লাশি করতে সাহস পাবে না।

মুহূর্তকাল কী-যেন চিন্তা করলেন কবি। মহাকালের মন্দির থেকে ভেসে এল একটা শঙ্খনির্ঘোষ! সহস্রক-ব্যাপী একটা সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কবি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এটা কি সম্ভব? ঐ শঙ্খনির্ঘোষে পিনাকপাণি যেন সায় দিলেন রুদ্রাণীর আকুতিকে। কবির মুখমণ্ডল যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যুক্তকরে বললেন, ভগবতি ! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিস্যে।

পাটলীপুত্র মহাসঙ্ঘারাম থেকে যখন ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন কবি তখন মধ্যরাত্রি। সমস্ত নগরী তখন সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। জেগে ছিলেন ব্যর্থকাম পরাভূত এক কবি। এতবড় আঘাত জীবনে ক্বচিত পেয়েছেন। কল্পনাই করতে পারেননি, এমন একটি সত্য-শিব-সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখাত হতে পারে। বন্ধুবর ভিক্ষু তাও-চিঙ্-এর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ফা-হিয়েন ছিলেন তাঁর সঙ্কল্পে অটল! এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান তিনি নাকি ন্যায়ত-ধর্মত বাধ্য! প্রথমত এটি চৌরকার্য, দ্বিতীয়ত হিন্দুধর্মদ্রোহিতা, তৃতীয়ত এতে 'মার'-এর জয় এবং সর্বোপরি সুতনুকা গৃহস্থঘরের অনূঢ়া কন্যা নয়—সে দেহোপজীবিনী নিতান্ত ঘৃণার্হ।

রুদ্রাণীকে দুঃসংবাদটা জ্ঞাপন করবার সময় ও সুযোগ নাই। সমস্ত রাত্রি নির্জন রাজপথে পদচারণা করছেন কবি। ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। গঙ্গাতীরে পাষাণ রাণায় পদ্মাসনে বসলেন অবশেষে। লক্ষ্য হল, সন্ধ্যাকালে যে বৃশ্চিকরাশির চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে দেখেছিলেন পূর্বগগনে সে নিশ্চিহ্ন হল পশ্চিম দিগন্তে! জিজ্ঞাসা অস্তমিত, কিন্তু উত্তর কোথায়?

গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোত। মধুকর, সপ্তডিঙা, খরসান, ময়ূরপঙ্খী। তদ্ভিন্ন স্থানীয় কিছু ক্ষুদ্রতর জলযানও ভাসমান—ডিঙি, দ্রোণা, পানসি, বালান, মান্দাস। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীতধ্বজাবাহী বিশাল অর্ণবপোতটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। স্থির করলেন, এখানেই অপেক্ষা করবেন সূর্যোদয় পর্যন্ত। রুদ্রাণী এখনই আসবে পলাতক প্রেমিকযুগলকে নিয়ে, তার কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদটি জ্ঞাপনান্তে ব্যর্থতার তিরস্কার নতমস্তকে গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন।

ক্রমে পূর্বগগন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গের কলকাকলীতে গঙ্গাতীর মুখরিত। কবি ধীরপদে ফা-হিয়েনের জলযান অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে কর্মচাঞ্চল্য লক্ষণীয়—যাত্রার প্রস্তুতি।

কবিকে প্রথম দেখতে পেলেন ভিক্ষু তাও-চিঙ্। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এসে তিনি কবির করগ্রহণ করে বলেন, কবি! কোথায় ছিলেন সমস্ত রাত্রি। সঙ্ঘারাম থেকে নির্গত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আপনি তো গৃহে প্রত্যাগমন করেননি।

—না, করিনি। কিন্তু আপনি সেকথা কেমন করে জানলেন?

—আমি যে প্রহরে প্রহরে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি।

—কিন্তু কেন? কী হয়েছে?

—মহাকারুণিক করুণা করেছেন! মহাঅর্হৎ মত পরিবর্তন করেছেন। সম্মত হয়েছেন।

—জয় শঙ্কর! তাহলে ওরা কোথায়?

—অর্ণবপোতের গোপন কক্ষে। রুদ্রাণী ওদের পৌঁছে দিয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমরা এখনই যাত্রা করব। শুধু আপনাকেই সংবাদটা....

—একবার তাহলে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন।

কিন্তু তার পূর্বেই অগ্রসর হয়ে আসেন মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন!

কবি তাঁকে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কবিকে তাঁর বুকে টেনে নিলেন।

বললেন, কবিবর! তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন করেছ। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে মনটা বড় চঞ্চল হল। আমি থেরীগাথা[10] গ্রন্থের সূত্রগুলি আবৃত্তি করতে উদ্যত হলাম। তুমি নিশ্চয় জান, তার প্রথম কবিতাটি মহাভিক্ষুণী আম্রপালীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। সে গ্রন্থ আমার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! একটি শ্লোকও আমার স্মরণে এল না। অবসন্নচিত্তে শয্যাগ্রহণমাত্র অগ্গসেবিকা আম্রপালী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। স্বপ্নে মাতা আম্রপালী আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "কুঙ্গ![11] থেরীগাথা আবৃত্তির অধিকার তুমি হারিয়েছ! কানীন পুত্রকে প্রত্যক্ষ করেও মহাকারুণিক আমার সেই পাপালয়কে বলেছিলেন : 'সর্বতোভদ্র'; আর তুমি সুতনুকাকে প্রত্যক্ষ না করেই তাকে বলেছ 'পাপিষ্ঠা'। মাতৃজাতির অপমান করেছ তুমি।"—

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল আমার।

ভিক্ষু তাও-চিঙ্‌কে প্রেরণ করলাম তোমার সন্ধানে।

ওঁরা তিনজনে প্রবেশ করলেন অর্ণবপোতের গর্ভে। নবদম্পতি যুগলে প্রণাম করল ওঁদের তিনজনকে। দেবদিন্নকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে কবি বললেন, রূপদক্ষ! তোমার সেই যক্ষিণী মূর্তিটি যুগযুগান্তকাল মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী প্রচার করবে—এই আশীর্বাদ করি।

সুতনুকা প্রণামান্তে প্রশ্ন করে, আর আমাকে? আমাকে কী আশীর্বাদ করবেন?

কবি সকৌতুকে বলেন, তোমাকে তো সেদিনই আশীর্বাদ করেছি সুতনুকে! "মা ভূদেবং..."! কিন্তু আজ শুধু সে কথা নয়। ঐ দেখ সূর্য উঠছে, তাই বরং পরামর্শ দিই—

'চক্রবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং উবট্‌ ঠিআ রতনী!'[12]

বালার্ক সূর্যের আভায়—নাকি লজ্জায়—রক্তিম হয়ে ওঠে সুতনুকার গণ্ডদ্বয়।

কবি প্রেমিকযুগলের দুটি হাত একত্র করে বললেন, গঙ্গাবক্ষে, ব্রাহ্মণের বিধানে এ তোমাদের

গান্ধর্ববিবাহ! এ মিলন সার্থক হোক। শিল্পীর বীর্যে আর সুতনুকার মাতৃস্নেহে জন্ম নেবে সেই 'কুমার'—যে এই আসুরিক প্রথার অবসান ঘটাবে।

সুতনুকা অস্ফুটে যেন আপনমনে শুধু বললে, আপনি ঠিক জানেন?

কাহিনী আমার শেষ হয়েছে। বাকি আছে সামান্য উপসংহার।

কবির বাণী ব্যর্থ হয়নি। মহাজনক মহিষী সীবলীর তপস্যা যেমন বহু জন্ম অতিক্রম করে সার্থক হয়েছিল রাহুলজননীর দাম্পত্য-জীবনে, তেমনি বহু জন্ম পরে—কে জানে হয়তো ঐ সুতনুকা-দেবদিন্নের বংশেই—জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যে ডক্টর মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি। বলতে গেলে যাঁর একক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল দেবদাসী প্রথা।

কিন্তু সে সব কথা এখন নয়। অনেক পরে। আমরা এখনও আছি গুপ্তযুগে। তাই আজ আমি শুধু শোনাব সেই বিশেষ দিনটির কথা। মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন আর কবি কালিদাসের স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রত্যূষের কথা।

ফা-হিয়েনের অর্ণবপোত গঙ্গার বাঁকে বিলীন হয়ে গেলে কবি গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তাঁর চিহ্নিত অজিনাসনে বসলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

এতক্ষণে তিনি বৃশ্চিকরাশির সেই জিজ্ঞাসার উত্তরটা খুঁজে পেয়েছেন। একটি প্রশ্নের ভিতর দিয়ে। সুতনুকার সেই আকুল অসতর্ক স্বগতোক্তি থেকে—

'আপনি ঠিক জানেন?'

না! কবি ঠিক জানেন না। স্বীকার করতে তিনি বাধ্য—গঙ্গাবক্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে গান্ধর্ব বিবাহেই ঐ মিলনান্তক কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটেনি। নৌকা চলেছে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু সহস্রাক্ষ এবং নগরকোট্টালের তল্লাশিবাহিনীও দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। অর্ণবপোত একদিন উপনীত হবে তাম্রলিপ্তি বন্দরে—সেই যেখানে নদী বিলীন হবে সাগরে। সার্থক হবে মহাসঙ্গমে।

কিন্তু সুতনুকা কি বিলীন হতে পারবে আর এক মহাসঙ্গমে?

তারকাসুর যে এখনও পদাঘাতে প্রকম্পিত করছে পৃথিবীকে!

'কুমার' অজাত!

শুধু 'ইচ্ছে হয়ে' লুক্কায়িত আছে সুতনুকার মাতৃহৃদয়ে।

না! স্বীকার্য: কাব্য এখনও অসমাপ্ত!

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা এ অধম সন্তানের ধৃষ্টতা মার্জনা কর।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে কবি লেখনী উদ্যত করলেন।

।। অষ্টম সর্গঃ ।।

"পাণিপীড়ণবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি—"[13]

সুতনুকা

কোণার্কযুগ

[1237—1248 খ্রিস্টাব্দ]



সত্তরের দশক কলিঙ্গের দেবদেউল ও মন্দির ভাস্কর্য নিয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ করব বলে উড়িষ্যা পরিক্রমা করছি। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মন্দির কোণার্কে আছি দিন সাতেক।

প্রতিদিনই মন্দিরে যাই, স্কেচ করি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে দেখেছি পীড়দেউলে—অর্থাৎ জগমোহনে ছিল দুই পোতাল। কোণার্কে সেটা তিন পোতাল বা তিন ধাপে গড়া। নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোতালে পীড় বা 'ফিন'-এর সংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় এবং পাঁচ। এই তিন পোতালের পরিকল্পনা কলিঙ্গে আর কোনও মন্দিরে আমার নজরে পড়েনি।

প্রথম পোতালের চাতালে চারিদিকে চারটি করে সর্বসমেত ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি। এ-ছাড়া রাহা-পাগ অংশের ঝুঁকে-থাকা অংশে চার দুকুনে আটটি নৃত্যরত মহাকাল বা ভৈরব মূর্তি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলটি নৃত্য-বাদ্যরতা কন্যামূর্তি সংস্থাপিত। সেখানে ভৈরব মূর্তি নেই। সর্বোচ্চ তৃতীয় পোতাল দর্শকের দৃষ্টিপথে সব চেয়ে দূরে। সেখানে কোন মূর্তিই নেই।

কোণার্ক-জগমোহনের এই ষোলটি নায়িকা-মূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বেশ মনে হয়, মূর্তিগুলি একই ভাস্করের হাতে গড়া। তাদের শৈলী এবং 'প্রমাণ' বা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুপাতিক হার সমান। প্রথম পোতালের চাতাল পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে, অন্তত সত্তরের দশকেও যাত্রীদের অতখানি পর্যন্ত যাবার অনুমতি ছিল। তার ওপরেও ওঠা যেত; কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ। প্রথম পোতালের ওপর উঠে আমি স্কেচগুলি আঁকতাম। সেখানে উঠলে মনে হয় মূর্তিগুলি কিছু স্থূলকায়া। প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে উচ্চতায় বেশি। শিল্পশাস্ত্র বলছেন, নারীমূর্তিগুলি হবে সপ্ততাল—*কিন্তু সে নির্দেশ এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে চলেননি*। তিনি জানতেন, এই বিশেষক্ষেত্রে দর্শক ও ভাস্কর্য এক সমতলে থাকবে না! দর্শক সচরাচর নিচে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে মূর্তিগুলি দেখবে। তাই তার তাল-মান এমনভাবে নির্ণয় করেছেন যাতে নিচে থেকে আদৌ মনে হয় না—ঐ মেয়েদের 'ডায়েট' করা দরকার।

কন্যামূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে দেবদাসীদের। তারা নৃত্যরতা—তাদের হাতে নানান বাদ্যযন্ত্র—ঢোলক, মৃদঙ্গ, বীণা, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদি। অঙ্গে তাদের নানান জাতের আভরণ—কঙ্কন, কেয়ুর, শতনরী, কর্ণাভরণ, মুকুট প্রভৃতি। তাদের চুলবাঁধার কায়দাতেও কত বৈচিত্র্য।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই পীনোদ্ধত যুবতীবৃন্দের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব অথবা বেশভূষাই শুধু নয়, ভাবব্যঞ্জনাতেও প্রতিটি মূর্তি আর সকলের থেকে পৃথক। ধরা যাক প্রথম পোতালের পূর্বমুখী নায়িকাটিকে। ফু দিতে গিয়ে ওর গালটা একটু ফুলেছে। অল্পবয়স, মনে হয় পঞ্চদশী! এখনও যেন কিশোরী। ও-যেন দুনিয়াদারীর অনেক কিছুই বোঝে না—তাই এখানে সুতনুকার হাসিটি অমলিন।

এবার ঠিক ওপরের ধাপে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পোতালের পূর্বমুখী মেয়েটিকে দেখুন। সে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তে। এখানে সুতনুকা পঞ্চদশী নয়—সে এখন পূর্ণযৌবনা। ভাদ্রের ভরা গাঙের মতো তার যৌবন 'টলমল-টলমল'! কিন্তু কি জানি কেন মনে হল ও বিষাদখিন্ন—সহস্রাক্ষের আদেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে কিছু একটা ভাবছে। কী ভাবছে? *যে দেবদিগ্নর সম্মুখে ওকে যে এই বঙ্কিমঠামে দাঁড়াতে হয়েছে তার থেকে দূরত্বের কথাটাই কী ও ভাবছে?* কাছে গিয়ে আর একবার স্কেচ করলুম অপর দিক থেকে—তবু ওর মনের নাগাল পেলুম না।

এবার দেখুন, প্রথম পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তবাসিনী পূর্বমুখী করতালবাদিনীকে। মনে হয়—এও কিশোরী নয়, মধ্য-যৌবনা; যদিও হয়তো পূর্বোক্ত দেবদাসীর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। দেবদাসী জীবনের যেন একপিঠই *সে দেখেছে—চন্দ্রাননী জানে না*—চন্দ্রের বিপরীত দিকে শাশ্বতকালের নীরন্ধ্র অন্ধকার! কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যৌবনোত্তর বারনারীদের যে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন সে

আইন আর মানে না কোনও রাজা! কিন্তু সেই অনাগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেনি ওর ভঙ্গিমায়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধতার দার্ঢ্য। ওর হাসিতে মিশে আছে উপেক্ষা। শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে। করতাল হাতে সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে দেবদিন্নর সম্মুখে।

এবার শেষ উদাহরণ। যার স্কেচ এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দিয়েছি। বস্তুত যার কথা বলব বলে পাশাপাশি কয়েকটি নায়িকা মূর্তির চালচিত্র রচনা করেছি। এটি আছে দ্বিতীয় পোতালে। উত্তর প্রান্তে। এ মূর্তিটি পশ্চিমমুখী। ওর দৃষ্টি অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে। অপূর্ব এই মূর্তিটি। ওর অধরপ্রান্তে লেগে অছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস—কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃউৎসারিত নয়—যেন বাসিফুলের মালার হাসি! কেন-যেন মনে হয়—মেয়েটি খিন্ন, ক্লান্ত; আর সে শ্রান্তি দৈহিক নয়, মানসিক, আত্মিক! দেবদাসী-জীবনের আবরণ ও আভরণে বুঝি ওর মন ভরেনি, যেন কোন সুদূর পল্লীপ্রান্তের এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতিতে ওর হাসিটি বিধুর। কিংবা কি-জানি পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায়গ্রহণে ও এমন বিষাদখিন্ন। কে জানে?

এই মূর্তিটির স্কেচ করার সময় একটা অদ্ভুত ইতিকথা সংগ্রহ করা গেছিল—যেটা আপনাদের শোনাব এবার। উপকথাটি আমি সংগ্রহ করেছিলুম একজন বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত গাইড-এর কাছ থেকে। আমাকে ঐ মেয়েটির স্কেচ করতে দেখে সে ঘনিয়ে এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। বস্তুত ক'দিন আগেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। প্রভঞ্জনবেগে যে সব টুরিস্ট আসেন আর শালপাতা, চিনেবাদামের খোলা ছড়িয়ে রেখে ঝটিকাগতি প্রত্যাবর্তন করেন, আমি যে তাদের দলে নই, হয়তো এটুকু সমঝে নিয়েই সে আমাকে ভালোবেসেছিল। প্রখর মধ্যাহ্নে যখন যাত্রীদের ভিড় থাকত না তখন সে ঘনিয়ে এসে বসত আমার কাছে, ছায়ায়। আমার ফ্লাস্ক শূন্যগর্ভ হলে যেচে জল এনে দিত নিচে থেকে। কখনও বা গরম চা। ও জানত, আমি কোণার্ক অতিথিশালায় আছি আজ সাতদিন।

তার মুখেই শুনেছি, এই উপকথাটি। সে শুনেছিল অপর একজন স্বর্গত পেশাদারী গাইডের মুখে, অন্তত ত্রিশ বছর আগে। এই মুখে মুখে চলে-আসা কাহিনীর মূল কোথায় আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কাহিনীর চরিত্রগুলির নামও সে বলেছিল, সেসব কথা ভুলে গেছি; কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না কিছু। নামগুলি তো আমরা জানিই।

বৃদ্ধ গাইডের মতে কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের যোলটি দেবদাসীর মূর্তি একই হাতে গড়া বটে; কিন্তু উপর-পোতালে যোলটি মূর্তি দ্বিতীয় আর এক শিল্পীর হাতের কাজ। আমি মানতে রাজি হইনি। এ নিয়েই তর্ক। এবং সেই সূত্রেই উপকথাটির অবতারণা :

কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের যোলটি দেবদাসীর মূর্তি যিনি গড়েছিলেন, ধরা যাক তাঁর নাম বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, লবণাক্ত সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়াকে অস্বীকার করে তাদের লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। তাঁর সমতুল্য প্রতিভাবান ভাস্কর ছিল না সমকালের ভারত-ভূখণ্ডে। কিন্তু ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত। বিশ্রুতকীর্তি শিল্পী হওয়া ছাড়া আর কোনও অপরাধ তিনি করেননি—স্বাধিকারপ্রমত্ততার আর কোনও নজির নাই; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে আনা হয়েছিল অর্কক্ষেত্রে। জগমোহনের উচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী পুষ্করমেঘের উদ্দেশে তিনি কুর্চি ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন কি না জানা নেই। কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা যৌবনবতী ভাস্করজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তাঁর পুনর্মিলন হয়নি। দ্বাদশবর্ষকাল এই অর্কক্ষেত্রেই প্রাণপাত পরিশ্রম করে অন্তিমে এখানেই প্রাণপাত করেছিলেন তিনি।

ভাস্কর বিশ্বকর্মা মুক্তি পেলেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার তরফে নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য-পুরোহিত সহস্রাক্ষ প্রমাদ গণলেন—তল-পোতালের মূর্তিগুলির সমতুল্য উপর-পোতালের মূর্তিগুলি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে যাননি। দু-একজন বিশিষ্ট ভাস্করকে দিয়ে সে কাজ করানোর চেষ্টা হল—কিন্তু তাদের কাজ একটুও মনোমত হল না সহস্রাক্ষের। মহামাত্য চতুর্দিকে

সন্ধান করতে থাকেন, বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত শিল্পী কি গোটা কলিঙ্গ রাজ্যে নেই? দূত ছুটল রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেল। আছে। বিশ্বকর্মার শিল্পসাফল্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো কারিগরও আছে স্বর্ণপ্রসূ কলিঙ্গ রাজ্যে। দূত স্বচক্ষে দেখে এসেছে তার হাতে-গড়া পাথরের মূর্তি। সে মূর্তি নাকি অপূর্ব। শিল্পতীর্থ কোণার্কেও নাকি অমন সুন্দর, অমন প্রাণবন্ত মূর্তি নাই!

ভ্রূ কুঞ্চিত হল সহস্রাক্ষের। বললেন, কী বক্‌ছ উন্মাদের মতো?

হাত দুটি জোড় করে সংবাদবহ নিবেদন করে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি প্রভু, না হলে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না।

—তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—সে অস্বীকার করল। বলল, তোমাদের রাজাও মন্দির গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাত্য। কে এই দুঃসাহসী, দুর্বিনীত শিল্পী? কোন্ সাহসে সে প্রত্যাখ্যান করে রাজাদেশ? আত্মসংবরণ করে শুধু বললেন, মন্দির গড়ছে? নিজ ব্যয়ে? কোন্ দেবতার মন্দির?

—জানি না প্রভু। মন্দির এখনও শুরু হয়নি। সে গড়ছে একটি দেবমূর্তি! আমি সেই অসমাপ্ত মূর্তিটি দেখেছি প্রভু, কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারিনি। পুরুষমূর্তি। দেবতার। শুনলাম, সে দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। অশ্বমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে। দেবমূর্তিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—অশ্বারোহী দেবমূর্তি? হরিদশ্ব?

দূত মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না প্রভু। হরিদশ্ব তো অশ্বারোহী সূর্যমূর্তি। ইনি অশ্বারোহী নন, আছেন ভূতলে, অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরে তার গতি রুদ্ধ করেছেন।

দুরন্ত কৌতূহল হল সহস্রাক্ষের। শুধু কৌতূহল নয়, ক্রোধ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট শিল্পশাস্ত্রসম্মত ভাবমূর্তি আছে। অশ্বারোহী মূর্তির পরিকল্পনা আছে সামান্যই। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'হরিদশ্ব-সূর্য' মূর্তি। বিশ্বকর্মা সে মূর্তি ইতিপূর্বে গড়েছে কালো কষ্টিপাথরে। মূল বিমানের উত্তর-পার্শ্বদেবতা হিসাবে সে মূর্তিটি অধিষ্ঠিতও হয়েছে। তাহলে এই অর্বাচীন ভাস্কর কোন্ দেবতার মূর্তি গড়ছে? পদাতিক-অশ্বারোহীর কোনো পরিকল্পনা তো শিল্পশাস্ত্রে নাই! শুধু এজন্য—শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধেই তো লোকটার শিরচ্ছেদ করা চলে! কিন্তু না! মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে দেখতে হবে লোকটা বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারে কি না।

সপার্ষদ তখনই রওনা হয়ে পড়েন অশ্বপৃষ্ঠে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে।

স্বচ্ছতোয়া করুণা নদীর একান্তে একটি ঝিমন্ত পল্লীগ্রাম একদিন মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরধ্বনিতে! রাজপ্রতিনিধি মহামাত্য সহস্রাক্ষ নাকি স্বয়ং এসেছেন গ্রামে। দূতের সঙ্কেতে অশ্বারোহীর দল তাদের গতি সংবরণ করে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটীরের সম্মুখে। বাহির হয়ে আসে নগ্নগাত্রে এক তরুণ ভাস্কর। তার হাতে ছেনি-হাতুড়ি।

শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নত নাসা, আয়তচক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প আবার ধরাধামে নেমে এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে। অথবা মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড' ফ্লোরেন্স-আকাদেমির পাদপীঠ ত্যাগ করে। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে তাকায় আগন্তুকের দিকে।

সহস্রাক্ষ আত্মপরিচয় দেওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি তালপাতায়-বোনা একটা চাটাই বিছিয়ে দেয় মেটে দাওয়ায়। মহামাত্য অবশ্য তাঁর মহামূল্য বসনে পল্লীপ্রান্তের ধূলার প্রলেপ লাগাতে অনিচ্ছুক; তাই গৃহদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রশ্ন করেন, তোমার নাম?

—দেবদিন্ন।

—তুমি নাকি পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমান্ মহারাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মন্দির গড়ছ?

দেবদিন্ন ম্লান হেসে বলে, আজ্ঞে না। ভুল শুনেছেন। আমি উন্মাদ নই। তাছাড়া কারও সঙ্গেই পাল্লা দেওয়ার বাসনা আমার নাই। আমি নিজ অভিরুচি অনুসারে একটি দেবমূর্তি গড়ছি মাত্র। মন্দির নির্মাণের আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই।

—বটে! কোন্ দেবতার মূর্তি?

—ভাস্করের।

—অর্থাৎ সূর্যের?

—আজ্ঞে না। তিনি স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্তের ভাস্কর। সূর্য অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্!

অর্থ গ্রহণ হয় না সহস্রাক্ষের। তবু অখ্যাত পল্লীগ্রামের এই অর্বাচীনের ঔদ্ধত্যে তাঁর দক্ষিণহস্ত অভ্যাসবশে চলে গিয়েছিল তরবারির মুঠের দিকে। ব্রাহ্মণ হলেও রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র। শেষে কোনক্রমে ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, আমরা তোমার সেই মূর্তিটি একবার দেখতে পারি?

—এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আসুন ভিতরে—

গৃহ-প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটির দিকে দৃকপাত করেই চমকিত হন সহস্রাক্ষ। বলেন, এ কি! দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের প্রয়াত ভাস্কর : বিশ্বকর্মা মহাপাত্র?

দেবদিন্ন সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই মূর্তি। আমার কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম, তিনিই আমার পরমংতপঃ!

—তুমি,..... তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র?

—না হলে ওকথা বলব কেন?

দেবদিন্নের কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজি নন মহামাত্য। বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ এই দেবদিন্ন ভিন্ন আর কেউ শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তরুণ শিল্পীও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললে, মায়ের সমস্ত অভিশপ্ত জীবনটা চোখের উপর দেখেছি। এ আদেশ আপনি করবেন না প্রভু। জননী আজ দৃষ্টিশক্তিহীনা—আমিই তাঁর অন্ধের যষ্টি। আর তা ছাড়া.....

সঙ্কোচে সে থেমে যায়।

কিন্তু রাজার প্রয়োজনের কাছে অন্ধ বৃদ্ধার চোখের জলের কী মূল্য?

অবশেষে দেবদিন্নের জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন পুরোহিতের চরণদুটি। দেবদিন্নের অসমাপ্ত বাক্য শেষ করে বললেন, পুত্রের বিবাহ স্থির করেছি। আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে আমার গৃহে আসছেন পুত্রবধূ। এমন সময়ে এ কী সর্বনাশের কথা বলছেন, প্রভু?

প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের হৃদয় কিন্তু পাষাণ দিয়ে গড়া।

বধূও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেবদিন্নের শিশুকাল থেকেই বন্ধুত্ব। খেলাঘরের বর-বউ হত ওরা। লক্ষ্মী এখন বড় হয়েছে, সঙ্কোচে সে তার বাল্যবন্ধুর সামনে বড় একটা আসে না। ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা। আহা, দুটিতে ভারি সুন্দর মানায়। গাঁয়ের সবাই কাতর অনুনয় বিনয় করতে থাকে! শেষে লক্ষ্মীর বাবা এসে হাত দুটি জোড় করে বলেন, আপনি রাজ পুরোহিত, আপনিই বলুন—এক্ষেত্রে কী করণীয়! আমার কন্যার আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন তো তার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আপনি ওকে স্বচক্ষে দেখুন, আপনি কিছুতেই এমন লক্ষ্মীপ্রতিমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারবেন না।

ভিড়ের ভিতর থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্ধোন্মাদ টেনে নিয়ে আসেন ব্রীড়াবনতা একটি নতমুখী বালিকাকে। সলজ্জে এগিয়ে এসে সে সহস্রাক্ষের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেলেন প্রধান পুরোহিত! এমন পরমাসুন্দরী একটি নারীরত্ন কেমন করে লুকিয়ে ছিল এই ছায়াঘন

পল্লীপ্রান্তে ! ধীরে ধীরে বলেন, তোমরা ঠিকই বলেছ! এমন সুতনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি, মহারাজের আশীর্বাদে এই পঞ্চদশীর সর্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি। কিন্তু তার পূর্বে দেবদিন্নকে এখনই যেতে হবে আমার সঙ্গে। মহারাজের দরবারে। সব কথা বলতে হবে তাঁকে।

দেবদিন্ন বলে, রত্নালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই! এ মূর্তি অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না। আমি কারও বেতনভুক ভৃত্য নই! রাজশক্তির এমন ক্ষমতা নেই....

তার মুখ চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার বিধবা, অন্ধ বৃদ্ধা। কথাটা শেষ হয় না; না হোক, তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না কারও।

অন্তত তীক্ষ্ণধী সহস্রাক্ষের।

অথচ আশ্চর্য, সহস্রাক্ষের কোনও ভাববৈকল্য দেখা গেল না। তিনি যেন খেয়ালই করেননি ঐ অসমাপ্ত বাক্যের ঔদ্ধত্য। নিতান্ত কৌতূহলী শিল্পশিক্ষার্থীর মতো প্রশ্ন করেন, এ মূর্তির বক্তব্য কী দেবদিন্ন? ও কেন অমন করে অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরেছে?

তরুণ ভাস্কর ম্লান হাসে। বলে, কোণার্ক মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্তির ব্যঞ্জনা? বেশ তাই দিচ্ছি—আপনারা যে মন্দির গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে, নরসিংহদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না, এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম! তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে। যিনি আজীবন প্রেষিতভর্তৃকা-হিসাবে সেই সূর্যমন্দিরে ছেনি-হাতুড়ি চালাতে চালাতে নিজেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিলেন। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ পাননি। আমার এই মূর্তি তাই সেই ভাবীকালকে ডেকে বলবে—তোমরা শোন! কোণার্ক তীর্থে নভচারী মার্তণ্ডদেবের রথাশ্বের বল্‌গা একদিন চেপে ধরেছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। অরুণচালিত স্বর্গীয় রথাশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহাপ্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত মহাকাশে ধাবমান থাকবে, নিত্য গতিশীল—কিন্তু মর্ত্যে? এই কোণার্ক-ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সেই অশ্ব গতিহীন! চরৈবেতিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের 'ভাস্করের' অশ্ব মর্ত্যের 'ভাস্করের' হাতে নিশ্চল, গতিহীন, পাষাণ!

সহস্রাক্ষ বলেন, এই যদি হয় তোমার বক্তব্য, দেবদিন্ন, তবে এ মূর্তিটিকেও আমি নিয়ে যাব কোণার্ক-ক্ষেত্রে। সে মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে স্থায়ী আসন পাবে বিশ্বকর্মা মহাপাত্রের এই মূর্তিটি। পৃথিবী দেখুক, ভাবীকাল জানুক—স্বর্গীয় ভাস্করের অশ্ব কীভাবে গতিহীন হয়েছে পার্থিব ভাস্করের হাতে!

দেবদিন্ন বললে, তথাস্তু।

মহামাত্য সহস্রাক্ষ তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দেবদিন্নের স্বহস্তে গড়া বিশ্বকর্মার মূর্তিটি আজও আছে কোণার্ক জগমোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে-মূর্তি কী জানি কেমন করে মুণ্ডহীন!

দেবদিন্নও রেখেছিল তার প্রতিশ্রুতি। নিরলস পরিশ্রমে সে কাজ করে গেছে কোণার্কে। কে জানে হয়তো সেও কালে হয়েছিল প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্কতীর্থেই। কোণার্ক জগমোহনের উপর-পোতালে তার হাতের কাজ আজও দেখতে পাবেন; বুঝতে পারবেন না, সে মূর্তিগুলি তল-পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়। পুত্রের হাতে পরাজয়ই নাকি পিতার কাম্য। স্বর্গ থেকে তাই তৃপ্ত হয়েছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র।

হয়েছিলেন্ কি?

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম : আর লক্ষ্মী? তার কী হল। দেবদিন্নের নিরলস পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ মহারাজ কী তার সোনার অঙ্গ সোনা দিয়ে সত্যিই মুড়ে দেননি।

ম্লান হেসে বৃদ্ধ বলেছিল, মহামাত্য কি তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন, বাবুজি? আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া কন্যার অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন? মহারাজের আদেশে তিনি সত্যিই স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন সুতনুকাকে।

—মানে লক্ষ্মীকে?

—না বাবুজি! লক্ষ্মীকে আর কেউ কোনদিন দেখেনি। মহামাত্যের মতো মহারাজও বলেছিলেন, এমন সুলক্ষণা সুতনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! মাতা আম্রপালীর মতো লক্ষ্মীরও লৌকিক বিবাহ হয়নি। জানি না, কে তার 'অভিষেক' করেছিলেন—বৃদ্ধ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়া অথবা লালসাজর্জর পুরোহিত সহস্রাক্ষ। কিন্তু সে অন্তিমে হয়েছিল কোণার্ক মন্দিরের রুদ্রগণিকা! 'অলঙ্কারা'! মজা এই, রাজাদেশে দেবদিন্নকেই গড়তে হয়েছিল সেই সুতনুকার মূর্তি ! তার ছবিই তো আঁকলেন এতক্ষণ সারা দুপুর ধরে। ....

স্বীকার করি, এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। এ শুধু মুখে মুখে চলে আসা উপকথা। তবু মন চায় বিশ্বাস করতে— যেন তাহলেই ওই নারী মূর্তির এই ভাবব্যঞ্জনার হদিস মেলে।

ওর চোখে কোন্ মাঘী শুক্লা সপ্তমীর কুয়াশা-ঢাকা রহস্য। পিগ্‌ম্যালিয়ানের মতো প্রাণের সবটুকু আকুতি উজাড় করে গড়েছে বলেই দেবদিন্ন এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও আবার গড়তে পেরেছে তার সুতনুকার আলেখ্য—

পাথর তো নয়, এ মূর্তি যে প্রেম দিয়ে গড়া!

রাওয়ালা

মেবার, রাজপুত যুগ

[1503—1520 খ্রিস্টাব্দ]



রচনাকাল : 1953

উৎসর্গ : **আমার মা-কে (বসন্তলতা দেবী)**

প্রথম প্রকাশ : কৃষ্ণনগর থেকে মাসিক 'হোমশিখা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পরে পুস্তকাকারেও। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থের নাম ছিল 'রাওয়ালা' (শব্দার্থ : রাজ-অন্তঃপুর। লেখকের নাম 'গোপালক মজুমদার'।) একদশক পরে কলকাতার করুণা প্রকাশনী থেকে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় (1964) 'মহাকালের মন্দির' নামে। 'মহাকালের মন্দিরের' দ্বিতীয় সংস্করণের (1965) কৈফিয়ত থেকে আংশিক উদ্ধৃতি শোনাই :

'মহাকালের মন্দির' পুনর্মুদ্রিত হয়ে বের হবার অবকাশে কৈফিয়ত হিসাবে কিছু বলার আছে।

এ ঘটনায় যদিচ আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তবু সেটা আমার অলক্ষ্যে ঘটেছে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ঘটনাস্থল কোন এক সদ্য-বিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার রাত্রির জনান্তিক অবকাশ। নায়িকা আমার স্নেহভাজন, সম্পর্কে ভাগিনেয়ী। ফুলশয্যা রাত্রে যেমন হয়ে থাকে—পরস্পরের বাল্য-কৈশোরের গল্প, আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং অনুপান হিসাবে 'ইত্যাদি'। কথাপ্রসঙ্গে মেয়েটি উল্লেখ করেছিল : তার সম্পর্কে এক মামা বাঙলা বইটই লিখে থাকেন। নামটি উচ্চারণমাত্র নায়ক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে : তাই নাকি? উনি তোমার মামা হন? ভদ্রলোক কিন্তু .... মানে .... ইয়ে, লোক খুব সুবিধার নন্।

ভ্রূকুঞ্চনটা এবার সংক্রামিত হয় নববধূর চন্দনচর্চিত ললাটে : মানে?

ওঁর একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি যেটা আর একজনের বই থেকে মেরে দেওয়া। সদ্য-পরিচিত জীবনসঙ্গীর চেয়ে সেই খণ্ড-মুহূর্তটিতে পরিচিত মামাকেই আপন মনে হয়েছিল মেয়েটির, বলেছিল, 'ভাবাবলম্বনে'-লেখা বলতে চাও?

—না! যাকে বলে আদ্যন্ত ঝেড়ে টোকা! লাইন বাই লাইন! শুধু বইয়ের নাম, লেখকের আর প্রকাশকের নামগুলো আলাদা!

এর পরের অধ্যায়টা ঝাপ্সা। শুনেছি, ঠিক জানি না, ওরা কী একটা বাজি ধরে। পরদিন বাবাজীবন লাইব্রেরী থেকে দুটি বই এনে অকাট্য প্রমাণ পেশ করে। প্রথম বইটির নাম : 'রাওয়ালা' লেখক 'গোপালক মজুমদার', প্রকাশের তারিখ 'মহালয়া ১৩৬২'। দ্বিতীয় বইটি : মহাকালের মন্দির, নারায়ণ সান্যাল। মহালয়া ১৩৭১।

বেচারী নববধূ! 'লাইন বাই লাইন' মিলিয়ে তাকে হার স্বীকার করতে হল।

তার অভিমান যে কী অতলান্তিক তা বুঝতে পারি, কারণ সে এসব কথা আমাকে আদৌ জানায়নি। লোক পরম্পরায় দুঃসংবাদটা কানে আসায় জামাই বাবাজীবনের কাছে আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল—'রাওয়ালা' আমারই লেখা উপন্যাস, বস্তুত আমার লেখা প্রথম উপন্যাস, 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এরও আগে। সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেবক হিসাবে অনুমতি না থাকায় সেটা স্বনামে প্রকাশ করিনি, 'মহাকালের মন্দির' প্রকাশের সময়ে স্বীকারও করিনি।

কিন্তু আইনের চেয়েও পারিবারিক শান্তি বড়। আমার অন্য কোনও আত্মীয়-বন্ধুর জীবনে যাতে অনুরূপ দুর্ঘটনা পুনরায় না ঘটে তাই এই কৈফিয়ত।

আশা করা যেতে পারে : হারা-বাজি কাহিনীর নায়িকা নতুন করে জিতেছিল। অবশ্য বাজির পরিমাণটা কী, অথবা 'কী-জাতের' তা অনুমান-নির্ভর!

নির্দেশিকা ও ব্যাখ্যা : কাহিনী শেষে সন্নিবেশিত।

রাজপুতানার প্রস্তরসঙ্কুল পার্বত্য পথে একজন অশ্বচালক মন্থর গতিতে নামিয়া আসিতেছে। গৌরবে ইহাকে পথ বলা হইলেও বস্তুত ইহা অসমতল পায়ে-চলার একটি সড়ক মাত্র। কাষ্ঠাহরণকারীদের যাতায়াতে বনভূমির মধ্যে এই পথ।

অশ্বটিকে উচ্চৈঃশ্রবা বা পক্ষিরাজের বংশাবতংস বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহার পিতৃকুল অথবা মাতৃকুলে হয়তো কোন অশ্বতর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। পীতবর্ণের এই বিচিত্র অশ্বের উপর চিন্তিতমুখে যে সওয়ারটি বসিয়াছিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। অত্যন্ত সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মস্তকে অবিন্যস্ত মসীকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ। উন্নত নাসা এবং বুদ্ধিদীপ্ত আয়ত চক্ষে আর্যরক্তের ছাপ, যদিও তাহার পরিধান, উষ্ণীষের পক্ষ্ম প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে পার্বত্য মীনা, ভীল অথবা আহেরিয়া জাতির লোক বলিয়া মনে হয়।

প্রায় সহস্র হাত নিম্নে সমতল ক্ষেত্রের বাড়িগুলি ছবির মতোই দেখাইতেছিল। রাজপুতানার একটি গ্রাম্য জনপদ; বিস্তীর্ণ বজরা এবং জোয়ারের ক্ষেত্র—আপাদমস্তক যেন পারস্যদেশীয় গালিচায় আচ্ছাদিত। আরও নিম্নে একটি পার্বত্য নদীর বিসর্পিল রৌপ্যরেখা।

সহসা অশ্বচালক সচকিত হইয়া উঠিল। অশ্বেরও কর্ণদ্বয় চকিতে পশ্চাৎভাগে ফিরিয়া গেল। সে ঠিকই শুনিয়াছে। অশ্বক্ষুরধ্বনি। দেখিতে দেখিতে পাকদণ্ডীর পথ বাহিয়া কয়েকজন দ্রুতগামী অশ্বচালক নামিয়া আসিল এবং যুবক সতর্ক হইবার পূর্বেই তাহার পার্শ্ব দিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে নিচে নামিয়া গেল। উহাদের আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে আমাদের পীতবর্ণের পক্ষিরাজও গতিবেগ বর্ধিত করিল।

নায়কের কিছু পূর্ব-পরিচয় এইস্থলে দিয়া রাখা ভালো। তরুণের নাম বুদ্বুদ। পাহাড়িয়াদের মধ্যেই তাহার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত। এযাবৎকাল মধুকের সন্ধানে, বন্যবরাহের অন্বেষণে পার্বত্য পথেই তাহার দিন কাটিয়াছে। তলোয়ার এবং বল্লমের ব্যবহারটা সে শিখিয়াছে ভালোই। তাহার বন্ধুদের বিশ্বাস বুদ্বুদ অসিচালনায় অপরাজেয়। তাহাকে কখনও কেহ অসিযুদ্ধে পরাস্ত হইতে দেখে নাই। পাহাড়িয়া বন্ধুদের ধারণা স্বয়ং যমরাজ পর্যন্ত যদি কখনও তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তাহা হইলে বুদ্বুদ অসি নিষ্কাশিত করিবার পূর্বেই তাঁহাকে কাজ সারিতে হইবে; একবার অসি কোষমুক্ত করিলে স্বয়ং যমরাজও নাকি তাহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইবেন!

বুদ্বুদ আহেরিয়া সর্দার মঙ্গলরামের পালিতপুত্র। বস্তুত এতদিন সে মঙ্গলরামকেই পিতা বলিয়া জানিত। মঙ্গলরাম বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধ—তাহাকে সমস্ত আরাবল্লীপর্বতের পাহাড়িয়াগণ একডাকে চিনে। যৌবনে মঙ্গলরাম ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সে তাহার কৈশোরে মহাবীর হম্বীরের সহিত আহেরিয়ায় গিয়াছে। রানা ক্ষেত্রসিংহের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছে। মঙ্গলরামের পিতা রানা হম্বীরের সেনাদলে চিতোর উদ্ধারে স্বহস্তে লড়িয়াছেন। বৃদ্ধ মঙ্গলরাম তাহার পালিতপুত্রটিকে আপন বক্ষপঞ্জর অপেক্ষাও ভালবাসিত। অস্ত্রশিক্ষা শস্ত্রবিদ্যা নিপুণভাবে নিজে শিখাইয়াছিল। বুদ্বুদ যে মঙ্গলরামের পুত্র নহে একথা সে সম্প্রতি জানিয়েছে। তাহার ধমনীতে যে পার্বত্য আহেরিয়ার রক্ত বহিতেছে না একথা জানিবার পর পুত্র পিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। দাবি করিয়াছিল আপনার পিতৃ-পরিচয়।

মঙ্গলরাম সকল কথার জবাব দিতে পারে নাই। অষ্টাদশবর্ষের যবনিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সকল কথা স্মরণ হইল না। বারে বারে ভুল হইয়া গেল। বুদ্বুদ তাহাকে একই প্রশ্ন করিতেছিল,—'মা আমার কেমন ছিল দেখিতে ? সে কোন্ দেশের রমণী? তোমার কিছুই মনে নাই?'

বৃদ্ধ শিরশ্চালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া শুধু বলিল,—'না বেটা, আমার ঈয়াদ্ হইল না। খুব উম্‌দা বদন—বহুৎ খুপসুরৎ ছিল তোর মাঈ।'

বৃদ্ধের নিকট যেটুকু কাহিনী সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা নিম্নোক্তরূপ—দীর্ঘদিন পূর্বে মঙ্গলরাম সর্দার একবার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। একরাত্রে শিকার করিয়া ফিরিবার পথে সহসা জঙ্গলের ভিতর

একটি সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পায়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে গিয়া দেখে একজন ঘরণা-ঘরের রমণী তাহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে বক্ষপুটে আড়াল করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। মঙ্গলরামই স্বীয় তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জননীর সহিত শিশুর যোগসূত্রটি ছেদন করে। সদ্যোজাত সন্তানটিকে যখন সে সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল তখন জননীর বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার সর্দারের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া অস্ফুটে কী উচ্চারণ করিয়া রমণী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মৃতের সৎকারের জন্য কয়েকজন সহচরকে রাখিয়া বৃদ্ধ ছুটিল গ্রামের দিকে একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর সন্ধানে। আশ্চর্য জীবনীশক্তি সেই শিশুর। ভাগ্যের নিষ্ঠুর প্রতিবন্ধকতাকে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিল।

ইহার পর আহেরি সর্দার মঙ্গলরামের অপমৃত্যু হইল, বাঁচিয়া রহিল জনক মঙ্গলরাম, সংসারী মঙ্গলরাম। তবু এই পালিতপুত্রটি যে আহেরিয়া নহে, ভদ্রসন্তান, এ সত্য সে একদিনের জন্য ভোলে নাই। তাই নিজে তাহার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার লইলেও তাহাকে কিছু কিছু সংস্কৃত লেখাপড়াও শিখাইয়াছিল।

সমস্ত কাহিনীটি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিয়া বুদ্বুদ প্রশ্ন করিয়াছিল, 'আমার মা, আমার বাপের কোন সন্ধান তুমি পাও নাই? আমার পিতার পরিচয় কী?'

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, 'কাঁদিস না বেটা—দুনিয়ায় তোর পরিচয়—তুই মরদ। তুই লেখাপড়া শিখিয়াছিস, মহাবীর কর্ণের কথা তো তুই জানিস। তুই, তুই..... এই মঙ্গলরামের বেটা।'

ক্ষুব্ধ কিশোর অস্বীকার করিয়াছিল,—'না! আমি রাজপুত, আমি আহেরি নই! কেন তুমি আমার পিতার খোঁজ করলে না?'

বৃদ্ধ নীরব থাকে। খোঁজ যে সে একেবারে করে নাই তাহা নহে, কিন্তু গোপনে। বস্তুত প্রকাশ্যে সে আন্তরিক সন্ধান করে নাই—কারণ সেদিন সে ঐ সদ্যোজাত মাংসপিণ্ডকে হারাইতে রাজি ছিল না।

বৃদ্ধের নীরবতায় বুদ্বুদ ক্ষুব্ধ হয়—'বুঝিয়াছি! তুমি ইচ্ছা করিয়াই আমার সন্ধান লও নাই! আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া।'

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠে। হা-হা করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

বুদ্বুদ বৃদ্ধকে জানাইয়াছিল, সে রাজপুতদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহে। মেবার, মারবার, মালোয়া কোন সৈন্যদলে নাম লিখাইতে চাহে। পার্বত্যদের মধ্যে সে আপন জীবন ব্যর্থ হইতে দিতে পারে না। বৃদ্ধ আপত্তি করে নাই। পক্ষিশাবক যে চিরকাল পক্ষচ্ছায়ায় থাকে না এ-সত্য সে জানিত। তবে বৃদ্ধ অনুরোধ করিয়াছিল, বুদ্বুদ যেন চিতোরেই নিজ অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করে। মেবারের প্রতি তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। মেবারের পক্ষে সে নিজে অসি ধরিয়াছে।

বৃদ্ধ আপনহস্তে পুত্রকে সাজাইল। তাহার কটিদেশে তরবারি বাঁধিয়া দিল। বিদায়ের সময় ওর হস্তে তুলিয়া দিল একখানি কঙ্কণ। কহিল,—'তোর মাঈর গায়ে কোন গহনা ছিল না, কারুল, আওলা, পাঁয়জোর কিছুই না। শুধু এক হাতে ছিল, সীমন্তিনীর লক্ষণ এই কঙ্কণ। এটি তোর সম্পত্তি।'

কঙ্কণটি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বুদ্বুদ অঙ্গরাখার ভিতর রাখিল। বৃদ্ধ বলিল,—'চিতোরের শিশোদীয়া রানা আর একলিঙ্গ-ভবানীমাতা ভিন্ন কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করিবে না। তোমার পিতা, মানে আমিও কোনও দিন কাহারও নিকট নতিস্বীকার করি নাই—একমাত্র রানা ও দেবাদিদেব ভিন্ন। একথা ভুলিও না।'

উদ্ধত কিশোর তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—'চিতোরের শিশোদীয়া রানা আর একলিঙ্গ-ভবানীমাতার চরণ ভিন্ন কাহারও নিকট নতিস্বীকার করিব না।'

প্রতিজ্ঞান্তে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া বুদ্বুদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল বৃদ্ধ পিতাকে। মঙ্গলরামও দুই হাতে আশীর্বাদ করিল প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পালিতপুত্রকে। পিতা-পুত্রের কাহারও খেয়াল হইল না, প্রতিজ্ঞার পরমুহূর্তেই সেটিকে নিঃশেষে ভাঙিয়া ফেলা হইল।

অজানার পথে যাত্রা শুরু করিল কিশোর। পাহাড়ের চূড়ায় কল্যাণদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল বৃদ্ধ।

বুদ্বুদ যখন পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিল তখন সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়াছেন। ঘরে ঘরে একটি দুইটি করিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখেই একটি পান্থশালা দেখা যায়, একধারে একটি পাদপের সহিত কয়েকটি অশ্ব রজ্জুবদ্ধ। অপর পার্শ্বে একটি কূপ হইতে গ্রাম্যবধূরা জল তুলিতেছে। তৈলতৃষিত কপিকলের করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। পান্থশালার পার্শ্বেই একটি অত্যন্ত সুদৃশ্য পল্যঙ্কিকা। বুদ্বুদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই শুনিল একটি উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্য। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিল দ্বিতলের অলিন্দে দাঁড়াইয়া দুইজন রাজপুত যোদ্ধা কি লইয়া খুব হাসাহাসি করিতেছে। উহাদের একজনের তর্জনী হইতে সরলরেখা টানিলে রেখার অপর প্রান্ত আসিয়া পড়িবে বুদ্বুদের অবলা অশ্বটির অঙ্গে। বুদ্বুদ বুঝিল। ওর সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়িল। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল,—'মহাশয় শুনিতেছেন? হ্যাঁ, আপনাকেই বলিতেছি। আপনার অট্টহাসির কারণটা জানিতে পারি কি? হেতুটা জানিতে পারিলে আমরা সকলেই ঐ হাসিতে যোগ দিতে পারি।'

'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলিতেছি না।'

একটি ছদ্ম অভিবাদনের ভঙ্গি করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'আমি যে আপনার সহিতই কথা বলিতেছি।'

ওর বাচনভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে যে ব্যঙ্গ, যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল অপমান করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভদ্রলোকের মূর্তি অলিন্দ হইতে সরিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে পান্থশালার দ্বারপথে নির্গত হইয়া আসিয়া থামিল এই বিচিত্র ঘোটক এবং তাহার বিচিত্রতর প্রভুর মাঝখানটিতে।

রাজপুত সম্ভবত রাঠোর। মেদহীন সুগঠিত শরীর, রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ গাত্রবর্ণ। গুম্ফের দুইপ্রান্ত মোম দিয়া সযত্নে পাকানো এবং গুম্ফপ্রান্তদ্বয় যুগলেই সমান উচ্চাভিলাষী। চোখেমুখে একটি প্রচ্ছন্ন হাস্য-প্রলেপ। রাঠোরের বয়ঃক্রম চল্লিশোর্ধ্ব, তাহার পিছনে পিছনে আরও একজন রাঠোর বাহির হইয়া আসিল। প্রথম লোকটি বুদ্বুদকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, এবং তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কহিল, 'অঙ্গদেব, এইরূপ হরিদ্রাভ জীব আমি গোটা রাজপুতানায় কখনো দেখি নাই। এটি নিশ্চয়ই হর্দিতে[1] ভুগিতেছে অথবা অচিরেই ইহার বিবাহ ঘটিবে।'

সঙ্গী অঙ্গদেব কহিল,—'কেন বিবাহ হইবার কারণ কী?'

'তুমি রাওয়ালার রক্ষী, এটা বুঝিলে না? এটি যে গাত্রহরিদ্রার আসর হইতে সদ্য উঠিয়া আসিয়াছে!' বলিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত বেপরোয়া হাসিতে পরিবেশটা উচ্চকিত করিয়া দিল।

বুদ্বুদের আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল,—'দুনিয়ায় এক শ্রেণীর গাড়োল আছে যাহারা সোয়ারের দিকে চাহিয়া হাসিতে সাহস পায় না, তাই তাহার অশ্বের দিকে চাহিয়া হাসে।'

রাঠোর গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিয়া এতক্ষণে ওর ছদ্ম অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিল,—'অশ্ব? ধন্যবাদ! এটি যে অশ্ব তাহা বুঝিতে পারি নাই! যাহাই হউক—আমি সচরাচর হাসি না, তবে যখন হাসি তখন কাহারও অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। এইটি আমার স্বভাব।'

'কাহাকেও হাসিতে দেখিলে আমি সচরাচর আপত্তি করি না। তবে কাহারও হাস্য আমার অপছন্দ হইলে তাহাকে হাস্য সংবরণ করিতে বাধ্য করি। এটাই আমারও স্বভাব।'

'ও তাই নাকি? হইতে পারে।' বলিয়া রাঠোর হাসিতে হাসিতে পান্থশালার দিকে ফিরিল।

তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বুদ্বুদ হাঁকিল, 'এদিকে ফিরুন অট্টহাসিবাবু, পিছন হইতে আমি কাহাকেও আঘাত করি না!'

'আঘাত করিবেন? সকল ঠাট্টা-তামাশারই একটা সীমা আছে।'

'সেই সীমারেখাটিই আপনাকে সমঝাইয়া দিতে চাই।'

রাঠোর ফিরিল, কিন্তু সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়াই কহিল,—'অঙ্গদেব, তুমি বল মেবারের সেনাদলে লোক পাওয়া যায় না—অথচ পথে ঘাটে দেখ, কত বীর অহেতুক আস্ফালন করিয়া বেড়ায়।'

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বুদ্বুদ লাফাইয়া পড়িল অপরিচিতের উপরে। হাসি বিদ্রূপ করিলেও ধূর্ত রাঠোর সম্পূর্ণ সজাগ ছিল এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য। তাই বুদ্বুদের তরবারি

রাঠোরের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহার অস্ত্রে ব্যাহত হইল।

মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুইজন যোদ্ধা দাঁড়াইযাছে পান্থশালার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন দর্শক আকৃষ্ট হইয়াছিল। যোদ্ধৃবৃন্দের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। সকলেই সরিয়া গিয়া বৃত্তাকারে যোদ্ধৃদ্বয়ের জন্য খানিকটা স্থান করিয়া দিল। উভয়ের তরবারি মস্তকের উপরে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে; মুহূর্তের নীরবতা; আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বাভাস যেন!

অনিবার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধটিতে কিন্তু একটা ব্যাঘাত জন্মিল। দ্বিতলের অলিন্দ হইতে চারাগাছসমেত একটি ফুলগাছের টব সশব্দে আসিয়া পড়িল বুদ্বুদের মস্তকে। মুক্ত কৃপাণ তাহার হস্ত হইতে ছুটিয়া গেল। বুদ্বুদ সংজ্ঞাহীন হইয়া ধুলায় লুটাইল। রাঠোর উপরে চাহিল, দেখিল তাহার একজন বন্ধু অলিন্দে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

বুদ্বুদের জ্ঞান হইলে দেখিল, সে পান্থশালার একখানি চারপাইতে শুইয়া আছে। রাত্রি গভীর। নিকটে কেহ নাই। বুদ্বুদ উঠিয়া বসিল। তরবারিখানা পাশেই পড়িয়াছিল। কোষবদ্ধ করিল। বাহিরে যেন কাহাদের কথোপকথন শুনা যায়। লঘুপদে বুদ্বুদ বাহিরে আসিল। অন্ধকার তখন ঘনীভূত। কৌতূহলী দর্শকের দল যে যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছে। পান্থশালার সম্মুখভাগে একজন লোক মশাল-হস্তে পল্যঙ্কিকার ভিতরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। বুদ্বুদ চিনিল সেই রাঠোর যোদ্ধাটি। এ পাশে যে স্থানে অশ্বগুলি বাঁধা ছিল সে স্থানটা শূন্য। রাঠোরের অশ্ব তাহার অনতিদূরেই দণ্ডায়মান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহার অজ্ঞান অবস্থাতেই অর্বাচীনটা পলায়ন করে নাই। মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই বুদ্বুদ শুনিল পালকির ভিতর হইতে কে বলিল, 'তাহা হইলে আমাকে এক্ষণে দিল্লী যাইতে হইবে? এতটা পথ যাইবার যাবতীয় খরচও আশা করি আনিয়াছ?'

রাঠোর বিনা-বাক্যব্যয়ে একটি কাষ্ঠের ক্ষুদ্রায়তন বাক্স হইতে একটি চর্মপেটিকা বাহির করে পালকির অভ্যন্তরবাসীর দিকে সেটিকে নিক্ষেপ করিল এবং মশালটি উঁচু করিয়া ধরিল। বুদ্বুদ অবাক বিস্ময়ে দেখিল পালকির ভিতর রহিয়াছেন একজন মহিলা—মুসলমান জেনানা বলিয়া বোধ হয়। সর্বাঙ্গে মূল্যবান আভরণ, পরিধানে রক্তবর্ণের রেশমবস্ত্র, মাথার উপর দিয়া একটি সূক্ষ্ম দোপাট্টা। মেয়েটির বয়স বিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ যাহা খুশী হইতে পারে। বস্তুত স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে ও প্রসাধনের পারিপাট্যে বয়সের অঙ্কটা একেবারে আন্দাজের বাহিরে। মশালের আলোকে, অন্ধকারের পটভূমিকায় সর্বালঙ্কারভূষিতা এই লাবণ্যময়ী রমণীর রহস্যময় আবির্ভাবে বুদ্বুদ যেন হতচেতন হইয়া গেল। রমণী চর্মপেটিকা বামহস্তের উপর উপুড় করিয়া দিল। সবগুলিই সোনার আসরফি।

রমণী হাসিল। অদ্ভুত মোহিনী হাসি। কহিল,—'তাহলে আদাব! আমি রওনা হইলাম। তুমিও দেরি করিও না।'

'আমি মুহূর্ত বিলম্ব করিব না। এখনি যাইব।'

'সেকি? ওই আহেরি ছোঁড়াটাকে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই?'

আর সহ্য হইল না বুদ্বুদের। একলম্ফে অকুস্থলে আবির্ভূত হইল সে মুক্তকৃপাণ হস্তে। কহিল,—'আহেরি ছোঁড়াই শিক্ষা দিবে এই মারোয়ারি ভেড়ুয়াকে!'

চকিতে সতর্ক হয় রাঠোর,—'আপনার জ্ঞান হইয়াছে দেখিতেছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়! এইবার আপনাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করিতে চাহি। আশা করি এবারও আপনি পলাইবার চেষ্টা করিবেন না।'

'পলাইব!'

পালকি হইতে রমণী সাবধানবাণী উচ্চারণ করে,—'ভুলিও না, তোমার উপর ন্যস্ত আছে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব।'

'না ভুলিব না। তুমি যাও, আমিও চলিলাম!'

মুহূর্তে অশ্বারোহণ করিল রাজপুত। বিদ্যুদ্‌গতিতে ঘুরিল তাহার অশ্বের মুখ।

'ভীরু কাপুরুষ!'—চীৎকার করে বুদ্বুদ। পান্থশালার অধীপও তখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পিছনে। সে কহিল,—'আমার পাওনা?'

'ঐ ছোঁড়া দিবে। খোকাবাবু—দামটা দিয়া দিও।' ভাসিয়া আসিল দূর হইতে।

বুদ্বুদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার চেষ্টা করিতেই রাঠোর হস্তধৃত শূন্যগর্ভ বাক্সটি ছুড়িয়া মারিল বুদ্বুদের মস্তকে। পুনরায় সংজ্ঞা হারাইয়া বুদ্বুদ মাটিতে পড়িল। দূর হইতে দূরে বনভূমি উচ্চকিত করিয়া একটা অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি শুধু শুনা যাইতেছিল তখন।

দুই

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়াছে জানে না, জ্ঞান হইলে প্রথমটায় বুদ্বুদের কিছুই মনে পড়িল না। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সে একাকী শুইয়াছিল। ধীরে ধীরে সে চাহিয়া দেখিল। শিয়রের দিক হইতে শীতল বাতাস ও একটি মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহার সব কথা মনে পড়ে। সেই অর্বাচীন রাজপুরুষটার বন্ধু তাহার মস্তকে ফুলগাছের টব ফেলিয়া দেওয়ায় সে অজ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? তবে কি সেই পালকির ভিতরে দেখা রমণী মূর্তি,. সেই আসরফির থলি, সবই স্বপ্ন?.... আরও যেন কী মনে পড়িতেছে! অস্পষ্ট একটি মুখ! যেন স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে! রক্তচীনাংশুকে মণ্ডিত সেই সেবাপরায়ণা দেবীমূর্তি? কখনও তাহার মস্তকে সিক্ত বস্ত্রের প্রলেপ দিতেছে, কখনও ঔষধ খাওয়াইতেছে, কখনও বা অর্ধস্ফুট একখানি কচি মুখ শুধুই নিষ্পলকে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!.... এ সকলই স্বপ্ন?

মৃদু সৌরভ এবং শীতল বাতাস শিয়রের দিক হইতে তখনও আসিতেছিল। বুদ্বুদ অতি ধীরে ধীরে সেদিকে ফিরিয়াই চমকিত হইল। এই তো সে। তবে তো স্বপ্ন নহে! শিয়রের নিকট একটি কিশোরী নিমীলিত নেত্রে মন্থরবেগে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। মৃদু সৌরভটি ঐ চন্দনকাষ্ঠের পাখার অথবা কিশোরীর প্রসাধনের অগুরু সুবাস, অথবা পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌরভ, সে সমস্যার সমাধান করিবার মতন মনের অবস্থা তাহার ছিল না। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়াই আমাদের নায়ক মহাবীর-বিনিন্দিত একটি উল্লম্ফন দিতে প্রয়াসী হইল। ফলে পতন এবং পুনরায় মূর্ছা।

বারান্দা হইতে ছুটিয়া আসিল একজন বৃদ্ধা। কিশোরী এবং বৃদ্ধা অবলীলাক্রমে কিশোরকে পুনরায় তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বৃদ্ধা কহিল,—'জ্ঞান হইয়াছিল?'

কিশোরী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করিল।

'তোমাকে দেখিয়াছে?'

কিশোরীর কপোলদুটি রক্তাভ হইল। সলজ্জে সে কহিল,—'না।'

বৃদ্ধা কহিল,—'আর অপেক্ষা করা উচিত নহে। মাধববর্মা এখনি রওনা হইতে বলিতেছেন।'

কিশোরী কহিল,—'আমার শরীর ভালো নাই। আজ রাত্রিটুকু এস্থলে থামিয়া কল্য প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিলেই চলিবে।'

বৃদ্ধা কিছুই বলিল না। বৃদ্ধা চলিয়া যাইতেই কিশোরী বুদ্বুদের কপালে শীতল করাঙ্গুলি বুলাইতে শুরু করিল।

পরদিবস বুদ্বুদের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা একপ্রহর অতিক্রান্ত। পান্থশালার একজন ভৃত্যজাতীয় লোক তাহার খিদমৎ করিতেছিল। ঔষধ দিল, পথ্য দিল। পান্থশালার অধীপও তাহার কুশল লইয়া গেল। পূর্বদিকের গবাক্ষের রৌদ্র ঘুরিয়া ক্রমে পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া উঁকি মারিল। বুদ্বুদের অবস্থা তখন শ্বশুরালয়ে নবাগত জামাতার মতো। সে সকলকেই দেখিতেছে অথচ কাহাকেও দেখিতেছে না। বস্তুত প্রত্যাশিত ব্যক্তি সারাদিনে একবারও আসিল না। বুদ্বুদের আঘাত মারাত্মক নহে। সে উঠিয়া বসিল। পান্থশালার অধীপকে ডাকাইয়া পাঠাইল। কিছু ইতস্তত করিয়া সে কিশোরীর কথা

জিজ্ঞাসা করিল। পান্থশালার অধীপের নিকট যাহা সংবাদ পাওয়া গেল তাহা স্বাভাবিক হইলেও মর্মন্তুদ। এটি পান্থশালা। কেহ কাহারও পরিচয় জানে না।

ঐ রাঠোর যুবক, যে তাহার শত্রুতা করিল সেও যেমন এখানকার একরাত্রের মুসাফির—এই কিশোরী, যে তাহার সেবা করিল সেও তেমনই এখানকার অপরিচিত অতিথি। কিশোরী ও বৃদ্ধা তাহাদের রক্ষকের সহিত মান্দোরের পথে অদ্য প্রাতেই চলিয়া গিয়াছে।

মান্দোর এখান হইতে দুইদিনের পথ। বুদ্বুদ ভাবিল, এক্ষণে রওনা হইতে পারিলে পথে পুনরায় তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। বুদ্বুদ তৎক্ষণাৎ পাওনা মিটাইয়া দিয়া রওনা হইয়া পড়িল।

এতক্ষণে যেন জীবনের একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। গৃহ হইতে রওনা হইবার সময় তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল মেবারের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া। মেবারের রাজধানী চিতোরের দিকেই সে যাইতেছিল। পথিমধ্যে গতি পরিবর্তন করিয়া এক্ষণে মান্দোরে চলিল। তাহার জীবনের দুইটি উদ্দেশ্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথমত, সেই রাজপুত রাঠোরটিকে শিক্ষা দিতে হইবে—দ্বিতীয়ত, এই কিশোরীর সন্ধান লইতে হইবে। কাহাকেও সে ভোলে নাই। রাঠোরকে তো নহেই—তাহার মোহিনী সঙ্গিনীটিকেও নহে। আর কিশোরী? তাহার আয়ত চক্ষু, কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ, চিবুক ও কপোলের উপর তিলচিহ্নগুলি পর্যন্ত তাহার মুখস্ত হইয়া গিয়াছে—মুহূর্তের দর্শনেই।

পথে নামিয়াই বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল—অসংখ্য লোক মান্দোর অভিমুখে চলিয়াছে। পদব্রজে, অশ্বে, গোযানে এবং পালকিতে। ব্যাপার কী? এত লোকে এদিকে কোথায় যাইতেছে? পথে চলিতে চলিতে একজন অশ্বারোহী গ্রাম্য সর্দারের সহিত বুদ্বুদ আলাপ করিল। গ্রাম্য সর্দার সপরিবারে মান্দোর যাইতেছেন, পিছনের গোযানে তাঁহার সর্দারণী সকাচ্চাবাচ্চা আসিতেছেন। সর্দারের নিকট অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিল বুদ্বুদ।

মান্দোর মারবার রাজ্যের রাজধানী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও মারবারের বিখ্যাত রাজধানী যোধপুরের পত্তন হয় নাই।[2] মারবারের বর্তমান রাজার নাম রাও রণমল্ল। যুবরাজের নাম কুমার যোধা। এই যুবরাজ যোধাই পরবর্তীকালে রাজা হইয়া যোধপুর নগরীর পত্তন করেন। মারবার রাজ্য মেবারের মতো শস্যশ্যামলা নহে—মরুভূমির মতো রুক্ষ দেশ। পূর্বে মেবার এবং পশ্চিমে মারবার—মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বত। তখন, শুধু তখন নহে সব যুগেই, সমস্ত রাজোয়ারার প্রধান ছিলেন মেবারের রানা। ঐতিহ্য, সম্মান এবং প্রতিপত্তিতে মারবারের স্থান মেবারের পরেই।

খবর পাওয়া গেল, মারবারের তদানীন্তন রাজধানী মান্দোরে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় একটি অসি প্রতিযোগিতার আসর হয়। মেবার, মারবার, বুন্দি, মালোয়া প্রভৃতি রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি-যোদ্ধা সমবেত হন এই আসরে। সকল রাজ্য হইতেই আসেন তিনজন করিয়া প্রতিনিধি। রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত তরবারি লইয়া আপোসে অসিযুদ্ধ হয় বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে। উপস্থিত রাজন্যবর্গ বিচার করেন। যে দল বিভিন্ন প্রতিযোগিদলকে পরাস্ত করিতে পারে সেই দল পায় মারবারের রাজার হস্ত হইতে সম্মান—আয়ুধ তরবারি। এই অসিযুদ্ধের আসরেই নির্ধারিত হইয়া যায় সে বৎসরের জন্য সমস্ত রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অসিবীরত্রয়ীর নাম। সর্দার বলিতেছিল, এই অসিযুদ্ধের আসরে কৃতিত্ব দেখাইয়া কত সাধারণ সৈনিক মনসবদারের পদে উন্নীত হইয়াছে। অসিযুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে বুদ্বুদ উৎসাহিত হয়। ওকে এখানে যাইতেই হইবে। কে জানে হয়তো এখানেই ওর ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। বুদ্বুদ জিজ্ঞাসা করে,—'গতবার কী হইয়াছিল?'

'গত বৎসরও মেবার জয়লাভ করে।'

'যোদ্ধাদের নাম কী?'

'নাম আমার মনে থাকে না—কি যেন পাহাড় পর্বতের নাম সব।'

'পাহাড় পর্বতের নাম? সে আবার কি? যুবরাজ চণ্ড? রঘুদেব?'

হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠে মারোয়ারি সর্দার। বলে,—'যুবরাজ চণ্ড আর রঘুদেব যুদ্ধ করিবে? রঘুদেবটা তো শুনিয়াছি একটা সন্ন্যাসী—তরোয়াল তো দূরের কথা তাহার বাঁট দেখিলেই মূর্ছা যায়। আর চণ্ড ? সে তো একটা—'

'সাবধান!' গর্জন করে বুদ্বুদ।

ইহার একটি গোপন কারণ আছে। মঙ্গলরামের প্রভাবে বুদ্বুদ মনে মনে মেবারের ভক্ত। বর্তমান রানা লখার দুই পুত্র। যুবরাজ চণ্ডদেব ও কুমার রঘুদেব। ইহারা কতদূর শক্তিধর সে কিছুই জানিত না বটে—কিন্তু মনে মনে সে ইহাদের পূজা করিত। তাই মারোয়ারি সর্দারের কথায় বুদ্বুদ জ্বলিয়া উঠিল। মারোয়ারি হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে কহিল,—'আপনি কি মেবারী? আপনাকে তো আহেরিয়া ভাবিয়াছিলাম।'

'তুমি কি ভাবিতেছ তাহাতে কিছুই যায় আসে না। শুনিয়া রাখ—ঐ কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলে এতক্ষণ শুধু বাঁটই দেখিতেছ—এইবার আমার তরবারির নগ্ন স্বরূপ দেখিতে পাইবে।'

মারোয়ারি ভয় পাইয়াছিল। তবু হাসিয়া কহিল,—'এখন আর তাহা হইবার নহে। কারণ আমরা মান্দোরনগরী-সীমায় পৌঁছিয়াছি। এখানে তরবারি নিষ্কাশিত করিলেই প্রহরী আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।'

বুদ্বুদ কহিল, 'কেন?'

সর্দার একথার জবাব দিল না। সে আগাইয়া গেল। বুদ্বুদ তখন অন্যান্য পথচারীর সহিত আলাপ করিতে সচেষ্ট হইল এবং আরও সংবাদ পাইল যে, এই অসিযুদ্ধের সময় মান্দোরে একটি বিখ্যাত মেলা হয়। এত যাত্রী-সমাগমের কারণ ইহাই। এ ছাড়াও একটি খবর পাওয়া গেল। কার্তিকের শুক্লপক্ষে মান্দোর নগরবাসীর মধ্যে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ। ঐ সময়ে রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য হইতে সৈনিকেরা মারবার-রাজ্যে সমবেত হয়—তাই কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা এড়াইবার জন্য মারবার-রাজ আদেশ দিয়াছেন—কার্তিকের শুক্লপক্ষে মান্দোরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ। কাহাকেও ব্যক্তিগত বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে মান্দোরনগর সীমার বাহিরে যাইতে হইবে। এই ভরসাতেই মারোয়ারি সর্দার ওকথা বলিয়াছিল। বুদ্বুদ এতক্ষণে মান্দোরে পৌঁছিয়াছে।

তিন

মারবারের প্রকৃতি রুক্ষ, মাটি অনুর্বর। একমুষ্টি ভুট্টা অথবা জোয়ার দান করিতেও যেন কৃপণা ধরিত্রী কুণ্ঠা বোধ করেন। রাজধানী মান্দোরও এমন কিছু চমকপ্রদ নগরী নহে। দোকানপাট নিতান্তই সাধারণ, বস্তুত মান্দোর নগরী নহে, একটি পাহাড়ের অংশ। টিলার উচ্চতম অংশে মারবার রাজদুর্গ। ঐ দুর্গই রণমল্লের রাজপ্রাসাদ।

বুদ্বুদ দেখিল, মান্দোর আসন্ন মেলা ও উৎসবের উপলক্ষে প্রসাধন করিয়াছে প্রচুর। হর্ম্যশীর্ষে নিশান। পথের মাঝখানে তোরণদ্বার। নানাবেশে সজ্জিত কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছে। বিপণীতে বিপণীতে জনসমাগম। পর্বতের সানুদেশে অসংখ্য সারি সারি তাঁবু। প্রতিযোগী সৈন্যদলের ছাউনি। মালভূমির একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া অসি-প্রতিযোগিতা তথা মেলার আসর। বিভিন্ন শিবিরে বাত্যাতাড়িত নিশানগুলি পত্‌পত্‌ করিয়া উড়িতেছে। ঐ নিশান দেখিয়া বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে চিহ্নিত করিবার শক্তি বুদ্বুদের নাই—সে শুধু চিনিল স্বর্ণসূর্যলাঞ্ছিত মেবারের রক্তনিশান। এটির বর্ণনা আবাল্য শুনিতে শুনিতে সে চিনিয়া রাখিয়াছে।

মান্দোরে পৌঁছাইয়া বুদ্বুদ একটি পান্থশালায় আশ্রয় লইয়াছে। তাহার অর্থাভাব শুরু হইয়াছে। সম্বলের মধ্যে সঙ্গে আছে একটি স্বর্ণকঙ্কণ, তরবারি ও অশ্ব! বুদ্বুদ তৃতীয় জিনিসটিকেই বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিল।

আজ সমস্ত দিন সে মেবার শিবিরের আশেপাশে ঘুরঘুর করিতেছে। দ্বারে দুইজন মেবারী পাহারা।

ইতিপূর্বে প্রত্যেক শিবিরেই ঘুরিয়া সে সংবাদ পাইয়াছে যে কোথাও যোদ্ধার অভাব নাই। সকল দলেই তিনজন করিয়া যোদ্ধা উপস্থিত। মেবারের শিবিরের তিনজন অপরাজেয় শক্তিধর, যাহারা গতবার বিজয়ী হইয়াছিল তাহারাই উপস্থিত। ইহারা তিনজনেই দেওয়ানী ফৌজের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্বুদ সংবাদ লইয়া জানিয়াছে, মেবারীদলকে লইয়া আসিয়াছেন সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং—রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছেন কুমার রঘুদেব। যুবরাজ চণ্ডদেব আসেন নাই।

যুবরাজের না আসিবার একটি কারণ আছে। সচরাচর রাজপুত্রেরা এই সাধারণ অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন না। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকিত। মেবার পর পর দুই বৎসর বিজয়ী হওয়ায় মারবার রাজকুমার যোধা আর গতবার স্থির থাকিতে পারেন নাই। স্বয়ং নামিয়াছিলেন অসিযুদ্ধে। যোধা অমিত বিক্রমশালী ও সুনিপুণ অসিচালক। তিনি গতবার তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গীই মেবারী যোদ্ধাদ্বয়ের নিকট পরাজিত হয়। ফলে দলগতভাবে মেবার বিজয়ী হয়। তাই এবার মেবারের যুবরাজ চণ্ডদেব স্বয়ং অসিধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মেবারের যুবরাজ মারবারের রাজার হস্ত হইতে তরবারি গ্রহণ করিবে—এ যেন রানার মনঃপূত হয় নাই। অনিচ্ছা রানা লখা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। যুবরাজ চণ্ডদেব অত্যন্ত অভিমানী এবং স্পর্শকাতর। পিতার অনিচ্ছা জানিতে পারিয়া তিনি এ বৎসর প্রতিযোগিতার আসরেই আসেন নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বন্যশূকরের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। অগত্যা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রঘুদেবকে লইয়াই সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র দলপতি হইয়া আসিয়াছেন। রঘুদেব ধার্মিক প্রকৃতির লোক। মারামারি কাটাকাটি তাঁহার ভালো লাগে না। কিন্তু পিতার আদেশে তাঁহাকেই প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিতে হইয়াছে।

মেলার বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া বুদ্বুদ এ সকল মুখরোচক সন্দেশ সংগ্রহ করিয়াছিল। কোথাও স্থান হইল না দেখিয়া হতাশ বুদ্বুদ মেবার-শিবিরের অনতিদূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া বসিল। অদূরে একজন সৈনিককে লইয়া তাহার কয়েকজন বয়স্য হাসিঠাট্টা করিতেছিল। বুদ্বুদ দেখিল, সৈনিক মেবারী রাজপুত, সুন্দর সুপুরুষ। উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ। একজন বন্ধু বলিতেছিল,—'সত্যি কথাটা স্বীকার কর উদয়—আমরা তো কাহাকেও বলিয়া দিব না। ছুটি পাইলেই তুমি উন্তালায় ছোট। অথচ তোমার বাড়ি উন্তালায় নহে। কোন একটা আকর্ষণ তোমার আছেই উন্তালা গ্রামে?'

উদয় প্রতিবাদ করিল,—'কে এইসব মিথ্যা প্রচার করিতেছে বলত ? আমি উন্তালায় যাই না—যাই উদয়পুর, আমার পিসিমাতাকে দেখিতে।'

—'উন্তালার মেহ্‌রা সর্দারকে তুমি চিন না? আমরা সেবার যখন উদয়পুরে ছাউনি ফেলিলাম তুমি সে রাত্রে মেহ্‌রা সর্দারের গৃহে অতিথি ছিলে না?'

—'কী আশ্চর্য! মেহ্‌রা আমার স্বজাতি, আমার পরিচিত। তাহার গৃহে আমার নেওতা হইলে কি আমি প্রত্যাখ্যান করিব?'

—'আরে ছি ছি! কে বলে একথা। আমরা বলিতেছি, মেহ্‌রা সর্দারের একটি সুন্দরী কন্যা আছেন। তাঁহাকে আমরা বন্ধুপত্নীরূপে দেখিতে চাই এবং আমরাও ঐ উপলক্ষে একদিন মেহ্‌রা-গৃহে নেওতা খাইতে চাই।'

—'এ সকল রসিকতা আমার ভালো লাগে না। মেহ্‌রা সর্দারের একটি কন্যা আছেন শুনিয়াছি। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলার নাম যুক্ত করিয়া—'

—'শুনিয়াছি? অর্থাৎ দেখ নাই বা চিন না?' অপর একজন কহিল,—'এবারও অসিযুদ্ধে আমরাই জয়ী হইব—ফিরিবার পথে উন্তালা হইয়া আমরা যাইব। উদয়, তাই বলিতেছি ভাই, মান্দোরের মেলা হইতে কিছু উপহার ক্রয় করিয়া রাখিলে পারিতে।'

উদয় ছদ্মক্রোধে স্থান ত্যাগ করিল, বলিল,—'তোমাদের শুধু একই রসিকতা। আমার তিনকুলে কেহ নাই। উপহার কিনিব কাহার জন্য?'

উহাদের হাসিঠাট্টায় বুদ্বুদ উন্মনা হইয়া যায়। কেমন সুখে আছে উহারা। হৈ-হল্লা লাগিয়াই আছে।

আজ আহেরিয়া—চলো শিকারে; কাল যুদ্ধ— চল যুদ্ধক্ষেত্রে! অথচ তাহার জন্য না আছে এই যুদ্ধে যাইবার আহ্বান, না যুদ্ধ-প্রত্যাগতকে অভিনন্দন করিবার জন্য কোন উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষমানা কেহ। নাঃ, একটা কিছু করিতে হইবে। এক্ষনি, এই মুহূর্তে! বুদ্বুদ সোজা চলিয়া গেল মেবার সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্রের শিবিরের দিকে।

শিবিরে দ্বারী তাহার পরিচয় লইয়া ভিতরে খবর দিতে গেল। অনতিবিলম্বে বাহিরে আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,—'সর্দার হিমাচল, সর্দার বিন্ধ্যাচল, সর্দার উদয়াচল! সেনাপতি আপনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

মন্থরপদে বুদ্বুদ শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ক্ষুদ্রায়তন শিবিরের অপর পার্শ্বে মেবার সেনাপতি অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। সেনাপতি বৃদ্ধ হইয়াছেন—শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত গম্ভীর মুখ। মস্তকে উষ্ণীষ, কটিদেশে বিরাটাকার তরবারি। প্রতি পদক্ষেপে রুদ্ধকোষের ভিতরে তরবারি যেন গুমরিয়া আর্তনাদ করিতেছে। উপেন্দ্রবজ্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক—তাহাকে শিবিরের অপর পার্শ্বে রক্ষিত একটি কাষ্ঠাসনের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে বসিল। সেই মুহূর্তে শিবিরের কৃষ্ণ যবনিকাটি দুলিয়া উঠিল এবং দুইজন রাজপুত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

একজন বুদ্বুদের পরিচিত উদয়াচল। অপরজন বিন্ধ্যাচল সর্দার। তাহার বিশালকায় মূর্তির উপরে একটি সুদর্শন উষ্ণীষ। সর্দারদ্বয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ভারি পর্দাটি বন্ধ হইয়া গেল। নবাগত দুইজন সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে তাহাদের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন,—'আমি এখানে আসিবার পূর্বে রানা আমাকে কী বলিয়াছিলেন জান?'

ক্ষণিক স্তব্ধতায় দুইজন শিরশ্চালনে অজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

—'রানা বলিয়াছিলেন—উপেন্দ্রবজ্র, এবার যদি প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে চাও তবে বেতনভুক মারবারী সৈন্য লইয়া যাও। মেবারী নহে, বুঝিলে?'

—'মেবারী নহে, মারবারী?'

—'হ্যাঁ, কারণ রানা হম্বীরের পর মেবারে আর কেহ অসি ধরিতে শিখে নাই। ও চর্চা আজকাল শুধু রাঠোর রাজপুতরাই করিতেছে।'

—'রানা ক্ষেত্রসিংহ, রানা লখা, যুবরাজ চণ্ডদেব,—'

—'চুপ কর! যুবরাজ উপস্থিত থাকিলে কি আজ আমায় এভাবে অপমানিত হইতে হয়? যুবরাজ যোধার বেপরোয়া হাসিটা এখনও কানে বাজিতেছে!

এইস্থলে পূর্বরাত্রির একটি ঘটনার কথা বলিয়া রাখা ভালো। কার্তিকের শুক্লপক্ষে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জনৈক মারবারী রাঠোরের সহিত মেবার পক্ষের একজনের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মারবারী আহত হয়—কিন্তু ঐ সময় সাত আটজন মারবারী রাজপ্রহরী উপস্থিত হইয়া মেবারী সৈনিকদের আক্রমণ করে। ফলে মেবারী সর্দার হিমাচল আহত হয় এবং অপর দুইজন বন্দী হয়। অবশ্য পরে দুইজন বন্দী কৌশলে পলায়ন করে। এই ঘটনা লইয়া আজ মারবার দরবারে সেনাপতিকে কিছু বিদ্রূপবাণী শুনিতে হইয়াছে।

—'তোমরা ছিলে কাল সন্ধ্যার গণ্ডগোলে—অস্বীকার করিও না। তোমাদের চিহ্নিত করিয়াছে মারবার সৈনিকরা। তোমাদের নাম পর্যন্ত যোধা আমাকে বলিয়াছে। বন্দী হইবার ভয় থাকিলে কেন লড়িতে যাও? তুমি উদয়, সৈন্যদল হইতে নাম কাটাইয়া তোমার পিসিমাতার অঞ্চলতলে কেন ফিরিয়া যাইতেছ না? আর তুমি বিন্ধ্যাচল, রেশমের উষ্ণীষ পরিলেই কেহ বীর হয় না—তোমার আমকাঠের তরবারিটির বদলে একখানি লাঙ্গল যোগাড় কর, চাষবাসে মন দাও; আর তুমি হিমাচল—কই হিমাচল কোথায়?'

—'সর্দার হিমাচল অসুস্থ। অত্যন্ত অসুস্থ।'

—'অসুস্থ। অত্যন্ত অসুস্থ? কি হইয়াছে তাহার?'

—'বোধহয় বসন্ত।'

—'বসন্ত? অসম্ভব? কার্তিকমাসে বসন্ত ? বুঝিয়াছি! সে বীর! না! তোমাদের দোষ কি, দোষ আমারই, আমিই তোমাদের গ্রহণ করিয়াছি। আমারই উচিত পদত্যাগ করা।'

প্রস্তরমূর্তির মত দুইজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল। শিবিরের বাহিরে যাহারা এতক্ষণ গোপনে এই ভর্ৎসনা শুনিতেছিল তাহারা ইতিমধ্যে গোলমাল শুরু করিয়াছে। একটা চাপা উত্তেজনা, বিভিন্ন শপথ, প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া আসিতেছে এপার্শ্বেও।

বিন্ধ্যাচল ধীরকণ্ঠে কহিল,—'আমরা মাত্র তিনজন ছিলাম, উহারা ছিল নয়জন। তাহার মধ্যে তিনজন কাল আহত হয়। তাহা ভিন্ন তরবারি নিষ্কাশিত করিবার পূর্বে হিমাচল আহত হয়। এক্ষেত্রে নয়জনের বিরুদ্ধে আমাদের দুইজনের পরাজয় যদি কাপুরুষতার পরিচায়ক হইয়া থাকে তবে আপনি কেন সর্দার, আমরাই পদত্যাগ করিতেছি।' বিন্ধ্যাচল সেনাপতির পদপ্রান্তে আপন তরবারি সমর্পণ করিতে গেল। বাধা দিলেন উপেন্দ্রবজ্র নিজেই।

—'উহারা নয়জন ছিল? একথা তো যোধা বলে নাই!'

—'মেবারী মিথ্যা কথা বলে না সর্দার।'

—'তাহা হইলে উহারা এটাকে বাড়াইয়া বলিয়াছে দেখিতেছি।'

সেনাপতি যেন বিচলিত। বিন্ধ্য কহিল,—'কিন্তু সর্দার, হিমাচলের আঘাতের কথাটা যেন গোপন থাকে। এমনিতেই সে অত্যন্ত অভিমানী—যদি শোনে—'

তাহার কথা শেষ হইল না। শিবিরের দ্বারদেশে পর্দা সরাইয়া দেখা দিল একজন রাজপুত। তুষার-শুভ্র, চিরউন্নত হিমাচলের সহিতই শুধু সে মূর্তির তুলনা চলে। হিমালয়ের বিশালতা, তাহার গাম্ভীর্য, তাহার অতলস্পর্শ রহস্য যেন মূর্ত হইয়াছে ঐ মূর্তিটির ভিতর।

ওরা দুজনেই অস্ফুটে বলে,—'হিমাচল!'

যেন প্রতিধ্বনি করেন সেনাপতি—'হিমাচল!'

—'হ্যাঁ সর্দার, আমিই। শুনিলাম আপনি আমাকে তলব করিয়াছেন। তাই আদেশের অপেক্ষায় হাজির হইয়াছি।'

মরণাহত হিমাচলের এই অদ্ভুত স্থৈর্যে সেনাপতি একেবারে মুগ্ধ হইলেন।

—'আমি তোমার বন্ধুদের বলিতেছিলাম, যে মেবারের শ্রেষ্ঠ বীরদের এভাবে জীবন বিপন্ন করা উচিত নহে। এই এক একটি রত্নের মূল্য কত তাহা তো তোমরা জান না, জানি আমি।'

সেনাপতি ভাবাবেগে হিমাচলকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন্দ্রবজ্রের বক্ষলগ্ন হিমাচল একটি অস্ফুট আর্তনাদ করিল শুধু। বিস্মিত সেনাপতি তাহাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিতেই সংজ্ঞাহীন হিমাচলের দেহ ভূতলশায়ী হইল। বস্তুত তাহার দক্ষিণ স্কন্ধেই আঘাত লাগিয়াছিল। সেনাপতির ঘন আলিঙ্গনপাশে ক্ষতস্থান হইতে পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হইয়াছিল।

সেনাপতি চীৎকার করিয়া লোকজন ডাকিলেন। বৈদ্যকে সংবাদ দিতে লোক ছুটিল। অল্পক্ষণেই বৈদ্য আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ভয়ের কিছু নাই। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতাতেই সে অজ্ঞান হইয়াছে। হিমাচলের জ্ঞান হইতে বিলম্ব হইল না। বন্ধুরা তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে গেল।

সৈন্যাধ্যক্ষ এতক্ষণে স্থির হইয়া আপন আসনে বসিতেই দেখিলেন নীরবে দূরপ্রান্তে বুদ্বুদ বসিয়া আছে। সেনাপতির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিলেন,—'তোমার কথাটা আমার মনে ছিল না। বল, তোমার জন্য কী করিতে পারি?'

বুদ্বুদ তখন নিজ পরিচয় দিল। মঙ্গলরামকে সৈন্যাধ্যক্ষ ঠিক স্মরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বুদ্বুদকে পক্ষকাল পরে চিতোরে দেখা করিতে বলিলেন। বস্তুত এখানে তাঁহারা অতিথি মাত্র। বুদ্বুদ হতাশ হইল।

সেনাপতির পিছন দিকেই একটি দ্বারপথ। কথা বলিতে বলিতে বুদ্বুদ সেই দ্বারপথে দেখিল একজন যোদ্ধা অশ্বারোহণে রাজপথ দিয়া যাইতেছে। দেখিয়াই বুদ্বুদের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল, চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া

উঠিল। সেই পান্থশালার রাঠোর রাজপুত! স্থান-কাল-পাত্র কিছুই আর তাহার মনে রহিল না। উল্কার বেগে সে বাহির হইয়া গেল ঘর হইতে।

উপেন্দ্রবজ্র বিস্মিত হইলেন। ছোকরা কি পাগল নাকি? যাইবার সময় একটা ভদ্রতাসূচক অভিবাদন পর্যন্ত করিল না। সহসা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। ছোকরা যোধার গুপ্তচর নহে তো! বাহির হইয়া গেল কেন সে?

চার

তিন লাফে বুদ্বুদ শিবির হইতে বাহির আসিল। ঝড়ের বেগে বাঁক লইতেই একজন রাজপুতের সহিত তাহার অতর্কিতে সংঘর্ষ হইল। লোকটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল শুধু। 'মাপ করিবেন, লক্ষ্য করি নাই'—জাতীয় কী একটা বাক্য নিক্ষেপ করিয়া ছুটিতে শুরু করিল বুদ্বুদ; কিন্তু একপদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই একটি ইস্পাতে গড়া হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল তাহার কোমরবন্ধ।

'মাপ করিবেন! লক্ষ্য করি নাই! মহাশয়ের কি ধারণা ঐ কয়টা কথা কোনক্রমে উচ্চারণ করিলেই অন্ধের মত লোককে ধাক্কা মারিবার অধিকার জন্মায়!'

হিমাচলকে চিনিতে বুদ্বুদের বিলম্ব হয় না। বস্তুত তাহার আহত অঙ্গে পুনরায় আঘাত দেওয়াতে সে মর্মান্তিক দুঃখিত!

—'মানে, অর্থাৎ, আরও যাহা যাহা শিষ্টাচারসম্মত সমবেদনার কথা এস্থলে বলা শোভন আমি সবই ফিরিয়া আসিয়া বলিব। এক্ষণে দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমার অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ আছে।'

হিমাচলের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, কহিল, '—আপনি যাইতে পারেন। মহাশয়ের সহবৎটা এখনও শিক্ষা করা হয় নাই। মনে হয় মহাশয় পাহাড়িয়া অঞ্চলের মানুষ।' ছাড়া পাইয়াই বুদ্বুদ তীরবেগে রওনা হইয়াছিল। শেষ কয়টা কথা কানে যাইতেই সে গতিবেগ সংবরণ করে। বুদ্বুদ ঘুরিয়া দাঁড়াইল,—'হইতে পারে আমি পাহাড়িয়া অঞ্চলের লোক। তাহা হইলেও মহাশয়ের নিকটে সহবৎ সম্বন্ধে শিক্ষা লইবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।'

—'আপনার সে সুমতি হইলেও আরাবল্লী পর্বতের গোঁয়ার-গোবিন্দকে শিক্ষা দিবার ধৈর্য আমার নাই।'

—'আঃ, আমার হাতে যদি একফোঁটা সময় থাকিত, তবে সহবতের প্রথম পাঠটার আলোচনা এখানে সারিয়া লইতাম।'

—'শ্রীল যুক্ত একফোঁটা-সময়হীন মহাশয়! ফোঁটা-খানেক সময় সংগ্রহ করিতে পারিলে যে কোন সময় আমার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন।'

—'উত্তম! কোথায়? কখন?'

—'মালভূমির দক্ষিণপ্রান্তে বৌদ্ধবিহারের প্রাঙ্গণে।'

—'সময়টা? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার—'

—'একফোঁটা সময় নষ্ট না করিয়া শুনিয়া রাখুন—অদ্য গোধূলি লগ্নে—'

—'উত্তম! গোধূলি লগ্নে বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণে।' উল্কার বেগে বুদ্বুদ ছুটিতে শুরু করিল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল কয়েকজন বন্ধু লইয়া বিন্ধ্যাচল কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছে। তাহার হস্তে সেই রেশমী উষ্ণীষটি। কথোপকথনরত বন্ধুবর্গের মধ্যে সামান্য ফাঁক দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে বাহির হইবার উপক্রম করিল বুদ্বুদ। সে সতর্ক ছিল যাহাতে কাহারও সহিত কোন ধাক্কা না লাগে। চলিয়াও গিয়াছিল ঠিক, শুধু শেষ মুহূর্তে তাহার সামান্য অঙ্গস্পর্শে বিন্ধ্যাচলের হস্তধৃত উষ্ণীষ মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্রোধে বিন্ধ্য রক্তাভ হইল। তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ইহার পিছনে একটু ইতিহাস আছে—বিন্ধ্যাচল পোশাক পরিচ্ছদ বিষয়ে একটু সৌখীন। তাহার

রেশমের মূল্যবান উষ্ণীষটির সকলেই প্রশংসা করিয়াছে। সে সেটি বন্ধুদের দেখাইতেছিল। এক্ষণে উষ্ণীষটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত পাক খুলিয়া গেল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া হাসিল। কারণ উষ্ণীষটি মোটেই রেশমের নহে, কার্পাসের। শেষ ছয়পাকমাত্র মূল্যবান রেশমবস্ত্র।

বুদ্বুদ লজ্জিতভাবে উষ্ণীষটি বিন্ধ্যাচলের হাতে দিয়ে কহিল,—'দুঃখিত। তাড়াতাড়িতে দেখিতে পাই নাই।'

বিন্ধ্যের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। একজন বন্ধু কহিল,—'তাড়াতাড়ি আছে বলিয়া এমন মূল্যবান রেশমবস্ত্রের উষ্ণীষটি আপনি ধুলায় লুটাইলেন।'

বুদ্বুদ কহিল,—'তা রেশমের অংশে তো ধুলা লাগে নাই। সূতীর অংশটিতে কিছু লাগিয়াছে। ও ধুইলেই উঠিয়া যাইবে।'

বন্ধুরা সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বুদ্বুদ পুনরায় যাত্রা শুরু করিতেই শুনিল পিছনে বিন্ধ্যাচলের কণ্ঠস্বর,—'যত সব পাহাড়িয়া গাঁওয়ার আসিয়া জোটে মেলায়—।' বুদ্বুদকে ফিরিতে হয়—'গাঁওয়ার! কথাটা আমাকে বলিলেন?'

—'মহাশয়ের কি সন্দেহ হয়।'

—'কথাটা সুরুচিসম্মত?'

—'মহাশয়ের নিকট কি সুরুচির শিক্ষা লইতে হইবে?'

—'না লওয়াটাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ পাহাড়িয়া গাঁওয়ারের কোমরে আমকাঠের তরবারি থাকে না।'

ক্রুদ্ধ মহিষের মত বিন্ধ্যাচল একপদ অগ্রসর হইতেই বুদ্বুদ বাধা দেয়,—'এখন নহে, আমার সময় অল্প। রুচি সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা লওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে সূর্যাস্তের অর্ধদণ্ড পরে ঐ কাষ্ঠফলকের তরবারি সমেত বৌদ্ধচৈত্যের প্রাঙ্গণে আসিবেন।'

—'বেশ, তখনই আসিব।'

ঝঞ্ঝার বেগে বাহির হইয়া আসিল বুদ্বুদ। রাস্তায় পৌঁছিল। কিন্তু কোথায় কে? এই সময়ের মধ্যে অশ্বারোহী পথের বাঁকে জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

হতাশ কিশোর একটি বড় শিংশপাবৃক্ষের নিচে গিয়া বসে। আপনাকেই ধিক্কার দেয়। আজ সাতদিন মাত্র বাহির হইয়াছে বাড়ি হইতে; ইহারই মধ্যে একজন রাঠোর, দুইজন মেবারীকে শত্রু করিয়াছে। নিজের হঠকারিতায় নিজেই সে বিরক্ত হয়। এত মাথা গরম করিলে চলে? আপন মনেই সে বকিতে থাকে—'তোর মতো মূর্খ দেখি নাই! অমন সর্বংসহা হিমাচলের মতো মানুষ, তাহারই আহত অঙ্গের উপর অন্ধের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলি। না জানি তাহার কত লাগিয়াছে। অবশ্য বিন্ধ্যাচলের ব্যাপারটায় তোর দোষ নাই।'

একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখে, তাহার স্বগতোক্তি কেহ শুনিতেছে কিনা। কাহাকেও কোথাও না দেখিয়া পুনরায় শুরু করে,—

—'বন্ধু বুদ্বুদ! তোকে একটি কথা বলি শোন। বিন্ধ্যাচলের সহিত তোকে লড়িতে হইবে না। কারণ সূর্যাস্তের একদণ্ড পরে সে অকুস্থলে পৌঁছিয়া কর্তিত কদলীকাণ্ডের মতো তোর মৃতদেহকেই পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। শুনিয়াছিস্ তো, গতবার মেবার পক্ষে এই হিমাচল, বিন্ধ্যাচল এবং উদয়াচলই লড়িয়াছিল? কোথায় এইসব অসমসাহসিক যোদ্ধাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবি, না শত্রুতা করিলি। এটা তোর কেলোয়ারা নহে—আরাবল্লীর জঙ্গলও নহে—এটা শহর। এখানে ভদ্রভাবে চলিতে শেখ। শত্রু তো করিলি—বন্ধু একটি করতো দেখি।'

এই বলিয়া বুদ্বুদ উঠিল। উদ্দেশ্য একটি বন্ধুর সন্ধান করা। সে নিশ্চিত জানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহার জীবনের মেয়াদ। ইতিপূর্বে তাহাকে একটি বন্ধু যোগাড় করিতে হইবে। রাজদ্বারে তাহার আর পৌঁছান হইল না, তবু শ্মশানের জন্যও তো বন্ধুর প্রয়োজন। সূর্যাস্তের পূর্বেই একটি বন্ধু যোগাড় করিতে না পারিলে তাহার মৃতদেহের সৎকার হইবে না।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই বুদ্বুদের নজরে পড়িল, সেই কয়েকজন বয়স্যদের লইয়া উদয়াচল কি একটা আলোচনা করিতেছে। বন্ধুরা উদয়ের সর্বাঙ্গ তল্লাস করিতেছে। হাসাহাসি করিতেছে। বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল, সহসা উদয়ের হাত হইতে অলক্ষিতে একটি আসরফি মাটিতে পড়িয়া গেল, এবং উদয় অন্যমনস্কভাবে সেটির উপর একটি পদস্থাপন করিল। বন্ধুত্ব করিবার এই সুযোগ। বুদ্বুদ উহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। উহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলে থামিল এবং জিজ্ঞাসাভরা চক্ষে চাহিল। বুদ্বুদ অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ অভিবাদন করিয়া বলিল,—'আপনাদের আনন্দে বাধা দিলাম, মাপ করিবেন।' বলিয়া উদয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—'আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না। আপনার দক্ষিণ চরণটিকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিবেন কি?'

সকলেই বিস্মিত হইল। কে একজন কহিল,—'মহাশয় কি নৃত্য-শিক্ষক?'

—'আজ্ঞে না, আমি একজন সাধারণ লোক, আমার নাম বুদ্বুদ। আমি বলিতেছিলাম, ইঁহার পদতলে একটি আসরফি চাপা পড়িয়াছে।'

—'আসরফি!'—সমবেত বিস্ময়।

—'কী পাগলের মত বকিতেছেন!' উদয় ধমক দেয়।

—'সত্য বলিতেছি—আপনার হাত হইতে একটি সুবর্ণ আসরফি পড়িয়াছে এবং আপনার দক্ষিণ পদে চাপা পড়িয়াছে।'

—'না পড়ে নাই। আমার কাছে কোনও আসরফি ছিল না।'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই বন্ধুদের কে একজন অতর্কিতে উদয়কে প্রচণ্ড ধাক্কা মারিল। উদয় দুই পা পিছাইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বুদ্বুদ নীচু হইয়া জিনিসটি কুড়াইয়া লইল। আসরফি নহে, একটি কর্ণাভরণ—রমণীদিগের অলংকার। সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। বুদ্বুদ সেটি উদয়াচলকে দিতে গেল। উদয় কহিল,—'এটি আমার নহে!'

বুদ্বুদ এতক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াছে। পূর্বেকার কথোপকথন তাহার মনে পড়িল। উদয় বলিয়াছিল,—তাহার তিনকুলে কেহ নাই—উপহার কিনিবে কাহার জন্যে। সে মূঢ়ের মতো বন্ধুদিগের দিকে চাহিল। তাহারা সমস্বরে কহিল,—'এটি আমাদেরও নহে।'

উদয় তখন গম্ভীরভাবে কহিল,—'কেহই যখন এটি দাবি করিতেছে না, তখন যেহেতু এটি আমার পদতল হইতে পাওয়া গিয়াছে তাই আমি এটি গ্রহণ করিলাম।'

কর্ণাভরণটি উদয়াচল গ্রহণ করিতেই অপরিচিতের সম্মুখে উচ্ছ্বসিত হাস্য গোপন করিতে করিতে বন্ধুরা একপ্রকার ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। বুদ্বুদ অত্যন্ত লজ্জিত স্বরে কহিল,—'আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারি নাই। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।'

—'হ্যাঁ করিয়াছি। কারণ আপনার আকৃতি দেখিয়াই বুঝা যায় আপনি আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলের লোক। শিক্ষিত রাজপুতের মতো সুবুদ্ধি আপনার নিকট আশা করাই অন্যায়।'

না! প্রত্যুত্তর বুদ্বুদ করিবে না! জিহ্বাটিকে দুই দন্তের দৃঢ়বন্ধনে ধরিয়া রাখিল যতক্ষণ না কর্ণকুহরের ঝিল্লীস্বর মিলাইয়া যায়। ঝগড়া করিবে না। কিছুতেই নহে। উদয়াচলের সহিত তাহাকে বন্ধুত্ব করিতে হইবে। নহিলে তাহার মৃতদেহ সৎকার হইবে না।

—আচ্ছা, আপনি কি করিয়া ভাবিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় একজোড়া সুবর্ণ-কর্ণাভরণ মাটিতে ফেলিয়া সজ্ঞানে পদদলিত করিতেছি। স্বর্ণ কি এতই সুলভ?'

—'আমি দেখিলাম আপনার হাত হইতে ঐটি পড়িয়া গেল, আর আপনি—'

—'আবার বাজে বকিতেছেন। বলিতেছি না, আমার হাত হইতে পড়ে নাই—'

—'আমার কাছে আর ওকথা বলিবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'

—'আচ্ছা গোঁয়ারের পাল্লায় পড়িলাম তো। তবে কি আমি মিথ্যা বলিতেছি?'

—'অন্তত সত্যকথা বলিতেছেন না।'

—'আপনি তো অতি অভদ্র। স্পষ্টই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন!'

ধর্মসাক্ষী, বুদ্বুদের দোষ নাই—এবার তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

—'স্পষ্টই মিথ্যা কথা বলিলে আমি কী করিব? আপনাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিব?'

—'যথেষ্ট। প্রাণের মায়া থাকিলে এইবার সরিয়া পড়ুন।'

—'আমি যাইতেছি। তবে প্রাণের মায়ার জন্য নহে—এমন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ আমার সহ্য হয় না বলিয়াই।'

বুদ্বুদ একপদ অগ্রসর হইয়াই শুনিল,—'দাঁড়ান।'

বুদ্বুদ ঘুরিল।

—'প্রাণের মায়া যদি সত্যই না থাকে তবে সত্যমিথ্যার মীমাংসা মিটাইয়া গেলেই ভাল হয় নাকি?'

একটি সামরিক অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'স্বচ্ছন্দে। অনুমতি হইলে এখানেই আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।'

—'এস্থলে নহে। প্রকাশ্য স্থানে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ। আপনার অসুবিধা না হইলে অন্য কোনও নির্জন স্থানে—'

—'তবে সন্ধ্যার একদণ্ড পরে বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণে।'

—'সেই ভালো। তবু পীঠস্থানে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে আপনি স্বর্গে যাইতে পারিবেন।'

—'সেটা উভয়তই!'

পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া দুইজনে বিপরীত পথ ধরিল।

পাঁচ

আর কি? এইবার তো খেল খতম্। কার্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে, তুলারাশিস্থে ভাস্করে, চতুর্দশ্যাং তিথৌ, শুভ গোধূলি-লগ্নে বুদ্বুদের বর্ণচ্ছটা জল-বুদ্বুদের মতোই মুহূর্তে মিলাইয়া যাইবে। বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের চরম বঞ্চনা করা যাইবে—কারণ তাহাদের আবির্ভাবের পূর্বেই হিমাচলের কৃপাণাঘাতে তাহার সকল আস্ফালনের অবসান ঘটিবে নিশ্চয়।

সন্ধ্যার পূর্বেই বুদ্বুদ দ্রুতপদে বৌদ্ধবিহার অভিমুখে চলিল। সেই সময়ে রাজস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য—অধিকাংশই শৈব। তাই নগরপ্রান্তের এই বৌদ্ধবিহারটি নির্জন স্থান। মেলার লোক এদিকে বিশেষ আসে না। নির্জন বিহারভূমিতে আসিয়াই বুদ্বুদ দেখিল জনশূন্য প্রাঙ্গণে একজন রাজপুত বসিয়া আছে। বুদ্বুদ চিনিল—হিমাচল।

কাছে আসিতেই লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনেই পরস্পরকে সামরিক অভিবাদন করিল। হিমাচল বলিল,—'আমার দুইজন বন্ধুরও আসিবার কথা আছে। তাহারা বিচারক এবং সাক্ষী হিসাবে থাকিবে। আমাদের মধ্যে কাহারও অন্তিম সৎকারের প্রয়োজন হইলে তিনজনের পক্ষে তাহা করাও সহজ হইবে।'

—'অসংখ্য ধনব্যাদ। আমারও হয়তো কোন বন্ধুকে লইয়া আসা উচিত ছিল। আমি দুঃখিত—মান্দোরে আমি অদ্যই আসিয়াছি, এখনও বন্ধু কেহ হয় নাই।'

—'তাই নাকি? আজই মাত্র মান্দোরে আসিয়াছেন? আমি সত্যই দুঃখিত। আপনার মতো একজন নবাগত কিশোরকে বধ করিলে আমার কোনও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না—কিন্তু আমি নাচার।'

—'সেজন্য আপনার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই—কারণ আপনি আহতাবস্থায় অসুস্থ শরীরে আমার সহিত লড়িবেন। আপনার যন্ত্রণাদায়ক আঘাতটাকে তো উপেক্ষা করা চলে না।'

—'হাঁ যন্ত্রণাদায়ক। সত্যই অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক। আর আপনি কিনা সেই আহত দক্ষিণ স্কন্ধেই ধাক্কা মারিলেন। ও হ্যাঁ, আপনাকে বলিতে ভুলিয়াছি। দক্ষিণ বাহুতে আঘাত থাকায় আমাকে আজ বাম হস্তে লড়িতে হইবে—না, না, আপনার কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই। আমার ও দুই হাতই সমান চলে।'

—'মাপ করিবেন, আপনি আমার একটি পরামর্শ লইবেন?'

—'কী?'

—'অপেক্ষা করুন আমি এক্ষনি আসিতেছি।' এই বলিয়া বুদ্বুদ নিকটস্থ বনবীথিকায় প্রবেশ করিল। এবং অল্প পরে এক মুষ্টি আরণ্যক উদ্ভিদ আনিয়া কহিল,—'এই উদ্ভিদগুলি বাটিয়া তুলসীপত্র যোগে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে তিনদিনেই আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন। আমরা আরাবল্লীর পাহাড়িয়ারা অনেক প্রকার ঔষধ জানি কিনা।' অল্প থামিয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল,—'আমি নিজেই আপনার চিকিৎসার ভার লইতাম—কিন্তু আজ সন্ধ্যার পরে হয় আপনার আঘাত সারাইবার আর প্রয়োজন হইবে না অথবা আঘাত সারাইবার জন্য আমি থাকিব না।'

এ কথায় হিমাচলকে যেন বেশ কিছু বিচলিত মনে হইল। বস্তুত এই সুদর্শন কিশোরটির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেমন যেন একটি অপত্যস্নেহ তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। এই উদার বীরত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া হিমাচল তাড়াতাড়ি বলিল,,'আসুন ততক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলি। ও প্রসঙ্গ থাক্। আপনি মান্দোরে কি মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন?'

—'না, আমি মেবারী সৈন্যদলে ভর্তি হইতে আসিয়াছিলাম।'

—'কী দুঃখের কথা। সৈনিক জীবনের শুরু না হইতেই এখানে তাহার শেষ হইবে।'

—'ইহাতে দুঃখের কিছু নাই। মরিতে একদিন হইতই। দেবমন্দির প্রাঙ্গণে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা হিমাচলের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু কিছু অবাঞ্ছনীয় মৃত্যু নহে।'

একথায় যেন আরও বিচলিত হইল হিমাচল। ওরা দুইজন কি আসিবে না? এই কিশোরের সহিত এভাবে আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিলে সত্যই ইহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। হয়তো ছোকরা ভাবিবে হিমাচল আহত বলিয়া ভয় পাইয়াছে।

ঠিক এই সময়ে অদূরে ভীমকান্তি বিন্ধ্যাচলের বরবপু দেখিতে পাওয়া গেল।

—'এই যে আমার একজন বন্ধু আসিয়া পড়িয়াছেন।'

—'একি ? আপনি কি সর্দার বিন্ধ্যাচলকে বিচারক করিবেন স্থির করিয়াছেন?'

—'হাঁ। কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

—'বিন্দুমাত্র নহে।'

—'এই যে আমার অপর বন্ধুটিও আসিয়াছেন।'

সত্যই ত্বরিতগতি উদয়াচলকে দেখা গেল।

—'কী আশ্চর্য! আপনার দ্বিতীয় সাক্ষী কি সর্দার উদয়াচল?'

—'নিঃসংশয়ে। কেন আপনি কি জানেন না দেওয়ানী ফৌজদলে একটি পর্বতমালা আছে—হিমাচল, বিন্ধ্যাচল আর উদয়াচল?'

ইতিমধ্যে বিন্ধ্যাচল নিকটে আসিয়াছে। বলাবাহুল্য তাহার মস্তকে এখন উষ্ণীষটি নাই। বুদ্বুদের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া হিমাচলকে সে প্রশ্ন করিল,—'এর মানে কি ?

হিমাচল কহিল,—'এই ভদ্রলোকের সহিতই আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হওয়ার কথা।'

—'সে কি ! ইহার সহিত তো আমার লড়িবার কথা।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু সন্ধ্যার অর্ধদণ্ড পরে।' গম্ভীরভাবে কহিল বুদ্বুদ। উদয়াচলও এতক্ষণে আসিয়াছে। সে বলে,—'কিন্তু আমারও যে ইহারই সহিত একটা বোঝাপড়া হইবার কথা—'

—'সন্ধ্যার একদণ্ড পূর্বে নহে।' বুদ্বুদের জবাব।

—'কিন্তু তুমি কী জন্য লড়িতেছ হিমাচল?'

—'কি জানি, আমি নিজেই ঠিক জানি না। ও হ্যাঁ, মনে পড়িয়াছে বটে। এই ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে আমাকে ধাক্কা মারিয়াছিলেন। তাই নহে? সেইটাই তো কারণ?'

প্রশ্নটা বুদ্বুদকে। সে সবিনয়ে বলে,—'আমারও ঐরূপ স্মরণ হয়।'

—'কিন্তু তুমি কী জন্য লড়িতেছ বিন্ধ্য?'

—'আমি লড়িতেছি কারণ, মানে লড়াইটা প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া।'

—'ওঁর সঙ্গে পুরুষের শিরস্ত্রাণ বিষয়ে আমার একটু মতবিরোধ হইয়াছিল।' বলিল বুদ্বুদ।

—'ও। আর তুমি উদয়? তোমার ব্যাপার কী ?

উদয়ও অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বুদ্বুদ তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—'ওঁর সহিত সাংখ্যের একটি ভাষ্য লইয়া আমার কিছু মতভেদ আছে। আমরা সত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চাই।'

বুদ্বুদের ওষ্ঠাধরে, চিক্কণ গুম্ফপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখিয়া হিমাচল বুঝিল, সে মিথ্যা বলিতেছে। প্রতিপক্ষকেও বিড়ম্বনার হাত হইতে উদ্ধারের এই প্রচেষ্টায় হিমাচল মুগ্ধ হইল। তিনজনকে সামরিক অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ বলিল,—'আপনারা তিনজনেই যখন উপস্থিত তখন আমি সর্বাগ্রেই আপনাদের নিকট এই বেলা ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া লই।'

'ক্ষমা' কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র বিচলিত হইল তিনবন্ধু। বিন্ধ্যাচলের ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপহাস্য, অসহিষ্ণু হইল উদয়াচল, মর্মাহত হইল হিমাচল।

বুদ্বুদ পুনরায় অভিবাদন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—'আপনারা সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। ক্ষমা আমি সেজন্য চাহি নাই। আমার বক্তব্য ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে আমি প্রথম সর্দার হিমাচলের সহিত লড়িব। তাঁহার অস্ত্রেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অপর দুইজনের সহিত প্রতিশ্রুত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু এইজন্যই আমি ক্ষমা চাহিতেছিলাম। সুতরাং আপনারা অনুমতি করিলে—'

খাপ হইতে তরবারি বাহির করিল বুদ্বুদ। হিমাচলও খাপ হইতে তরবারি বামহস্তে গ্রহণ করিল। দুইজনের মুক্ত কৃপাণ মাথার উপরে পরস্পরকে চুম্বন করিল। অস্তমিত সূর্যের শেষ বিদায়রশ্মি আসিয়া পড়িল যুগ্ম আয়ুধে। মুহূর্তের স্তব্ধতা। ইঙ্গিতমাত্রেই উহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবে। সহসা উদয় কহিল,—'সর্বনাশ! তরবারি কোষবদ্ধ কর। মারবারের প্রহরী!'

তখন আর সময় নাই! যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে। মারবারী সৈন্যদলের একজন মনসবদার সাগরজী অপর চারিজন সৈনিকের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে আগাইয়া আসিতেছেন। এখন আর ছলনার অবকাশ নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচজন ঘটনাস্থলে আসিয়া থামিলেন এবং দলপতি সাগরজী আইনভঙ্গকারীদিগকে, আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। বিচলিত তিনবন্ধু অস্ফুটে হিমাচলকে কহিল,—'উহারা পাঁচজন। আমরা মাত্র তিনজন, তাহার উপর তুমি আবার আহত ! কী করিবে?'

—'আজিকার ঘটনার পর আমি আর পরাজিত অথবা আহত অবস্থায় সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিব না—কিন্তু উহারা পাঁচজন, আমরা তিনজন মাত্র।'

ঘটনার নূতন পরিস্থিতিতে বুদ্বুদের প্রথমটা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। এই কথায় তাহার অন্তরে মেবারের সম্মানের জন্য আকুলি উঠিল। সে মঙ্গলরামের পুত্র, যে মঙ্গলরাম মেবারের জন্য অসি ধরিয়াছে। তাই জনান্তিকে হিমাচলকে কহিল—'মাপ করিবেন, আপনার হিসাবে কিছু ভুল হইল না? আমরা তিনজন নহি—চারিজন।

—'কিন্তু আপনি তো আমাদের শত্রুপক্ষ !'

—'তখন ছিলাম, এক্ষণে নহে! সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তরশত!'

উদয়াচল কহিল,—'সুতরাং?'

হিমাচল কহিল,—'সুতরাং? হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার নামটা যেন কী—'

—'আমার নাম বুদ্বুদ!'

—'সুতরাং হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল, বুদ্বুদ—আগে বাঢ়ো!'

ওপক্ষ যেন এইটাই আশঙ্কা করিতেছিল। মুহূর্তে প্রাঙ্গণটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। হিমাচলের সহিত যুদ্ধ বাধিল একজন মধ্যবয়স্ক লোকের। বামহস্তে সে আঘাত গ্রহণ করিতেছিল। উদয়াচল তাহার বিপক্ষকে বাছিয়া লইয়াছে। বিন্ধ্যাচল একসঙ্গে দুইজনকে প্রতিহত করিল। আর আমাদের ক্ষুদ্রায়তন দৈত্যশিশু রণহুঙ্কারে বনভূমি উচ্চকিত করিয়া ভীমবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল স্বয়ং সাগরজীর উপরেই।

এতক্ষণে বুদ্বুদের প্রাণে স্ফূর্তির জোয়ার আসিয়াছে। বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর চারিজনের

সহিত তাহার বচসা হইয়াছে কিন্তু কেরামতি দেখাইবার অবকাশ সে একবারও পায় নাই! আজ ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এইবার তরবারির খেল কাহাকে বলে এই পেট-মোটা মারবারিগুলোকে দেখাইতে হইবে। মুক্ত কৃপাণ হস্তে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত রণভূমিটি একচক্কর নাচিতে নাচিতে ঘুরিয়া আসিল এবং সাবলীল ক্ষিপ্রগতি একটা চিত্রকের মত আক্রমণ করিল সাগরজীকে। সাগরজী প্রথমটায় এই অর্বাচীন কিশোরটিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই কিন্তু অনতিবিলম্বে বামজানুতে একটি তীব্র আঘাত পাইয়া তাহার সংবিৎ ফিরিল। বুঝিল, এ বালক উপেক্ষার বস্তু নহে। সাবধান হইয়া আত্মরক্ষামূলক অসিচালনা শুরু করিল সাগরজী। কিন্তু কী আশ্চর্য! এর অসিচালনার কি কোনও নিয়মকানুন নাই? বস্তুত আহেরিয়াদিগের অসিচালনার পদ্ধতি অন্যরকম—তাহার উপর বুদ্বুদের আবার নিজস্ব কয়েকটি প্যাঁচ আছে! রাজপুতরা সাধারণত দক্ষিণপদ সম্মুখে রাখিয়া অসিচালনা করে। আত্মরক্ষামূলক অসিচালনার সময় দেহভার পড়ে বামপদে—আক্রমণাত্মক খেলায় দক্ষিণপদে। অথচ এ ছোঁড়া সে সব আইনকানুন কিছুই মানে না। সদ্যোজাত গোবৎসের মত সে অনবরত অহেতুক তাহার প্রতিপক্ষের চতুর্দিকে নাচিয়া ফিরিতেছে। কখনও কোনদিক হইতে আঘাত আসিবে কোনই স্থিরতা নাই। কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে, কখনও একলম্ফে একেবারে পিছনে। সাগরজী গলদ্‌ঘর্ম হইয়া পড়িল। ওর তুর্কিনাচনটা ঠিকমত আয়ত্ত হইবার পূর্বেই বামমণিবন্ধে পুনরায় একটি আঘাত পাইল সাগরজী। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বুদ্বুদের কণ্ঠদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিল সে। বুদ্বুদ ত্বরিতে মস্তক নিচু করিল—শূন্যে বিদ্যুৎরেখার মত সাগরজীর তরবারি অর্ধচন্দ্রাকারে একটা পাক খাইল এবং সে দেহভার রক্ষা করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। পরমুহূর্তেই বুদ্বুদের অস্ত্র তাহার উপর পড়িবার কথা, কিন্তু সাগরজী গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল বুদ্বুদ বিশহাত দূরে চিত হইয়া মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতেছে আপন খেয়ালে।

বিন্ধ্যাচলের প্রতিপক্ষদ্বয়ের একজন নিকটেই আহত হইয়া পড়িয়া আছে। বিন্ধ্য হাঁকিল,—'বুদ্বুদ, কী হইল?'

বুদ্বুদ ছাগশিশুর কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া ডাকিল—'ব্যা।'

'এ কী করিতেছ?'

'পাঁঠা-কাটা হইয়া গেল! সাগরজী আমার গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে।'

রাগে ফুলিতে ফুলিতে ভীমবেগে সাগরজী তাহার নিকট ছুটিয়া আসিতেই বুদ্বুদ তড়াক করিয়া উঠিল এবং তুর্কিনাচন শুরু করিল। সাগরজীর প্রত্যেকটি আঘাত প্রতিহত করিয়াই বুদ্বুদ দূরে সরিয়া যায় এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে। কখনও জিহ্বা বাহির করে, কখনও উর্ধ্বাঙ্গ নাচায়। কখনও বক দেখায়।

সাগরজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। ক্রোধোন্মত্ত শার্দুলের মতো সে পুনরায় ঝাঁপাইয়া পড়িল বুদ্বুদের উপরে এবং পরক্ষণেই নিজস্কন্ধে দারুণ আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল।

বুদ্বুদ রণভূমির দিকে ফিরিল এখন সে যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিতে পারে।[3] উদয়াচল তখনও লড়িতেছে। বিন্ধ্যাচলের একজন শত্রু পড়িয়াছে মাত্র।

হিমাচল চিবুকের উপর পুনরায় একটি আঘাত পাইয়াছে। বুদ্বুদের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বুদ্বুদ বুঝিল, সাহায্যের প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী হিমাচলের—কিন্তু সে মৃত্যুর পূর্বে সাহায্য চাহিবে না। দৈত্যশিশু হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—'এইদিকে ফিরুন লম্বকর্ণ মহাশয়। নচেৎ বলিদান খতম্ করিলাম। হিমাচলের প্রতিপক্ষ ফিরিল। ক্লান্ত আহত হিমাচল বসিয়া পড়িল এবং বলিল,—'উহাকে প্রাণে মারিও না বন্ধু। উহার সহিত আমার একটা বোঝাপড়া আছে। তুমি উহাকে শুধু নিরস্ত্র করিয়া দাও। এই তো, সুন্দর, চমৎকার!'

হিমাচলের এ প্রশংসাবাণীর কারণ আছে। তরবারির বিপরীত দিক দিয়া বুদ্বুদ প্রতিপক্ষের দক্ষিণ মণিবন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল এবং তাহার হস্তচ্যুত আয়ুধ বহুদূরে ছিটকাইয়া পড়িল। উভয়েই ছুটিল সেদিকে—কিন্তু ক্ষিপ্রগতি বুদ্বুদ প্রথমে পৌঁছিয়া সেটি করায়ত্ত করিল। নিরস্ত্র সৈনিকের পক্ষে

আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ইতিমধ্যে উদয়াচলের প্রতিপক্ষও আহত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিন্ধ্যের প্রতিপক্ষও অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে।

তখন উহারা হত এবং আহতদিগকে তাহাদের অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া রওনা হইল।

একগাল হাসিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'যদিচ মেবারের সেনাদলে আমি আজও ভর্তি হই নাই তবু শিক্ষানবিশীর প্রথম পাঠে তুর্কিনাচনটা আমি ভালই নাচিলাম। কী বলেন?'

সকলে সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল।

ছয়

চারি বন্ধুতে কিন্তু প্রথমেই শিবিরে গেল না। শহরের দিকে আসিতেই সংবাদ পাওয়া গেল সমস্ত নগরীতে একটা উত্তেজনার প্রলেপ। সাগরজী বন্ধুর মৃতদেহটি পূর্বেই অশ্বপৃষ্ঠে প্রধান রাজপথের সংযোগস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে। মৃত সৈনিক হাজার হউক মারবারী। প্রতিযোগিতার ব্যাপারে মান্দোর এমনিতেই মেবারী সৈনিকদের উপর বিদ্বেষপরায়ণ। এখন এই সংবাদে সমস্ত নগরীতে অত্যন্ত উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য।

চারিবন্ধু ইতস্তত করিল। বুদ্বুদ উহাদের সকলকে নিজ পান্থশালায় আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু পান্থশালাটি নগরীর কেন্দ্রস্থলে। এইরূপ রক্তরাঙা অবস্থায় সেখানে গেলে ধরাপড়ার সম্ভাবনাই অধিক। অবশেষে হিমাচল কহিল,—'আমি একটি নির্জন এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলের সন্ধান দিতে পারি। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, তাই পূর্বেই তোমাদের সকলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। যে গৃহে তোমাদের লইয়া যাইব সেই গৃহবাসী সম্বন্ধে তোমরা কোনও ঔৎসুক্য দেখাইবে না।'

তিন বন্ধুই বিস্মিত হইল—কিন্তু সম্মতি দিল সকলেই। অনেকদূর ঘুর পথে উহারা অবশেষে নগরীর অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। কার্তিক মাসের শীত; এ দিকটা জনবিরল। পথ নির্জন। বনবীথি দিয়া তাহারা চারিজনে একটি ভগ্ন প্রাসাদের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। বিরাট একটি উদ্যান অতিক্রম করিয়া তাহারা জীর্ণ প্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইল। হিমাচল দ্বারে করাঘাত করিল। তাহার করাঘাত করিবার একটা বিচিত্র ভঙ্গি আছে। প্রথম দুইবার খুব ঘন ঘন এবং একটু অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় আঘাত। এইভাবে কয়েকবার সঙ্কেতধ্বনি হইতেই ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—'কে?'

—'আমি হিমাচল। দ্বার উন্মোচন কর।'

—'আপনি গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসুন।'

হিমাচল নির্দেশমতো পার্শ্বের গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসিল। প্রদীপ হস্তে একটি কিশোরী মূর্তি জানলায় আবির্ভূতা হইল। মেয়েটি হিমাচলকে প্রদীপালোকে চিনিল। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল। হিমাচল আহ্বান করিল বন্ধুদিগকে। উদয় এবং বিন্ধ্য দ্বারপথে প্রবেশ করিল।

—'বুদ্বুদ। বুদ্বুদ কোথায়?'

বাহিরে আসিয়া হিমাচল দেখিল অন্ধকারে অল্পদূরে মোহাবিষ্টের ন্যায় বুদ্বুদ দাঁড়াইয়া আছে—নিস্পন্দ নির্বাক।

বিস্মিত হিমাচল বন্ধুর করগ্রহণ করিল,—'কী হইল তোমার?'

—'অ্যাঁ?' সংবিৎ ফিরিয়া আসে বুদ্বুদের।

—'ভিতরে এস?'

—'আসিতেছি, কিন্তু—'

—'কিন্তু কী?'

—'ঐ কিশোরী মেয়েটি কে?'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় হিমাচলের। একী অশোভন প্রশ্ন? উহারা কথা দিয়াছিল কোনও প্রশ্ন করিবে না,

এত অল্প সময়ের ভিতরেই বুদ্বুদ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় হিমাচল রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়। বুদ্বুদেরও মনে পড়িয়া যায় প্রতিজ্ঞার কথা। তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইয়া বলে,—'মাপ করিবেন! চলুন ভিতরে যাই।'

ক্ষুণ্ণভাবে হিমাচল বুদ্বুদকে লইয়া দ্বারের নিকটে আসে। সেখানে কিশোরী মেয়েটি অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রদীপ হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিন্ধ্য এবং উদয় পূর্বেই ভিতরে গিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। দ্বারের নিকট আসিতেই অবগুণ্ঠনবতীর সহিত বুদ্বুদের দৃষ্টি বিনিময় হইল। উভয়েই মুহূর্তে যেন প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত। দুইজনেই নির্বাক নিস্পন্দ।

হিমাচল ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি বুদ্বুদের স্কন্ধে স্থাপন করে। সংবিৎ ফিরিয়া পায় বুদ্বুদ; দ্রুতচরণে উহারা ভিতরে আসিয়া বসে।

বিন্ধ্য তাহার বিশাল বপু একটি চৌপায়াতে এলাইয়া দিল। উদয়াচল একখানি পুঁথি টানিয়া লইয়া মনোনিবেশ করিল। হিমাচল অন্তরালে গিয়া একজনকে শিবিরে সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা শুরু করিল। গৃহস্থের পক্ষে কেহই আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। বস্তুত যে শিবিরে সংবাদ আনিতে গেল সে ভিন্ন গৃহে অবস্থান করিতেছিল দুইজন স্ত্রীলোক। একজন বৃদ্ধা, অপরজন কিশোরী। অল্পকিছু পরেই দ্বারের শিকলটি নড়িয়া উঠিল। হিমাচল উঠিয়া গেল—এবং পরক্ষণেই কিছু ভোজ্যদ্রব্য এবং এক লোটা সিদ্ধির শরবত লইয়া ফিরিয়া আসিল। সিদ্ধির নামে বিন্ধ্যাচল উঠিয়া বসিল। বুদ্বুদ কিছুই খাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহার নাকি ক্ষুধা নাই। পুনরায় দ্বারের শিকল নড়িয়া উঠিল এবং হিমাচল ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, 'বুদ্বুদ, গৃহস্থ বলিতেছেন—অতিথি আসিয়া কিছু গ্রহণ না করিলে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়—তুমি যাহা ইচ্ছা কণিকামাত্র গ্রহণ কর।' বস্তুত ক্ষুধায় বুদ্বুদের জঠরে তখন যেন একদল মূষিক কুচকাওয়াজ করিতেছে। তুর্কিনাচনটা তো সে কম নাচে নাই। সে শুধু দেখিতেছিল, ভিতর হইতে কোনও অনুরোধ আসে কিনা। ভিতর অর্থে গৃহের ভিতর। জঠরের ভিতর তখন অনুরোধ নয়, বিদ্রোহ হইবার উপক্রম।

সুতরাং চারি বন্ধুতে গোগ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অবশেষে শিবির হইতে সংবাদ লইয়া সেই ব্যক্তি ফিরিলেন। উপেন্দ্রবজ্র পত্র দিয়াছেন। হিমাচল পত্র খুলিয়া প্রদীপের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল; তাহাতে লেখা আছে—

'শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ, স্নেহের উদয়াচল, বিন্ধ্যাচল, হিমাচল, অতঃপর তোমরা অদ্যরাত্রেই পত্রপ্রাপ্তিমাত্র মান্দোর ত্যাগ করিবে। কল্য সারা দিনমানে মারবার রাজ্য। রানা রণমল্ল আদেশ দিয়াছেন, তোমাদের তিনজনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া আনিতে পারিলে তাহাকে সহস্র আসরফি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতার জন্য চিন্তা করিও না। আশীর্বাদক শ্রীউপেন্দ্রবজ্র।'

তিন বন্ধুরই মুখ শুকাইল। সকলেই বুঝিল, এই সুযোগে রাও রণমল্ল মেবার পক্ষের প্রতিযোগিতা জয়ের সম্ভাবনা নির্মূল করিলেন।

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'এবার বোধহয় সেনাপতিকে নিজেই অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে! কিন্তু উপায় কী?'

উদয় তাহার সহিত তর্ক জুড়িল, এ ক্ষেত্রে কাহাকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। হিমাচল কোনও কথা বলিল না। একখণ্ড ভূর্জপত্র লইয়া লিখিল—

''—শ্রীরামজয়তি, শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ, অতঃপর পত্রবাহক আমার বিশেষ পরিচিত। অধমের অস্ত্রশিক্ষা জ্ঞানের উপর যদি সর্দারের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, তবে জানিবেন পত্রবাহক মেবার শিবিরের মধ্যে অবশিষ্টাংশ সৈনিক অপেক্ষা অসিচালনায় নিপুণ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি নিজে অস্ত্রধারণের পূর্বে ইহাকে প্রথমবার অস্ত্রধারণ করিতে দিবেন। ইতি স্নেহভিক্ষু হিমাচল।''

পত্রটি বুদ্বুদের হস্তে অর্পণ করিয়া হিমাচল অপর বন্ধুদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে বলিল। চারিবন্ধু পথে বাহির হইল। উদয় এবং বিন্ধ্য একটু অগ্রসর হইতেই হিমাচল বুদ্বুদকে জনান্তিকে টানিয়া অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—'তুমি তিলাঞ্জলিকে চিনিতে?'

—'তিলাঞ্জলি! তিলাঞ্জলি কে?'

—'ঐ কিশোরী মেয়েটি।'

—'না, উহাকে আমি চিনি না—নামও জানিতাম না, তবে পূর্বে উহাকে দেখিয়াছি।'

—'কোথায়?'

—'এক পান্থশালায়!'

—'কথাবার্তা হয় নাই?'

—'না!'

—'ও আচ্ছা! শোন বুদ্বুদ, এ মেয়েটি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ও আর মাত্র দুইদিন এস্থলে থাকিবে। আমি তো চলিয়া যাইতেছি! সম্ভব হইলে তুমি উহাকে একটু দেখিও।'

—'কেন?' বিস্মিত বুদ্বুদের প্রশ্ন।

—'ও এখানে আসিয়াছে একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজে! ওর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ আছেন, আর আছেন এক বৃদ্ধা। অরক্ষিতা উহাকে একটু দেখিও।' বুদ্বুদ সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

—'আর একটি কথা। তুমি ইহাদের পরিচয় জানিতে কখনও চেষ্টা করিও না।'

—'মাপ করিবেন, সে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলাম না।'

—'কিন্তু তুমি এখানে আসিবার পূর্বেই তো সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ।'

—'যতদিন উহারা এস্থলে আছেন, আমি কোনও সন্ধান করিব না—কিন্তু পরে জীবনে কখনও সন্ধান লইব না এ কথা বলি নাই।'

—'বেশ। মনে রাখিও। মেয়েটিকে আমি সত্যই স্নেহ করি।'

বারংবার স্নেহ করার কথায় বুদ্বুদের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তবে কি—? কিন্তু হিমাচল? ঐ কিশোরী বালিকাকে? ওর ভ্রূভঙ্গিটি হিমাচলের দৃষ্টি এড়ায় না।

মনে মনে হাসিয়া হিমাচল নিমেষে অন্তর্হিত হইল। বুদ্বুদও প্রাসাদের দিকে দৃক্‌পাত করিল। সেখানে দ্বিতলের একটি গবাক্ষে অনির্বাণ শিখায় একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি নয়, দুইটি। জীবন্ত দীপশিখার পার্শ্বে মৃৎপ্রদীপ যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ফুৎকারে মৃৎপ্রদীপ নিবিয়া গেল। অপর শিখাটিও।

বুদ্বুদ অস্ফুটে উচ্চারণ করিল,—'তিলাঞ্জলি, তিলাঞ্জলি।'

বীজমন্ত্র যেন।

পরদিবস বেলা একদণ্ডের সময় আমাদের ভাগ্যান্বেষী নায়ক দুরুদুরু বক্ষে মেবার শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এক্ষণে দ্বারপাল তাহার পূর্বপরিচিত; শিবির-প্রবেশে বুদ্বুদকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা সরাইয়া শিবিরের গর্ভকক্ষে প্রবেশ করিয়া বুদ্বুদ দেখিল—সেনানায়ক কুঞ্চিত-ভ্রূভঙ্গে কয়েকজন সেনানীর সহিত আলাপনরত। সম্ভবত নির্বাচিত যোদ্ধৃত্রয়ের অনুপস্থিতিতে কে কাহার পাদপূরণ করিবে ইহাই বিচার্য বিষয়। সৈন্যাধ্যক্ষ উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে চাহেন—ইহাতে উপস্থিত যোদ্ধৃবৃন্দের ঘোরতর আপত্তি। প্রথমত, শেষ মুহূর্তের এই দুর্ঘটনায় মেবারের পরাজয় সম্বন্ধে সকলেই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। মারবার শিবিরে রাঠোর সৈনিকেরা প্রতিযোগিতার পূর্বে এখনই যেন জয়োল্লাসে মাতিয়াছে। সমস্ত নগরীতে আসন্ন বিজয়ের চাঞ্চল্য। উপেন্দ্রবজ্রকে অবিলম্বে একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনজন সৈনিকের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে শত্রু হাসিবে। বিজয়লক্ষ্মী চিরকাল কিছু একপক্ষে থাকেন না—এই অবস্থায় মেবারের পরাজয়ে লজ্জা পাইবার কারণ নাই; তবু যেন আসন্ন পরাজয়ের গ্লানি, মারবারী সৈনিকদের ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি এখন হইতেই উপেন্দ্রবজ্রের বুকে পাষাণের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া পরাজিত হইলে তাহা যেন দ্বিগুণভাবে বাজিবে, তাই সকলের ইচ্ছা তিনি অবশিষ্ট মেবারীদিগের ভিতর হইতে ইচ্ছামত তিনজনকে নির্বাচিত করিয়া স্বয়ং অস্ত্রধারণে বিরত থাকুন; কিন্তু সাহস করিয়া একথা কেহই সেনাপতি সমীপে নিবেদন করিতে পারিতেছে না।

বুদ্বুদের প্রবেশে কথোপকথন মুহূর্তের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। বুদ্বুদ দেখিল, সকলেই জিজ্ঞাসু নেত্রে

তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আর উপেন্দ্রবজ্র দেখিলেন যোধার সেই চরটি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে বুদ্বুদের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন। সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ আংরাখার ভিতর হইতে সযত্নরক্ষিত হিমাচলের পত্রটি বাহির করিয়া সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিল। সেনাপতি পত্রটি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া হস্ত সঞ্চালনে সকলকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। ঘর নির্জন হইলে উপেন্দ্রবজ্র বুদ্বুদকে কহিলেন,—'এ পত্র যে জাল নহে তাহা কিরূপে বুঝিব?'

—'সর্দার হিমাচলের হস্তাক্ষর বিষয়ে মহানায়কের পূর্ব পরিচিতি আছে ইহাই আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম! অন্য কোনও প্রমাণ আমার নাই।'

—'তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে? তোমার অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে পত্রলেখকের ধারণাই বা কীরূপে জন্মিল?'

তখন বুদ্বুদ গতকল্যকার সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে বিবৃত করিল। অবশ্য তিলাঞ্জলির বৃত্তান্ত কিছুই বলিল না। করলগ্নকপোলে সেনাপতি অধীর আগ্রহে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। মারবার রাজসভায় নিগৃহীত রাঠোর সৈনিকগণের অভিযোগ ও ঘটনার বর্ণনা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন—সুতরাং ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। তাহা ভিন্ন হিমাচলের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে সত্যই তাঁহার সন্দেহাতীত পূর্ব অভিজ্ঞান ছিল।

উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'তোমাকে আজ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ দিব; কিন্তু কেহ যদি তোমাকে চিনিয়া ফেলে?'

বুদ্বুদ বলিল,—'অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি মেবারী পোশাক দিবেন—বেশ পরিবর্তন করিলে আমাকে চিহ্নিত করা কঠিন হইবে। প্রথমত, এক সাগরজী ভিন্ন কেহই আমাকে অধিকক্ষণ লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু আশাকরি সাগরজী আজ নিশ্চয়ই শয্যাশায়ী। দ্বিতীয়ত, আপনি আদেশ করিলে আমি কিছু ছদ্মবেশ ধারণ করিব।'

—'উত্তম! আমি বলি তুমি 'তোমার ঐ চিক্কণ গুম্ফরাজি সর্বপ্রথমে নির্মূল কর। তাহা হইলে তোমার আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন হইবে।' শুনিয়া বুদ্বুদের সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল। বেচারী পৃথিবীতে যে কয়টি জিনিসকে জীবনে ভালবাসিয়াছে তাহার সযত্নরক্ষিত গুম্ফরাজি তাহার অন্যতম। ঘন মসৃণ কৃষ্ণদামের এই বস্তুটির প্রাত্যহিক পরিচর্যার জন্য তাহার অনেকটা সময় ব্যয়িত হইত। ইহা অপেক্ষা সেনাপতি যদি বলিতেন তোমার একটি কর্ণচ্ছেদ করিতে হইবে তাহা হইলেও সে এতটা মর্মাহত হইত না। সখেদে অবনতমস্তকে সে গুম্ফরাজির উপর হাত বুলাইতে লাগিল। উপেন্দ্রবজ্র বলিলেন,—'কী ভাবিতেছ?'

বুদ্বুদ ইতস্তত করিতেছিল। 'তা-তা, ইয়ে' জাতীয় কয়েকটি শব্দ তাহার মুখনিঃসৃত হইল মাত্র। সেনাপতি বুঝিলেন, সহাস্যে কহিলেন,—'যুবক, তুমি মেবারের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে চাও—সেনাপতির আদেশে যে কোন সৈনিক তাহার মস্তকের মায়া ত্যাগ করে, আর তুমি সামান্য—'

বুদ্বুদকে একটি সামরিক অভিবাদন করিতে দেখিয়া সেনাপতি অর্ধপথে থামিয়া গেলেন। বুদ্বুদ মনস্থির করিয়াছে। আকৈশোরের এত সাধের সাথীটিকে সে মেবারের উদ্দেশ্যে বলি দিবে। অতঃপর সেনাপতির আদেশে রাজপুত-মেবারী যোদ্ধার সামরিক পোশাক আনীত হইল। পদদ্বয়ের চর্মাবৃত পাদুকা, ঊর্ধ্বাঙ্গের লৌহজালিক, মস্তকের লৌহজাল শিরস্ত্রাণ, ধাতব হস্তাবরণ এবং দীর্ঘ তরবারি। বুদ্বুদ নিজ অঙ্গের উপযুক্ত সামরিক সজ্জা নির্বাচন করিয়া সেনাপতিকে বিদায়-জ্ঞাপক অভিবাদন করিল। উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'সে কি? তুমি তরবারি লইলে না?'

বুদ্বুদ কহিল,—'এ তরবারিগুলি কিছু দীর্ঘ। আমার অভ্যস্ত নিজস্ব তরবারিতেই আমার সুবিধা হইবে। সুতরাং আর প্রয়োজন নাই।'

সেনাপতি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বুদ্বুদ কহিল,'আজিকার যুদ্ধে যদি জয়লাভ করি তখন আপনার হাত হইতে নূতন তরবারি লইব—এখন নয়!'

সেনাপতি চপলমতি কিশোরের কথায় হাস্য করিলেন মাত্র। বুদ্বুদ অভিবাদনান্তে বাহির হইয়া গেল।

কাহার বিরুদ্ধে তাহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে তাহা জানা গেল না—অবশ্য ক্ষতি নাই, সে তখন সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে প্রস্তুত! তাহার অপর দুইজন সঙ্গী কে হইবে তাহাও জানা হইল না। অবশ্য তাহার সঙ্গীদ্বয়ের একজন নিঃসন্দেহে উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং। কিন্তু এখন ও-সকল কথায় তাহার মন নাই—এখন সর্বপ্রথমে মেবারের সম্মান রক্ষার্থে তাহার এত সাধের বন্ধুটিকে অবিলম্বে বিসর্জন দিতে হইবে।

চিন্তান্বিত মুখে সে নিজ পান্থশালায় ফিরিয়া গেল। রুদ্ধদুয়ারে ধাতব দর্পণ লইয়া বসিল। তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আকৈশোরের বন্ধুটিকে রাজকার্যে বলি দিতে উদ্যত হইল।

হায় সেনাপতি! তুমি বলিয়াছিলে তোমার আদেশে কত বীর শিরদান করে। তুমি তো সাহিত্যচর্চা কর না; তাই গুম্ফমাহাত্ম্য সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নাই। যাহা চাহিয়াছ তাহার কিছু বেশি দেওয়া মোটেই কঠিন হইত না। তোমার করুণা হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া অনায়াসে গোঁফের সহিত বুদ্বুদ মাথা দিতে পারিত; কিন্তু মস্তক রাখিয়া শুধু গুম্ফ! এ বস্তু যে ঈশ্বরদত্ত ধন! এর মালিকানা কি বুদ্বুদের? বস্তুত বুদ্বুদই তো তাহার গুম্ফরাজির সম্পত্তি!

অস্ফুটে কী যেন মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে বুদ্বুদ নাসিকাগ্রভাগ কৃপাণ স্পর্শ করাইল।

নিভৃত কক্ষে, বিনা সহানুভূতিতে, বিনা অশ্রুজলে, বিনা আবহসংগীতে শিশোদীয়া রানার সম্মানরক্ষার্থে বুদ্বুদের প্রথম দান ঝরিয়া পড়িল।

মৃদু শব্দ উঠিল শুধু 'ক্যাচ!'

অসিযুদ্ধের আসরে লোকে লোকারণ্য। পর্বতের সানুদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিদল আসন গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যস্থলে মারবার অধীপের সিংহাসন। তাহার বামপার্শ্বে বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের সুসজ্জিত আসন। বুন্দি, মালোয়া প্রভৃতি রাজ্যের সামন্তসর্দার ও রাজপুরুষরা সভা অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। রাজার পার্শ্বেই মেবারের নির্দিষ্ট আসনে রাজকুমার রঘুদেব বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে সূর্যের উপর যেরূপ ধূম্রবর্ণের ছায়াপাত ঘটে—আসন্ন পরাজয়ের ছায়া এখনই যেন তেমনি রঘুদেবের মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। এই নির্বিরোধী রাজকুমারটির বদলে যদি যুবরাজ চণ্ডদেব আজ উপস্থিত থাকিতেন তবেই যেন মারবারীরা বেশি খুশী হইত।

আজ প্রতিযোগিতা শুধু মেবার আর মারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অন্যান্যদল পূর্বেই পরাজিত হইয়াছে। এই দুই দলের মধ্যেই জয়লক্ষ্মী এ বৎসরের মতো বিজয়ীকে বাছিয়া লইবেন।

রৌপ্যদণ্ডের উপর রেশমের বৃহদাকার চন্দ্রাতপ বিলম্বিত। তাহারই ছত্রচ্ছায়ায় সাড়ম্বরে মারবাররাজ সমাসীন। এই চন্দ্রাতপের দক্ষিণভাগে একটি বৃহদায়তন কানাতের প্রকোষ্ঠ; তাহার সম্মুখভাগে উশীরসদৃশ স্বচ্ছ জালিকা। অভ্যন্তরে রাজান্তঃপুরিকারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন। রাজপুতানায় সে যুগে পর্দাপ্রথার বিশেষ প্রাবল্য ছিল না; তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যের এমনকি যবনরাজগণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যস্থানে রাজপুরীর এবং নগরীর বিশিষ্ট পরিবারের ললনাগণ বসিবার স্বাধীনতা পান নাই। সম্মুখভাগের সূক্ষ্ম জালিকার ভিতর দিয়া রণক্ষেত্রের সকল দৃশ্যই গোচর হয়; অথচ বাহির হইতে স্বল্পালোকে অভ্যন্তরভাগের অন্তঃপুরিকাদের শনাক্ত করা যায় না। অস্পষ্টভাবে বিচিত্র বর্ণের একটি আলিম্পনরেখা বলিয়া ভ্রম হয়। জালিকার অবরোধ-মধ্যে রাজমহিষী বেত্রবতী, রাজবধূ লছমীবাঈ এবং রাজকন্যা মধুশ্রী বসিয়া আছেন। সকলেরই বক্ষে উত্তেজনা—আসন্ন জয়ের বিষয়ে সেখানেও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

রাজকন্যা মধুশ্রী একদৃষ্টে কী দেখিতেছিলেন; সহসা পার্শ্ববর্তী সখীকে প্রশ্ন করিলেন,—'পর্ণা, মহারাজের দক্ষিণপার্শ্বে কে বসিয়া আছেন?'

পর্ণা কহিল,—'জান না? ঐটি তো মেবারের নির্দিষ্ট আসন। উনি মেবারের কুমার।'

মধুশ্রী পুনরায় কী জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলেন।

পর্ণা হাসিয়া কহিল,—'যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে—উনি ছোটকুমার রঘুদেব।'

মধুশ্রী অকারণে লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—'আমি আবার কী ভাবিতেছিলাম?'

অপর কয়েকটি সখীও ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় পর্ণা শুধু কহিল,—'তাহা তুমিও জানো আমিও জানি।'

মধুশ্রী আর কথা বাড়াইলেন না।

সর্বাঙ্গে রণসজ্জা পরিধান করিয়া যুবরাজ যোধা ব্যস্তসমস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। এবারও তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণেচ্ছু। তাঁহার গুপ্তচর গোপনে সংবাদ আনিয়াছে এবার সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র নিজেই অস্ত্রধারণে বাধ্য হইয়াছেন। যুবরাজ যোধার অন্তরের বাসনা উপেন্দ্রবজ্রকে স্বহস্তে পরাজিত করিয়া মারবারের জয়তিলকটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। বৃদ্ধ উপেন্দ্রবজ্রকে পরাজিত করার বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; বস্তুত সে সন্দেহ কাহারও নাই। কারণ যোধাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করার স্পর্ধা তখন সমগ্র রাজস্থানে হয়তো কাহারো ছিল না। যোধার দূত অবশ্য মেবারের অপর দুইজন প্রতিযোগীর সন্ধান আনিতে পারে নাই। যাহা হউক তাহাতে যোধার কোনও চিন্তা নাই—কারণ মেবার শিবিরের উপস্থিত প্রত্যেককেই তিনি উত্তমরূপে জানেন।

মেবারের শিবির সম্মুখে সসৈন্য উপেন্দ্রবজ্র অপেক্ষা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে : বুদ্বুদ প্রথম প্রতিযোগিতায় নামিবে, অতঃপর উপেন্দ্রবজ্র। তৃতীয় যোদ্ধার বিষয়ে সেনাপতি এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মনে মনে তিনি ভাবিয়াছিলেন তৃতীয় যোদ্ধার আর প্রয়োজনই হইবে না। কারণ প্রথম দুইটি যুদ্ধেই যদি মারবার জয়লাভ করে তাহা হইলে আইন অনুসারে তৃতীয় যুদ্ধের আর প্রয়োজনই হইবে না। তাই এ বিষয়ে তিনি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। যদি দৈবাৎ দুইটি অসিযুদ্ধেও জয়পরাজয় অনিশ্চিত থাকে তখন 'ক্ষেত্রে কর্মবিধিয়তে।'

হঠাৎ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। প্রতিযোগীদের আসরে নামিবার সঙ্কেত। জনারণ্যের মধ্যভাগে নির্জন শাদ্বলে মুক্ত কৃপাণ হস্তে মারবারের প্রতিযোগী যুবরাজ যোধা অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে অসিযুদ্ধের উপযুক্ত রণসম্ভার। বামহস্তে বিরাটাকার ঢালিকা এবং দক্ষিণ হস্তে ভীমদর্শন বিরাটাকার অসি। সর্বাঙ্গে রত্নরাজি, বক্ষে লৌহজালিক, মস্তকে ধাতব শিরস্ত্রাণ। যোধার আবির্ভাবে জনারণ্য উৎসাহে উদ্বেগে আনন্দে জয়ধ্বনি করিল; যোধা আপন আয়ুধ শূন্যে উত্তোলিত করিয়া সে সম্মান গ্রহণ করিলেন।

বিপরীত দিক হইতে মেবারের যোদ্ধা রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এ কে? যোধা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন উপেন্দ্রবজ্রের পরিবর্তে একটি কিশোর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। প্রথমে বিস্ময়, ও পরে কৌতুকে তাঁহার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। তিনি বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ভয় পাইয়াছে! উপেন্দ্রবজ্র যোধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহে না—তাই এই নাবালকটিকে নির্লজ্জভাবে বলি দিতে পাঠাইয়াছে। যোধা ধীরপদে বিচারকদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন। অস্ফুটে কী আলোচনা হইতে লাগিল।

পাঠক আশাকরি মেবারী যোদ্ধাটিকে চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব পাঠকের নহে! পূর্বজ্ঞান না থাকিলে সমরসাজে সজ্জিত এই তরুণকান্তি নির্গুম্ফ যুবককে—পাঠক তো ছাড়, কোন তরুণী পাঠিকাও সেই পীত ঘোটকের উপর আসীন আহেরিয়া কিশোর বলিয়া কিছুতেই চিহ্নিত করিতে পারিতেন না, একথা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

যোধার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল। যোধা অবসর লইলেন। কুটিলহাস্যে যোধার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। বৃদ্ধ সেনাপতিকে আজ শায়েস্তা করিতেই হইবে। যোধার প্রস্থানে দ্বিতীয় যোদ্ধা রণভূমে অবতীর্ণ হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল বুদ্বুদ। চিনিয়াছে! এ মূর্তিটিকে সে এক মুহূর্তও বিস্মৃত হয় নাই। পান্থশালার সেই উদ্ধত রাঠোর রাজপুত।

কিন্তু হায়! আজ যে তাহার তরবারি রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত। আজ ইহাকে পরাজিত করিলে ইহার

রক্তে তাহার কৃপাণ তো মুক্তিস্নান করিবে না। দুই যোদ্ধা পরস্পরের নিকটবর্তী হইল। পরস্পরকে সামরিক অভিবাদনপূর্বক উভয়ে মুখোমুখি হইল, দুইজনের তরবারি পরস্পরকে চুম্বন করিল। রাঠোরও তাহাকে চিনিয়াছে। নিকটবর্তী হইতেই রাঠোর অস্ফুটে কহিল,—'আহেরিয়া বাচ্ছা! পান্থশালায় আমার দেয় মুদ্রা কয়টি দিয়া দিয়েছিলে তো?'

বুদ্বুদও নিম্নকণ্ঠে কহিল,—'হ্যাঁ, সুদসমেত আজ তাহা মহাশয়কে শোধ করিতে হইবে দেখিতেছি।'

রাঠোরের ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু দুইটি নাচিয়া উঠিল। একটি ব্যঙ্গের হাসি তাহার ওষ্ঠাধারে ফুটিয়া উঠিল, বলিল,—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে আজ আমার কৃপাণ বস্ত্রাচ্ছাদিত! নহিলে—'

বুদ্বুদ কথা শেষ করিবার পূর্বেই কহিল,—'সে খেদ মিটাইবার বাসনা থাকিলে কল্য প্রাতে ভবানী মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা করিবেন।'

—'আপনার সে আশা দুরাশা; কারণ আজ এই বস্ত্রাচ্ছাদিত তরবারির আঘাতেই কাল মহাশয় শয্যাত্যাগে বিরত থাকিবেন অনুমান হইতেছে।'

বুদ্বুদও কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার বাক্য নিঃসরণের পূর্বেই সশব্দে ভেরী বাজিয়া উঠিল এবং সে সাবধান হইবার পূর্বেই সজোরে তাহার বাম বাহুমূলে রাঠোরের তরবারি আঘাত করিল। বুদ্বুদ ক্ষিপ্রগতি শাদূর্লের মতই দুই পদ পিছাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিল।

দুইজনে অসিযুদ্ধ শুরু করিল।

সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত শক্তি একত্র করিয়াও বুদ্বুদ অপরিচিত রাঠোরকে আয়ত্তে আনিতে পারিল না। অদ্ভুত তাহার অসিচালনার শিক্ষা! বিদ্যুদ্‌গতি কিশোর চতুর্দিক হইতে মুহুর্মুহু তাহাকে অস্ত্রাঘাতে প্রয়াসী হইল; কিন্তু একবারও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। রাঠোরের এক তরবারি যেন সহস্রখানা হইয়া নিজের চতুর্দিকে এক অদৃশ্য লৌহজাল বিস্তার করিয়াছে! বুদ্বুদ বিস্মিত হইল। এইরূপ ঘটনা তাহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। মঙ্গলরামের কূটকৌশলগুলি একের পর এক প্রয়োগ করিল কিন্তু প্রতিবারেই রাঠোরের অস্ত্রের উপর পড়িল তাহার আঘাত। ক্রমে বুদ্বুদের সর্বাঙ্গে শ্রমজল দেখা দিল। ভয় সে পায় নাই—ভয় কাহাকে বলে বুদ্বুদ তাহা জানে না; কিন্তু ক্রমশ যেন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। ব্যর্থতার কারণটা সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণাই হইল না। ইহার আয়ুধ কি মন্ত্রপূত? নিঃশ্বাস লইবার জন্য বুদ্বুদ দুই পদ পিছাইয়া গেল।

এতক্ষণ রাঠোরই আত্মরক্ষার্থ লড়িতেছিল—এক্ষণে বিপক্ষকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া সে সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িল না। প্রতিপক্ষের উপর রাঠোর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্তে কালবৈশাখীর শিলাবৃষ্টির ন্যায় রাঠোরের কৃপাণ মুহুর্মুহু বুদ্বুদকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া দিল। বুদ্বুদের বিশ্বাস—অসিশিক্ষার আইন অনুযায়ী সে প্রতিটি আঘাতই প্রতিহত করিয়াছে, তবু প্রায় প্রত্যেকটি আঘাতই আসিয়া পড়িয়াছে তাহার প্রত্যঙ্গদেশে। স্তম্ভিত আহত বুদ্বুদ পুনরায় আক্রমণ করিবার পূর্বেই ভেরী বাজিয়া উঠিল। বিচারকগণ নিঃসংশয়ে রাঠোরকে জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সমস্ত রণক্ষেত্রটি বুদ্বুদের চক্ষের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল। সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পরাজয়ের গ্লানি যে এতদূর মর্মান্তিক চির-অপরাজেয় বুদ্বুদ তাহা আজ জীবনে প্রথম অনুধাবন করিল। দুইহস্তে মুখমণ্ডল লুক্কায়িত করিয়া সে রণস্থলেই বসিয়া পড়িল। রাঠোরের অট্টহাসি ও জনগণের কোলাহলের মধ্যে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া বসিত। ভাগ্যে তাহার তরবারি বস্ত্রাচ্ছাদিত! বিজয়ী রাঠোর মারবার শিবিরে ফিরিয়া গেল। বুদ্বুদ তখনও চলৎশক্তি রহিত।

সহসা কে তাহার বাহুমূল ধরিয়া আকর্ষণ করিল; বুদ্বুদ সাশ্রুলোচনে দেখিল উপেন্দ্রবজ্র। কেহ কোনও কথা বলিল না। ওর বাহুমূল দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উপেন্দ্রবজ্র বিচারকবর্গের সম্মুখে আসিয়া অভিযোগ করিলেন—রাঠোর অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে। তিনি বিচারের প্রতিবাদ করিতেছেন। মারবারের যোদ্ধা প্রতিযোগিতার আইনে নির্দিষ্ট সীমারেখার অপেক্ষা দীর্ঘতর তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। অপর পক্ষে বুদ্বুদের তরবারি অনেক ক্ষুদ্রায়তন। এতক্ষণে বুদ্বুদ বুঝিল, কেন সে রাঠোরের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষতা লাভ করিতেছিল না। রাঠোরের তরবারি বিচারকগণ তলব করিলেন। সর্বসমক্ষে তাঁহার

দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হইল এবং দেখা গেল অভিজ্ঞ সেনাপতির দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই। নির্ধারিত সীমারেখার অপেক্ষা দীর্ঘতর তরবারি লইয়াই রাঠোর অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে।

যোধা বলিলেন,—'তবে পুনরায় যুদ্ধ হউক।'

বিচারক রাজন্যবর্গ কহিলেন,—'না! মারবারী যোদ্ধার কিতবসদৃশ হস্তলাঘবতা শাস্তিযোগ্য। অতএব মেবারী যোদ্ধাই জয়ী।'

মেবার শিবিরে জয়ধ্বনি উঠিল।

যোধার অক্ষিতারকা অলাতখণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। তিনি উপেন্দ্রবজ্রকে কহিলেন,—'বিচারকগণের আদেশ অবশ্য শিরোধার্য; কিন্তু আশা রাখি, নিয়মতান্ত্রিক জয় ঘোষণার অন্তরালে মেবারীরা আত্মগোপন করিতে চাহে না। আপনি যদি ঐ একই যোদ্ধাকে দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসাবে প্রেরণ করিতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে আমিও পুনরায় আমার চির-অপরাজেয় যোদ্ধাকে এই বিচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পাঠাই।'

বুদ্বুদের কচি কিশোর মুখমণ্ডলে যেন দেহের সমস্ত রক্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছে! সে দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল,—'আমি এক শর্তে পুনরায় ঐ কিতবের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে পারি।'

যোধা কিশোরের ঔদ্ধত্যে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন,—'কী শর্ত ?'

—'যদি উভয়কেই মুক্ত কৃপাণ লইয়া এ তর্কের মীমাংসা করিতে দেওয়া হয়।'

রাও রণমল্ল কহিলেন—'উভয়পক্ষ রাজি থাকিলে ইহাতে দোষের কিছু দেখি না।'

অপমানিত রাঠোর তৎক্ষণাৎ একটি মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণক্ষেত্রে লাফাইয়া নামিল।

কিন্তু বাধা দিলেন বিচারকবর্গ। উভয় প্রতিযোগীর সম্মতিতে মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের আপত্তি নাই—কিন্তু পরাজিত-প্রতিযোগীর দ্বিতীয়বার অস্ত্রধারণের অধিকার প্রতিযোগিতার আইনে নাই। আইন—আইন! ক্ষুধিত সিংহের মত যোধা ও রাঠোর রাজপুত বুদ্বুদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। ক্ষণিক স্তব্ধতা। সহসা যোধার কর্ণমূলে কে যেন নিম্নস্বরে কী বলিল। যোধা পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিলেন সর্দার সাগরজী। শ্রবণমাত্র যোধার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তিনি রাও রণমল্লের কর্ণে গোপনে কী যেন নিবেদন করিলেন।

রণমল্ল কহিলেন,—'প্রতিযোগিতার শেষে।'

উপেন্দ্রবজ্র বুদ্বুদকে লইয়া মেবার শিবিরে ফিরিলেন। বুদ্বুদকে জনান্তিকে লইয়া কহিলেন—'তোমাকে উহারা চিনিয়াছে! তুমি অবিলম্বে জনারণ্যে মিশিয়া যাও। মেবার শিবির হইতে একটি অশ্ব লইয়া এক্ষণি মান্দোর ত্যাগ কর।'

বুদ্বুদও তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতার এই অবস্থায় স্থানত্যাগ করার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। সে সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করিল, কিন্তু মনে মনে স্থির করিল প্রতিযোগিতার শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং আরও কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখা যাইতে পারে। হয়তো সর্দার উপেন্দ্রবজ্রের অসিচালনা দেখার সৌভাগ্য তাহার জীবনে আসিবে না।

পুনরায় ভেরী বাজিয়া উঠিল। উপেন্দ্রবজ্র মেবার শিবির হইতে স্বয়ং রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। অপরদিক হইতে রণহুঙ্কার দিয়া যোধাও যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। যোধা কহিলেন,—'সর্দারজী, আপনার সৈনিকটির সাহসকে আমি প্রশংসা করি। যাহাই বলুন, এরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত তরবারির শিশুসুলভ অস্ত্র-আস্ফালনে অসিযুদ্ধের প্রতর্ক নিঃসন্দেহে সুসম্পন্ন হয় না।'

উপেন্দ্রবজ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন। তাঁহার দুই কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। বিশ বৎসর পূর্বে হইলে শুধু রাজস্থানের নয় সমগ্র পৃথিবীর যে কোনও যোদ্ধার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু আজ? হ্যাঁ, আজ তিনি বৃদ্ধ! কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল—তাঁহার ধমনীতেও শিশোদীয়া বংশের রক্ত। উপেন্দ্রবজ্র সহাস্যে কহিলেন,—'যুবরাজের কথা যথার্থ! আপনার আপত্তি না থাকিলে আমারও পর্দানশীন কৃপাণকে মুক্তি দিতে পারি।'

যুবরাজের চক্ষুদ্বয় কৌতুকে উৎসাহে নাচিয়া উঠিল, কহিলেন,—'তবে অপেক্ষা করুন, আমি বিচারকের অনুমতি লইয়া আসি।'

যোধা অনুমতি আনিতে গেলেন। উপেন্দ্রবজ্র ধীরে ধীরে তরবারির অগ্রভাগ হইতে রেশমাচ্ছাদন অপসারিত করিতে লাগিলেন। সহসা উপেন্দ্রবজ্র দেখিলেন জনতার ভিতর হইতে একজন রাজপুরুষ তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। রাজপুতের সুগঠিত দেহ, সমস্ত অঙ্গ যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত। হস্তে নগ্ন কৃপাণ। মুখের উপর লৌহজালিকার একটি আচ্ছাদন। উপেন্দ্রবজ্র সবিস্ময়ে দেখিতেছিলেন। সাধারণ সৈনিকবেশী রাজপুত সেনাপতির নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে আভূমি নত হইয়া সামরিক অভিবাদন করিল এবং আংরাখার ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া দিল। উপেন্দ্রবজ্র নির্বাক বিস্ময়ে পড়িতেছিলেন—

'শ্রীরামজয়তি, শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ, অতঃপর পত্রবাহক আমার বিশেষ পরিচিত। অধমের অস্ত্রশিক্ষাজ্ঞানের উপর যদি মহামান্য সেনানায়কের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে জানিবেন, অসি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিনিধিত্রয়ের যে কোনও যোদ্ধার অপেক্ষা ইঁহার অস্ত্রশিক্ষা অল্প নহে। অতএব আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রতিযোগিতায় নিজে অস্ত্রধারণের পূর্বে এই দ্বিতীয় পত্রবাহককে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দিবেন।

নিবেদন, ইতি হতভাগ্য হিমাচল।'

পত্রবাহককে কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই যোধা প্রত্যাবর্তন করিলেন। উপেন্দ্রবজ্র মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'যুবরাজ আমিই মেবারী সৈনিকদের দলপতি। আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি যদি হত অথবা আহত হই তাহা হইলে মেবার ও মারবারের মধ্যে জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রতিযোগিতায় মেবারী-যোদ্ধা তাহার দলপতির নির্দেশলাভে বঞ্চিত হইবে। তাই আমার প্রস্তাব—আপনার অসুবিধা না হইলে আমরা দুইজনে শেষ ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই।

যোধা কহিলেন,—'তথাস্তু!'

—'এই আমার দ্বিতীয় যোদ্ধা। আপনার?'

যোধার মুখ শুখাইল। এও দেখা যায় একজন অপরিচিত সৈনিক। দ্বিতীয় অঙ্কেও যদি মারবারী যোদ্ধা পরাজিত হয় তাহা হইলে তৃতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিতই হইবে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করিতেই হইবে। যোধা পুনরায় বিচারকদিগের অনুমতি লইলেন, যদি তিনি এই দ্বিতীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করিতে পারেন তাহা হইলে তৃতীয়বার পুনরায় তিনি অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন কিনা। বিচারকগণ পুনরায় জানাইলেন—বিজয়ী যোদ্ধার দুইবার অস্ত্রধারণের অধিকার আছে—বিজিতের নাই। যোধা তখন মনস্থির করিয়া বস্ত্রাবৃত কৃপাণ লইয়া পুনরায় রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। কুঞ্চিত ভ্রূ উপেন্দ্রবজ্র দূরে দণ্ডায়মান। যোধা প্রতিপক্ষের নিকটবর্তী হইতেই অপরিচিত মেবারী যোদ্ধা কহিল—'যুবরাজকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে—'

—'কেন?'

—'আমার তরবারিকে বোরখা পরাইতে হইবে। আমি বুঝিতে পারি নাই, শুধু বৃদ্ধের সহিতই নগ্ন তরবারি লইয়া লড়িবার সখ আপনার!'

যোধা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। এতবড় অপমান তাঁহাকে কেহ করিতে পারে ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত! কিন্তু এক্ষণে তিনি আর যুবরাজ নহেন; স্বেচ্ছায় সাধারণ সৈনিক সাজিয়াছেন। দশনাঘাতে অধরে তাঁহার রক্ত ফুটিয়া উঠিল। তিনি মুহূর্তমধ্যে নিজ তরবারির বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিলেন। দুই নগ্ন আয়ুধ শূন্যে ঝলসিয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল নিনাদ উত্থিত হইল; সবার উপর ভীমগর্জনে ভেরী যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করিল।

বুদ্বুদ ইত্যবসরে জনারণ্যের ভিতরে মিশিয়া গিয়াছে। মেবার শিবির হইতে একটি মূল্যবান কম্বোজী অশ্ব লইয়া নগরপ্রান্তের এক উদ্যানবাটিকার দিকে চলিয়াছে। অদ্য রাত্রেই সে মান্দোর ত্যাগ করিবে—কিন্তু যাইবার পূর্বে হিমাচলের কথামতো কিশোরী তিলাঞ্জলির সংবাদ না লইয়া যাইবে না।

রাজপথ আজ জনশূন্য। সকলেই প্রতিযোগিতার আসরে গিয়াছে। কে জানে, হয়তো তিলাঞ্জলিও গৃহে নাই।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া কিশোর চালক শুধু ভাবিতেছিল, কী করিয়া এমন অসম্ভব সম্ভব হইল! রাজস্থানের অপরাজেয় অসিযোদ্ধা যোধা কিনা শেষে এক সাধারণ সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞা হারাইলেন? তিন বন্ধুর কেহ কি ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিল? হিমাচল অথবা উদয়াচল নহে; কারণ সৈনিকের বিরাটাকার বপু একমাত্র বিন্ধ্যাচলের সহিতই তুলনীয়; কিন্তু কণ্ঠস্বরে মনে হয় বিন্ধ্যাচল নহে তাহা হইলে? কে এ?

অপরিচিত মেবারী যোদ্ধার পরিচয় কেহই পায় নাই। তাহার অস্ত্রাঘাতে অপ্রত্যাশিতভাবে যোধার পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদিগের দৃঢ়বেষ্টনী ভেদ করিয়া সকলে আহত রাজপুত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছিল—কোট্টপাল এবং প্রতিহারিবর্গের প্রচেষ্টায় জনতা অবশেষে পথ দেয়। রাজবৈদ্য তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে পরীক্ষা করেন। আঘাত মারাত্মক নহে। অজ্ঞান কুমারের দেহ শিবিরে নীত হইল। এই গণ্ডগোলে প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পুনরায় জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

উপেন্দ্রবজ্রকে আর অস্ত্রধারণ করিতে হইল না। অপরিচিত যোদ্ধার কথাই সকলে আলোচনা করিতেছিল—আর কেহ না চিনিলেও উপেন্দ্রবজ্র তাহাকে চিনিয়াছেন। পোশাকে আত্মগোপন করা সহজ, কণ্ঠস্বর বিকৃত করা অসম্ভব নহে—কিন্তু অস্ত্রচালন পদ্ধতি? ছদ্মবেশী অর্জুনকে কি দ্রুপদসভায় দ্রোণাচার্যও চিনিতে পারেন নাই? অভিজ্ঞ সেনাপতির ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

মেবারকে জয়ী সাব্যস্ত করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল। উপেন্দ্রবজ্র রায় রণমল্লের হস্ত হইতে সম্মান আয়ুধ গ্রহণ করিলেন। জয়লক্ষ্মী আজও মেবারকে ত্যাগ করেন নাই।

আস্কন্দিত অশ্বের উপর দেহ হিন্দোলনে বুদ্বুদ সহসা সচেতন হইল, তাহার সর্বাঙ্গে বেদনা বোধ হইতেছে। বামবাহুর উপরই যন্ত্রণা সর্বাধিক। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বামবাহুমূল উন্মোচিত করিয়া বুঝিল রাঠোরের অস্ত্রাঘাতে সেখানে ক্ষত হইয়াছে। আশ্চর্য, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। এতক্ষণে লক্ষ্য করিল যে, তাহার অধোবাস রক্তক্ষরণে রক্তিম। কিয়দ্দূরের একটি প্রপা দৃষ্টিগোচর হয়,—নিকটে আসিয়া দেখিল প্রপাপালক নাই; কিন্তু কুটীরদ্বারে পূর্ণকুম্ভে জল সঞ্চিত আছে। সেই জলে ক্ষতস্থান ধৌত করা সত্ত্বেও রক্তস্রাব বন্ধ হইল না। বোঝা গেল, রাঠোরের অস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল বটে কিন্তু যে প্রকার আচ্ছাদনে অস্ত্র নিরাপদ করা যায় সেরূপ আচ্ছাদন দেওয়া হয় নাই। তাই এ আঘাত চিহ্ন। কৈতবটার বর্বরতায় বুদ্বুদ আপনার মনেই জ্বলিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই বুদ্বুদ গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধীরপদে গৃহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিবার সময় যেন তাহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। এ সে করিতেছে কী? এ গৃহের কবাটে আঘাত করিবার কী তাহার অধিকার? গৃহবাসী তো তাহার পরিচয় জানে না। সেনাপতির আদেশ মনে পড়িল—অদ্য রাত্রেই তাহাকে মান্দোর ত্যাগ করিতে হইবে। বুদ্বুদ ফিরিল; কিন্তু অশ্বের নিকটবর্তী হইতেই প্রাসাদ কুড্যের উপর হইতে কে বজ্রনির্ঘোষে কহিল, 'কে তুমি? কী চাও?'

ঊর্ধ্বে নেত্রপাত করিয়া বুদ্বুদ দেখিল প্রাকারস্থ সারিসারি ইন্দ্রকোষের ভিতর একটিতে একজন ধানুকী শার্ঙ্গে শর সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। মুহূর্তে বুদ্বুদ স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হইল; তাহার মনে হইল এই দণ্ডে পলায়ন করিতে না পারিলে মারবার রাজহস্তে তাহার লাঞ্ছনা সুনিশ্চিত। এক লম্ফে বুদ্বুদ অশ্বারোহণ করিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার দক্ষিণ মণিবন্ধে তীক্ষ্ণ শরাঘাত হইল। সশব্দে সে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। একেই অস্ত্রাঘাতে জীর্ণ শরীর, তদুপরি শরাঘাতে এবং পতনজনিত আঘাতে বুদ্বুদ একেবারে সংজ্ঞা হারাইল।

অনতিবিলম্বে গৃহদ্বার উন্মোচিত হইল। দীপ হস্তে একটি কিশোরী এবং তাহার রক্ষক এক প্রৌঢ় রাজপুত বাহিরে আসিলেন। সংজ্ঞাহীন কিশোরকে দেখিয়া কিশোরীর আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। রাজপুত কহিলেন,—'তিলাঞ্জলি—এই যুবকটিই কল্য সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল না?'

তিলাঞ্জলি কহিল,—'হ্যাঁ, এ যুবক আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরিচিত—আমাদেরই প্রচণ্ড ভুল হইয়াছে।' অতঃপর সংজ্ঞাহীন যুবকের দেহ দুইজনে ধরাধরি করিয়া ভিতরে আনিলেন।

রাজপুত কহিলেন,—'তিলাঞ্জলি, যুবকের অঙ্গাবরণ উন্মোচিত কর; আমি ঔষধ লইয়া আসিতেছি।'

তিলাঞ্জলি অল্প ইতস্তত করিল; নির্জন কক্ষে অপরিচিত যুবকের বক্ষাবরণ উন্মোচিত করিতে তাহার কুণ্ঠা হইতেছিল; কিন্তু উপায় নাই। বুদ্বুদের রণসজ্জা উন্মুক্ত করিয়া তিলাঞ্জলি আরও বিস্মিত হইল—তাহার সর্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত। লৌহজালিকে যেটুকু রক্ষা হইয়াছে তাহার বাহিরে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন! অতঃপর তিলাঞ্জলি, তাহার রক্ষাকর্তা মাধববর্মা এবং তাহার বৃদ্ধা আয়ী-মা কিশোরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আয়ী-মা বুদ্বুদকে চিনিতে পারে নাই। পান্থশালায় ক্ষণিক-দেখা যুবকের কথা তাঁহার মতো বৃদ্ধার মনে থাকিবার কথা নহে, কারণ স্মৃতির রেখাঙ্কনের উপর তিনি তো সেই মুখখানিকে বারে বারে স্মরণ করিয়া উজ্জ্বল করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই। তাহা ভিন্ন বিসর্জিত-গুম্ফ বুদ্বুদের মুখাকৃতিও কিছু বদলাইয়াছে। মাধববর্মা প্রশ্ন করিলেন,—'এখন কেমন বোধ করিতেছেন?'

—'ভাল। আপনারা অনুমতি করিলে আমি এখন যাইতে পারিব। আমি কোনও অসদুদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই।'

—'জানি। আপনি আমাদের পূর্ব পরিচিত।'

—'পূর্ব পরিচিত? আপনি পূর্বে আমাকে কখনও দেখিয়াছেন?'

—'কল্য আপনি কি এই বাটিতে আসেন নাই।'

—'হ্যাঁ, হিমাচলের সহিত আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার পূর্বে আমাকে দেখিয়াছেন কি!'

—'কই, মনে পড়ে না।'

—'কোনও পান্থশালায়!'

—'কোন্ পান্থশালায়?'

বুদ্বুদ গৃহের চতুর্দিকে দৃক্পাত করিতেই দেখিল মাধববর্মার পিছনে চিত্রার্পিতাবৎ তিলাঞ্জলি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কজ্জললাঞ্ছিত হরিণ নয়ন হইতে কৌতুক-স্নেহ-ভালবাসা যেন ক্ষরিত হইতেছে। বান্ধুলিরক্তিম অধরের উপরে চম্পকতর্জনী স্থাপিত করিয়া সে গোপনতার সঙ্কেত করিতেছে।

মঙ্গলরাম নিজে নিরক্ষর, কিন্তু রাজপুত পালিতপুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বুদ্বুদের কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্য পড়া ছিল। তাহার মনে হইল, এই তন্বী তরুণী কুন্দকলি দ্বারা অলকগুচ্ছ অনুবিদ্ধ করে নাই; চূড়াপাশে নবকুরুবক নাই, নীবিবন্ধেও মূর্ছিত হয় নাই রত্নাভরণকাঞ্চী। সংস্কৃত কাব্যের এবম্বিধ লাঞ্ছনায় বুদ্বুদ যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হইল; পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, এ সকল সত্ত্বেও তো কিশোরীর নায়িকা হইতে কোনও বাধা নাই। উহার রেশমী কঞ্চুক-যুথীর জয়স্তম্ভদ্বয়ে অতসীপুষ্পের অবতংস দুলিতেছে, কর্ণে শিরীষ-কুসুমের কুণ্ডল, গ্রীবাভঙ্গে—

—'কোন পান্থশালার কথা বলিতেছেন?'

বুদ্বুদ যেন একগ্রাসে একটি বৃহৎ লড্ডুকপিণ্ড গলাধঃকরণ করিল। কহিল,—'না, আমারই ভুল হইয়াছে, সে অন্য একজন!'

কিশোরী হাস্য সংবরণ করিতে করিতে নিমেষে অন্তর্হিতা হইল।

মাধববর্মা কহিলেন,—'যাহা হউক, আপনি ক্লান্ত, অদ্যরাত্রে বিশ্রাম করুন। কল্যপ্রাতে আলাপ করা যাইবে। তিলাঞ্জলি ইহাকে কিছু আহার্য পানীয় দাও।'

অল্প পরে তিলাঞ্জলি একটি পাষাণপাত্রে কপিত্থ সুবাসিত তক্র আনিয়া বুদ্বুদকে পান করাইল। তক্র যে এরূপ সুস্বাদু হইতে পারে বুদ্বুদ তাহা পূর্বে জানিত না। আকণ্ঠ পান করিয়া সে নিদ্রাভিভূত হইল।

দীপ নির্বাপিত করিয়া তিলাঞ্জলি ও মাধববর্মা চলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ নিদ্রাভিভূত ছিল খেয়াল নাই, সহসা বুদ্বুদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার ললাটের উপর একখানি সুশীতল হস্ত স্থাপন করিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছে। কোনও সাড়াশব্দ না দিয়া সে পড়িয়া রহিল। পূর্ণশশীর চন্দ্রকিরণ গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পূর্ণালোকিত চন্দ্রালোকে বুদ্বুদ অনায়াসে উৎকণ্ঠিতা তিলাঞ্জলিকে চিনিতে পারিল। বুদ্বুদের অযত্নবিন্যস্ত কেশরাজি কপালের উপর হইতে অপসৃত করিয়া, গাত্রাবরণটি ধীর হস্তে আবক্ষ টানিয়া দিয়া তিলাঞ্জলি প্রস্থানোদ্যতা হইল। সেই মুহূর্তে বুদ্বুদ তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে যাইবে সহসা তৎপূর্বেই গবাক্ষ-পথে কে যেন কহিল,—'বিলম্ব করিতেছ কেন?'

অর্ধ উন্মীলিত চক্ষেই বুদ্বুদ স্পষ্ট দেখিল বক্তাকে। পোশাক দেখিয়া সে চিনিল। তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। এই রাজপুরুষটির অস্ত্রাঘাতেই আজ যোধা ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন। আশ্চর্য! সেই রাজপুতটা এখানে আসিল কি প্রকারে? তিলাঞ্জলি দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। বুদ্বুদ উঠিয়া বসে। কে এই রাজপুত? নিঃসংশয়ে ঐ রাজপুরুষ তিলাঞ্জলির প্রণয়ী! বুদ্বুদের বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। গবাক্ষপথে দেখা যায় রাজপুত তিলাঞ্জলির কনকচম্পকতুল্য করমুষ্টি নিজ করে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে উদ্যান অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বুদ্বুদ শয্যাত্যাগ করিল। সর্বাঙ্গে তখনও বেদনা বোধ আছে। থাক্! তবু তাহাকে উহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। সদর দ্বার উন্মুক্ত পাওয়া গেল, নিঃশব্দে মুক্ত কৃপাণ হস্তে দ্রুতগতিতে বুদ্বুদ উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনানী—বহুদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান। প্রায় পঞ্চাশ হস্ত ব্যবধান রাখিয়া বুদ্বুদ ঐ প্রেমিকযুগলকে অনুসরণ করিতেছিল। রাজপুত যে অসিযুদ্ধে কতদূর নিপুণ—তাহা তাহার অজানা নহে—এই দুর্বল শরীরে উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যে হাস্যকর প্রচেষ্টা তাহাও তাহার সুবিদিত, কিন্তু এতকথা ভাবিবার মতো তাহার মনের অবস্থা নহে। শুধুমাত্র সংস্কার বশেই সে যেন উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

পূর্ববর্তী যুবক-যুবতী সহসা স্তব্ধ হইল। বুদ্বুদ বিটপী অন্তরালে আত্মগোপন করিল। রাজপুত কহিল,—'কেহ আমাদের অনুসরণ করিতেছে।'

তিলাঞ্জলি কহিল,—'আমারও তাহাই মনে হইতেছিল।'

—'তুমি অপেক্ষা কর;—আমি দেখিয়া আসিতেছি।' রাজপুত পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া আসিতেই বুদ্বুদ একলম্ফে রাজপথে নামিল।

রাজপুত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'তুমি কে?'

—'আমি যেই হই—তুমি কে?' প্রতিপ্রশ্ন করিল বুদ্বুদ।

রাজপুত নিকটবর্তী হইয়া কহিল,—'তোমাকে আজ মেবারপক্ষে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়াছি। সত্য বল—তুমি কে?' বুদ্বুদ যেন প্রতিধ্বনি করিল—'তোমাকেও আজ মেবারপক্ষে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়াছি। সত্য বল—তুমি কে?'

—'তুমি পরিচয় দিবে না?'

—'না; তুমি পূর্বে পরিচয় দাও!'

—'উদ্ধত যুবক—'

দুইজনেই পরস্পরকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রে অস্ত্রে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তিলাঞ্জলি দূর হইতে সমস্ত কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল—সে ছুটিয়া আসিয়া অসীম সাহসে দুই অস্ত্রবীরের মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করাইল। দুইজনেই অস্ত্র সংবরণ করিলেন। রাজপুত কহিল,—'তিলাঞ্জলি, তুমি সরিয়া দাঁড়াও! এ যুবক আজ মেবারপক্ষে যুদ্ধ জয় করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, ইহাকে শেষ না করিয়া আমাদের যাওয়া চলে না।'

তিলাঞ্জলি মুহূর্তের জন্য কী ভাবিল। তৎপরে ছুটিয়া আসিয়া বুদ্বুদের দক্ষিণহস্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'তুমি অস্ত্র সংবরণ কর। যদি আমাকে একমুহূর্তের জন্যও ভালো—, যদি কখনও স্নেহ করিয়া থাক তবে আমার বিনীত অনুরোধ তুমি ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিও না।'

বুদ্বুদ কহিল, 'বুঝিলাম! কিন্তু একটা কথা বলিতে পার তিলাঞ্জলি—ইহাকেই যদি এত ভালোবাস,

তবে নিদ্রিত অপরিচিত যুবকের ললাটের জ্বরতাপ পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলে কেন?'

—'কী বলিতেছ! চুপ কর! জান ইনি কে? চিরায়ুষ্মন মহাভাগ শিশোদীয়া রানার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ চণ্ডদেব!'

—'যুবরাজ চণ্ডদেব!!'

বজ্রাহতের মতই বুদ্বুদ স্থির হইয়া রহিল। যুবরাজকে অভিবাদন করিতেও ভুলিয়া গেল।

যুবরাজ কহিলেন,—'যুবক, তরবারি গ্রহণ কর।'

বুদ্বুদ কহিল,—'মহাভাগ! আপনার বিরুদ্ধে—'

—'হ্যাঁ, তুমি যখন আমার পরিচয় জানিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে জীবিত রাখিয়া যাইতে পারি না।'

তিলাঞ্জলি এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিল—'যুবরাজ!'

—'সরিয়া দাঁড়াও তিলাঞ্জলি! ইহাকে বিশ্বাস কি?

—'যুবরাজ! এ যুবক আমার—আমার—'

—'তোমার—'

—'আমার সৌহর!'

তিলাঞ্জলি আরক্তিম বদনে অধোমুখী হইল। যুবরাজ চণ্ডদেবের আনন স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল, কহিলেন,—'তবে বিশ্বাস করিতে পারি বটে।'

বুদ্বুদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা! তরবারি যুবরাজের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া নতজানু হইল। চণ্ডদেব কহিলেন,—'বন্ধু, বড় সুসময়ে আসিয়াছ। তোমার সাহায্যের এখন আমার একান্ত প্রয়োজন। তুমি আজ মেবারীর বিজয়ের অর্ধেক গৌরব লাভ করিয়াছ—এজন্য না চিনিয়াও আমি পূর্বেই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম—এক্ষণে ভগ্নী তিলাঞ্জলির কথায় তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিলাম। তোমার আসল পরিচয় লওয়ার এখন সময় নাই। অস্ত্র লও; গোপনে আমাদের রক্ষকরূপে অনুসরণ কর।'

যুবরাজ চণ্ডদেবের হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া বুদ্বুদ পুনরায় উহাদের পঞ্চাশ হস্ত পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এবারে ভক্ষক হিসাবে নহে; রক্ষক হিসাবে।

বোধকরি পাঠক ইতিমধ্যে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুত আমি নিজেই বুঝিতেছি এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি—সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলি বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমানবেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখ দুঃখের খাতিরে কোথাও বেশীক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

আমি কি করিব? পাঠক দীর্ঘকাল এ জাতীয় দ্রুতগতি উপন্যাস পাঠ করেন না; সে দোষ আমার নহে। আধুনিক সাহিত্যের যাঁহারা দিক্‌পাল তাঁহারা পদে পদে বিশ্লেষণ করেন—'একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণ পরস্পর গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়। ব্যাপারটা হয়তো ছোট কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো বিপর্যয়।' বস্তুত অধুনাতন লেখকগণ নায়কের একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণে, নায়িকার একটি মাত্র কটাক্ষপাতেই থামিয়া যান এবং প্রথম, দ্বিতীয় বন্ধনীর সাহায্যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগুলির 'ছাইকো এনালিসিস' করিতে বসেন। [জানি না পাঠককুলকে ইঁহারা পূর্ব হইতেই কেনা জন্মগবেট বলিয়া ধরিয়া লন { কারণ মনঃসমীক্ষণের বন্ধনী চিহ্নগুলির মধ্যে নায়ক নায়িকার সকল প্রকার কার্যকারণ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়—পাঠককে কিছুই ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না (পুস্তক বিপণিতে অর্থদণ্ড ভোগই যেন পাঠকের শেষ কর্তব্যপালন) }]।

এই শম্বুকগতি আধুনিক সাহিত্যের বাতাবরণে এরূপ প্রভঞ্জনবেগ নায়ক-নায়িকাদের লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হয় বইকি। কিন্তু উপায় কি? —'যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত উপকরণ কাঁধে লইয়া চলিতে পারে না।...গৃহস্থ মানুষের পক্ষেই উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভাববাহুল্য শোভা পায়।' আমি উপায়ান্তরহীন। আমার উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর

মানুষ, এই উপন্যাসের রচনাশৈলী যে যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় সে যুগে এই দ্রুতগতি রিলে রেসে পাঠককেও লেখকের সহিত সমান তালে দৌড়াইতে হইত। লেখকের ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া পাঠক গতিবেগ সংবরণ করিলেই ধমক শুনিতেন,—"বোধহয় কোর্টশিপটা পাঠকের ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছুই নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিক!' সে সব কিছুই নাই—ধিক্।"

এ'ধিক্' লেখকের প্রাপ্য নহে, তাঁহার নায়ক-নায়িকারও দোষ নাই। পাঠককেই ধিক্কার দেওয়া উচিত। পাঠকের আত্মাভিমানে ঘা লাগিবার কারণ নাই—কারণ আপনার অপেক্ষা বুদ্ধিমান কোনও পাঠকও অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন—

—'প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, 'রাজসিংহ' পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারও যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গম্ভীররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভাল হইত।'

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসের সহিত আমার এ অকিঞ্চন উপন্যাসের তুলনা করায় পাঠক যেন রুষ্ট হইবেন না—পাঠককেও যথেষ্ট ঘুষ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিজ উপমানরূপে পাইয়াছেন।

অলমতি বিস্তরেণ—

মান্দোর পর্বতের অপর পার্শ্বে লোকালয় হইতে অর্ধযোজন দূরে একটি বৌদ্ধবিহার। রাত্রি একদণ্ড। শিবাকুল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনানী প্রকম্পিত করিয়া যাম ঘোষণা করিল। নির্জন বনপ্রান্তে বন্যজন্তুর গুমরানির মতো একটি শব্দ উঠিল হুম্-হো-হুম্-হো।

কোনও বন্যজন্তু নহে। মূল্যবান কিংখাবে মণ্ডিত একটি পাল্‌কি চারিজন বাহকের স্কন্ধে বৌদ্ধচৈত্যের সম্মুখে নীত হইল। একজন শূলহস্ত রাঠোর রক্ষী পল্যঙ্কিকার পার্শ্বে পার্শ্বে আসিয়া চৈত্যের দ্বারদেশে থামিল। দুইজন রমণী অবতরণ করিলেন। দুইজনেই কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন। একজন মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত—ব্রীড়াবতী—সদ্যস্ফুট কুসুমের ন্যায় বনভূমি আলোকিত করিয়া জ্যোৎস্নালোকে দণ্ডায়মানা হইলেন। ইনি মারবার রাজকুমারী মধুশ্রী! অপরজন তাঁহার সখী ও বয়স্যা পর্ণা।

রক্ষীকে সম্বোধন করিয়া পর্ণা কহিলেন,—'অঙ্গদেব, তুমি এইস্থলে অপেক্ষা কর। আমরা মহাস্থবিরের আশীর্বাদ লইয়া এখনই আসিব।'

রাঠোর রক্ষী নতমস্তকে অভিবাদন করিল শুধু।

উভয় সখী মন্থরপদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া চৈত্যে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধবিহারটি ক্ষুদ্রায়তন। রাজপুতানায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তখন ছিল নগণ্য। অধিকাংশই শৈব ধর্মাবলম্বী। তবুও মান্দোর নগরীর প্রান্তে এই ক্ষুদ্র বিহারে চারিজন বৌদ্ধভিক্ষু তাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করিতেন।

পাষাণ চত্বরের অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র অবরোধ। তাহার ভিতরে অনুচ্চ পাষাণবেদিকায় ক্ষুদ্রায়তন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি। মৃৎপাত্রের দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহারই ক্ষীণালোকে দেখা গেল তথাগতের সম্মুখে পীতবসনধারী মুণ্ডিতমস্তক শীর্ণ কলেবর এক বৃদ্ধ শ্রমণ নিমীলিত নেত্রে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তিনি পিছনে দেখিলেন। তাঁহার স্তবপাঠ শেষ হইয়াছিল। আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইল।

বৃদ্ধ শ্রমণ কহিলেন,—'আরোগ্য!'

উভয়ে উপবেশন করিলে পর্ণা কহিল,—'মহাভাগ, আমার প্রিয়সখীকে আহ্বান করায় আমরা

উভয়েই আসিয়াছি। আপনার বক্তব্য বিষয় নিশ্চয়ই গোপনীয়। আপনি অনুমতি করিলে আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে পারি।'

বৃদ্ধ শ্রমণ কহিলেন,—'পর্ণা, যদিচ তোমাকে আমি আহ্বান করি নাই, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তোমারও এস্থলে আসার প্রয়োজন ছিল। ভগবান তথাগত হয়তো অলক্ষ্য হইতে এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যাহা বলিব সত্যই তাহা গোপনীয়—কিন্তু তুমি আমার সুপরিচিত এবং আমি জানি তুমি রাজকুমারীর একান্ত হিতকামী।'

বৃদ্ধ শ্রমণ স্থির হইলেন। মধুশ্রী অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—'আদেশ করুন মহাভাগ।'

শ্রমণ কহিলেন,—'বলিতেছি। শ্রবণ কর। তোমরা জানো আমি দীর্ঘদিন তীর্থপর্যটন করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছি। প্রায় ছয়মাস পূর্বে তক্ষশীলায় আমার সহিত দুইজন চীনদেশীয় পরিব্রাজকের সাক্ষাৎ হয়—'

—'চীনদেশ? সে কোথায়? কতদূর?'

—'চীনদেশ বহুদূরে, আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত নহে—দুই বৎসরের পথ। এই চৈনিক পরিব্রাজকেরা মধ্যএশিয়ার নানাস্থানে পর্যটন করিয়া সম্প্রতি আর্যাবর্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহারা বক্ষু-নদীতীরে একদল অনার্য হূণের হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হন। অবশ্য পরিব্রাজকেরা বলিয়াছেন এই দস্যুদল হূণ নহে ইহারা মঙ্গোলীয়—আমাদের আর্যাবর্তে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি জাতি—ধর্মে যবন। যাহাই হউক হূণ অথবা পাঠানদিগের অপেক্ষা ইহাদের নৃশংসতা তুলনাহীন। শত শত জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া এই বর্বর জাতির নায়ক উল্কার বেগে আর্যাবর্তের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি, এই মঙ্গোলীয় দস্যুদলপতির একটি পদ খঞ্জ। চৈনিক শ্রমণদ্বয় এই দস্যুসর্দারের কবল হইতে অতি কষ্টে মুক্ত হইয়া আর্যাবর্তে আসিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহারা ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করেন—তাই সর্বপ্রথমেই দিল্লীশ্বরের নিকট এই বর্বর জাতির সংবাদ প্রেরণ করেন। দিল্লীশ্বর সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই—সম্ভবত নিজশক্তিতে পাঠানসম্রাট আস্থাশীল। এক্ষণে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এই মঙ্গোলীয় বর্বর দলপতি যদি আর্যাবর্তে প্রবেশ করে এবং সমধর্মাবলম্বী দিল্লীশ্বরের সহিত এই যবনের যদি মিত্রতা জন্মে তাহা হইলে উভয়ে রাজস্থানের হিন্দুরাজ্যগুলি বিধ্বস্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রেই সমস্ত রাজপুতানার রাজন্যবর্গকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। অবশ্য রাজপুতানায় বর্তমানে চিতোর এবং মান্দোরের নৃপতিদ্বয় যদি সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন তাহা হইলেই সমগ্র রাজোয়ারা এক হইবে। কিন্তু কোথায় সে মহামিলন? পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং ক্ষুদ্রস্বার্থে আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দুই রাজ্যে মনোমালিন্য বিদ্যমান।'

বৃদ্ধ শ্রমণ এই পর্যন্ত বলিয়া স্থির হইলেন। মধুশ্রী শান্ত কণ্ঠে কহিলেন,—'আর্য। এ সম্পূর্ণ রাজনীতির কথা—আমাকে বলিতেছেন কেন?'

—'বলিতেছি এইজন্য যে, তুমি হয়তো এক্ষেত্রে সমগ্র রাজস্থানকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার।'

—'আমি?' ভয়ে বিস্ময়ে বেতসপত্রের ন্যায় রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

—'হাঁ, তুমিই রাজকন্যা মধুশ্রী! টিট্টিভের পক্ষেও সমুদ্র-শাসন সম্ভব। অবধান কর। চৈনিক শ্রমণদ্বয়ের নিকট এই ভয়াবহ বার্তা শুনিয়া মান্দোরে ফিরিবার পথে আমি রাজোয়ারার সমস্ত রাজন্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে আসিতেছি। সকলকেই এ সংবাদ শুনাইয়াছি, কিন্তু কেহই এ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করে নাই। একমাত্র মেবারের যুবরাজ চণ্ডদেব দেখিলাম, আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। দেখিলাম যুবরাজ দুই রাজ্যের মধ্যে সখ্যসূত্রবন্ধনে আগ্রহশীল। কিন্তু সখ্যতা জন্মিবে কিরূপে? তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি আমার কথা বুঝিয়াছ। যুবরাজ চণ্ডদেব আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এক নিকটতম বয়স্যকে এ বিষয়ে রাজকুমারীর সহিত পরামর্শ করিতে পাঠাইবেন। যুবরাজের বয়স্য এ চৈত্যে উপস্থিত। মধুশ্রী, অনুমতি হইলে দূতকে এস্থলে আনিতে পারি।'

মধুশ্রীর মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করিল। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। পর্ণা কহিল,—'কিন্তু আর্য! মেবার-রাজকুমারের বয়স্যের সহিত আমার প্রিয়সখীর এই গোপন সাক্ষাৎকার কি মহাস্থবির

অনুমোদন করিতেছেন? ইহাতে সখীর অপবাদ হইবার আশঙ্কা নাই কি? আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।'

বৃদ্ধ কহিলেন,—'তুমি সমুচিত কথাই বলিয়াছ পর্ণা। যদিচ যুবরাজ চণ্ডদেব বয়স্য পাঠাইবেন বলিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন। বৃহত্তর মঙ্গলার্থ এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমি ইহা অনুমোদন করিতেছি। তাহা সত্ত্বেও তুমি বুঝিবে এই সাক্ষাতের পশ্চাতে রাজনীতি ভিন্ন আরও কিছু রহিয়াছে—সেজন্য এ বৃদ্ধের এখানে স্থান নাই। আমি তাই চণ্ডদেবকে বলিয়াছিলাম তাঁহার বিশ্বস্ত কোন রাজপুত রমণীকে তাঁহার সহিত আনিতে। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ভিন্ন উভয়ের সাক্ষাৎকার বাঞ্ছনীয় নহে। যুবরাজ আমার নির্দেশমত একজন রাজপুত রমণী সমভিব্যাহারেই আসিয়াছেন, কিন্তু তুমি যখন স্বয়ং উপস্থিত আছ তখন আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। তাই বলিতেছিলাম পর্ণা, ভগবান তথাগতের নির্দেশেই তুমি আজ আসিয়াছ।'

অতঃপর রাজকন্যার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—'মা?'

পর্ণাই উত্তর করিল,—'আপনি অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে অপেক্ষা করুন, আমরা অল্প পরামর্শ করিয়া আপনাকে সখীর মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।'

জ্ঞানবৃদ্ধ ধীরপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুশ্রী পর্ণার করপুট নিজ করপদ্মে গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—'পর্ণা, অমি পারিব না। আমার ভীষণ লজ্জা করিবে!'

—'সে কি? তোমার সহিত নিভৃত আলাপনে যুবরাজের কত কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই সেদিনও তুমি রানা অনুমতি দেন নাই বলিয়া অনুযোগ করিতেছিলে—বলিয়াছিলে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ অসিবীরের যুদ্ধ দেখা হইল না। এখন তিনি সশরীরে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান, আর তুমি—'

মধুশ্রী পর্ণার দক্ষিণকর নিজ কঞ্চুলিকার উপত্যকায় স্থাপিত করিয়া কহিলেন,—'দেখ পর্ণা, আমার হৃদয়ের মধ্যে কী ভীষণ তোলপাড় করিতেছে। আমি পারিব না।'

পর্ণা ধিক্কারের সুরে কহিল,—'ছিঃ সখী! মহান্ অতিথি আজ যদি ফিরিয়া যান তাহা হইলে চিরকাল খেদ থাকিবে।'

—'তাহা হইলে আমি উপস্থিত থাকিব—কিন্তু আমার হইয়া সকল কথাবার্তা তোকে চালাইতে হইবে। আমার হৃদয়'—

—'জানি, জানি! তোমার হৃদয় যাহাতে শান্ত হয় সেই ব্যবস্থাই করিতেছি। বেশ, কথাবার্তা আমিই বলিব।'

পর্ণা কক্ষের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ শ্রমণকে কিছু বলিয়া পুনরায় সখীর নিকট ফিরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দ্বারদেশে এক দীর্ঘকায় রাজপুত যোদ্ধার আবির্ভাব। পর্ণা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

চণ্ডদেব রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। প্রোজ্জ্বল দীপালোকে চিত্রার্পিতাবৎ রাজকুমারী মধুশ্রীকে দেখিয়া তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল। অমনি কে যেন মধুশ্রীর মুখাবয়বে একমুষ্টি কুম্‌কুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিল। অধোবদনে তিনি চম্পক অঙ্গুলি দিয়া পাষাণ চত্বরে দাগ কাটিতে লাগিলেন।

পর্ণা কহিল,—'স্বস্তি দূতমহাশয়। আপনি আমার সখীর জন্য যুবরাজ চণ্ডদেবের নিকট হইতে কী বার্তা আনিয়াছেন নিবেদন করুন।'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'আশাকরি বৃদ্ধ শ্রমণ ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলিয়াছেন। তাহাতেই যুবরাজ আপনার সখীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী।'

পর্ণা হাস্য গোপন করিয়া ছদ্মগাম্ভীর্যে কহিল,—'রাজনৈতিক আশঙ্কার কথাই মহাস্থবির বলিয়াছেন—তাহার সমাধানের কথা কিছু বলেন নাই। যুবরাজ চণ্ডদেব শুনিয়াছি মহাবীর। আমার সখীর ন্যায় অবলা নারীর নিকট তিনি কীরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করেন?'

রাজকুমারের মুখমণ্ডলে এইবার অস্তরবির রক্তিমাভা। তিনি কোনক্রমে কহিলেন,—'মারবার ও মেবার যদি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়;—অর্থাৎ যদি মারবার কুণ্ডারী যুবরাজ চণ্ডদেবকে; অর্থাৎ—'

—'বিবাহ করেন; পরিষ্কার করিয়া বলুন না। যুবরাজের লজ্জা আপনাতে সংক্রামিত হইতেছে কেন?'

—'না না তাহা কেন হইবে!' যুবরাজ আরও রক্তিম হইয়া উঠিলেন।

—'তাহা হইলে যুবরাজ চণ্ডদেব এ বিবাহ করিতে উৎসুক?'

—'নিশ্চয়! নহিলে তিনি আমাকে পাঠাইবেন কেন?'

—'ঠিক কথা। কিন্তু আমার সখীকে না দেখিয়াই তিনি পছন্দ করিলেন? যদি আমার সখী কুরূপা হয়েন...'

—'মান্দোরের রাজকুমারীর সৌন্দর্যখ্যাতি সমগ্র রাজস্থানে সুবিদিত; যুবরাজের তাহা অজ্ঞাত থাকিবার কারণ নাই। তাহা ভিন্ন আমার নিকট রাজকুমারীর সুখ্যাতি শুনিলে—'

—'অর্থাৎ আপনি বয়স্যের নিকট আমার সখীর রূপের প্রশংসা করিবেন?'

—'নিশ্চয়ই! কেন করিব না?'

—'দূতমহাশয় নিজেই দেখিতেছি আমার সখীকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন! ভয় হয় শেষে না বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়া যায়।'

চণ্ডদেব অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কী যেন জবাব দিতে যাইবেন, তৎপূর্বেই পর্ণা 'উঃ' করিয়া উঠিল।

যুবরাজ কহিলেন,—'কী হইল?'

—'কিছু নহে! পিপীলিকার দংশন।' [4]

এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর যুবরাজ গাত্রোত্থান করিলেন। স্থির হইল, বৃদ্ধ শ্রমণ মারবাররাজ রাও রণমল্লের নিকট সকল বৃত্তান্ত বলিবেন। রণমল্ল অথবা রানা লখার আপত্তি হওয়ার কোন কারণ নাই। সুতরাং রণমল্লের দূত বিবাহপ্রস্তাব লইয়া মেবারে আসিলেই সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

পর্ণা কহিল,—'কিন্তু ধরুন রানা লখা অথবা মহারাজ রণমল্ল যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়েন?'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'সংযুক্তা দ্বিধা না করিলে পৃথ্বীরাজও পশ্চাৎপদ হইবেন না।'

পর্ণা কহিল,—'পৃথ্বীরাজ তো রাজনৈতিক কারণে সংযুক্তাকে অপহরণ করেন নাই—এক্ষেত্রে আপনার বয়স্য কি এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবেন—'

—'আশা তো করি!'

—'তাহা হইলে শুধু রাজনীতি নহে, যুবরাজের অন্য কোনও স্বার্থও আছে! সে যাহা হউক, কিন্তু আপনার বয়স্যের অন্তরের এতকথা আপনি জানিলেন কী করিয়া? আপনাকে একেবারে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বলিয়া মনে হয়!'

চণ্ডদেব আর কথোপকথন অগ্রসর করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। তিনি দ্রুত বিদায় জ্ঞাপন করিয়া বৌদ্ধ চৈত্যের বাহিরে আসিলেন। অপেক্ষমান তিলাঞ্জলির হস্তধারণপূর্বক তিনি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশহস্ত পরিমাণ পিছনে একজন অদৃশ্য রক্ষক গোপনে তাঁহাকে পুনরায় অনুসরণ করিতে লাগিল।

রাজকুমারীর রক্ষী অঙ্গদেব দ্বারের পার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। দুই সখী জ্যোৎস্নাপুলকিত বনবীথি দিয়া পল্যঙ্কিকায় বাহিত হইতেছেন। মধুশ্রী কহিলেন,—'পর্ণা, পিতা অথবা রানা যদি রাজী না হয়েন?'

পর্ণা রাজকন্যার কপালে একটি চুম্বন চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

—'ও কি করিতেছিস্?'

—'ভাগীদার আসিবার পূর্বেই যাহা পাই আদায় করিয়া লইতেছি!'

আরক্তিম মুখে মধুশ্রী হস্তধৃত পাখা দ্বারা বয়স্যাকে ছদ্ম তাড়না করিলেন।

উপরিলিখিত ঘটনার পর একপক্ষকাল অতীত হইয়াছে। এই পক্ষকালের ভেতরে বিজয়ী উপেন্দ্রবজ্র সসৈন্য চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। হিমাচল, বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল তৎপূর্বেই

রাজধানীতে সমাগত। তিলাঞ্জলি, আয়ীমাতা এবং তাঁহাদের রক্ষক ব্রাহ্মণও ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিলাঞ্জলি বস্তুত আয়ীমাতার কন্যা, আয়ীমায়ের একটি নিজস্ব নাম ছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবহারে তিনি নিজেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি যুবরাজ চণ্ডদেবের ধাত্রীজননী। রঘুদেবের জন্মের পরেই তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন। রানা লখা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই রাজপুত শিশোদীয়া ধাত্রীটি তখন শিশুকুমার দুটিকে নিজ বক্ষপুটে ধারণ করিয়া নিজ কন্যার সহিত মানুষ করিয়াছেন। যুবরাজ তাঁহাকে জননীর মতই শ্রদ্ধা করিতেন। রাজান্তঃপুরেই শুধু নয়—রাজসভাতেও এই বৃদ্ধা আয়ীমায়ের প্রভাব বড় অল্প ছিল না। অনেক সময়ে প্রকাশ্য রাজসভা হইতে তিনি কুমারকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন।

তিলাঞ্জলি এই বিধবার একমাত্র কন্যা। সেও রাজাবরোধবাসিনী। চণ্ডদেব তাহাকে ভগ্নীজ্ঞানে স্নেহ করিতেন। মান্দোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যুবরাজ তিলাঞ্জলির নিকট বুদ্বুদের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে কিছুতেই বলে নাই। বস্তুত বুদ্বুদের প্রকৃত পরিচয় সে নিজেই জানিত না—কিন্তু সে যে জাতিতে পার্বত্য আহেরিয়া তাহা জানিত; গোপন করিয়াছিল।

প্রসঙ্গত বলা চলে সে যুগে রাজপুতের সহিত ভীল, মীনা অথবা পার্বত্য আহেরিয়াদের মধ্যে কোনও বৈবাহিক আদানপ্রদান সচরাচর সামাজিক অনুমোদন লাভ করিত না।

বুদ্বুদ মেবারী সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ সৈনিক হিসাবে। রানার পার্শ্বচর দেওয়ানী ফৌজে এখনও উন্নীত হয় নাই। তাহার বন্ধুত্রয় দেওয়ানী ফৌজভুক্ত। সুতরাং সেনাবাসের বাহিরে ভিন্ন তাহাদের সাক্ষাৎ পায় না বুদ্বুদ। দেওয়ানী ফৌজ শব্দটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মেবারের রানা আইনত দেবাদিদেব একলিঙ্গের দেওয়ান;—রাজ্য একলিঙ্গদেবের। রানা তাঁহার প্রতিভূ মাত্র। তাই রানার নিজস্ব পার্শ্বচরদলের নাম দেওয়ানী ফৌজ! দুঃসাহসিকতার পরিচয় ভিন্ন কেহ দেওয়ানী ফৌজভুক্ত হইতে পারে না।

বুদ্বুদ চিতোরের প্রান্তদেশে 'বিরাচ' নদীতীরে একটি কুটীর ভাড়া লইয়াছে। এই একপক্ষকালের ভিতরে সে তিলাঞ্জলির সাক্ষাৎ পায় নাই। পাইবে কী প্রকারে? তিলাঞ্জলি দুর্গমধ্যে রাজাবরোধবাসিনী, বুদ্বুদ সামান্য সৈনিক মাত্র। আপন গৃহের নির্জন অবকাশে বুদ্বুদ শুধু ভাবে—'আচ্ছা সে রাত্রে তিলাঞ্জলি যে আমাকে সৌহর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল সেকি শুধু আমার প্রাণদানের জন্যই?'

নির্জন কক্ষে সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কেহ করে না।

পথে পথেই বুদ্বুদের দিন কাটে। চিতোর নেহাত ক্ষুদ্রায়তন নহে। মান্দোরের তুলনায় তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতি দুইই উন্নততর। রাজপথগুলি বিসর্পিল; দুই পার্শ্বে পাষাণ-নির্মিত হর্ম্য, কিছু কিছু জয়পুরী রক্তবর্ণের প্রস্তর নির্মিত। মাঝে মাঝে উদ্যান—শিলাময় জলাধার। পাষাণ-গোমুখ হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে। অদূরে চিতোর দুর্গ। তাহার উপর স্বর্ণসূর্যলাঞ্ছিত রক্তপতাকা—শিশোদীয়া স্বর্ণসূর্যবংশের রানা বাপ্পা রাওয়ের প্রতীক।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার একশত বর্ষ পূর্বে সম্রাট আলাউদ্দীনের বিষবাষ্পবহ্নিতে সমস্ত চিতোর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। ভীমসিংহ এবং পদ্মিনীর সে উপাখ্যান বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়। তারপর একযুগ চিতোরের সিংহাসনে শিশোদীয় বংশের কাহারও স্থান হয় নাই। ঝালোরের রানা মালদেবকে আলাউদ্দীন নিজ সামন্তরাজরূপে চিতোরের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। আলাউদ্দীনের সহিত সংগ্রামে হত যুবরাজ অরিসিংহের পুত্র হম্বীর চিতোর পুনরুদ্ধার করেন। রানা লখা, বর্তমান মেবার অধিপতি, এই বীর হম্বীরের পৌত্র।

বীর হম্বীর যে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন তাহা যেন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তূপ—একমাত্র রাণী পদ্মিনীর প্রাসাদ ভিন্ন সমস্ত চিতোর ধূলিসাৎ না করিয়া আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হয় নাই। হম্বীরের পুত্র ক্ষেত্রসিং অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করেন। বস্তুত রানা লখাই চিতোর পুনর্গঠনের প্রথম কাণ্ডারী। লখা ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ধারক। তাঁহার রাজত্বকালে মেবারে টিন ও রৌপ্যের খনিও আবিষ্কৃত হয়। এবং এই দুইটি কারুশিল্প মেবারে জন্মলাভ করে। ক্রমে ক্রমে চিতোর রাজভাণ্ডারে এই দুই শিল্পের মারফত বহির্বাণিজ্যে স্বর্ণদীনার আসিতে লাগিল। স্বর্ণকে রাজভাণ্ডারে অবরুদ্ধ রাখিলে

দেশের মঙ্গল নাই একথা লখা জানিতেন। তাই তাঁহার আদেশে বড় বড় জলাশয় খনন করা হইল। ভূমিসাৎ হর্ম্যমালা একটি দুইটি করিয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল। শুধু ইহাই নহে, পার্বত্য নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া খরস্রোতা নদীকে রানা লখা কৃষির কাজে লাগাইলেন।

অলস চরণে ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্বুদ রাজপথের এক মদিরা ভবনে আসিয়া প্রবেশ করিল। মদিরাতে তাহার খুব বেশি আকর্ষণ নাই। বস্তুত তাহার বাল্যকালে আহেরিয়া যুবকদলের সহিত যে মধুক বৃক্ষের রস আস্বাদন করিত তাহার স্বাদ যেন এই সকল গৌড়ী মাধ্বীতে পাওয়া যায় না। সখ করিয়া আসব, বারুণী মদিরা, সুরা, মাধ্বী সকল প্রকার পানীয়ই যে চাখিয়া দেখিয়াছে কিন্তু সেই গ্রাম্য মধুক-রসের স্বাদ সে কিছুতেই পায় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে সে কিসের আকর্ষণে আসবাগারে আসিল? সে আসিয়াছিল হিমাচলের সন্ধানে।

বুদ্বুদ জানিত হিমাচল অত্যন্ত আসবাসক্ত। প্রত্যহ সে যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান করে। এবং এই মদিরাভবনের একটি নিভৃত কক্ষ তাহার বড় প্রিয় স্থান। হিমাচলের এই অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রথমটা বুদ্বুদের কেমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই সে বুঝিল হিমাচল যেন বিশেষ কোনও কারণে সুরাসক্ত হয়। যেন তাহার মনের প্রান্তদেশে রহিয়াছে কোনও গোপন ব্যথা, তাহাকেই ভুলিবার জন্য হিমাচলের এই ব্যর্থ প্রয়াস। অথচ আশ্চর্য, এত অধিক মদ্যপান করিয়াও সে কখনো মাতাল হইত না।

এই একপক্ষকালের ভিতর তিনবন্ধুর সহিত বুদ্বুদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় তাহারা একই স্থানে মিলিত হইত। নগরের কোনও আসবাগারে, কোনও নির্জন উদ্যানে, কোনও পণ্যবীথিকায় চারি বন্ধুতে গল্পগুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। বিন্ধ্যাচল এবং উদয়াচল অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধ অথবা আহেরিয়ার গল্প পাড়িত। কখনও কখনও উন্তালা গ্রামের প্রসঙ্গ উঠিত—তখন উদয় কিন্তু কিছুতেই উন্তালা গ্রামে তাহার বিশেষ আকর্ষণের হেতুটি ব্যক্ত করিত না।

বুদ্বুদ বহুবার তাহার নিজের প্রেমকাহিনীটি বন্ধুদের বলিতে চাহিয়াছে; কিন্তু পাছে তাহার কোমল চিত্তবৃত্তি ইহাদের উপহাসের ইন্ধন যোগায় তাই এতদিন কাহাকেও কিছু বলে নাই। অথচ নিজে সে মনে মনে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে বুদ্বুদ মনে করিল, আর যে হউক হিমাচল কখনো এ বিষয় লইয়া তাহাকে পরিহাস করিবে না; তাই সে আজ নিভৃত আসবাগারে হিমাচলের সন্ধানে আসিয়াছে।

বস্তুত পান্থশালার দূরতম প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে হিমাচলকে পাওয়া গেল। সম্ভবত সে অত্যধিক মদ্যপান করিয়াছিল। আরক্তিম নেত্রে একটি কেদারায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় কী ভাবিতেছিল। সম্মুখে কাষ্ঠাসনে একটি কাচের চষক এবং একটি সুরাপূর্ণ ভৃঙ্গার। বুদ্বুদকে নিকটে আসিতে দেখিয়া হিমাচল ঈষৎ হাসিল এবং সম্মুখস্থ আসন নির্দেশ করিল।

—'কী খবর বন্ধু? তুমি মনে হয় আমারই সন্ধানে এখানে আসিয়াছ?'

বুদ্বুদ ইতস্তত করিয়া বলিল,—'সত্যই অনুমান করিয়াছ বন্ধু, কিন্তু তোমার এ অবস্থায় আর সে কথা নহে! আইস, পাশক খেলা যাউক!' আসবাগারের একজন পরিচারককে ডাকিতে যাইবে সহসা হিমাচল দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। তাহার নিমীলিত অক্ষিতারকাদুটি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল।

—'তুমি ভাবিতেছ আমি মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছি? বন্ধু বুদ্বুদ! মদে আমাকে আর মাতাল করিতে পারে না। ইহাই তো দুঃখ! মদ্যপান করিলেই আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হইয়া উঠে। যদি তোমার কোন পরামর্শ গ্রহণ করিবার থাকে তবে এই তাহার উপযুক্ত সময়।'

বুদ্বুদ আর ভূমিকা না করিয়া তাহার বক্তব্য শুরু করিল। আরাম-কেদারায় লম্বমান হিমাচলের চক্ষুদুটি আবেশে মুদিয়া গেল। আপনার আবেগে তিলাঞ্জলিঘটিত সকল কথা ধীরে ধীরে বলিয়া বুদ্বুদের সন্দেহ হইল হিমাচল নিদ্রাভিভূত। সে থামিতেই হিমাচল উঠিয়া বসে। পুনরায় এক চষক সুরা গলাধঃকরণ করিয়া বলে—'শিশুসুলভ চপলতা।'

বুদ্বুদ বিরক্ত হয়। এ জাতীয় উত্তর সে আশা করে নাই। তাই রুক্ষ স্বরে কহিল,—'তোমার নিকট এরূপ বোধ হইতে পারে কারণ স্ত্রীলোকের ভালবাসা তুমি কখনো পাও নাই।'

—'সে কথা সত্য—ও জঞ্জাল আমার বরাতে কখনও জোটে নাই।'

—'তাহা হইলে যাহা জানো না বোঝ না তাহাকে চপলতা কিংবা জঞ্জাল বলিবার চেষ্টা করিও না। প্রেমের স্পর্শে যাহাদের কোমল হৃদয়ের ভালবাসা—'

—'কী বলিলে 'কোমল হৃদয়ের ভালবাসা'? কথাটা শুনিতে খাসা! কোমল হৃদয়ের ভালবাসা।'

—'এ কথার অর্থ?'

—'এ কথার অর্থ প্রেম, ভালবাসা, কোমলহৃদয় শব্দগুলি কাব্যতেই মানায় ভাল। বাস্তবে পুরুষের জন্য আছে শুধু তরবারি আর এই—'

পুনরায় একপাত্র মদ্য গলাধঃকরণ করিয়া কহিল,—'আর স্ত্রীলোকের জন্য কিছু ছলনা, কিছু মিষ্ট ভান আর শঠতা।'

—'সব মেয়েই কিছু শঠ নয়। অন্তত আমার সহিত সে শঠতা করে নাই।'

হিমাচলের কুজ্ঝটিকাম্লান চক্ষুতারকা দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল। কহিল,—'বন্ধু প্রেমও একটি যুদ্ধ। শুধু তফাত এই যে, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একই ফল। পরাজয়ে ছলনা, বিজয়ে ললনা। অথচ ললনা ছলনারই নামান্তর! দুনিয়াতে এমন কোনও পুরুষ নাই যে প্রিয়ার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস না করিয়াছে! এমন কোনও নারী নাই যে প্রিয়কে মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়াছে।'

বুদ্বুদ এ মদ্যপের উপর রাগ করিতে পারিল না, হাসিয়া বলিল, —'একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম হিমাচল, কারণ তুমি কাহাকেও ভালবাস নাই।'

—'সে কথা সত্য, আমি শুধু ভালবাসি আমার রঙিন পেয়ালাকে।' আবার একপাত্র উগ্র পানীয়।

বুদ্বুদ প্রসঙ্গান্তরে আসিবার আগ্রহে বলিল,—'ও কথা যাক্, তাহার পর আর কি খবর বল? উদয়াচল, বিন্ধ্যাচল কোথায়?' হিমাচল সে কথায় কর্ণপাতও করিল না;—'তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিলে না? বেশ তাহা হইলে তোমাকে একটা প্রেমের গল্প বলি শোন।'

—'বলো, আশা করি ইহা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা নহে।'

—'ঘটনা যাহার জীবনেই ঘটুক ইহার একবর্ণ মিথ্যা নহে।'

বুদ্বুদ করলগ্নকপোলে সাগ্রহে হিমাচলের প্রেমকাহিনী শুনিতে লাগিল। ভৃঙ্গারের শেষ কয়েক বিন্দু নিঃশেষ করিয়া হিমাচল শুরু করিল—'কোনও এক দেশের রাজা—মনে রাখিও বন্ধু, আমি নহে, এ একেবারে খান্‌দানী রাজবংশের গল্প—হ্যাঁ, রাজা মাত্র বিশ বৎসর বয়সে একটি সুন্দরীর প্রেমে পড়িলেন। ঘটনা রাজপুতানার নহে —দাক্ষিণাত্যের। রাজা একদল পারসিক দাসব্যবসায়ীর কবলে মেয়েটির প্রথম সাক্ষাৎ পান, তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ মাত্র। কালিকটের সমুদ্রতীরে একহাজার দাস আমদানি হইয়াছে এবং একজন পারসিক দাসব্যবসায়ী ঐ মেয়েটিকে একজন যবনের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। মেয়েটি জাতে ইহুদি—অত্যন্ত সুন্দরী—সে কিছুতেই ঐ যবনের সহিত যাইবে না। যবন বালিকাটিকে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাড়না করিতেছিল। আর স্ত্রীলোকটি সকাতরে অনুনয় বিনয় করিতেছিল। রাজা দেখিলেন, সমুদ্রতটের বেলাভূমিতে একদল দর্শক লুব্ধ দৃষ্টিতে এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। ভূলুণ্ঠিত বালিকার অসংবৃত বেশবাসের ভিতর হইতে নবোদ্ভিন্ন যৌবন প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুরাজার আপাদমস্তক জ্বালিয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া যবনের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। যবন অপমানিত বোধ করিল এবং তরবারি নিষ্কাশিত করিল। রাজাও নিরস্ত্র ছিলেন না; কিন্তু অনিবার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরে পারসিক বণিক সহসা মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল। রাজা স্ত্রীলোকটির মূল্য যবনকে প্রদান করিলেন এবং যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া স্থানত্যাগ করিলেন।'

বুদ্বুদ সখেদে কহিল,—'এমন দ্বন্দ্বযুদ্ধটা অনুষ্ঠিত হইল না? জয়-পরাজয় অমীমাংসিত রহিয়া গেল?'

—'তা গেল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি প্রেমের দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ে একই ফল। রাজা ললনাকে পাইলেন, ছলনা হইতেও বঞ্চিত হইলেন না। রাজা পূর্বেই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই অনাথা

বালিকাকে লইয়া তিনি কী করিবেন? কুমারী সদ্যোজাত অনাঘ্রাত কুসুমের মতই অপাপবিদ্ধা। বস্তুত তাহার সৌন্দর্যে ও মিষ্ট ব্যবহারে রাজা বিলক্ষণ বিচলিত। রাজপুরীতে ফিরিয়া তিনি মহিষীকে নিজ চিত্তচাঞ্চল্য ভিন্ন সকল কথাই বলিলেন। রাণী কিন্তু নিজেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া নবাগতাকে সপত্নীপদে বরণ করিয়া লইলেন। নবাগতা যে দাস একথা রাজ্যে গোপন রহিল। নববধূকে লইয়া রাজা একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। হৃদয়ের—কী যেন বল তুমি—হ্যাঁ কোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসাই তাহাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। সুখেই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ ভগবান বাধ সাধিলেন। সেই যবন একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, বালিকা তাহার বিবাহিত বধূ—তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন,—'সে কি? তুমি তো উহাকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ? ও তো দাস, তোমার বধূ হইল কি প্রকারে?'

যবন বলিল,—'আপনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি সত্য বলিতেছি কি না।'

রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া নববধূকে একথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বালিকা স্বীকার করিল।

রাজা বলিলেন,—'তাহা হইলে আমার সহিত বিবাহের সময় সে কথা বল নাই কেন?'

বালিকা রাজার চরণযুগল চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'ওই যবন যে আবার কোনদিন ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তখন আপনার প্রেমে অন্ধ হইয়াছিলাম। যবন আমাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিল বটে তবে আমাকে ভোগ করিবার অবকাশ পায় নাই।'

প্রেম মানুষকে এমন আহাম্মক করিয়া দেয় যে, একথার পরেও রাজা বালিকাকে ক্ষমা করিলেন। যবনকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। রাজা যে একজন সধবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন একথা গোপন রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যবন চলিয়া গেল।

এবং অল্পদিন পরেই ফিরিয়া আসিল।

রাজা বলিলেন,—'তুমি যে আবার আসিয়াছ?'

—'কী করিব? আমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিন—আমি দেশে চলিয়া যাই—এখানে আমার রোজগার নাই।'

রাজা তাহাকে পুনরায় অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। ক্রমে যবনের যাতায়াত যেন একটা নিয়মে রূপায়িত হইল। প্রেমে রাজা অন্ধ, তিনি উপায়ান্তরহীন। এইভাবে দিন চলিতেছিল। সহসা একটি ঘটনায় রাজার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। ছোটরাণীর শয়নকক্ষে একটি রত্ন-মঞ্জুষার ভিতর হইতে রাজা একখানি পত্র পাইলেন। দীর্ঘদিন পূর্বে পত্রখানি যবনের নিকট হইতে আসিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া রাজা নিঃসংশয়ে বুঝিলেন ছোটরাণী বস্তুত যবনের পত্নী নহে, উপপত্নী। এইভাবে দুইজনে ইতিপূর্বেও কৌশল করিয়া অন্য কয়েকজনকেও প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ মেয়েটি ইতিপূর্বেই চার পাঁচজনের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে—যবনের তো বটেই।

ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটি সংবাদ পাইয়াছিল যে, রাজা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। রাজা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিনদিন বনমধ্যে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন—এবং প্রতারণার অপরাধে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করেন।'

বুদ্বুদ কহিল,—'কী কালসর্পকেই আশ্রয় দিয়াছিলেন রাজা।'

হিমাচল বলিল—'বন্ধু, আমার গল্পের আসল কথাই এখনও বলা হয় নাই।'

তিন দিবস অন্তে রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা দেখিলেন—তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডাকাতদল রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজভাণ্ডার লুণ্ঠিত। বড়রাণী হত। রাজা সংবাদ পাইলেন, যবন আসলে দস্যুসর্দার; তাহার উপপত্নীকে এইভাবে দুর্গে পাঠাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে ইতিপূর্বে আরও কয়েক স্থলে দস্যুবৃত্তি সাধিত করিয়াছে। তাই তো বলিতেছিলাম বন্ধু, ও ললনা-ছলনার জঞ্জাল আমার বরাতে জোটে নাই, আমিই ভাগ্যবান।'

নীরন্ধ্র অন্ধকার কক্ষে হয়তো আপনি একা বসিয়া আছেন—আপনার চতুর্দিকে মসীকৃষ্ণ ঘনান্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই সময়ে যদি ধীর পদক্ষেপে কোনও বিপদ আপনার নিকট আগাইয়া আসে তবে ইন্দ্রিয়াতীত কোন সংস্কারবশে আপনি তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। আপনি যেন কোন অস্বস্তি বোধ করিবেন। যুক্তি দিয়া না বুঝিলেও বাতাস কেমন ভারি ঠেকিবে—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মারফত আপনি অহেতুক সতর্ক হইয়া উঠিবেন।

বুদ্বুদেরও তাহাই হইতেছিল।

কে বা কাহারা যেন তাহার চতুর্দিকে একটি অদৃশ্য জালিকা বিস্তার করিয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্তেই যেন মনে হয়, কে যেন অলক্ষ্যে তাহার উপর নজর রাখিতেছে—তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে। চিতোরে বুদ্বুদের কোনও শত্রু নাই—সুতরাং এখানে তাহার ভয় করিয়া চলিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বস্তুত যদিও সে রানার সৈন্যদলে সামান্য সৈনিক তবুও তাহার অসিচালনদক্ষতার কথা সকলেই জানে। সহসা কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিবে না। নিজেকে তাই সে নিজেই প্রবোধ দেয়—এখানে কে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। রানার দুর্গরক্ষীদের সহিত সে আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সুবিধা হয় নাই। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পারিলেও অন্তঃপুরের কোন নিভৃত কক্ষে তিলাঞ্জলি থাকে তাহা জানা নাই—সে কী করিয়া সংবাদ দিবে? দুর্গপ্রাকারের বাহিরে বাহিরেই বেচারী ঊর্ধ্বমুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঞ্ছিত কমলাননটি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সেদিন অপরাহ্নে ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্বুদ সেই মদিরাভবনে গিয়া উঠিল। এখানে ওখানে কয়েকজন পানবিলাসী জটলা করিতেছে। বন্ধুত্রয়ের কেহই তখনও আসে নাই। এক পাত্র ফলাম্ররস লইয়া পানে কালাতিপাত করিতে লাগিল। আসবাগারে কয়েকজন পৌরবাসী তুমুলকণ্ঠে কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। বুদ্বুদ উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া শুনিল আলোচনা সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে। নগরে সম্প্রতি দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত মুসলমান বাঈজী আসিয়াছে। পূর্বরাত্রে রানা অমাত্যবন্ধুদের লইয়া তাহার কণ্ঠসংগীত শুনিয়া তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছেন। গায়িকার সংগীত নিপুণতাই তার্কিকদের বিচার্য বিষয়। এক পক্ষের মতে ইহার কণ্ঠসংগীত স্থানীয় কুহুনাম্নী অপর একজন পেশাদার গায়িকা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অপরপক্ষ—কিছুতেই মানিবে না। বুদ্বুদ উহাদের কথাবার্তায় বুঝিল উহারা কেহই নবাগতার সংগীত স্বকর্ণে শোনে নাই—বস্তুত রানার সংগীতাসরে ইহাদের উপস্থিতি সম্ভব নহে। বুদ্বুদ নিজে এই ললিতকলা বিষয়ে কিছুই বুঝিত না, কিন্তু উহাদের তর্কটি সে শুনিতেছিল।

সহসা উহাদের একজন তাহাকেই সালিস মানিয়া বসিল।

বুদ্বুদ দেখিল চারিজোড়া চক্ষু তাহার দিকে একাগ্রভাবে চাহিয়া আছে। বেচারী নবাগতা বাঈজীর কথা জানিত না—কুহুর নামও জীবনে প্রথম শুনিল। তবু কৌতুকপ্রিয় বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে কহিল, আমার মতে নবাগতা বাঈজীর সংগীতশাস্ত্র অধিকার সম্ভবত কুহুর অপেক্ষা অধিক কিন্তু কণ্ঠস্বর বোধহয় কুহুরই মিষ্টতর!

ওপাশ হইতে একজন এ'কথায় একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—'আমিও ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। আপনি নিশ্চয় সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; আপনার সঙ্গ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না।'

বুদ্বুদ দেখিল বক্তার বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর বণিক বলিয়া বোধ হয়। পোশাক পরিচ্ছদ মূল্যবান—মস্তকে দর্পণ-সদৃশ ইন্দ্রলুপ্ত!

বাঈজী নাকি আজ চিতোরের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদ বেনিয়ার গৃহে মুজ্‌রা লইয়াছে। ইঁহারা সেই স্থলেই যাইতেছিলেন—সাদা চক্ষুতে বাঈজীর রূপ হয়তো ঠিকমতো ধরা দিবে না, তাই আসবাগারে রঙিন চশমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। বুদ্বুদের কোনও ওজর আপত্তি টিকিল না। নিমন্ত্রণ নাই বলিয়া আপত্তি করায় ভদ্রলোক কহিলেন,—'আমার সবান্ধব নিমন্ত্রণ আছে!' শ্রেষ্ঠী নিজের পরিচয় দিলেন—'মতিচাঁদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আমার নাম ইন্দ্রগুপ্ত, যদিচ বয়স্যেরা আমাকে 'ইন্দ্রলুপ্ত' বলিয়াই ডাকে। আপনাকে যাইতেই হইবে!'

ইহার পর আর আপত্তি করা শোভা পায় না। সদলবলে উহারা শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদের গৃহাভিমুখে

চলিল। বুদ্বুদ জানিত সংগীতের আসরে যাইবার পূর্বে কিছু বেশভূষা করার প্রয়োজন; কিছু আতর কিছু সুগন্ধি। বেচারীর তিনদিন ক্ষৌরকার্য করা হয় নাই।

শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদ তদানীন্তন চিতোরের শ্রেষ্ঠ ধনিক। এক পুরুষের ধনবত্তা, সুতরাং তাহার বাহ্যাড়ম্বরও অল্প নহে। বিশাল প্রাসাদোপম গৃহ, পাষাণনির্মিত নাট্যমন্দির। দেওয়াল-গাত্রে সারি সারি চিত্রাবলী। বিষয়বস্তু যদিচ রামায়ণ মহাভারত হইতে সংগৃহীত তবু ইহার ভিতরেই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বিবস্ত্রা দময়ন্তীর বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন, কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ, রাবণ কর্তৃক স্খলিতবসনা সীতাহরণ!

আসরে তিলধারণের স্থান নাই। গৃহস্বামী-নিযুক্ত পরিচারক কিন্তু সবান্ধব ইন্দ্রগুপ্তকে আসরের একেবারে সম্মুখভাগে লইয়া গিয়া বসাইল। বুদ্বুদ এরূপ আসরে ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই; বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সে চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিল। দীপাধারে দীপাধারে প্রোজ্জ্বল দীপাবলী, ধূপদান হইতে অগুরু চন্দনের ধূমায়িত সৌগন্ধ, রৌপ্যনির্মিত গোলাপদান হইতে কিঙ্করগণ মুহুর্মুহু আতরশীকর বর্ষণ করিতেছে—সমস্তই যেন স্বপ্নরাজ্য! সভাস্থলের ঠিক মধ্যভাগে শ্যামশষ্পলাঞ্ছিত কামদার গালিচায় নবাগতা বাঈজী গান গাহিতেছে। কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি আসরের পুরোভাগে অর্ধনিমীলিত নেত্রে অর্ধশয়নে সংগীতসুধা পান করিতেছেন; হাতে হাতে আলবোলা, তামাকু, পান-পুগ-মসল্লার থালিকা ও বিভিন্ন পানীয় ফিরিতেছে। বামদিকে একটি সূক্ষ্ম যবনিকা—মহিলাদিগের পৃথক আসন।

বুদ্বুদ কিছুই না বুঝিয়া তালে তালে সমজদারের মতো মাথা নাড়িতে লাগিল। অভ্যাসবশে গুম্ফে হস্ত দিয়াই মনে পড়িল সুকোমল গুম্ফরাজির পরিবর্তে সেস্থলে অল্প কিছু দিনের সদ্যোজাত শিশুর দল কণ্টকগুল্মের মতো মাথা চাড়া দিয়া রহিয়াছে মাত্র।

বাঈজী গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাল কাটিয়া থামিল। বুদ্বুদ মুদিতনেত্র খুলিয়া দেখিল বাঈজী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। একী! ইহাকে যে সেও পূর্বে কোথাও দেখিয়াছে! কোথায়? কোথায়! স্মৃতির সরণী বাহিয়া ক্রমে তাহার মনে পড়িল—পান্থশালায় পল্যঙ্কিকার ভিতর যে মোহিনীমূর্তি একদিন সে দেখিয়াছিল এ বাঈজী সেই! তেমনিই মদমদিরাক্ষী, তেমনই ভ্রূভঙ্গি, দক্ষিণ চিবুকের উপর সেই কিণ-চিহ্ন! আসরের মৃদু গুঞ্জন উপেক্ষা করিয়া যেন তাহাকেই বিশেষ করিয়া শুনাইতে—তাহারই দিকে পদ্মকোরকতুল্য হাতখানি বাড়াইয়া বাঈজী পুনরায় গান শুরু করিল।

বুদ্বুদ আত্মহারা হইয়া গান শুনিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। সহসা কে যেন তাহার কানে কানে কী বলিল। বুদ্বুদ ফিরিয়া দেখে একজন রক্ষী অথবা কিঙ্কর—'বাহিরে আপনাকে ডাকিতেছেন।'

কে, কেন, কোথায় ডাকিতেছেন তাহা জানা হইল না—মোহাবিষ্টের মতো ধীরপদে বুদ্বুদ আসর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বাঈজীর আবার বোধ হয় তাল কাটিল—পিছনে মৃদু গুঞ্জন উঠিল। জনসমুদ্র মন্থন করিয়া একটি প্রশস্ত চত্বর পার হইয়া এক নির্জন অলিন্দে আসিয়া থামিল। রক্ষী তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে গেল। এ সে কোথায় আসিয়াছে? রক্ষীকে কোনও প্রশ্ন করিবার অবকাশ হয় নাই। ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছে, সহসা দেখিল সম্মুখের কক্ষ হইতে যবনিকা উত্তোলন করিয়া একটি রমণীমূর্তি বাহির হইয়া আসিল।

তিলাঞ্জলি!

বিস্মিত বুদ্বুদ ছুটিয়া গিয়া তাহার করপদ্ম নিজ করে গ্রহণ করিল।

কিশোরী বাধা দিল না, কহিল, 'আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। এস্থলে এক্ষণি কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। আপনি কল্য রাত্রি দুইদণ্ড পরে আমার সহিত দুর্গমধ্যে সাক্ষাৎ করিবেন। দুর্গের পশ্চিমদ্বারে ঐ সময় একজন রক্ষী থাকিবে—তাহার নাম স্বয়ম্ভু। তাহাকে এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইলেই সে আপনাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।'

বুদ্বুদের বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। অপ্রশস্ত নির্জন অলিন্দে স্বপনচারিণীর মতো তিলাঞ্জলির আবির্ভাবে সে যেন বজ্রাহত হইয়া গিয়াছে। কিশোরী ধীরকণ্ঠে কহিল,—'হাত ছাড়ুন—এখানে এক্ষণি কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনেকেই আমাকে চিনে। আপনার বিপদ হইতে পারে।'

বুদ্বুদ কহিল,—'হাত ছাড়িতেছি; কিন্তু সত্য করিয়া বল, সেদিন যুবরাজকে তুমি যাহা বলিয়াছিলে সে কি নিছক আমার প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করুণা করিয়া; অথবা—'

বুদ্বুদের করতল হইতে নিজ মুঠি বাহির করিয়া নিয়া অপরূপ লাজরহস্যহাসি হাসিয়া রমণী কহিল,—'কাল এ প্রশ্নের জবাব দিব, আজ নহে।'

তিলাঞ্জলি ত্বরিতে ফিরিল,—কয়েকপদ গিয়া পুনরায় কহিল,—'এই পথে আপনি ফিরিয়া যান—চত্বর পার হইলে ডাহিনে ফিরিবেন।'

অন্যমনস্ক বুদ্বুদ ধীরপদে আসরের দিকে ফিরিতেছিল; দক্ষিণ বাম তখন তাহার খেয়াল থাকিবার কথা নহে। কয়েকপদ চলিতেই দেখিল অলিন্দের পার্শ্বস্থিত রৌপ্যদণ্ডে রক্ষিত দীপাধারের বাতি কে যেন ফুৎকারে নিভাইয়া দিল। চকিতে বুদ্বুদের দক্ষিণ কর অভ্যাসবশে তরবারির মুঠের দিকে ছুটিল—কিন্তু তাহা টানিয়া বাহির করিবার পূর্বেই কে যেন অন্ধকারের মধ্যে তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল! বুদ্বুদও আক্রমণকারীকে সবলে ভূপতিত করিতে যাইবে—কিন্তু তাহার হাত উঠিল না। সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল—বিনাশ্রমেই যেন তাহার সর্বাঙ্গ শ্রমজলে ভাসিয়া গেল। আততায়ী পুরুষ নহে। আক্রমণকারী তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না—প্রেমালিঙ্গন করিতেছে মাত্র! বুদ্বুদ কিছু বলিবার পূর্বেই মৃণাল ভুজের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া গেল—এবং দ্রুতচ্ছন্দ নূপুর নিক্কণ দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল।

সংবিৎ ফিরিয়া পাইতে বুদ্বুদের কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক। ক্রমে ঘনান্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে অলিন্দ এবং চত্বর পার হইয়া সভাকক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিল। সভাগৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে, দেখিল পার্শ্বে একটি স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া বাঈজী দাঁড়াইয়া আছে। হয়তো একটানা সংগীতের পরিশ্রমেই তাহার এই শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা। বুদ্বুদকে দেখিয়া বাঈজী কুর্নিশ করিল। তবে কি—?

—'মেহেরবান আমার সংগীতের তারিফ করিতেছিলেন দেখিলাম। আশা করি হুজুরের ভাল লাগিয়াছে!'

বুদ্বুদ চটুল হাস্য করিয়া কহিল,—'শুধু যে সংগীতই ভালো লাগিয়াছে তাহা বলি না। সংগীত তো সকলের ভোগ্য—আমি যেন সাধারণের নাগালের অতীত কিছু পাইলাম বোধ হইতেছে।'

কথাটা দ্ব্যর্থবোধক—বাঈজীও তাই কহিল,—'গান শুনিতে অনেকেই আসে—প্রকৃত সমজদার পাই কোথায়! গুণিজন যদি সাধারণ লভ্যের অতীত কিছু পায়, তবে সে নিজগুণেই পায়। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।'

বাঈজীর বাক্‌পটুতায় বুদ্বুদ খুশী হইল, কহিল,—'কিন্তু এমনই আমার দুর্ভাগ্য যে, এত আনন্দ পাইয়াও তোমাকে কোন পুরস্কার দিতে পারিলাম না—আমি আজ প্রস্তুত হইয়া আসি নাই।'

—'সে তো হুজুরের পোশাক দেখিয়াই বুঝিতেছি। সংগীতের আসরে আসিবার পূর্বে সমরসাজটা বদলাইয়া আসিবার সময়ও পান নাই।'

বুদ্বুদ ভাবিতেছিল রাজপুত যোদ্ধার পরিচয় এই বাঈজীর নিকট পাওয়া যাইতে পারে। তাই কহিল, 'সে কথা সত্য! তাই তো বলিতেছিলাম—তোমাকে দিবার মতো কিছুই আনি নাই।'

—'হুজুর মেহেরবান—অবশ্য হাত ঝাড়িলেই আপনাদের কত সোনাদানা পড়ে। জনাবের হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ই হয়তো আমার মতো কত শত সুন্দরীকে কিনিতে পারে!'

অঙ্গুরীয়? সত্যই তাহার অনামিকায়, সদ্যোলব্ধ একটি হীরকখচিত অঙ্গুরীয় আছে বটে। তিলাঞ্জলির প্রথম উপহার। বুদ্বুদ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কী যেন জবাব দিতে যাইবে তৎপূর্বেই বাঈজী চটুল হাস্য করিয়া কহিল,—'না না আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না। ও অঙ্গুরীয়ের প্রতি আমি লোভ করি নাই। জানি, কোন রাজপুতানীর স্মৃতিচিহ্নর দাম হীরকমূল্যে নির্ধারণ করা যায় না। বস্তুত অঙ্গুরীয়ের কী মূল্য, যদি পিছনের অনুরাগটুকু না মিলে?'

বাঈজীর প্রগল্‌ভতায় বুদ্বুদ সাহসী হয়—'অঙ্গুরীয়তে যদি তোমার বাসনা না থাকে—অনুরাগেই যদি তোমার এত ঈপ্সা—তাহা তো লইলেই পার—গ্রহণের অপেক্ষা মাত্র।'

বাঈজী আভূমি কুর্নিশ করিয়া কহিল,—'আসরে সকলে আমার অপেক্ষা করিতেছে, হুজুর ইচ্ছা করিলে কল্য রাত্রি একদণ্ড পরে অধমের গরিবখানায় আসিতে পারেন। অঙ্গুরীয় রাখিয়া শুধু অনুরাগই আনিবেন। দাসীর নাম—শতভিষা—নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে আমার কুটীর।'

গৃহে ফিরিবার পথে বুদ্বুদ মনে মনে বলিতেছিল,—'শুধু সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্যই আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার প্রগাঢ় প্রেমকে আমি অবমাননা করিতেছি না। সুধার পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া বিষভাণ্ডের দিকে ছুটিব এতবড় মূর্খ আমি নই তিলাঞ্জলি!'

নগরের দক্ষিণপ্রান্তে একটি সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বুদ্বুদ কামদার একটি পারস্যদেশীয় গালিচার উপর পক্ষ্মের নরম উপাধানে হেলান দিয়া বাঈজীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। রাত্রির প্রথম প্রহর। দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শতভিষা তাহারই আলোকে যেন শততৃষ্ণার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সাজসজ্জা কামোদ্দীপক; লুতজালসদৃশ সূক্ষ্ম কাজ করা চীনাংশুকের ভিতর দিয়া গজদন্তশুভ্র দেহের অনেকখানিই পরিদৃশ্যমান। অন্তর্বাসের বর্ণাঢ্য, রঙিন কঞ্চুলিকার বীচিভঙ্গ, সুর্মারেখাঙ্কিত নয়নের চঞ্চলতা, নীবিবন্ধের রত্নাভরণ কাঞ্চী—সমস্তই যেন অভিসারিকার বেশ—অথচ আশ্চর্যের কথা কল্য রজনীর সেই প্রগল্‌ভ বাঈজীর যেন কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। কথাবার্তায় ব্রীড়াবনতা, লজ্জাশীলা পঞ্চদশী কুলললনার একটা আড়ষ্টতা যেন তাহার উপর পাষাণভারের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। যদিচ বাঈজীর বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশতি বর্ষের কম নহে। বুদ্বুদ সতর্ক হইল। সে বুঝিল—এই বয়সে, এই বেশে, এই আমন্ত্রণ যে করিতে পারে তাহার পক্ষে এরূপ লজ্জা অস্বাভাবিক। শতভিষার অভিনয়ে বুদ্বুদ মুগ্ধ হইল বটে কিন্তু সতর্ক হইল চতুর্গুণ।

বুদ্বুদ বলিতেছিল,—'কালরাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। বলিতে পার ইহার অর্থ কী? দেখিলাম, তোমার সংগীতের আসর হইতে উঠিয়া নির্জন অলিন্দ দিয়া আসিতেছি—সহসা কে যেন ফুৎকারে অলিন্দের বাতিদানের আলো নির্বাপিত করিল। তাহার পর কে যেন আমার উপর সবলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।'

মধুর হাস্য করিয়া শতভিষা কহিল,—'ভাগ্যে ইহা স্বপ্ন। বাস্তবে কেহ আপনাকে এরূপ আক্রমণ করিলেই হইয়াছিল আর কি!'

বুদ্বুদ বলিল,—'বাস্তবে হইলেও আমার দুঃখ ছিল না।'

—'বলেন কি! কেন?'

—'কারণ আক্রমণকারী পুরুষ নহে—তাহার আলিঙ্গনের হেতু ভয়প্রদ নহে।'

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল শতভিষা। যেন সদ্যই একটি স্বপ্নাদ্য কাহিনী শুনিয়াছে।

—'তাহা হইলে ইহাকে সুখস্বপ্ন বলুন।'

—'তাহা আর কী করিয়া বলি? স্বপ্ন তো দর্শকের ইচ্ছাধীন নহে; ক্ষণিক সুখস্পর্শ দিয়া স্বপ্নের নায়িকা সেই যে মিলাইয়া গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও তো তাহার দর্শন আর পাইব না।'

শতভিষার সমস্ত মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে—নতশিরে অস্ফুটে কহিল,—'স্বপ্নকে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন কি? আপনার তো বাস্তবের অভাব নাই। স্বপ্ন-নায়িকার অভাব তিনিই পুরাইতে পারিবেন—'

—'তিনি কে?'

—'কাল যাহার অঙ্গুরীয় আপনার অনামিকায় দেখিয়াছিলাম।'

তারপর আরও অস্ফুটে একটি দীর্ঘশ্বাসের মতোই কহিল,—'অথচ স্বপ্নের সেই নায়িকা হয়তো শূন্য ঘরে বিরহযন্ত্রণায় ক্ষণিক উন্মাদনার লজ্জায় মরমে মরিতেছে! আমি নিশ্চয় জানি, মুহূর্তের বিহ্বলতায় সে যে আচরণ করিয়াছিল তাহার জন্য লজ্জায় আজ বেচারী মর্মাহতা!'

স্বপ্নের কল্পিত নায়িকার লজ্জা যেন অকারণেই শতভিষার মুখাবয়বে সঞ্চারিত হইল।

বুদ্বুদও নিম্নকণ্ঠে কহিল, 'তুমি ভুল করিতেছ শতভিষা! আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।'

—'চিনিতে পারিয়াছেন! ছি ছি!'

কনকচম্পকের ন্যায় দুইহাতে শতভিষা আপনার মুখ ঢাকিল। সমস্ত শরীরে তাহার লজ্জার এক শিহরণ বহিয়া গেল। ইহা যে অভিনয় তাহা আর বুদ্বুদের মনে রহিল না। সে দ্রুতগতিতে শতভিষার হাত দুইটি তাহার মুখ হইতে সরাইয়া আনিল। নিমীলিত নেত্রে আরক্ত বদনে শতভিষা গ্রীবাভঙ্গি করিল। হয়তো বুদ্বুদ এই অসতর্ক মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হইয়া কিছু একটা করিয়া বসিত, কিন্তু তদ্দণ্ডেই একজন দাসী একটি ভৃঙ্গার ও একটি শঙ্খধবল পানপাত্র আনিয়া ঘরে রাখিল। বুদ্বুদ চকিতে হাত ছাড়িয়া দেয়। উভয়েই যেন সংযত হয়। বুদ্বুদ হঠাৎ লক্ষ্য করিল, শতভিষা রোষকষায়িত লোচনে দাসীর দিকে চাহিল—যেন এই অসময়ে প্রবেশ করিয়া সে তাহার সমস্ত অভিনয়টি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বুদ্বুদ পুনরায় আত্মস্থ হইল। বলিল,—'আমি মদ্যপান করি না।'

তখন শতভিষার ইঙ্গিতে দাসী ফলাম্ররস, কিছু ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ একটি রৌপ্যপাত্র রাখিয়া গেল, কিন্তু শতভিষার নির্বন্ধাতিশয্যেও বুদ্বুদ কিছু খাইতে স্বীকৃত হইল না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে—'সকল খাদ্যেই ঔষধ মিশ্রিত আছে। খাইলেই সংজ্ঞা হারাইবে। শতভিষা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল, কহিল,—'অতিথি আসিয়া যদি কিছুই গ্রহণ না করেন তবে গৃহস্থকে অপমান করা হয়।'

—'কে বলিল কিছুই গ্রহণ করি নাই? তোমার অনুরাগ—'

—'অনুরাগ দিবার আর সাহস কোথায়? আপনি সামান্য মিষ্টান্নের এক কণিকাও গ্রহণ করিতেছেন না—'

শতভিষার সুর বদলাইয়াছে। যেন অত্যন্ত অভিমানাহত কণ্ঠ। বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে বলিল,—'কিছু মনে করিও না শতভিষা—আমি হিন্দু; তুমি—তুমি—'

—'মাপ করিবেন! আমার মনে ছিল না! হ্যাঁ, আমি অস্পৃশ্য যবন বালিকাই বটে।'

স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া শতভিষা বাহিরে গেল এবং সশব্দে দূরে নিক্ষেপ করিল। দ্বারের বাহিরেই যেন কে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহার সহিত শতভিষার উষ্ণ বাক্য বিনিময় হইল। বুদ্বুদ বুঝিয়াছিল—সুর কাটিয়াছে। এখন আর সেই অপরিচিত রাঠোর যুবকের সংবাদ পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আশ্চর্য—শতভিষা ফিরিয়া আসিল যেন অন্যমূর্তি। সহাস্যে বলিল,—'ভাগ্যে আপনার স্বপ্নের নায়িকা শুধু আলিঙ্গন করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিল।'

—'কেন?'

—'মুখচুম্বন করিলেই তো সর্বনাশ। কে জানে স্বপ্নের নায়িকার কী জাত!'

বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে কহিল,—'তা বটে। সে আমার জাত খোয়াইতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি—স্বপনচারিণী আমার পরিচিতা। তাহাকে বহুদিন পূর্বে একটি পান্থশালায় আমি দেখিয়াছিলাম। সেও যবনকন্যা।'

শতভিষাও গম্ভীর হইল। সে বুঝিল বুদ্বুদ তাহাকে চিনিয়াছে; সুতরাং এখন ধরা দেওয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ; তাই বলিল,—'আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন দেখিতেছি। বস্তুত সেই প্রথম দিন হইতেই আপনার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম—তাই আজ আপনাকে আমি আমন্ত্রণ করিয়াছি।'

—'আমিও তাই আহ্বানমাত্র তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি তোমার নিকট হইতে জানিতে চাই—কে সেই রাঠোর রাজপুত যে তোমার সহিত সে রাত্রে কথা বলিতেছিল—'

—'আপনি তাহাকে আর কখনও দেখেন নাই?'

—'দেখিয়াছি, কিন্তু পরিচয় পাই নাই। অর্বাচীনটার সহিত আমার একটা বোঝাপড়া বাকি আছে। তুমি তাহার সন্ধান আমাকে দাও।'

এই সময় দ্বারের অপরপার্শ্বে কিসের যেন একটা শব্দ উঠিল :— অস্ত্রের ঝন্ঝনা অথবা দাসীরা ধাতব পাত্র সরাইতেছে। কেহই ভ্রূক্ষেপ করিল না। শতভিষা বলিল,—'এ প্রশ্ন আপনি করিবেন না। আমি বলিতে পারিব না।'

—'কেন?'

—'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'এই না বলিতেছিলে তুমি আমার প্রেমে পড়িয়াছ? প্রেমাস্পদকে বিশ্বাস করিয়া এই সামান্য কথাটাও কি বলা যায় না?'

—'বলিব, তৎপূর্বে আপনি বলুন, আপনি আমাকে ভালবাসেন কিনা?'

বুদ্বুদ বুঝিল এইবার তাহাকেও চরম অভিনয় করিতে হইবে। শতভিষার হাত দুইটি গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে সুধা ঢালিয়া কহিল,—'সে কথা কি এখনও বোঝ নাই শতভিষা!'

—'তাহা হইলে তুমিও আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও। প্রতিযোগিতার পর রাত্রে তুমি মান্দোরের বৌদ্ধবিহারে যখন গিয়াছিলে তখন তোমার সহিত আর কে কে ছিল?'

বুদ্বুদ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। শতভিষা কি ঐন্দ্রজালিক? এই গোপনতম সংবাদ সে কেমন করিয়া জানিল? ধীরকণ্ঠে কহিল,—'মাপ করিও, সে কথা গোপন রাখিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'এই না বলিতেছিলে তুমি আমার প্রেমে পড়িয়াছ? প্রিয়াকে বিশ্বাস করিয়া কি এই সামান্য কথাটাও বলা যায় না?'

বুদ্বুদ সতর্ক ছিলই এইবার উঠিয়া পড়িল। ইহার পিছনে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আছে কিছু! কে এই রমণী? কেন সে ও কথা জানিতে চায়? সেই গোপন রাত্রির ঘটনায় তিনজন মাত্র সাক্ষী—এ সেকথা জানিল কীভাবে? সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত না ভাবিয়া কিছু করা উচিত হইবে না। বলিল,—'আমি একদিন সময় চাই। কল্য রাত্রে আমি পুনরায় আসিব। যদি মনস্থির করিতে পারি তবে সকল কথা বলিব ও শুনিব। আজ বিদায়!'

ব্যথাবিধুরকণ্ঠে শতভিষা কহিল,—'না হয় নাই বলিলে,—যাইবার প্রয়োজন কী?'

—'আমার একটা জরুরী কাজ বাকী আছে—'

—'কাল যাহার অঙ্গুরীয় দেখিয়াছিলাম তাঁহারই কাছে চলিলে বুঝি?'

চটুল হাস্য করিল শতভিষা।

বুদ্বুদও এক মর্মান্তিক চাল চালিল—দরদভরা কণ্ঠে কহিল,—'না! তাহার কথা ভুলিয়াছি। তুমি আমাকে সব ভুলাইয়াছ। আজ আমি অন্য লোক। এই দেখ আমার হস্তে সে অঙ্গুরীয়টি নাই।'

বস্তুত সত্যই বুদ্বুদ সাহস করিয়া অঙ্গুরীয়টি আজ পরিয়া আসে নাই। কি জানি শতভিষা যদি চাহিয়া বসে! তাই সে অঙ্গুরীয়টি আংরাখার ভিতর লইয়া বাহির হইয়াছিল।

একরাত্রের এরূপ সাফল্যে শতভিষাও আন্তরিক উৎফুল্ল হইল। বলিল,—'তাহা যদি সত্য হয়—আমারই জন্য যদি তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাক তবে ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার দায়িত্ব আমারই।'

মোহিনী হাস্যের চটুলভঙ্গিতে শতভিষা যেন বুদ্বুদকে একেবারে বধ করিল। নিজ চম্পক অঙ্গুলি হইতে নীলাখচিত অঙ্গুরীয় লইয়া ধীরে ধীরে বুদ্বুদের আঙুলে পরাইয়া দিল।

তাহার পর—'সায়াহ্নের পৃথিবী যেমন অস্তরবি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলিয়া ধরে, তেমনই নীরবে, তেমনই শান্ত দীপ্তিতে'...শতভিষা আপন অনিন্দ্যকান্তি পদ্মাননখানি বুদ্বুদের দিকে তুলিয়া ধরিল।

বুদ্বুদ কিন্তু তখন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। একবারও পিছনে চাহিল না,—চাহিলে দেখিতে পাইত শাবকহীন ব্যাঘ্রীর মত শতভিষার দুই জ্বলন্ত চক্ষু হইতে তাহার পৃষ্ঠে উল্কাপাত হইতেছে।

দ্রুতপদে বুদ্বুদ দুর্গপ্রাকারের নিম্নে গিয়া থামিল। মেবার রাজ্যের পক্ষ হইতে সে একটি অশ্ব পাইয়াছে; কিন্তু অদ্য রাত্রের নৈশ অভিসারে সে পদব্রজেই বাহির হইয়াছে। চিতোর দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের চতুর্দিকে পাষাণ প্রাচীর। তাহার চতুর্দিকে পরিখা। চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাকার—অনায়াসে অশ্বচালনা করা চলে—এতই প্রশস্ত। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পরে রানা লখা দুর্গপ্রাকার পুনরায় সংস্কার করাইয়াছেন। শতাব্দী পূর্বের যুদ্ধের চিহ্ন কোথাও কোথাও রহিয়াছে মাত্র। বুদ্বুদ দুর্গের পশ্চিমদ্বারে উপনীত হইল। দুর্গের উপর হইতে কে তাহাকে বজ্রনির্ঘোষে থামিতে বলিল। বুদ্বুদ থামিল, দেখিল ইন্দ্রকোষের ভিতর হইতে কয়েকজন তীরন্দাজ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। রাজ্যে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ

নাই, তাহা সত্ত্বেও দুর্গের প্রহরীরা নিয়মতান্ত্রিক সতর্কতা অবলম্বন করে। বুদ্বুদ বলিল, দ্বাররক্ষী স্বয়ম্ভুর সহিত তাহার প্রয়োজন আছে। তখন দুর্গদ্বারের নিম্নে ছোট্ট একটি দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন রাজপুত বাহির হইয়া আসিল।

—'আমারই নাম স্বয়ম্ভু, আপনি কী চাহেন?'

বুদ্বুদ আংরাখার ভিতর হইতে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দেখাইল। রক্ষীর সম্ভবত পূর্ব নির্দেশ ছিল, সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার হাত ধরিয়া দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে খানিকটা প্রশস্ত স্থান, তৃণাচ্ছাদিত শাদ্বল, তাহার পিছনে আর একটি তোরণ। এটি অতিক্রম করিয়া তাহারা একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল। সম্মুখেই রানার মন্ত্রণাসভা, দক্ষিণে কোষাগার, বামে অস্ত্রাগার। রক্ষী তাহার হাত ধরিয়া বিসর্পিল পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া হর্ম্যতলে উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারে অপেক্ষমান পাহারাদার, রক্ষী পুরুষ নহে রমণী। তাহাকে জনান্তিকে কী বলিয়া স্বয়ম্ভু বুদ্বুদকে লইয়া হর্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিল। একটি অপ্রশস্ত সোপান বাহিয়া উহারা উপরে উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ উঠিয়া একটা ফাঁকা অলিন্দের মতো স্থানে বুদ্বুদকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ম্ভু অদৃশ্য হইয়া গেল।

বুদ্বুদ দেখিল সে একটি মিনারের প্রায় চূড়ায় উঠিয়াছে। তখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে চিতোরের হর্ম্যরাজি চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান। অল্পক্ষণ পরে স্বল্পালোকিত সোপান বাহিয়া তিলাঞ্জলি উপরে উঠিল। দুজনেই নীরবে অলিন্দে দাঁড়াইল। বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির ভীরু কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বলিল,—'আমাকে কেন ডাকিলে?'

—'বলিতেছি, কিন্তু আপনাকে এখানে এভাবে আহ্বান করায় আপনি কিছু মনে করেন নাই তো?'

—'সেইটাই তো আমার প্রশ্ন তিলাঞ্জলি। এভাবে আমাকে আমন্ত্রণ করার একটি মাত্র অর্থ হয়, তাহাই মনে করিয়াছি।'

তিলাঞ্জলি অধোবদন হইল।

—'আমি কি এতই নির্লজ্জ বলিয়া মনে হয় আপনার?'

—'প্রেম কি নির্লজ্জ নয়?'

তিলাঞ্জলি ইতস্তত করিল; পরে বলিল,—'মনে থাকিতে পারে, আমি আপনাকে কাল ডাকিয়াছিলাম একটি বিশেষ প্রয়োজনে। আমি নির্লজ্জের মতো ওজন্য আপনাকে ডাকি নাই।'

বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির হাত ছাড়িয়া দিল। তিলাঞ্জলি নিঃসংশয়ে ব্যথিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। বুদ্বুদ বলিল,—'আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিও। বেশ বলো, তোমার কী প্রয়োজনীয় কথা।'

—'আপনি দুঃখ পাইয়াছেন।'

—'যদি পাইয়াই থাকি—তাহার জন্য তোমার দোষ নাই। বলো তোমার জন্য কী করিতে পারি।'

—'আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী। যে কার্যে আপনার সাহায্য চাহিতেছি তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা—কিন্তু অপর কাহারও নিকট সে গোপনীয় কথা বলিতে পারি না।'

তিলাঞ্জলি থামিল।

—'বল, থামিলে কেন?'

—'আপনি শুধু আমার অনুরোধমাত্র এই বিপদ বরণ করিবেন—কেন করিবেন—কাহার স্বার্থে করিবেন জানিতে চাহিবেন না?'

—'না!'

—'প্রতিদানে?'

—'প্রতিদানের প্রশ্নই উঠে না!'

—'আপনার ইহাতে কি স্বার্থ?'

—'আমার স্বার্থ যদি এখনও না বুঝিয়া থাক, তবে আর বুঝাইয়া কাজ নাই। বল তোমার বক্তব্য।'

তিলাঞ্জলি তখন বুদ্বুদকে জানাইল—মধুশ্রীর সহিত চণ্ডদেবের সাক্ষাৎ-কাহিনী। যুবরাজ যে মারবারে কেন গিয়াছিলেন তাহা তিনি কাহাকেও জানান নাই—এমন কি হিমাচল পর্যন্ত এ গোপন সংবাদ জানিত না। সে শুধু জানিত—যুবরাজের কোনও গোপন কার্য উদ্ধার করিতে তিলাঞ্জলি ও

আয়ীমাতা মান্দোরে গিয়াছিলেন। অবশ্য হিমাচল যখন মান্দোর হইতে ফিরিতেছিল তখন পথিমধ্যে তাহার সহিত যুবরাজের সাক্ষাৎ হয়—এবং যুবরাজ তখনই হিমাচলের পত্র সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশে প্রতিযোগিতার আসরে উপস্থিত হন। মধুশ্রীর সহিত সাক্ষাতের পর একপক্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এখনও মান্দোর হইতে কোনও সংবাদ আসে নাই। যুবরাজ চঞ্চল হইয়া আছেন। তাই তিলাঞ্জলি বুদ্বুদকে অনুরোধ করিতেছে। সে কি পুনরায় মান্দোরে গিয়া সেই বৌদ্ধচৈত্যের বৃদ্ধ শ্রমণের নিকট হইতে অধুনাতম সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে না?

পারে না? এখনই পারে? কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনাটা আবার কোথায়? প্রশ্নটা বুদ্বুদ না করিয়া পারিল না। শুনিয়া তিলাঞ্জলির পদ্মদলতুল্য নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—'বিপদ নাই? আপনাকে যদি কেহ চিনিয়া ফেলে? মান্দোরের না আপনি পলাতক আসামী?'

বুদ্বুদ হোহো করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিল,—'সে কথা মনে ছিল না বটে!'

এই দুঃসাহসিক বেপরোয়া হাসি দেখিয়া তিলাঞ্জলি শিহরিয়া উঠিল। তখন বুদ্বুদও ছদ্মগাম্ভীর্যে বলিল,—'হ্যাঁ, সেস্থলে আমার একাধিক শত্রু আছে। সাগরজী, মুঞ্জ, অঙ্গদেব আরও কয়েকজন। একবার ধরা পড়িলেই—'

তিলাঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলিল,—'তবে থাক, কাজ নাই!'

—'না, যাইব তো বটেই। বিপদকে আমি ভয় করি না! কিন্তু ইহাতে যখন আমার প্রাণহানির আশঙ্কা রহিয়াছে তখন তৎপূর্বে আমার সংশয় নিরসন করিতে চাই। হয়তো এ প্রশ্ন করিবার সুযোগ আমার আর নাও আসিতে পারে। বল তিলাঞ্জলি, সেদিন যে কথা তুমি যুবরাজকে বলিয়াছিলে সে কি আমার প্রাণরক্ষার্থেই শুধু?'

তিলাঞ্জলির কর্ণমূল পর্যন্ত উষাদেবীর রক্তরাগ! বুদ্বুদ এমন আবেগের সুরে কথা কয়টা বলিয়াছিল যে, সে সত্যই বিশ্বাস করিল হয়তো এই তাহাদের শেষ সাক্ষাৎ! তাই লজ্জানতমুখে কহিল—

—'তুমি বিশ্বাস কর নাই?'

—'না!—না, তিলাঞ্জলি আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই! আমি সামান্য আহেরিয়া তুমি রাজান্তঃপুরের পুরকামিনী—আমি মর্ত্যবাসী ঊষর মরুভূ, আর তুমি সুদুর গগনের সপ্তবর্ণা ইন্দ্রায়ুধ। তোমার আমার মধ্যে যে অসীম দূরত্ব তিলাঞ্জলি!'

তিলাঞ্জলি ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। তাহার মুখপঙ্কজে ক্ষীণচন্দ্রের রশ্মিজাল লোধ্ররেণুর মতো ছড়াইয়া পড়িল। তিলাঞ্জলি কহিল,—'তুমি জানো না, ইন্দ্রধনুর সার্থকতা তাহার বর্ণসম্ভারে নহে—ঊষর মরুভূমির উপর ধারাপতনে ঝরিয়া পড়িতেই তাহার জন্ম?'

বুদ্বুদের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল। বিকচিত পদ্মের মতো এই ঊর্ধ্বোন্মুখ মুখটি দেখিয়া একদণ্ড পূর্বের একটি দৃশ্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। একদণ্ড পূর্বেকার উদ্যত মেঘ যেন একদণ্ড পরে এখানে আসিয়া ঝড়িয়া পড়িল।

উভয়েই শিহরিয়া উঠিল!

রক্ষীর হাত ধরিয়া কখন দুর্গের বাহিরে আসিয়া পৌছিয়াছে বুদ্বুদ সে বিষয়ে সুচেতন নহে। প্রত্যাবর্তনের পথটুকু সম্ভবত সে হাঁটিয়াই ফিরিয়াছে—যদিও তাহার মনে হয় সে উড়িয়া আসিল।

পানশালার সেই অর্ধান্ধকার নির্জন কক্ষে মদের পেয়ালায় নিমজ্জিত হিমাচলের সাক্ষাৎ মিলিল। বিন্ধ্যাচল ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে। সেখানে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার আছে।

দেখাদেখি উদয়াচলও উপেন্দ্রবজ্রের নিকট ছুটির দরখাস্ত করিল। উদয়পুরে তাহার এক পিতৃষ্বসা নাকি মৃত্যুশয্যায়। রাজ্যে এখন সর্বত্র শান্তি—সুতরাং ছুটি মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। উদয়াচল আজই প্রত্যূষে অশ্বারোহণে উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করে। বন্ধুরা তাহার পিতৃষ্বসার অসুখের কথাটা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া ছদ্মক্রোধে সে যেন রাগ করিয়াই বিদায় লইল। উদয়পুর চিতোর হইতে সপ্তযোজন পথ। পার্বত্যপথে সাবধানে যাইতে হইলে অশ্বারোহীর সমস্ত দিন লাগিবার কথা, কিন্তু

উদয়াচলের ছুটি অল্প, আকর্ষণ অধিক। যাহার দেহে ক্ষমতা আছে, মনে আগ্রহ আছে, সে কেন এক দিবসের পথ অর্ধদিবসে অতিক্রম না করিবে? অপরাহ্নকালে উদয় উদয়পুরে পৌঁছিল, কিন্তু সে কোথাও থামিল না। তাহাকে আরও একযোজন পথ উত্তর-পশ্চিমে যাইতে হইবে—উন্তালা গ্রামে মেহরা সর্দারের গৃহে। কশাঘাতে অশ্বকে উচ্চকিত করিয়া উদয়পুরের রাজপথে ধুলা উড়াইয়া সে উন্তালাগ্রামের দিকে ছুটিয়া চলিল।

অর্ধদণ্ড পরে গ্রামের একটি কুটীরদ্বারে আসিয়া থামিল। গৃহের পার্শ্ববর্তী একটি মধুকবৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া দ্বারের দিকে ফিরিবে—সহসা পিছনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া উদয় ফিরিল। দেখিল অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হিমাচল তাহার দিকে আসিতেছে। উদয় বিস্ময়ে হতবাক্! হিমাচল সমস্ত দিনের পথ সমান বেগে তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে! সর্বাঙ্গে তাহার ধুলার প্রলেপ! অশ্বের মুখবিবর ফেনায়িত। উদয়াচল শুধু বলিল,—'তুমি!'

হিমাচল উষ্ণীষ খুলিয়া বন্ধুকে ছদ্ম অভিবাদন করিয়া বলিল,—'বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছি। তুমি রাগ করিয়া চলিয়া আসিলে তাই ভাবিলাম তোমার পিসিমাতা ঠাকুরাণীর সংবাদটা লইয়া আসি! অবাক হইও না ভাই;—এ শুধু কৌতূহল। আমি বয়সে তোমার অপেক্ষা অনেক বড়, আশীর্বাদ করি তোমার এ 'পিতৃষ্বসা-প্রেম' সার্থক হউক!'

হিমাচল ফিরিল; উদয় আসিয়া তাহার হাত ধরিল,—'কোথা যাও?'

—'এ কুটীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দুজনের অধিক তৃতীয় জনের এখানে স্থান নাই! আমাকে আমার আপন স্থানে ফিরিতে দাও!'

—'কোথায় তোমার আপন স্থান?'

—'চিতোরের ক্ষুদ্রতর পানশালার অর্ধান্ধকার ক্ষুদ্রতম কোণায়!'

বিমূঢ় উদয়াচল কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারে না। হিমাচল একলম্ফে অশ্বারোহণ করে। বিদ্যুদ্‌বেগে অশ্বের মুখ ঘুরিয়া যায়। ঘর্মাক্ত অশ্ব, স্বেদস্নাত সোওয়ার—কাহারও কোথাও আশ্রয় নাই। তাহাদের আজ রাত্রেই চিতোরে ফিরিতে হইবে। উদয় ভাবিতেছিল—এই একদিনের পথ আমি অর্ধদিবসে অতিক্রম করিলাম প্রেমের আকর্ষণে—আর ঐ হতভাগ্য সোওয়ার এই পথ আজ সারাদিনে দুইবার অতিক্রম করিল কিসের বিকর্ষণে। সে কি শুধুই কৌতূহল।

বুদ্বুদ এত কথা জানিত না। সে শুধু দেখিল, বৃহৎ এক ভৃঙ্গার লইয়া সেই চিরন্তন ভঙ্গিতে হিমাচল পোয়ালার পর পেয়ালা আসব পান করিয়া চলিয়াছে। তাহার উষ্ণীষের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে পথের ধূলি—চক্ষুর পক্ষ্মে, গুম্ফরাজিতে ধূলির প্রলেপ! বুদ্বুদকে অনাসক্ত ভঙ্গিতে পার্শ্বের আসন নির্দেশ করিল। বুদ্বুদের অনেক কথাই বলার ছিল। কাল দুইটি রমণীয় সহিত তাহার সাক্ষাত হইয়াছে। দুইজনের বিষয়েই অনেক কথা বলা চলে; কিন্তু দ্বিতীয় জনের বিষয়ে সে কিছুই বলিল না। পূর্বদিন নারী-প্রেম-কোমল হৃদয় প্রভৃতি বিষয়ে সে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা তাহাকে শুনিতে হইয়াছে তাহাতে ও প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। শুধু শতভিষার কথাই বলিয়া গেল। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া হিমাচল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বুদ্বুদ বলিল,—'হাসিলে যে?'

—'হাসিলাম? তা হাসিব না কেন? হাসির কথায় হাসাই তো স্বাভাবিক।'

—'এটা হাসির কথা?'

—'মাপ কর বন্ধু! প্রেমের গল্প এবং হাসির গল্পের পার্থক্যটা আমি আজও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না! আজ সকালে দেখিলাম উদয় উদয়পুরে যাত্রা করিল! শুনিয়াছ বোধহয় বন্ধুরা তাহার পিসিমাতার অসুখের সংবাদটা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া সে রাগ করিয়া গিয়াছে। আমারও কেমন রোখ চাপিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। তোমাকে কি বলিব বুদ্বুদ—আহম্মকটা সমস্ত রাস্তায় একবারও থামিল না—এমন কি উদয়পুরে মধ্যাহ্ন আহার পর্যন্ত করিল না! সোজা উন্তালা চলিয়া গেল! হা হা হা!'

—'ইহাতে হাসির কি আছে?'

—'নাই? প্রেম মানুষকে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলাইয়া দেয়। বুদ্ধিমানকে বুড়বাক্ করিয়া ছাড়ে! যতবার উদয় ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতেছিল ততবারই পিছন হইতে আমার মনে হইতেছিল যে, অদৃশ্য হাতে উন্তালাগ্রামের কোনও সোওয়ারনী উদয়ের পৃষ্ঠে চাবুক মারিতেছে! উদয় প্রতিবার চাবুক খায় আর অশ্বকে কশাঘাত করে। হা হা হা!'

বুদ্বুদ বুঝিল আজ সত্যই হিমাচল মাত্রা ছাড়াইয়াছে! বলিল, —'আজ তুমি কতপাত্র খাইয়াছ বলত?'

—'কেন? ও, তুমি ভাবিতেছ আমি মাতাল হইয়াছি? না বন্ধু! সমস্ত দিন অশ্বারোহণে ক্লান্ত বলিয়াই একটু বেশী সেবন করিয়াছি। মাতাল হই নাই।'

—'তাহা তো হও নাই! কিন্তু একটা কথা বলিতে পার? উদয় না হয় প্রেমের কশাঘাতে কোথাও না থামিয়া ছুটিয়াছিল, কিন্তু বন্ধু, তুমি কেন আহাম্মকের মতো সমস্ত দিন ছোটাছুটি করিলে? তোমাকে কে কশাঘাত করিতেছিল?'

হিমাচল যেন এইমাত্র কশাঘাত খাইয়াছে—সে চমকিয়া উঠিল। হস্তধৃত আসব তাহার আংরাখায় পড়িয়া গেল—সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। পরক্ষণেই অর্ধনিমীলিত নেত্রে শুইয়া পড়িল, বলিল,—'এ তুমি ঠিকই বলিয়াছ! আমার তো ও জঞ্জাল কোনদিন ছিল না, নাই, থাকিবে না! আমি কেন তবে আহাম্মকের মতো সারাদিন ছুটিয়া বেড়াইলাম?'

তাহার পাত্র শূন্য হইয়াছিল। পুনরায় একপাত্র মদ্য ক্রয় করিবার জন্য সে কামিজের বিভিন্ন অংশ খুঁজিল। কপর্দকমাত্রও যখন তাহার সর্বাঙ্গ তল্লাস করিয়াও পাওয়া গেল না তখন বলিল,—'তোমার কাছে কিছু আছে? আমার তো জেবের পকেট শূন্য। আমার এখনও তৃষ্ণা মিটে নাই।'

বুদ্বুদের কাছে কিছু অর্থ ছিল—কিন্তু হিমাচলের পক্ষে আর মদ্যপান করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া বুদ্বুদ মিথ্যা কথা বলিল।

তখন হিমাচল কহিল,—'তাহা হইলে তোমার গল্পের উপসংহারটুকু বল।'

—'উপসংহার আর কী? একদিন সময় লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। শতভিষা নিজ অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া আমার আঙুলে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল।'

—'বল কি? কিসের অঙ্গুরীয়?'

—'স্বর্ণধৃত নীলাঙ্গুরীয়!'

—'এতক্ষণ বল নাই! কই দেখি? সেইটি বন্ধক রাখিলেই তো ধারাস্নান করিবার মতো মদ্য জুটিবে।'

—'কিন্তু প্রেমের দান কি মদে উড়ানো উচিত?'

—'প্রেম? দাও দাও ওটা!'

বুদ্বুদ আর বাক্যব্যয় করিল না। অঙ্গুরীয় খুলিয়া হিমাচলের হস্তে অর্পণ করিল। হিমাচল সাগ্রহে সেইটি লইয়াই কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত করিল। অনেকক্ষণ নীলাঙ্গুরীয়ের দিকে চাহিয়া পুনরায় তাহা বুদ্বুদকে প্রত্যর্পণ করিল, বলিল,—'থাক। ইহাকে বিক্রয় করিয়া কাজ নাই।'

—'সেকি! কেন?'

—'ঠিক এইরূপ একটি অঙ্গুরীয় আমার মায়ের হস্তে ছিল—ওটি বিক্রয় করিয়া মদ্যপান করা উচিত নহে।'

বুদ্বুদ বলিল,—'এই রকম দেখিতে। এটি তো নহে। তাহা হইলে আর দোষ কী?'

—'জননীর আলেখ্যও তো জননী নহে—কিন্তু সেই আলেখ্য বিক্রয় করিয়া তুমি মদ্যপান করিতে পার?'

—'আমার জননী! তোমার যেমন প্রিয়ার জঞ্জাল নাই আমারও তেমনি জননীর জঞ্জাল নাই। তাঁহাকে আমি দেখি নাই—চিনি না।'

—'ছিঃ বুদ্বুদ। জননীকে তুমি দেখ নাই হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বকে তুমি অস্বীকার কর কী করিয়া? ঈশ্বরকেও তো তুমি দেখ নাই—চিন না, তাই বলিয়া কি তিনি নাই?'

বুদ্বুদ চুপ করিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লোকে পার্থিব পিতামাতার উদাহরণ দেয়! অথচ ইহার যুক্তি উল্টো প্রকার—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে লজ্জিত হইল। মদ্যপের প্রলাপ বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিল না। প্রসঙ্গান্তরে আসিবার জন্য বলিল,—'তবে সেই জননীর অঙ্গুরীয় তো তোমার হস্তে দেখি না—সেটি কোথায় গেল?'

—'সেটি বিবাহ রাত্রে আমার স্ত্রীর হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলাম।'

—'স্ত্রী? তিনি—'

সে কথার উত্তর না দিয়া হিমাচল বলিল,—'কিন্তু আশ্চর্য! দুইটি অঙ্গুরীয়ের ভিতর এতদূর সাদৃশ্য হইতে পারে? একেবারে একই রকম! তুমি বন্ধু অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া রাখ। না হইলে আমি খোলা মনে তোমার সহিত কথা বলিতে পারিতেছি না।'

বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া অঙ্গরাখার ভিতর রাখিতে গেল। হিমাচল বলিল,—'দেখি, সেই অঙ্গুরীয়টির ভিতরের দিকে একটি আঁচড়ের কাটা দাগ ছিল—নীলাটি নিখুঁত ছিল না।'

দুজনেই পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইল। এটিরও ভিতরের দিকে একটি দাগ রহিয়াছে। হিমাচল বলিল,—'তোমার শতভিষাকে দেখিতে কেমন বল তো?'

বুদ্বুদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনা দিয়া গেল। নিজস্ব ভঙ্গিতে নিমীলিত নেত্রে সমস্ত শুনিয়া হিমাচল একইভাবে বলিল,—'তাহার চিবুকের দক্ষিণভাগে একটি কিণ-চিহ্ন আছে?'

—'হাঁ আছে। তুমি ইহাকে চিন?'

হিমাচল জবাব দিল না। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পদচারণ করিতে করিতে সহসা আসবাগারের একজন কিঙ্করকে ডাকিয়া একপাত্র মদ্য আনিতে বলিল। মদ্য আসিলে একগ্রাসে অনেকখানি গলাধঃকরণ করিয়া সে স্থির হইয়া বসিল। হিমাচল যে বর্তমানে কপর্দকশূন্য তাহা বোধহয় তাহাঁর মনেই ছিল না। বুদ্বুদ বুঝিল, উহার হৃদয়ে এখন একটি তুফান বহিতেছে। তাহাকে প্রসঙ্গান্তরে আনিবার জন্য বাধ্য হইয়া তখন সে তিলাঞ্জলির প্রসঙ্গ পাড়িল। হিমাচল অস্থির হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল,—'ভুল, ভুল, বুদ্বুদ! স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস করিও না। যতক্ষণ তোমার বাহুবন্ধে আছে ততক্ষণ সে দাসী;—আলিঙ্গনমুক্ত করিলেই করাল দংশন করিবে।'

—'কিন্তু তিলাঞ্জলি? সে রাজ-অন্তঃপুরচারিকা হইয়াও আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।'

'—বিবাহ? বিবাহের মন্ত্র কি নাগিনীকে বশ করিতে পারে? কালিকটের সমুদ্রতীর হইতে আমি একটি ক্রীতদাসীকে আনিয়া আমার বুকে টানিয়া লইয়াছিলাম। কী দিই নাই তাহাকে? রাজ্যেশ্বরী করিয়াছিলাম, নয়নের মণি করিয়াছিলাম! কিন্তু কী পাইলাম! সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে আমাকে করাল দংশন করিল। রাজ্য গেল, সংসার গেল, স্ত্রীপুত্র জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইল—আর আমার স্ত্রী? সে আমার বিবাহ-রাত্রের প্রথম উপহার দিয়া তোমাকে ক্রয় করিতে চায়!'

—'শতভিষা'—

—'না, শতভিষা নহে, তখন তাহার নাম ছিল—; কিন্তু ও কথা থাক্! বুদ্বুদ আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার সন্তান যদি অগ্নিদগ্ধ না হইত তবে সে আজ তোমারই মতো হইত। আমি যুক্তকরে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—নারীকে কখনও বিশ্বাস করিও না। জীবনে যদি কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, কোনও উচ্চাভিলাষ থাকে তবে তাহা পূর্বে চরিতার্থ করিয়া লও। তারপর বৃদ্ধকালে বিবাহ করিও—যাহাতে নাগিনীকন্যা আসিয়া তোমার যৌবন, তোমার উদ্যম, তোমার কর্মক্ষমতা কিছুই নষ্ট করিবার সুযোগ না পায়।'

বুদ্বুদ জীবনে প্রথম দেখিল পাষাণ হিমালয়ের বুক ফাটিয়াও জলধারা নামে।

মন্থরপদে বুদ্বুদ আসবাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল। এ স্থান হইতে তাহার শতভিষার গৃহে যাওয়ার কথা। শতভিষা সেই রাঠোর যুবকটির সন্ধান জানে; কিন্তু তাহার যে পরিচয় সে এইমাত্র পাইয়াছে তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে শতভিষাকে শতখণ্ড করিলেও সে আসল কথা কিছুই

বলিবে না। শতভিষা অন্য জগতের মানুষ! এই উত্তীর্ণযৌবনা বাঈজী যে তাহার প্রেমে পড়ে নাই—তাহার নিখুঁত অভিনয় সত্ত্বেও একথা বুদ্বুদের প্রত্যয় হইতেছিল যেন সত্যই সে তার প্রেমে অকুণ্ঠ নিমজ্জমান। এক্ষণে শতভিষার কক্ষে যাওয়ার বিন্দুমাত্র স্পৃহা তাহার অবশিষ্ট ছিল না। ধীরপদে তাই সে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে তাহার জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল। কল্য রজনীর সেই দাসীটি তাহার দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে। বুদ্বুদকে দেখিয়া যবনী দাসী আভূমি কুর্নিশ করিয়া তাহার হস্তে একটি মোহরাঙ্কিত লেফাফা দিল। তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বুদ্বুদ দীপ জ্বালিল। সীলমোহর ভাঙিয়া যে পত্রখানি বাহির করিল তাহা এইরূপ—

'প্রাণাধিক,

'আমি জানি তুমি আজ আসিবে না। তাই পূর্বেই এই পত্র দিতেছি! কাল তোমাকে প্রশ্ন করিবার পরমুহূর্তেই তুমি চলিয়া গেলে। জানি না, কেন তুমি আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিলে! কেন তোমাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহা জানাইতেছি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিও—তাহার পর তোমার যাহা অভিরুচি হয়, করিও।

'আমি পেশাদার সংগীতজ্ঞা। ধনবানের মনোরঞ্জনার্থে গৃহে গৃহে সংগীতের বেসাতি লইয়া ফিরি। সকলেই আমার সংগীত শোনে, মুগ্ধ হয়, আমার রূপযৌবনে লুব্ধ হয়,—কিন্তু আমার সংগীত-রূপ-যৌবনের-অতীত যে 'আমি' তাহার সন্ধান আজ পর্যন্ত কেহই লয় নাই। আমাকে সকলেই ভোগ করিতে চায়—কিন্তু স্বামী-পুত্র-সংসার, সাধারণ গৃহস্থের জীবনের প্রতি আমারও যে একটা বাসনা থাকিতে পারে এ সহজ সত্যটা কেহ বুঝে না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরি। সহসা একরাত্রে পান্থশালায় তোমাকে দেখিলাম। আমার সমস্ত ধারণা, সমস্ত সংযম টুটিয়া গেল। আমি তোমার চক্ষে সেই মর্মভেদী দৃষ্টি দেখিলাম—মনে হইল, এই যুবককে আমি স্বেচ্ছায় আমার রূপ-যৌবন-সংগীতের পসরা ঢালিয়া দিতে পারি। আমি বিনাপণে বিকাইতে পারি। আমি বিনাপণেই বিকাইলাম! তুমি জানিতেও পার নাই। তাহার পর হইতে আমি তোমাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছি। তুমি জান নাই—তুমি সে সংবাদ রাখ না। হয়তো তুমি অবিশ্বাস করিবে তাই বলিতেছি—মিলাইয়া দেখ!

'পান্থশালা হইতে তুমি মান্দোরে যাও; সেখানে তিনজন দুর্ধর্ষ অসিবীরের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হয়। সাগরজীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুমি জয়ী হও (এ সংবাদ পাইয়া আমার কী আনন্দ হইয়াছিল, কারণ সাগরজী একবার অরক্ষিত আমাকে অপমান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল)। তৎপরে প্রতিযোগিতার আসরে তুমি আমার জন্মশত্রু সেই রাঠোর যুবককে পরাজিত কর (মাপ করিও, রাঠোর যুবক অসিচালনায় অদ্বিতীয়, তাই তাহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া তোমার মতো প্রিয়জনের সর্বনাশ করিতে ইচ্ছা করে না)। তাহারও পর দেখিলাম গভীর রাত্রিযোগে তুমি একজন রাজপুত ও একজন রমণীর সহিত বৌদ্ধচৈত্যের দিকে ছুটিতেছ। উহারা কে, কেন যাইতেছিলে তাহা আমি কিছুই জানি না। আমার মনে সন্দেহ জাগে। ঐ রাজপুত রমণী তোমার প্রণয়িনী অথবা অপর রাজপুত পুরুষের নায়িকা তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম। স্বীকার করি, আমার ঈর্ষা জন্মিয়াছিল।

'আমার সকল কথাই বলিলাম। আমার আর কিছু বলিবার নাই। তুমি যদি ঐ স্ত্রীলোক অথবা পুরুষের নাম বলিতে না চাও তবে ক্ষতি নাই। আমি সামান্য বাঈজী, যবনী, তোমার কুলবধূ হইবার স্বপ্ন আমি কোনদিনই দেখি নাই। না হয় থাকিলই তোমার অপর প্রণয়িনী। আমি স্বামী চাহি না, পুত্র চাহি না, সংসার চাহি না—তোমার জীবন কলঙ্কিত করিয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই। আমি অদ্যই চিতোর ত্যাগ করিব। যাইবার পূর্বে একবার চোখের দেখাও কি পাইব না?

'জানি না, ভ্রষ্টা বাঈজীর কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলে কিনা। তবু যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই যে, তুমি আমার জীবনপাত্র প্রেমের মদিরাতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছ—এ মদিরা আমার আকণ্ঠ পান না করিয়া মুক্তি নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্য! তুমি নিজে তাহা জানিতেও পারিলে না।

'ইতি—চিরউপেক্ষিতা ছিন্নলতা
শতভিষা।'

পত্রটি এক নিঃশ্বাসে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বুদ্বুদের ধারণা পাল্‌টাইয়া গেল! একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল। তৎপরে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সে ভাবিতেছিল, মদ্যপ হিমাচলের কথার মূল্য কী? প্রথম দিন হিমাচল বলিল যে, সে তাহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল—পরদিন শতভিষার দক্ষিণ চিবুকের আঁচিলের কথা শুনিয়া বলিল, শতভিষাই তাহার স্ত্রী। দ্বিতীয়ত, একই রকম দুইটি অঙ্গুরীয় কি থাকিতে পারে না? তাহা ভিন্ন বাঈজীর পক্ষে বহুস্থান হইতে উপহার পাওয়া স্বাভাবিক। হয়তো বহু হাত ঘুরিয়া উহা এক্ষণে বাঈজীর হাতে আসিয়াছে। অসম্ভব নহে। এবং সর্বোপরি এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যে দরদ, যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সন্দেহ করা যায় না। উপেক্ষিতা ছিন্নলতার প্রতি তাহার সমবেদনা জাগিয়া উঠিল। সত্যই তো, তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ অলক্ষ্যে থাকিয়া এই নারী লক্ষ্য করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক অথবা প্রেমোন্মাদ নারী ভিন্ন এত সংবাদ সে পায় কী করিয়া? শতভিষা জাদুকর নহে—তাহা হইলে বাঈজীর এই ঘৃণিত জীবন সে ইন্দ্রজালেই দূর করিতে পারিত। তাহার মতো একজন নগণ্য সৈনিকের নিকট দীনভাবে প্রেমভিক্ষা করিত না। শতভিষার ললিত কটাক্ষ, তাহার উন্মাদিনীর মতো আলিঙ্গন, তাহার সদ্যস্ফুট পদ্মকলির ন্যায় চুম্বনপ্রত্যাশী কম্পিতাধর একে একে সকলই মনে পড়িল। দ্রুত বাহিরে আসিয়া দাসীকে বলিল,—'তোমার মনিবকে বলিও আমি অদ্য রাত্রেই দেখা করিব।'

—'আপনার যাহা বক্তব্য তাহা পত্রে লিখিয়া দিন।'

—'তবে অপেক্ষা কর—এস, ভিতরে এস।'

দাসী দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বুদ্বুদ মস্যাধার লেখনী লইয়া পত্ররচনায় বসিল।

লিখিতে লিখিতে হঠাৎ চোখ তুলিতেই যবনী দাসীর সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। বুদ্বুদ চমকিয়া উঠিল। কিঙ্করীর মুখাবয়ব রক্তবর্ণ! অধর দংশন করিয়া সে যেন অবরুদ্ধ ক্রন্দন রোধ করিতেছে।

—'কী হইল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?'

—'কাঁদিতেছি? কই না!' দাসী শান্ত হইল।

বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল যবনী দাসীর পরিধানে সাধারণ মুসলমান রমণীর পোশাক—বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে। দীন পরিচ্ছদ সত্ত্বেও তাহাকে সহসা দাসী বলিয়া মনে হয় না। বুদ্বুদ কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সহসা কিঙ্করী প্রশ্ন করিল—

—'আপনার নামই কী বুদ্বুদ সর্দার?'

—'হ্যাঁ, কেন?'

—'আপনিই সর্দারজীকে মান্দোরে পরাজিত করিয়াছিলেন?'

—'সর্দারজী কে?'

—'আপনিই মেবার পক্ষে অসি প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রতিযোগী ছিলেন?'

—'ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে মারবার পক্ষে কে লড়িয়াছিল জান?'

—'জানি।'

—'জান?'

—'হ্যাঁ!'

—'কে?'

—'মাপ করিবেন সে কথা আমি বলিতে পারিব না।'

বুদ্বুদ লেখনী ফেলিয়া এক লম্ফে উঠিয়া আসিল,—'তোমাকে পারিতেই হইবে।'

—'মার্জনা করিবেন, সে অসম্ভব।'

—'তোমার সর্বাঙ্গ যদি স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দেই?'

—'দিল্লীর তক্তহাউস পাইলেও নহে।'

—'কেন?'

—'সেকথাও বলিতে পারিব না।'

বুদ্বুদ হতাশ হইয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিল। দাসী বলিল,—'বাঁদীর প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন; কিন্তু তাঁহার পরিচয় জানিতে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

—'কারণ সেই যুবক আমার জন্মশত্রু! তাহাকে বধ না করিয়া মরিলেও আমার শান্তি নাই?'

—'আপনি কি জানেন সেই যুবক অপরাজেয় শক্তিধর?'

—'তুমি হয়তো জান না সর্দার বুদ্বুদ জীবনে কখনও পরাজিত হয় নাই!'

তারপর হাসিয়া বলে,—'আমার বন্ধুদের বিশ্বাস তরবারি খাপ হইতে একবার খুলিয়া লইলে স্বয়ং যমরাজও আমার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইবেন—সে রাঠোর তো কোন ছার!'

দাসীর চক্ষুতারকা জ্বলিতেছিল, কহিল,—'যুবক রাঠোর নহে—'

—'রাঠোর নহে? তবে কি?'

—'বলিতে পারি, যদি আপনি তরবারি লইয়া একলিঙ্গজীর নামে শপথ করেন।'

মুহূর্তে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বুদ্বুদ বলিল,—'বল, কী শপথ করিতে হইবে।'

—'আপনাকে দুইটি শপথ করিতে হইবে—'

—'করিব!'

—'আপনার প্রথম শপথ—আপনি আমার নিকট আজ যাহা শুনিবেন, তাহা জীবন থাকিতে কখনও কাহাকেও বলিবেন না।'

বুদ্বুদ দেবাদিদেব একলিঙ্গজীর নামে শপথ করিল।

—'আপনার দ্বিতীয় শপথ, অপরিচিতের পরিচয় পাইলে তাহাকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। সে জীবিত থাকিতে আপনি ঘর-সংসার-বিবাহ কিছুই করিবেন না।'

—'বধ করিব?'—বুদ্বুদের কণ্ঠে বিস্ময়।

দাসী বলিল,—'মনে রাখিবেন সর্দার, এইমাত্র যাহা শুনিলেন তাহা আপনার প্রথম প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। আমি এ-কথা বলিয়াছি তাহা জীবন থাকিতে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না। আপনি রাজপুত, তরবারি হস্তে দেবতার নামে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'মনে থাকিবে। আমি সেজন্য বলি নাই। আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না—বস্তুত তাহাকে বধ করিবার জন্যই আমি তাহার পরিচয় খুঁজিতেছি।'

—'তাহা হউক! আপনি প্রতিজ্ঞা করিলে তবেই আমি তাহার পরিচয় বলিব।'

বুদ্বুদ তখন দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিল এবং দাসী তাহার বক্তব্য বলিয়া গেল।

দাসী যবনী নহে। সে হিন্দুকন্যা। পৈতৃক নাম আশা। বর্তমানে সকলে তাহাকে আয়েসা বলিয়া ডাকে। শৈশবে তাহাকে দস্যুতে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এবং দাসব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে।—এই দাসব্যবসায়ীই হইতেছে শতভিষার উপপতি—বুদ্বুদের শত্রু। বুদ্বুদ তাহাকে যুবক ভাবিয়াছে বটে—কিন্তু তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশের কম নহে। দাসব্যবসায়ী যবন। গত বিশ বৎসর মান্দোরে আছে। আপনাকে রাঠোর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। শতভিষার পরিচয় আয়েসা জানে না—তবে তাহাকে যবনের উপপত্নী হিসাবে চেনে। এই যবন আশার ধর্মনষ্ট করিয়াছে বলিয়াই সে আজ আয়েসা-যবনী। যবনের প্রকৃত নাম সে জানে না—সকলে তাহাকে সর্দার মীনকেতন বলিয়া ডাকে। সর্দার যোধার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এই বেপরোয়া দুর্ধর্ষ অসিবীর আয়েসার জন্মশত্রু—কিন্তু উপায়ান্তরহীনা সে আজীবন ইহারই সেবা করিতেছে, তাহার ধারণা ছিল সর্দার অজেয়—কিন্তু মান্দোরের অসি-প্রতিযোগিতায় মীনকেতন নাকি কোন বুদ্বুদ সর্দারের নিকট পরাজিত হইয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া আশা আশার আলোক দেখে। সেইদিন হইতে আশা এই বুদ্বুদ-সর্দারের স্বপ্ন দেখিতেছে। আশা যে দীর্ঘ-জীবনব্যাপী বৈরিতা ও ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছে একথা শতভিষা অথবা মীনকেতন ঘুণাক্ষরেও জানে না। জানিলে, আজ কখনই তাহাকে এখানে পাঠাইত না।

আজন্মের সাধের কথা বলিয়া আয়েসা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বুদ্বুদ কহিল,—'দুঃখ করিও না আশা বহীন্! আমি তোমার আজন্মের সাধ মিটাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।'

তৎপরে কহিল,—'আমাকে শতভিষা কেন আমন্ত্রণ করিয়াছিল জান?'

—'জানি। সর্দার তাহার গোপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চায়। আজই উহারা চিতোর ত্যাগ করিবে। শতভিষার সহিত আলাপনরত আপনাকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করিয়া মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া উহারা যাত্রা করিতে চায়।'

—'তাহা হইলে কাল আমাকে হত্যা করে নাই কেন?'

—'কারণ তাহা হইলে বৌদ্ধ-চৈত্যের সংবাদটা পাইত না। আজ উহারা বুঝিয়াছে যে, প্রাণ যাওয়ার পূর্বে সে কথা আপনি স্বীকার করিবেন না। আপনাকে আজ জীবন্ত বন্দী করিতে পারিলে হয়তো হত্যা করিবার পূর্বে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া সেকথা বাহির করিবার চেষ্টা করিত।'

—'বুঝিলাম, আচ্ছা তুমি বিংশতি বর্ষ পূর্বে কালিকট বন্দরের কোন ঘটনার কথা জান? দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার সহিত শতভিষার বিবাহ হইয়াছিল?

—'হইতে পারে! আমি জানি না! বিংশতি বর্ষ পূর্বে সম্ভবত আমি পিত্রালয়ে ছিলাম—অথবা সে বালিকা বয়সের কথা আমার স্মরণ নাই। তবে কালিকট বন্দরে ব্যবসার জন্য সর্দারকে প্রায়ই যাইতে হইত।'

তখন আয়েসাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুদ্বুদ পত্র রচনায় বসিল। পরে সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফা তাহার হস্তে দিল। আয়েসা লেফাফা লইয়া আপনার হস্ত হইতে একটি রৌপ্য বলয় লইয়া বুদ্বুদের হস্তে পরাইয়া দিল।

বুদ্বুদ সবিস্ময়ে কহিল,—'এ কী করিতেছ?'

আয়েসা কহিল,—'আজ আমি দাসী, আমি যবনী, কিন্তু জন্মসূত্রে আমি রাজপুতানী। তুমি আমাকে আশা-বহীন বলিয়াছ! তাই তোমার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলাম।'

চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে আশা পথে নামিল।

দাসী প্রবেশ করিতেই শতভিষা কর্কশকণ্ঠে কহিল,—'পত্র আনিয়াছিস?'

আশা কহিল,—'হাঁ জী।'

তাহার হাত হইতে পত্র লইয়া শতভিষা তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। বলিবার প্রয়োজন ছিল না;—গালিচায় অর্ধশয়ান অবস্থায় সর্দারের সহিত বিশ্রান্তালাপরতা শতভিষার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও সখ আশার ছিল না।

সীলমোহর ভাঙিয়া শতভিষা প্রদীপের আলোকে পত্রপাঠ শুরু করিল। সর্দারের পক্ষেও কৌতূহল দমন করা কঠিন। বস্তুত দুইজনে পরামর্শ করিয়াই পূর্বের প্রেমপত্রটি রচনা করিয়াছিল;—এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তরটি দেখিবার জন্য উভয়েই সমোৎসুক।

গোপন-চারিণীর প্রথম প্রেমপত্র পাঠের লক্ষণই ফুটিয়া উঠিল প্রথমে শতভিষার মুখাবয়বে, কিন্তু এ তো লজ্জার অরুণাভা নহে! শতভিষার নাসারন্ধ্র হইতে যেন শতনাগিনী গর্জন করিতে লাগিল। পীবর বক্ষ উত্তেজনায় হিন্দোলিত হইতেছিল। পত্রপাঠান্তে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল সে। বাধা দিল মীনকেতন। কহিল,—'নষ্ট করিও না! পত্রটি যত্ন করিয়া রাখিত হইবে। আশ্চর্য! ছোকরা কি ঐন্দ্রজালিক?'

শতভিষা কহিল,—'না, আয়েসা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।'

তখনই সে ছুটিয়া যাইতে চায়। তাহাকে বাধা দিয়া মীনকেতন বলিল,—'তুমি কি উন্মাদ? আয়েসা আমাদের কালিকটের ঘটনার কথা বিন্দুবিসর্গ জানে না। দাক্ষিণাত্যের রাজপরিবারের ঘটনার সময় সে থাকিত আমার নিকট। সে কিছুই জানে না।'

—'তাহা হইলে?'

—'বুঝিতে পারিতেছি না।'

—'সে যাহাই হউক। আজ রাতেই এই শত্রুকে বধ করা চাই। তুমি এক্ষনি যাও।'

—'তুমি কি উন্মাদ হইলে?'

—'বুঝিয়াছি; তুমি ভয় পাইয়াছ!'

—'ভয় পাওয়াও অন্যায় নহে! ভুলিও না, এস্থান মান্দোর নহে। চিতোর! এ পত্র লিখিয়া সে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। বস্তুত অবিলম্বে আমাদেরই স্থান ত্যাগ করা উচিত। ইহাকে বধ না করিলে আমাদের শান্তি নাই—কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই। এখন সর্বাগ্রে আত্মরক্ষার প্রয়োজন!'

শতভিষা তাহার যুক্তি যে অনুধাবন করিল না তাহা নহে। কিন্তু অপমানিতা কালভুজঙ্গীর মতো সে ফুলিতে লাগিল। এই সময় একটি শ্বেতবর্ণের কাবুলি মার্জার শতভিষার কোল ঘেঁষিয়া বসিল। শতভিষা কঠিন হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। অতর্কিত আক্রমণে মার্জার গর্জন করিয়া উঠিল। বস্তুত মার্জার শতভিষার প্রিয়পাত্রী। এরূপ তাড়নায় সে অভ্যস্ত নহে। মার্জারের গর্জনে শতভিষা যেন বিস্ফোরকের ন্যায় সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থিত একটি ধাতব পাত্র লইয়া সজোরে তাহার মধ্যদেশে আঘাত করিল। অন্তিম আর্তনাদ করিয়া মার্জার ভূপতিত হইতেই আঘাতের পর আঘাত করিয়া শতভিষা তাহাকে হত্যা করিল।

মীনকেতন কিছুই বলিল না। সে তন্ময় হইয়া কী ভাবিতেছিল। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক—প্রেমপত্রে এমনকি থাকিতে পারে যাহাতে এরূপ প্রেমোন্মাদনা জন্মে। পত্রটি অবিকল তুলিয়া দিতে হইল,—

'প্রাণাধিকা!

'তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম তুমি সত্যই আমার প্রেমে পড়িয়াছ। প্রেমে আমারও যে ভরাডুবি হইয়াছে সখি! প্রথম দর্শনের পর তুমি আমার পিছনে নাকি ছায়ার মতো ফিরিতেছিলে। আমি জাদুকর—তাই আমি ছায়ার মতো তোমার পথ ধরিয়া অতীতের দিকে যাত্রা করিলাম। তোমার হাত ধরিয়া কত দেশদেশান্তর ঘুরিলাম। তুমি আমার জীবনপাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে অথচ নিজে তুমি জানিতেও পারিলে না! হয়তো তুমি অবিশ্বাস করিবে তাই বলিতেছি, মিলাইয়া দেখ—

'বিংশতি বর্ষ পূর্বে ক্রীতদাসী তোমাকে যখন যবন ক্রেতা বেত্রাঘাত করিতেছিল তখন পঞ্চদশী বালিকার অতি নিকটেই দর্শকরূপে আমিও ছিলাম, তুমি তাহা জান না। তারপর তোমার হাত ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজার অন্তঃপুরে আসিলাম। সেখানে তুমি স্বামী পাইলে, সংসার পাইলে, গৃহস্থের জীবনের সকল উপকরণই পাইলে—তবু রূপযৌবনের-অতীত তোমার 'তুমি' তাহাতে তৃপ্ত হইল না। রাজার সর্বনাশ সাধন এবং যবনের হস্তধারণ করিয়া যখন তুমি নূতন পাপের পথে যাত্রা শুরু করিলে তখনও আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই।

'আজও ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাতে ফিরিতেছি। অতিক্রান্তযৌবনা বাঈজীর অপঅভিনয়ে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমিও তোমার প্রেমে নিমজ্জমান। আমার সকল কথাই বলিলাম। আর কিছুই বলিবার নাই। জানি না, তুমি বিশ্বাস করিতে পারিলে কিনা। তবু যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই—তুমি আমার জীবনপাত্র যে তীব্র রাসায়নিক দ্রব্যে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছ আকণ্ঠ তোমাকে তাহা পান না করাইলে আমার বিরহ-তাপিত হৃদয় শান্ত হইবে না।

'ইতি চির-উন্নত ঋজুপাদপ
বুদ্বুদ!'

সেই রাত্রেই শতভিষা সদলবলে মান্দোর অভিমুখে যাত্রা করিল।

পরদিন প্রাতে রাজপুতরক্ষী স্বয়ম্ভু বুদ্বুদকে একটি পত্র দিয়া গেল। সাগ্রহে পত্র খুলিয়া বুদ্বুদ মর্মাহত হইল। এই কি প্রেমিকার প্রেমপত্র! একটি মিষ্ট কথা নাই—একখণ্ড ভূর্জপত্রে শুধু একপঙ্‌ক্তির লিপি—'মান্দোরের সন্দেশ আসিয়াছে। যাইবার প্রয়োজন নাই।—তি'

বুদ্বুদ চন্দনকাষ্ঠের একটি মঞ্জুষা বাহির করিয়া খুলিল। এই চন্দনকাষ্ঠের ক্ষুদ্র পেটিকাই বুদ্বুদের রাজকোষ, রত্নভাণ্ডার। উহারই ভিতর থাকে তাহার অর্থ—একধারে রহিয়াছে একটি হীরকাঙ্গুরীয় অপর পার্শ্বে একটি নীলাঙ্গুরীয়—মধ্যভাগের কোষে মঙ্গলরামের দেওয়া মুক্তার কঙ্কণ।

এই মঞ্জুষার একটি নিভৃত প্রান্তে বুদ্বুদ সযত্নে ভূর্জপত্রখানি রাখিয়া দিল। নাই বা থাকিল ইহাতে সম্ভাষণ—নাই বা থাকিল কোন মিষ্ট সম্বোধন—এই পত্রই বুদ্বুদের অবিস্মরণীয়া নায়িকার প্রথম প্রত্র।

'এর মূল্য এর রচনায়—নয় এর বস্তুতে।'

রাজকুমার চণ্ডদেব আপনার কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বেলা একপ্রহর অতিক্রান্ত। সমস্ত রাত্রি একটি বন্য বরাহের পিছনে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উষামুহূর্তে সেটিকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া ক্লান্ত শরীরে যুবরাজ নিজ শয্যায় নিদ্রাগত। কাহার আহ্বানে তাঁহার ঘুম ভাঙিল; চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন তিলাঞ্জলি ডাকিতেছে। যুবরাজ বিরক্তভাবে পার্শ্ব পরিবর্তনের উপক্রম করিতেই তিলাঞ্জলি কহিল,—'বেলা এক প্রহর অতীত প্রায়; আর কত ঘুমাইবেন? উঠুন, রাজসভা অনেকক্ষণ শুরু হইয়াছে।'

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন,—'হউক, তাহাতে আমার কি? আমি কী মেবারের রানা?'

—'আজ না হইলেও দুদিন পরে তো হইবেন—'

—'যখন হইব তখন সময়ে উঠিব।'

—'যখন হইবেন তখনও এমনি দিবসে নিদ্রা দিবেন। কী ব্যবস্থা, সমস্ত রাত্র শিকার আর সমস্ত দিবস নিদ্রা!'

—'দেখ্ বহিন! তোর বড় বাড় বাড়িয়াছে। তুই আমাকে পর্যন্ত মান্য করিস না! রানাকে বলিতেছি অবিলম্বে তোর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া রাজপুরী হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।'

—'আমার বিবাহের জন্য তো আপনার নিদ্রা হইতেছে না! যাক্ এখন উঠুন।'

—'না, আমি উঠিব না! স্নান করিব না! খাইব না!'

—'স্নানাহার না করুন তাহাতে দুঃখ নাই। আপনার ঐ শরীরে মাসাধিককাল আহার না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু তাহার অপেক্ষা একটি গুরুতর কার্য যে আজ আপনাকে করিতে হইবে!'

—'কি?'

—'বিবাহ!'

যুবরাজ তিলাঞ্জলির প্রগল্‌ভতায় তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য উঠিলেন। শিয়রের নিকট হইতে একটি পাঙ্খা উঠাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তিলাঞ্জলি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—'হাসো কেন?'

—'বিবাহের নামেই যুবরাজ গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া।'

চণ্ডদেব এবার সত্যই বিরক্ত হইলেন। তিলাঞ্জলি যুক্তকরে কহিল,—'বিশ্বাস করুন যুবরাজ! মান্দোর হইতে আজ প্রাতে দূত আসিয়াছে। এক্ষণি হয়তো সভায় আপনার ডাক পড়িবে।'

তখন চণ্ডদেব উঠিয়া তৈয়ার হইতে লাগিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি শিশোদীয়া ধাত্রী আয়ীমার হস্তে একই সঙ্গে তিলাঞ্জলি এবং যুবরাজ মানুষ হইয়াছিলেন। এইজন্য সামাজিক সোপানে যুবরাজের বহু বহু নিম্নে স্থান হইলেও তিলাঞ্জলি যুবরাজকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখিতেন—যুবরাজও তাহাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করিতেন।

বলাবাহুল্য এ সকলই জনান্তিকে।

যুবরাজ চণ্ডদেব সভায় প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাজসভায় তখন একটি হাস্যরোল উঠিয়াছে। কৌতুকপ্রিয় রানা লখার সভায় রসিকতা তামাশা ও হাস্য অত্যন্ত সুলভ বস্তু। যুবরাজ থামিয়া পড়িলেন। পিতা হয়তো আদিরসাত্মক কোনও রসিকতা করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সভায় প্রবেশ করা হয়তো উচিত নহে। শালীনতাবোধ যুবরাজের অত্যন্ত প্রবল।

যুবরাজ দেখিলেন, রানার সম্মুখে রাও রণমল্লের দূত; তাহার হস্তধৃত স্বর্ণথালিকায় একটি নারিকেল, একটি গুবাক, কিছু ধান ও দূর্বা। সকলেই হাস্য করিতেছে—শুধু দূতের মুখে কথা সরিতেছে না। কুমার বুঝিলেন দূতই এ হাসির মূল উৎস। তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তবে কি রানা লখা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দূতকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন? তাঁহার ভুল অবিলম্বে ভাঙিল।

রানা কহিলেন,—'তা দূত-মহাশয়—এ তো আনন্দের কথা। রাও রণমল্ল আমার সহিত কুটুম্বিতা করিতে চাহেন—এ তো সুখের কথাই! শুনিয়াছি তাঁহার কন্যাটিও নাকি অত্যন্ত সুন্দরী। তাই নহে!'

—'আজ্ঞে, তাহা তো বটেই। রাজকন্যা মধুশ্রীর রূপ—'

—'কী নাম বলিলেন, মধুশ্রী?'

—'আজ্ঞে হাঁ।'

—'তা নামটা ভালো, কি বল মন্ত্রী? নামটা শুনিলেই প্রাণের মধ্যে মধুসঞ্চার হয়!'

রাজকুমার চণ্ডদেবের কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। যে নাম নিভৃত স্বপ্নে অস্ফুটে উচ্চারণ করিবার সময়েও তাঁহার রোমাঞ্চিততনু শিহরিয়া উঠে সেই গোপন নামটি লইয়া প্রকাশ্য দরবারে ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ চলিতে দেখিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে তিনি জপ করিতেছিলেন,—'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমংতপঃ—'

—'তা মধুশ্রীর রূপের কথা কী বলিতেছিলে?'

—'আজ্ঞে বলিব আর কী? তাঁর রূপ স্বর্গের দেবীগণকেও—

—'আরে চুপ চুপ, আর বলিও না—রাজসভায় ওকথা বলিতে আছে! এখানে হয়তো কত মধুপ আছে—শেষে শ্রী লইয়া না একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া যায়?'

রানার রসিকতায় পুনরায় একটা হাস্যরোল উঠিল। ওদিকে যুবরাজ ভাবিতেছিলেন—'পিতরি প্রীতিমাপন্নে'—তারপর কী? তারপর কী? কী আশ্চর্য, সহস্রবার উচ্চারিত শ্লোকটার পাদপূরণ হইতেছে না!'

—'যাহা হউক, বুঝিলাম। দূত মহাশয়ের বক্তব্য : এই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব মেবার দরবারে পেশ করিবার জন্য, মারবাররাজ রাও রণমল্ল আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, কেমন?'

—'আজ্ঞে হাঁ। এতক্ষণে আপনি আমার সমগ্র প্রস্তাবটা বুঝিতে পারিয়াছেন।'

—'তাহা আর কই পারিলাম দূত-মহাশয়? পাত্রের নামই তো এখনও আপনি বলেন নাই!'

—'আজ্ঞে, চিরায়ুষ্মন যুবরাজ শ্রীশ্রী চণ্ডদেব।'

—'আমারও তাহাই অনুমান হইতেছিল।'

তাহার পর দূতের হস্তধৃত থালিকা হইতে নারিকেলটি লইয়া বয়স্যদের দেখাইয়া বলিলেন,—'আমারও তাহাই মনে হয়—রাও রণমল্ল এরূপ কাঁচালোক নহেন যে, এই পলিতকেশ বৃদ্ধের লড্ডুক খেলিবার জন্য এরূপ সুগোল নারিকেলটি পাঠাইবেন।'

রাজসভায় পুনরায় হাস্যরোল!

দূত কহিল,—'আমাদের এতবড় সৌভাগ্য যে হইতে পারে, তাহা সম্ভবত আমার রাজাও প্রত্যাশা করেন নাই। এ তো অতি সুখের কথা!'

দূতের কথায় রানার সংবিৎ ফিরিল। রসিকতাটা বোধহয় শালীনতার মাত্রা লঙ্ঘন করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নারিকেলটি সুবর্ণ পাত্রে পুনঃস্থাপিত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—'আমি রহস্য করিতেছিলাম মাত্র। যুবরাজ এখনি আসিবেন; এবং তাঁহার দ্রব্য তিনিই গ্রহণ করিবেন। ঐ যে কুমার আসিতেছেন।'

সকলেই পিছন ফিরিয়া দেখিল ধীর পদক্ষেপে যুবরাজ রাজসমীপে আসিয়া থামিলেন।

তাহার চক্ষে ঘৃণা, দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদের যেন সম্মেলন।

রানা কহিলেন,—'মান্দোর হইতে দূত আসিয়াছেন। রাও রণমল্ল তাঁহার কন্যার বিবাহপ্রস্তাব স্বরূপ তোমার নিকট শ্রীফল [5] পাঠাইয়াছেন। গ্রহণ কর।'

যুবরাজ শুধু বলিলেন,—'মার্জনা করিবেন।'

—'মার্জনা করিব? কেন তুমি, এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছ না?'

—'না!'

—'না?'

—'না!'

রানার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। ক্ষণকাল একদৃষ্টে পুত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—'কারণটা জানিতে পারি, যুবরাজ?'

—'পারেন, তৎপূর্বে প্রকাশ্য দরবার ভঙ্গ করিতে হইবে।'

রানা ইঙ্গিত করিলেন। সভাস্থ সকলেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছিল। মুহূর্তে সভাস্থল শূন্য হইয়া গেল। রানা কহিলেন,—'দূতপ্রবর আপনি অপেক্ষা করুন। দেওয়ান, মন্ত্রী, আপনারাও যাইবেন না। এ কথোপকথন শুধু পিতাপুত্রের নহে, রানা ও রাজপুত্রের। এ বিবাহ শুধু সামাজিক অনুষ্ঠান নয়—রাষ্ট্রনৈতিক মিলন।'

দেওয়ান, মন্ত্রী, পদস্থ অমাত্যবর্গের মধ্যে অচপল বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় চণ্ডদেব দাঁড়াইয়া আছেন। রানা কহিলেন,—'এক্ষণে বল, কেন তুমি এ বিবাহে অসম্মত।'

—'কারণ প্রকাশ্য দরবারে মেবারের বর্তমান রানা ইতিপূর্বেই পাত্র হইতে শ্রীফল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।'

—'কুমার, উন্মাদ হইও না!'

—'আমি উন্মাদ হই নাই পিতা। আপনি রহস্যের ছলেও, কৌতুকের বশেও যাঁহাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন—তিনি আমার জননীসদৃশা—'

—'চণ্ড! এ তুই কী বলিতেছিস!'

—'ঠিকই বলিতেছি পিতা। আপনি নিজেই এ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন? রাও রণমল্লের কন্যা—না, নামটা প্রকাশ্যে আর উচ্চারণ করিব না! তিনি আজ হইতে আমার—'

—'চণ্ড! ক্ষান্ত হ'!'

—'আমার জননী, আমার মাতা!'

রানা উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কথায় বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুটে কহিলেন,—'পুত্রের হস্তে এতবড় আঘাত পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!'

—'আঘাত! আঘাতের কথা আপনি কী জানেন! যাক্ সেকথা এখানে নহে!'

মর্মান্তিক লজ্জায় রানা মাথা নত করিয়াছিলেন, এ কথায় পুনরায় উঠিয়া বসিলেন,—'তবে কি তুমি চাও এ বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাহাকে বিবাহ করি?'

—'করাই তো উচিত। প্রকাশ্য দরবারে স্বহস্তে শ্রীফল গ্রহণ করিয়া পরে প্রত্যাখ্যান করিলে সেই কন্যার পুনর্বিবাহ হওয়া শক্ত!'

—'সে নীতিকথা আমাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই! তাহা ভিন্ন তোমার হঠকারিতার জন্য মারবার রাজাকে স্বেচ্ছায় শত্রু করিব এমন মনে করিও না, কিন্তু কুমারীর নিজের কিশোরী হৃদয়ের বাসনা কামনা—'

—'সে দায়িত্ব আপনার।'

—'শুধু আমার? বেশ, তবে মনে রাখিও তোমার অর্বাচীনতায় যে কুমারীকে আজ এই বৃদ্ধ পতিবরণের লাঞ্ছনা দিতেছি—তাহাকেই আমি ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাজমাতা করিব। মারবার কুমারীর যদি সন্তান জন্মে তবে তাহাকেই দিব আমার সিংহাসন! মন্ত্রী, দেওয়ান তোমরা সাক্ষী রহিলে! নাবালকের দায়িত্ব তোমরা লইবে—'

—'কোনও প্রয়োজন হইবে না পিতা। আমি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—চন্দ্রসূর্য সাক্ষী, সাক্ষী অমাত্যবর্গ, সাক্ষী একলিঙ্গভবানী! আমি যদি শিশোদীয়া রাজবংশের সন্তান হই তাহা হইলে তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি মেবারের সিংহাসন আমি কখনও দাবি করিব না।'

সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। রানা লখার মুখ আরও মসীকৃষ্ণ হইয়া গেল। পুত্রকে লাঞ্ছনা করিতে গিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে আরও গৌরবান্বিত করিলেন; নিজেকে তিনি চরম অপমানিত মনে করিলেন—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'খুব তো প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহবা

লইতেছ; কিন্তু তোমার সন্তান-সন্ততি যখন অজাতকুমারের বংশধরদের সহিত সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিবে—'

চণ্ডদেব যেন দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিলেন—'বেশ, আমি সে প্রতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতেছি! আমি পুনর্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি—সাক্ষী অন্তরীক্ষবাসিগণ, সাক্ষী মহাভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ভীষ্মদেবের স্বর্গগত আত্মা। আমি যদি সূর্যবংশের সন্তান হই—' অমাত্যবর্গ শিহরিয়া উঠিলেন। রানার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিয়া গেল। যুবরাজের বাক্য কিন্তু শেষ হইল না। অন্তঃপুর হইতে উন্মাদিনীর মতো ছুটিয়া আসিল দুইটি নারী। একজন তরুণী,—ছিন্নমূল লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল যুবরাজের চরণে। অপরজন বৃদ্ধা। সবলে চাপিয়া ধরিলেন যুবরাজের মুখ।

রাজসভা অকালে ভাঙিয়া গেল।

সমগ্র মেবার উৎসবের উন্মাদনায় উত্তাল। মেবারের অধীপ, সমগ্র রাজোয়ারার প্রধান, রানা লখার শূন্যপুরী দীর্ঘদিন পরে আজ পূর্ণ হইবে। পথে পথে উৎসবের আয়োজন। ঘরে ঘরে বিচিত্র গৃহসজ্জা। যাহারা গৃহ সাজাইতে পারে নাই সরকারী অর্থে তাহাদের গৃহ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহামন্ত্রী, সেনাপতি উপেন্দ্রবন্ধু বড় বড় সামন্তসর্দারেরা সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। যুবরাজ চণ্ডদেব সমস্ত ব্যবস্থাপনার তদারক করিতেছেন কিন্তু পারতপক্ষে পিতার সম্মুখে আসিতেছেন না।

নৃত্য-গীতের প্রবাহে, রাজপথে বিচিত্রবর্ণের পোশাক পরিহিত নরনারীর সমাবেশে, মদিরাভবনগুলিতে জনসমাগমে সমগ্র চিতোর উৎসবে মত্ত। শুধু একজনের মনে শান্তি নাই—তিনি রানা লখা নিজে। এই বৃদ্ধ বয়সে যেন তিনি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছেন। তিনি রসিক ছিলেন, হাস্য-পরিহাসে তাঁহার আনন সদাপ্রফুল্ল। পরিহাসের পরিণাম দেখিয়াই বুঝি সে প্রফুল্ল আননের শেষ হাস্যবিন্দুটুকুও যেন মুছিয়া গিয়াছে।

সহস্র বরযাত্রী লইয়া, সামন্তসর্দারদের পার্শ্বচর লইয়া বরবেশে স্বর্ণমণ্ডিত রাজপোশাকে রানা লখা বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। অনুষ্ঠানের কোথাও কোনও ত্রুটি হইল না।

মান্দোরের উৎসব আয়োজনও ত্রুটিহীন। পথে পথে তোরণ, যে পথ দিয়া বরযাত্রী দল যাইতেছে তাহার দুই পার্শ্বের হর্ম্যরাজী হইতে অবিরাম পুষ্পবর্ষণে পথ কুসুমাকীর্ণ। কোথাও আতরমিশ্রিত গোলাপ জল ছিটাইতেছে—আলোকমালায় পথ উজ্জ্বল—মুহুর্মুহু আতসবাজীর আলো শূন্যে উঠিয়া গিয়া শত শত পুষ্পধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। বরযাত্রীরা সকলেই মান্দোরবাসীর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করিল। শুধু রানা লখার মনে অন্য চিন্তা; তিনি দেখিতেছিলেন পুষ্পাচ্ছিন্ন পথে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে তাঁহার অশ্ব পদস্থাপন করিল—কুসুমটি পিষ্ট হইল। তিনি দেখিতেছিলেন—আতসবাজীগুলি ফুল কাটিতে কাটিতে শূন্যে উঠে—সহসা আতসবাজী ফাটিয়া যায়! একমুষ্টি ছাই ভিন্ন অমন সুন্দর জিনিসটির আর কিছুই অবশেষ থাকে না। যেন স্বর্গের কোন দেবতার অভিশাপে ছাইমুষ্টি রসাতলের দিকে নামিয়া আসে।

রানা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

চণ্ডদেব অস্বীকৃত হওয়ায় রানা একবার রঘুদেবকে বলিবেন কিনা ভাবিলেন; কিন্তু অগ্রজের বিবাহ না হইলে অনুজের বিবাহ শোভন নহে; তাহা ভিন্ন স্বহস্তে নিমন্ত্রণের শ্রীফল গ্রহণ করিয়া তিনি সমস্ত সম্ভাবনার মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

বরযাত্রীদল মান্দোর রাজদুর্গে পৌছিল। দুন্দুভি ধ্বনিতে কন্যাপক্ষ অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বয়ং রাও রণমল্ল আসিয়া মহান অতিথির কর গ্রহণ করিয়া ভিতরে আনিলেন। রানা লখা লক্ষ্য করিলেন, রাওয়ালার পক্ষ হইতে নববধূর সখীদল পুষ্পতোরণ তৈয়ার করে নাই। পুষ্পতোরণ দুর্গ অধিকারের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া রানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন! পিতামহের বিবাহ চারণমুখে তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। রানা হম্বীরের পর তিনিই সম্ভবত প্রথম রাজপুত রানা, যিনি পুষ্পতোরণ চূর্ণ না করিয়াই নববধূর নিকট উপনীত হইতে পারিলেন।[6]

নির্বিঘ্নে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইল। মহারাণীকে লইয়া রানা চিতোরে ফিরিলেন। সমস্ত চিতোরবাসী অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া এই শুভদিনটিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত। ঘরে ঘরে ব্যস্তসমস্ত-ভাব। কখন বরযাত্রিদল ফিরিয়া আসে। রাজবাড়িতে ব্যস্ততার অন্ত নাই। শুধু অতি প্রত্যুষে তিলাঞ্জলি তাহার প্রাত্যহিক কার্য সারিতে আসিয়া দেখিল—শয্যা শূন্য। রাজকুমার চণ্ডদেব রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই সকলের অলক্ষিতে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। প্রভাতের রাগরশ্মি প্রাসাদশীর্ষে প্রথম চুম্বন আঁকিবার পূর্বেই, নহবতের তোরণ হইতে রামকেলির প্রথম মূর্ছনা জাগিয়া না উঠিতেই বিনিদ্ররাত্রি জাগরণে ক্লান্ত দেহে যুবরাজ উঠিয়াছিলেন। মন্দুরায় গিয়া প্রিয় অশ্বটিকে লইয়া গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আজ সারাদিন তিনি একাকী বনমধ্যে শিকার করিবেন। শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া তিলাঞ্জলির মনের মধ্যে হুহু করিয়া উঠিল; মনে হইল তাহার নিত্য-কর্মপদ্ধতির আজ প্রথম ব্যতিক্রম হইল; এবং বুঝিল হয়তো এই ব্যতিক্রমগুলিই অতঃপর নিয়মে রূপান্তরিত হইবে।

তিলাঞ্জলি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

সমস্ত দিবস আলোয়-বাজনায়, নৃত্যে-গীতে, আহার্যে পানীয়ে নববর ও নববধূকে লইয়া সকলে মাতিয়া রহিল। শুধু রাজকুমার চণ্ডদেব বনে বনে শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। সমস্ত দিন অস্নাত অভুক্ত যুবরাজ একটিও বন্যপশুর সাক্ষাৎ পাইলেন না। বনচারী কীটপতঙ্গগুলি পর্যন্ত যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজকুমার শ্রান্তদেহে একটি পার্বত্য ঝরনার ধারে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যামশষ্পের উপর শুইয়া পড়িলেন। গোধূলিলগ্নে অস্তপ্রায় সূর্যের স্বর্ণকিরণ তাঁহার ক্লান্ত দেহের উপর যেন কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিল। সহসা যুবরাজ দেখিলেন, অদূরে ঝরনার জলধারার নিকটে একটি অতি সুন্দর চিত্রক হরিণী জলপান করিতে আসিয়াছে। রাজকুমার উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্বে রক্ষিত ভল্লটি দক্ষিণহস্তে উঠাইয়া লক্ষ্য স্থির করিলেন। এরূপ সুন্দর চিত্রক হরিণী তিনি বনমধ্যে কখনও দেখেন নাই। ভাগ্য তাঁহার সুপ্রসন্ন। অস্ত্র ত্যাগ করিবার পূর্বেই কুমার আত্মসংবরণ করিলেন। কারণ সেই মুহূর্তে বনমধ্য হইতে অপর একটি শৃঙ্গীমৃগ আসিয়া হরিণীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক হরিণী পরম সোহাগভরে জিহ্বাদ্বারা শৃঙ্গীমৃগের দেহচর্ম লেহন করিতে লাগিল। কুমার অস্ত্রসংবরণ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুতে অশ্রুজল ভরিয়া আসিল।

রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মহাআড়ম্বরে তখন চিতোরে বধূবরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

পরদিন রাজকুমার ফিরিতেই আয়ীমা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিলেন, কিন্তু কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার আর সেকথা বলা হইল না। শুধু বলিলেন,—'মহারাণীমাকে সকলেই প্রণাম করিয়াছে, শুধু তুমিই বাকি আছে।'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'আসিতেছি; তুমি তিলাঞ্জলিকে একবার পাঠাইয়া দাও।' আয়ীমা তিলাঞ্জলিকে পাঠাইয়া দিলেন।

চণ্ডদেব বলিলেন,—'বহীন, জানি তুই আমার উপর রাগ করিয়াছিস; কিন্তু পলায়ন ভিন্ন আমার আর পথ ছিল না। সর্বসমক্ষে ও, অর্থাৎ মাতা আমাকে দেখিলে হয়তো এমন চমকিয়া উঠিত যে কথাটা গোপন থাকিত না। তুই হয়তো জানিস না—বৌদ্ধবিহারে আমি নিজ পরিচয় দিই নাই। আমাকে সে রাজকুমারের বয়স্য বলিয়া জানে।'

—'জানি।'

—'জানিস্? কেমন করিয়া জানিলি?'

—'রাণীমাতাই বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। বৌদ্ধবিহারে সাক্ষাতের সময়েই তাঁহারা আপনার পরিচয় জানিতেন।

শুনিয়া রাজপুত্রই চমকিয়া উঠিলেন। সেদিনকার সমস্ত কথোপকথন, পর্ণার বিদ্রূপ-বক্রোক্তি সকলই মনে পড়িল; মনে পড়িল, পর্ণার জঙ্ঘায় পিপীলিকা দংশনের কথাও। তিনি বাহুবদ্ধবক্ষে কক্ষমধ্যে নীরবে পদচারণা করিতেছিলেন।

তিলাঞ্জলি কহিল,—'রাজমাতা আপনাকে অবিলম্বে দেখা করিতে বলিয়াছেন।'

তারপর অল্প ইতস্তত করিয়া কহিল,—'যুবরাজ, মাপ করিবেন, আপনি এভাবে পলাইয়া বেড়াইলে সকলের সন্দেহ উদ্রেক করিবে। আপনি স্থির হউন।'

চণ্ডদেব অতঃপর মনস্থির করিয়া তিলাঞ্জলির সহিত রাজকন্যা মধুশ্রীর কক্ষে আসিলেন। রত্নালঙ্কারে মণ্ডিতা নববধূ সূক্ষ্ম চীনাংশুকের ওড়না জড়াইয়া মহামূল্য পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। চণ্ডদেব মনে মনে মহড়া দিতে দিতে আসিলেন। প্রণামান্তে বলিবেন, 'আমাদের মা ছিলেন না, আপনি সে অভাব পূরণ করিলেন।' নতশিরে কক্ষমধ্যে আসিয়া রাজকুমার একজোড়া পদ্মকোরক তুল্য রাতুল চরণে মস্তক স্পর্শ করাইতেই মধুশ্রী শিহরিয়া উঠিলেন। রাজকন্যার অলক্তক রাগ কুমারের ললাটে যেন কঠিন আঘাত চিহ্নের মতেই রক্তরেখা আঁকিয়া দিল। ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া মুখস্থের মতো চণ্ডদেব আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে গিয়াও পারিলেন না। রাজকন্যার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। তাঁহার আর বাক্য সরিল না। বলির পশু যেমন অন্তিম দৃক্‌পাতে খড়্গধারীর দিকে চাহিয়া জানিতে চায়, কেন তাহার এ প্রাণদণ্ড—তেমনি দুইটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া পঞ্চদশী রাণীমাতা চাহিয়া আছেন বিংশতিবর্ষ বয়স্ক তাঁহার পুত্রের দিকে। সে দৃষ্টি হইতে ব্যর্থতা, অভিমান, ভালবাসা, প্রতিহিংসা—কী যে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল জানি না; শুধু জানি, অপরাজেয় শক্তিধর যুবরাজ চণ্ডদেব সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতই নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তারপর ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাত্রে এই অপরূপ-লাবণ্যবতী কিশোরীর চিবুক ধরিয়া রানা লখা প্রদীপালোকে নববধূকে দেখিলেন। রাজকন্যা নয়নদ্বয় মুদিত করিলেন। রানা লখার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছিল কিনা তাহা বুঝি তাঁহার অন্তর্যামীও জানিতে পারিলেন না।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

উপন্যাস ইচ্ছা করিলে লেখকের লেখনী-ইঙ্গিতে পঞ্চবর্ষের দীর্ঘ সময় এক মুহূর্তে পিছনে ফেলিয়া আসিতে পারে। ইতিহাস পারে না। তাই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সংক্ষেপে এইস্থলে নিবেদন করা প্রয়োজন।

রানা লখার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। মুকুল। বিবাহের পর হইতেই রানা লখার জীবন যেন নূতন পথে চলিতেছিল। রাজকার্যে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কুমার রঘুদেব ধার্মিক ও কবি প্রকৃতির মানুষ—তিনিও রাজকার্য বড় একটা দেখিতেন না। অগত্যা চণ্ডদেবকেই রাজকার্যের সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। সামন্ত সর্দারেরা যুবরাজ চণ্ডদেবের সহিতই যাবতীয় পরামর্শ করিতেন। রানা লখা বস্তুত কিছুই দেখিতেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই একদিনের হঠকারিতার কথা দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে তাঁহার মনের গ্লানিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে। বস্তুত মহারাণীর অন্তরতলে যে কোনও গ্লানি আছে তিনি স্পষ্ট বুঝিতেই পারেন নাই। যুবরাজ চণ্ডের সহিত মধুশ্রীর পূর্ব পরিচয় এবং অনুরাগের কথা তিনি, শুধু তিনি কেন, কেহই জানিত না। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত বটে মধুশ্রীর মনে সুখ নাই—ইহাকে যুবতী রমণীর পক্ষে বৃদ্ধ পতি গ্রহণ করার স্বাভাবিক দুঃখ বলিয়াই তিনি মনকে বুঝাইয়াছিলেন।

বিবাহের পাঁচ বৎসর পর আজ রানা বানপ্রস্থ লইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার জানা ছিল, কুমার চণ্ডদেবই তাঁহার রাজ্যভার লইবার একমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তি। একদিনের প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার মনে ছিল না তাহা নহে কিন্তু সে বিষয়ে আর কোনও কথাবার্তা কখনও হয় নাই। সামন্ত-সর্দারেরাও চণ্ডের একান্ত অনুগত। প্রকৃতপক্ষে আজও তাঁহারা রঘুদেব ও মুকুলকে 'কুমার' বলিয়া সম্বোধন করেন—চণ্ডকে বলেন 'যুবরাজ'! সুতরাং বুঝা যায়, একদিনের অবিমৃষ্যকারিতায় চণ্ড যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেটাকে কেহই গুরুত্ব দেয় নাই। সেই ঘটনার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আজ রানা লখা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া মহৎকার্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন। গয়াতীর্থ যবন শত্রুর কবলিত; তিনি ধর্মযুদ্ধে যবনদের গয়াতীর্থ হইতে বিতাড়িত করিতে গিয়া প্রাণ দিবেন—ইহাই তাঁহার বাসনা।[7] সে যুগে এ কথায় কেহ বিস্মিত হইত না।

সকলেই রানার এ সাধু সংকল্পে সাধুবাদ দিল। সমস্ত দরবার একবাক্যে রানা লখার জয়ধ্বনি করিল। রানা লখা তখন সামন্ত-সর্দারদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'আমার অবর্তমানে যাহাতে আমার সন্তান-সন্ততিরা সিংহাসন লইয়া না বিবাদ করে তাই মেবার ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে আমি রাজ্যের একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে চাই। মহামন্ত্রী, সামন্ত সর্দারগণ, যুবরাজ চণ্ড, কুমার রঘুদেব, সকলেই এ স্থলে উপস্থিত। সর্বসম্মতিক্রমে এখানে সিদ্ধান্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

সকলেই রানার যুক্তি মানিয়া লইলেন।

রানা কহিলেন,—'যুবরাজ চণ্ড! আমার অবর্তমানে তুমিই মেবারের দায়িত্ব লইবে।'

যুবরাজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া পিতার চরণতলে রাখিলেন,—'রানা, আমার তরবারি মেবারের জন্য উৎসর্গ করিলাম।'

রানা স্বহস্তে তরবারি চণ্ডের হস্তে তুলিয়া দিলেন, চণ্ড তাহা কোষবদ্ধ করিলেন। রানার বুকের উপর হইতে একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। সামন্তসর্দারগণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মহামন্ত্রী আনন্দে যুবরাজ চণ্ডকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রানা কহিলেন,—'আমার অবর্তমানে তুমি যখন মেবারের দায়িত্ব লইলে তখন আমার ধর্মযুদ্ধে প্রাণদান করিতে আর কোনও কুণ্ঠা রহিল না; কিন্তু এখানেই কর্তব্য শেষ নহে। তুমি আমার একমাত্র সন্তান নহ। যুবরাজ, তুমিই বলো, কুমার রঘুদেবকে কোন্ জায়গীর দেওয়া যায়।'

—'কৈলোর দুর্গ এবং কৈলোর প্রদেশ। কুমার রঘুদেব এই প্রদেশের শাসনকর্তা হইবেন।'

সকলে সাধুবাদ করিয়া উঠিল। রঘুদেব পিতার চরণধূলি লইয়া স্বীকার করিলেন।

—'আর মুকুল? আমার কনিষ্ঠতম পুত্র? তাহাকে কোন জায়গীর দেওয়া যায়? চণ্ড, তুমি নির্ধারণ করিয়া দাও।'

—'মেবারের সিংহাসন।'

সমস্ত রাজসভা স্তব্ধ! সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

মহামন্ত্রী কহিলেন, 'সে কি?'

যুবরাজ চণ্ড প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,—'ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?'

—'আপনি যে পূর্বেই মেবারের সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব লইলেন?'

—'সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছি—সিংহাসনে বসিবার স্বীকৃতি দিই নাই। এ প্রতর্কের মিমাংসা তো পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশ্য রাজসভাতেই হইয়া গিয়াছে, মহামন্ত্রী!'

সভাসদবর্গের সাধুবাদ দিবার কথাও মনে পড়িল না।

সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'কিন্তু মুকুল বালকমাত্র।'

—'হইতে পারে। গোরা বাদলও যুবক ছিলেন না! প্রপিতামহ হম্বীর যখন মুঞ্জের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন তখন তিনিও বালকমাত্র ছিলেন।'

—'কিন্তু ও যে পাঁচ বৎসরের শিশু!'

—'যুবরাজ মুকুল নিঃসহায় নহেন। মহামন্ত্রীর মতো তাহার পরামর্শ-দাতা আছে, উপেন্দ্রবজ্রের মতো সেনাপতি আছেন—চণ্ডের মতো অভিভাবক আছে—যুবরাজ মুকুল নিঃসহায় নহেন।'

এতক্ষণে শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল।

রানা লখা পাঁচশত অনুচর লইয়া গয়াতীর্থের দিকে জীবনের শেষযুদ্ধ করিতে গেলেন। যাঁহারা বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌছিয়াছেন; জীবনে যাঁহাদের আর কোনও আকর্ষণ নাই,— ধর্মযুদ্ধে তীর্থস্থান অধিকার করিবার জন্য যাঁহারা মহারানার পার্শ্বে থাকিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন তাঁহারাই শুধু রানার সঙ্গী হইলেন। যাহারা যাইতে চাহিল রানা সকলকেই সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে স্থান দিলেন। শুধু একজন রাজপুত যোদ্ধাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার আবেদনে বিস্মিত হইয়া রানা কহিলেন,—'তুমি কেন আসিতেছ? তোমার তো বানপ্রস্থ লওয়ার বয়স হয় নাই।'

রাজপুত রানার চরণতলে পড়িয়া কহিল,—'সংসারের মোহ আমার কাটিয়াছে। দয়া করিয়া আমাকেও আপনার সঙ্গী করিয়া লউন।'

রানা কহিলেন,—'আত্মহত্যা মহাপাপ! তোমার দেহে এখনও প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণই দেখা দেয় নাই। এ বয়সে তো তোমার এ যুদ্ধে আসিবার অধিকার নাই।'

রাজপুত সাশ্রুনয়নে কহিল,—'প্রভু, জগতে আমার কোনও আকর্ষণ নাই। এক বিষময় স্মৃতি আমাকে বিভীষিকার মতো স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চলিয়াছে। এ দুঃস্বপ্নের অবসান করিতে দিন। আপনার চরণতলে আশ্রয় দিন।'

রাজপুতের বাহুমূল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া রানা কহিলেন,—'আমার অবর্তমানে মেবারের বিপদ আসিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। মারবাররাজ অতি ধূর্ত; সে আমার প্রস্থানের অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। ইহা ছাড়া আমি শুনিয়াছি উত্তরপথে এক দুর্ধর্ষ যবন বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থান জয় করিতে আসিতেছে। এক্ষণে তো মেবারের পক্ষে, ভারতবর্ষের পক্ষে, তোমার মতো লোকের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা ভিন্ন যিনি তোমার জীবন বিষময় করিয়াছেন তাঁহার করুণা ভিন্ন আত্মহত্যা করিয়া তো তোমার মুক্তি হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত তোমার এখনও বাকী আছে। তুমি ফিরিয়া যাও।'

ঘোষিতেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল, দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। পাঁচশত যোদ্ধা লইয়া রানা লখা জীবনের শেষ সমর করিতে চলিয়া গেলেন। সমস্ত মেবারী রাজপথে জমায়েত হইল। শুধু সেই প্রত্যাখ্যাত রাজপুত তাহার প্রিয় একটি আসবাগারের নিভৃত কক্ষে চষকের পর চষক মদিরায় ডুবিয়া রহিল।

দরবার-রাওয়ালার গল্প শুনিতে শুনিতে পাঠক আমাদের আরাবল্লী পাহাড়ের নওজোয়ানটিকে ভুলিতে বসিয়াছেন দেখিতেছি। কিন্তু এক্ষণে সে অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর নহে—পূর্ণ যুবাপুরুষ। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার জীবনেতিহাসে বিশেষ কোন স্বর্ণ-অধ্যায় রচিত হয় নাই। বুদ্বুদ সামান্য জমিদারী পাইয়াছে। সেকালে বেতনভুক সৈন্য চিতোরের রাজবাহিনীতে থাকিত অল্পই। অধিকাংশই জমি পাইত এবং কোনও সামন্তরাজা অথবা জায়গীরদারের অধীনে বিনা করে অথবা নামমাত্র খাজনা দিয়া জমি ভোগ করিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাহারা চাষবাস করিত এবং আহেরিয়ার দিন শিকার করিয়া ফিরিত। যেদিন রাজ্যের প্রয়োজনে ভেরী বাজিত সেদিন সকলেই চাষবাস ফেলিয়া সামন্ত রাজার পতাকাতলে সমবেত হইত রানায় সেবায়। সামন্ত রাজগণেরও নিজস্ব পতাকা ছিল। বুদ্বুদও এমন একটি ভূখণ্ড পাইয়াছিল—কিন্তু চাষবাস সে জানিত না—বিন্ধ্যাচলকে সে জমির উপস্বত্ব দিয়া দিয়াছিল—ভরণপোষণের বিনিময়ে। বস্তুত চিতোর ছাড়িয়া সে গ্রামে যাইতে চাহে নাই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাহার কাটিয়াছে সেই বিরাচ নদীতীরে, নিজ কুটিরে। এই পাঁচ বৎসরে অতি অল্প কয়েকবার মাত্র সে তিলাঞ্জলির সাক্ষাৎ পাইয়াছে। পাইবার কথাও নহে। নির্জন কুটিরে বসিয়া বসিয়া বুদ্বুদ ভাবিত তিলাঞ্জলিকে লাভ করিবার উপায়। বস্তুত যাহার সহিত অবরোধ-মধ্যে দেখা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহাকে বিবাহ করা যে সুদূরপরাহত তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে. তিলাঞ্জলিও আর ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকামাত্র নহে। এই দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে তাহার মন অন্যত্র সরিয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন তাহার সহিত তিলাঞ্জলির প্রভেদটা শুধু সাধারণ সৈনিক ও রাওয়ালার পুরনারীর প্রভেদ নহে, সে আহেরিয়া এবং তিলাঞ্জলি শিশোদীয়া রাজপুত রমণী। অবশ্য পাহাড়ীদিগের সহিত রাজপুতের বিবাহের নজির যে রাজোয়ারায় একেবারে নাই—তাহা নহে। স্বয়ং রানা অরিসিংহও একটি ভীল বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রানা হম্বীরের মাতা ছিলেন ভীলবালা।

বিন্ধ্যাচল নিজ জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে নাই—সুতরাং তাহারও ডাক পড়ে নাই। উদয়াচল উন্তালা গ্রামেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে। স্বর্গগত মেহরা সর্দারের যাবতীয় সম্পত্তি সেই দেখাশুনা করে। যাবতীয় সম্পত্তি বলিতে বলাবাহুল্য আত্মজা সমেত।

এবং এও বোধহয় বলা বাহুল্য এই উপলক্ষে উদয়াচলের বন্ধুবর্গ মেহরা সর্দারের গৃহে একদিন 'নেওতা' খাইয়াছে।

হিমাচল কিন্তু চিতোরেই আছে। যেস্থলে দিবারাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত হয় তাহাকেই যদি বাসস্থল বলা হয় তাহা হইলে আসবাগারের সেই নির্জন কক্ষটিই তাহার আবাসগৃহ।

শতভিষা এবং তাহার সঙ্গীর আর সাক্ষাত পায় নাই বুদ্বুদ! সেই রাত্রেই তাহারা চিতোর ত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু মান্দোরে যায় নাই—কারণ বুদ্বুদ গোপনে মান্দোরে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিয়াছে যে মান্দোরে তাহারা অনুপস্থিত।

বস্তুত শতভিষা এবং মীনকেতন চিতোর হইতে দিল্লী গিয়াছিল। সামান্য মারবার যুবরাজের পার্শ্বচর হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া তৃপ্ত থাকিবার লোক নহে মীনকেতন। সে বিশ্বাস করিত তাহার তীক্ষ্ণধী, অপূর্ব কূটবুদ্ধি, অদ্ভুত অসিশিক্ষা একমাত্র কোন রাজার পক্ষেই মানায় এবং সে রাজার রাজ্যসীমা ক্ষুদ্র মারবার মরুভূমির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে তাহার তৃপ্তি নাই। মীনকেতন দিল্লীর পাঠান সুলতানের স্নেহভাজন হইয়াছিল। পাঠান সুলতান ফিরোজ শাহ্ অবশ্য রাঠোরসর্দার মীনকেতনকে চিনিতেন না—তিনি চিনিতেন দাস-ব্যবসায়ী মীরকাশিমকে। প্রতি বৎসরই তাঁহার হারেমে এই যবনটি সারা ভারতবর্ষ হইতে সুন্দরী নারীরত্ন পৌঁছাইয়া দিত। গুর্জর, কান্দাহার এমন কি সুদূর পারশ্যদেশীয় ললনাদের সুকৌশলে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আসিত সে সুলতানের নিকটে। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল এই পাঠান ও তাহার সহধর্মিণী নৃত্যগীত-পারদর্শিনী শাৎভি বিবির উপর। ইহারা যখন তাঁহার কাছে রাজপুতানা বিজয়ের প্রস্তাব করিল—গোপনে সকল ষড়যন্ত্র করিবার আবেদন করিল তখন সুলতান মুগ্ধ হইলেন। রাজপুতানার হিন্দুরাজ্যগুলির উপর তাঁহার বরাবরই লোভ ছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের পর রাজস্থান বিজয়ের প্রচেষ্টা আর কেহ করে নাই। সুলতান রাজস্থানের যাবতীয় গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠাইলেন মীরকাশেম ও তাহার বিবিকে। খবর সংগ্রহ করিয়া চিতোর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিন্তু মীনকেতনের মুখ শুকাইল। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ইতিপূর্বেই ফৌত হইয়াছেন। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতণ্ডা। ইহা ভিন্ন উত্তরাঞ্চল হইতে এক দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় সর্দারের ভারত আক্রমণের গুজব রটিয়াছে। ভারত আক্রমণ অর্থ : দিল্লী আক্রমণ। শতভিষা এবং মীনকেতন অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া ঘুরপথে মান্দোরে ফিরিয়া চলিল।

রাজনৈতিক পরিবেশের দিক হইতে মেবারের দ্রুত পরিবর্তনগুলি বুদ্বুদ লক্ষ্য করিতেছিল ঠিকই। রানা লখা চলিয়া গিয়াছেন। রঘুদেব নিজ জায়গীর দেখিতে কৈলোর দুর্গে চলিয়া গেলেন। মেবারের রাজকার্যের সমস্ত দায়িত্ব এখন যুবরাজ চণ্ডদেবের। গিলোট রাজবংশের সিংহাসনে স্বর্ণসূর্যলাঞ্ছিত পতাকার নিম্নে পঞ্চবর্ষীয় শিশুটি গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে;—তাহারই পদতলে একটি মখমলের কামদার গালিচায় আচ্ছাদিত আসনে বসিয়া চণ্ডদেব দরবারের অমাত্যবর্গের অভিযোগ উপদেশ শোনেন। প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের দূতের বক্তব্য শোনেন—রানার ফরমান ছকিয়া দেন। সকল ফরমানে সহি করেন রানা মুকুল—কিন্তু চণ্ডের বল্লম-অঙ্কিত সীলমোহর না পড়িলে সে ফরমানের কোনও মূল্য নাই। এ ব্যবস্থা স্বয়ং রানা লখাই করিয়া গিয়াছেন।

রানা লখার অন্তর্ধানের পরে নবীন রানার মাতুল রাজমাতার আহ্বানে চিতোরে আসিলেন। সম্মানিত অতিথিকে সমাদর দেখাইতে একটি ভবন তাঁহার জন্য চিহ্নিত হইল। বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল মাতুল আসিলেন সাড়ম্বরে, বাস করিতেও লাগিলেন মহানন্দে; ফিরিয়া যাইবার নামও করিলেন না। উপরন্তু অনতিবিলম্বে রাও রণমল্লও আসিয়া দৌহিত্রের তদারকি শুরু করিলেন। বুদ্বুদ ভাবিল, রাজ্যের ভাগ্য দ্রুত বদলাইতেছে। সকলের ভাগ্যেই উত্থান পতন থাকে—শুধু তাহার ভাগ্যই স্থির হইয়া আছে। দেওয়ানী ফৌজে উন্নীত হইবার কোনও সম্ভাবনাই ইতিমধ্যে দেখা দেয় নাই।

এই সময় সহসা একদিন বুদ্বুদের আহ্বান আসিল। স্বয়ম্ভুর হস্তে পত্র দিয়া দুর্গমধ্যে তাহাকে দেখা করিতে লিখিয়াছে তিলাঞ্জলি। বুদ্বুদ উৎফুল্ল হইল। আজ একটা স্থিরসিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। তিলাঞ্জলি

যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি থাকে তবে কী উপায়ে এই বিবাহ সম্ভব হইবে তাহাও তাহাকে জানিতে হইবে।

রাত্রিকালে স্বয়ম্ভু তাহাকে লইয়া দুর্গমধ্যে সেই মীনার চূড়ায় আসিল। দীর্ঘদিন পরে বুদ্বুদ দেখিল তিলাঞ্জলিকে। বিদ্যুল্লতার মতো সঞ্চরমান ত্রয়োদশী লতিকা নহে—পূর্ণাবয়ব যুবতীর সম্মুখে সে যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তিলাঞ্জলির কথাবার্তাতেও কেমন যেন গাম্ভীর্য আসিয়াছে। আজ প্রায় তিন বৎসর পরে উভয়ের সাক্ষাত।

বুদ্বুদও আর কিশোর নহে। পূর্বেকার মতো উচ্ছ্বাসে আবেগে সে তিলাঞ্জলির করগ্রহণ করিল না। কহিল—'আমাকে ডাকিয়াছ কেন?'

—'আমি তোমাকে ডাকিয়াছি বলিয়া তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ?'

—'বিরক্ত? না, ডাকিয়াছ বলিয়া বিরক্ত হই নাই—বরং এতদিন ডাক নাই বলিয়া দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু মনে হইতেছে প্রথমবারে তুমি যেমন আমাকে শুধু কাজের জন্য ডাকিয়াছিলে আজও তেমনি শুধু কাজের জন্যই স্মরণ করিয়াছ।'

—'প্রয়োজনেই তো লোকে বন্ধুকে স্মরণ করে।'

—'না! প্রয়োজনে শুধু ভৃত্যকেই স্মরণ করে লোকে—বন্ধুকে উৎসবে এবং ব্যসনে উভয় দিনেই স্মরণ করার কথা।'

—'উৎসব তো ইতিমধ্যে এখানে হয় নাই—তবে শীঘ্রই একটি হইবে, তখন বন্ধুকে স্মরণ করিব।'

—'উৎসব? কী উৎসব?'

তিলাঞ্জলি জবাব দিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

—'বুঝিয়াছি! আমি ইতিপূর্বেই ও আশঙ্কা করিয়াছিলাম। বস্তুত এতদিন কোনও রাজপুতানীই অবিবাহিত থাকে না—তুমি বা কী করিয়া ছিলে ভাবিয়া আমার বিস্ময় জন্মিত। তাই কি আমায় স্মরণ করিয়াছ?'

—'উৎসবের দিনে বন্ধুকে স্মরণ করিব না?' মাথা না তুলিয়াই তিলাঞ্জলি জবাব দিল। বুদ্বুদের আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। তাই আজ তিলাঞ্জলি তাহাকে বিদ্রূপ করিতে, অপমান করিতে ডাকিয়াছে। তিলাঞ্জলির জন্ম শিশোদীয়া বংশে—বড় ঘরেই তাহার বিবাহ হইবে। হয়তো কোন বড় ঘরের যুবক—কোন বড় জায়গীরদারও হইতে পারে। তাই আজ আহেরিয়া স্তাবকটিকে ডাকিয়া সে উৎসবের ইতিহাস শুনাইতেছে। বুদ্বুদের বুকের ভিতর জ্বালা করিতেছিল। মনোভাব গোপন করিয়া সে বলিল,—'পাত্র কী করেন?'

—'রাজপুতানার একজন রাজা।'

—'রাজা? বড় জায়গীরদার?'

—'বড় জয়গীরদারকে রাজা বলে না। তিনি রাজাই।'

—'ও!'

উভয়েই নীরব।

বুদ্বুদ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—'এ আনন্দসংবাদে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। এ কথা আমাকে ডাকিয়া শুনাইবার প্রয়োজন ছিল না। রাওয়ালার এ গোপন সংবাদ রাজরক্ষীদের কর্ণে ঠিক সময়েই পৌঁছিত। ইতরজন মিষ্টান্ন পাইয়াই ধন্য।'

তিলাঞ্জলি কোনও জবাব দিল না। নতনেত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বুদ্বুদের কেমন সন্দেহ হইল। চিবুক ধরিয়া তুলিতেই চন্দ্রালোকে দেখিল তিলাঞ্জলির তিলচিহ্ন-লাঞ্ছিত কপোল বাহিয়া নিমীলিত আঁখিপল্লব হইতে দুইটি জলের ধারা নামিয়াছে। তিলাঞ্জলি কাঁদিতেছে। বুদ্বুদ তাহার করপদ্ম গ্রহণ করিতেই ছিন্নমূল লতার মতো তাহার কবাট বক্ষে তিলাঞ্জলি মুখ লুকাইল।

তবে তো তিলাঞ্জলি তাহাকে আজও ভালবাসে। রাজেন্দ্রাণী হইবার আকর্ষণেও তো তিলাঞ্জলি তাহার সামান্য প্রেমিক সৈনিককে ভোলে নাই। বুদ্বুদই তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া বুদ্বুদ তিলাঞ্জলিকে নিজ পার্শ্বে বসাইল। ধীরে ধীরে তাহার নিকট সমস্ত শুনিয়া তাহার রক্ত

মাথায় চড়িয়া গেল। দরবার-রাওয়ালার অভ্যন্তরে যে এতকাণ্ড চলিতেছে, সে সামান্য রক্ষী, বাহির হইতে তাহার বিন্দুমাত্র সংবাদ পায় নাই।

গত পাঁচ বৎসরের ভিতর যুবরাজ চণ্ডের সহিত মুকুলজননীর একবারও বাক্যবিনিময় হয় নাই। উভয়েই উভয়কে পরিহার করিয়া চলিতেন। রানা লখার মৃত্যু-সংবাদ আসিবার পর হইতে রাণী বৈধব্য বেশ পরিতেন। তাঁহাকে সহ-মরণে যাইতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন রানা লখা। চণ্ড প্রত্যূষে উঠিয়াই কুমার মুকুলকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। পঞ্চবর্ষীয় কুমারের সহিত বিংশতি বর্ষীয় কুমার অসিযুদ্ধ করিতেন। বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেলা এক প্রহর হইলে উভয়ে ফিরিতেন। তখন দরবার বসিত। দুইভায়ে দরবারে রাজকার্য চালাইতেন। মধ্যাহ্নে মুকুল জননীর নিকট আসিতেন। পুনরায় বৈকালে কুমার চণ্ড শিশুরানাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। চণ্ড মুকুলকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি মুকুলকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিতে মনোনিয়োগ করিলেন। এইভাবেই মেবারের রাজপুত্রেরা যুগে যুগে মানুষ হইয়াছে। চণ্ড নিজেও হইয়াছেন। কিন্তু রাও রণমল্ল এবং যোধরাও মুকুলজননীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলেন। জিনিসটা তাঁহারা সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। মধুশ্রীকে তাঁহারা বুঝাইলেন চণ্ডের উদ্দেশ্য এইভাবে অস্ত্রশিক্ষা দিতে দিতে আকস্মিক দুর্ঘটনার ছলনা করিয়া মুকুলজীকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওয়া। বস্তুত দুই কুমার যখন বনেজঙ্গলে রক্ষকবিহীনভাবে শিকারের সন্ধানে যান তখন এইরূপ দুর্ঘটনার মনগড়া কাহিনী রচনা করা কঠিন হইত না।

বুদ্বুদ অধীর হইয়া প্রশ্ন করিল,—'রাণীমা বিশ্বাস করিলেন? আমাদের দেবতুল্য যুবরাজ চণ্ডদেবকে তিনি অবিশ্বাস করিলেন?'

তিলাঞ্জলি কহিল,—'হ্যাঁ, কারণ এই সময় অসিশিক্ষার আসরে সত্যই অতর্কিতে যুবরাজের অসির সূচ্যগ্র আঘাতে মুকুলজীর কণ্ঠে একটা ক্ষত হইল। আঘাত আরও একটু গুরুতর হইলে রানার মৃত্যুও অসম্ভব হইত না। এই আঘাতের পরই রাণীমা মুকুলজীর অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা রদ করিলেন।'

বুদ্বুদ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—'অতি নীচ মন তোমাদের রাণীমার।'

—'চুপ! ও কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিও না।'

—'কেন করিব না, লক্ষবার করিব। যুবরাজের অস্ত্রাঘাতে স্বচক্ষে মুকুলজীকে হত হইতে দেখিলেও আমি বিশ্বাস করিতাম না, চণ্ডদেব এই দুরভিসন্ধি লইয়া স্বহস্তে মুকুলজীকে বধ করিলেন।'

—'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা উঠে না। শুনিয়া রাখ রাণীমা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।'

—'তাই তো বলিতেছিলাম—তোমাদের রাণীমার মন অতি নীচ।'

তিলাঞ্জলির ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

—'হাসিতেছ কেন?'

—'হাসিতেছি কারণ তুমি ভুল বলিতেছ বলিয়া।'

—'ভুল বলিতেছি? রাণীমার সন্দেহ নীচ মনের পরিচয় দেয় না?'

—'না!'

—'না? তুমিও বিশ্বাস কর!' বুদ্বুদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিলাঞ্জলি তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিরা তাহাকে বসাইয়া বলিল,—'তুমি আসল কথাটাই ভুলিয়াছ। মারবার রাজকন্যা মধুশ্রী একদিন যুবরাজকে ভালবাসিয়াছিলেন।'

—'সে তো জানি। তাই কী?

—'ভালবাসাটাই হয়ত ভুল। ভালবাসিলেই মানুষে সহজে ভুল বুঝে, ভুল করে। রাণীমার অন্তরের অব্যক্ত ভালবাসার কোন মর্যাদাই দিলেন না যুবরাজ। ভ্রান্ত আত্মাভিমানে রাণীমার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিলেন। রাণীমার নিরুদ্ধ ভালবাসা অন্তরে এতদিন গুমরিয়া মরিতেছিল—তিনি আঘাতই পাইয়াছেন—প্রত্যাঘাত করিতে পারেন নাই। তাই সহজেই তিনি ভুল করিলেন।'

—'তাই বলিয়া এত বড় ভুল? যাহাকে এত ভালবাসিতেন—'

—'তাই হয়। তুমিও তো একজনকে অত্যন্ত ভালবাসিতে। যেই শুনিলে কোন রাজার সহিত তাহার বিবাহ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—এবং নিভৃতে সে তোমাকে সেই কথা ডাকিয়া জানাইতেছে—

অমনি তুমি ভুল করিলে। ভাবিলে, তোমাকে অপমান করিবার জন্যই সে তোমাকে নির্জনে ডাকিয়াছে। ভালবাসাটাই হয়তো ভুল—ভালবাসিলেই সকলে সহজে ভুল করে।'

বুদ্বুদ লজ্জিত হইল। কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। তবুও সে বলিল,—'কিন্তু রাণীমা কেন ভাবিলেন দুঃখ তিনি একাই পাইয়াছেন? যুবরাজ চণ্ডদেবের জীবনও যে ব্যর্থ হইয়া গেল একথা কেন তাঁহার মনে পড়িল না।'

—'পড়ে না। যাহাকে ভালবাসিয়াছি সে যদি ভালো না বাসে তাহাও বুঝি সহ্য হয়—কিন্তু যাহার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি সেইখান হইতেই আঘাত আসিলে মানুষ সব ভুলিয়া যায়। অপর পক্ষও যে অনুরূপ দুঃখ পাইতে পারে একথা মনে পড়ে না।'

বুদ্বুদ ভাবিতেছিল, এই অষ্টাদশী কুমারী কি প্রেমের সবশিক্ষা শেষ করিয়াছে! এতকথা তো সে কখনও ভাবে নই। অল্প থামিয়া তিলাঞ্জলি কহিল,—'যদি পড়িত তবে তুমিও দেখিতে পাইতে রাজেন্দ্রাণী হইবার সম্ভাবনায় আমারও অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে—তোমারই মতো।'

বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির করাঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিল, কহিল,—'তারপর বল।'

—'তারপর হইতে চণ্ডদেব যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। যন্ত্রের মতো সমস্ত কার্য করিয়া যান। একবার সামন্ত সর্দারগণকে নিভৃতে ডাকিয়া তিনি বিদায় চাহিয়াছিলেন। সর্দারেরা তাঁহাকে বিদায় দিতে স্বীকৃত হয় নাই—কারণ তাঁহারা দেখিতেছিলেন : মেবারের সিংহাসনের উপর ধূমকেতুর করাল ছায়া পড়িয়াছে।'

—'ধূমকেতুর করাল ছায়া? তাহার অর্থ?'

—'দেখিতেছ না? মারবাররাজ রাও রণমল্ল, যুবরাজ যোধা ফিরিবার নাম করিতেছেন না। রানার নিকট আত্মীয়গণ আপনা হইতে না গেলে কেহ তাঁহাদের চলিয়া যাইতে বলিতে পারে না। অথচ তাঁহারা জাঁকাইয়া বসিতেছেন। অভিমান করিয়া চণ্ডদেব রাজকার্যে অবহেলা করিলে রণমল্ল রানার স্বার্থ দেখিতে ছুটিয়া আসেন।'

'বুঝিলাম! কিন্তু তুমি তো শুধু রাজনীতির কথাই বলিতেছ। তোমার কথা বলিতেছ না কেন?'

—'আমার কথা কী বলিব?'

—'তুমি কোথাকার রাজপরিবার আলোকিত করিতে চলিয়াছ?'

—'মেবারের রাওয়ালা হইতে মারবারের রাওয়ালায়।'

—'সে কি! যুবরাজ যোধা?'

—'না।'

—না? কিন্তু রাও রণমল্লের তো আর কোনো বিবাহের উপযুক্ত পুত্র নাই।'

—'সুতরাং—।'

—'সুতরাং?'

—'রানা লখার সহিত রাও রণমল্ল আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই রানা লখার উপর টেক্কা মারাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার রাজ্যও আজ গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। শুধু বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করার প্রতিযোগিতাতেই তিনি পরাজিত হইবেন?'

—'রাও রণমল্ল! পলিতকেশ, বৃদ্ধ রাও রণমল্ল! তোমাকে?'

বুদ্বুদ উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনরায় তিলাঞ্জলি তাহাকে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া বসাইল। রাজমাতাই বর্তমানে রাওয়ালার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। পাত্রীপক্ষের অভিভাবিকা। তিনি এ বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। বস্তুত রাণীমাতা যেন দুনিয়ার উপর প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছেন—না হইলে যে সর্বনাশ তাঁহার নিজের হইয়াছে সেই সর্বনাশই অপর কাহারও ভাগ্যে আরোপিত করিতেন না। যুবরাজ চণ্ডদেবকে একথা এখনও জানানো হয় নাই। চণ্ড অধিকাংশ সময়ই পথে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান—যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া আর নূতন আঘাত দিতে তিলাঞ্জলির মন সরে না। তাহা ভিন্ন সে জানে চণ্ডদেব তাহার অভিভাবক নহেন—রাওয়ালার অধিকার রাজমাতার। আয়ী-মা পর্যন্ত একথা এখনও জানেন না।

বুদ্বুদ কহিল,—'এক্ষণে কী করতে চাও? আচ্ছা আমি যদি তোমাকে লইয়া পলাইয়া যাই?'

—'সে সম্ভব নহে। এ রাজ অবরোধ হইতে পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব। তাহা ভিন্ন সমস্ত রাজপুতানার মধ্যে আমাদের কে আজ আশ্রয় দিবে?...আমি অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করিতেছি। যথাসময়ে তোমাকে জানাইব।'

—'ইতিমধ্যে যদি কিছু হয়—যদি দুই একদিনের মধ্যেই বিবাহ ব্যবস্থা হইয়া যায়?'

—'তাহা হইবে না। উহারা এখন চণ্ডদেবকে লইয়া ব্যস্ত। প্রথমে চণ্ডদেবকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবে। তারপর আমার দিকে মন ফিরিবে। তাহা ভিন্ন যুবরাজ উপস্থিত থাকিতে উহারা এতটা সাহস পাইবে না।'

—'যদি পায়?'

—'তাহা হইলে আমি তোমাকে সংবাদ দিব এবং পলায়নের শেষ চেষ্টা করিব। স্বয়ম্ভু আমাদের সহায়। প্রয়োজন হইলে যুবরাজ চণ্ডদেবকেও সব কথা জানাইব।'

এই কথাই স্থির করিয়া উভয়ে বিদায় লইল। যাইবার সময়ে বুদ্বুদ সহসা কহিল,—'আমরা যদি কুমার রঘুদেবের আশ্রয়ে কৈলোর দুর্গে আশ্রয় লই?'

—'রঘুদেব পরম ধার্মিক, এ বিবাহে তিনি সম্মত হইবেন না।'

—'কেন?'

—'কারণ তুমি রাজপুত নহ।'

নতমস্তকে বুদ্বুদ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কয়দিন বুদ্বুদ তাহার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল না। কি জানি যদি স্বয়ম্ভু তিলাঞ্জলির অন্তিম আহ্বান লইয়া আসে; তাহাকে গৃহে না দেখিয়া ফিরিয়া যায়। তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করার নানা উপায় ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিনগুলি অতিবাহিত হয়। উদ্ধারের যেসব পরিকল্পনা তাহার মাথায় আসে সবগুলিই রোমাঞ্চকর বটে কিন্তু প্রত্যেকটিই উদ্ভট এবং অবাস্তব। এ বিষয়ে হিমাচলের সহিত একটা পরামর্শ করিবে কিনা অনেকবার ভাবিয়াছে। হিমাচলও তিলাঞ্জলিকে যথেষ্ট স্নেহ করে।

উপরিলিখিত ঘটনার পর আন্দাজ একপক্ষকাল অতীত হইলে একদিন অতি প্রত্যূষে বুদ্বুদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দ্বারে কে যেন করাঘাত করিতেছে। দ্বার উন্মোচন করিয়া বুদ্বুদ দেখিল হিমাচল। দীর্ঘদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেল—কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিল গুরুতর কিছু হইয়াছে।

বুদ্বুদ কহিল,—'কী হইয়াছে হিমাচল?'

—'এক্ষুণি তৈয়ার হইয়া লও। আমাদের দূরদেশে যাইতে হইবে।'

—'দূরদেশে? কিন্তু এক্ষণে তো আমার পক্ষে চিতোর ত্যাগ করা অসম্ভব।'

—'অসম্ভব? কেন?'

—'ব্যক্তিগত কারণে!'

—'বুদ্বুদ। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া কিছু নাই। ভুলিও না, মেবারের জন্য আমরা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। দেওয়ানী ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিকের জীবন তাহার নিজের জন্য নহে।'

বুদ্বুদ বলিল না—সে দেওয়ানী ফৌজভুক্ত নহে। কহিল,—'কী হইয়াছে আমাকে বল।'

—'বলিব, কিন্তু একবিন্দু সময় নষ্ট করিতে পারিব না। আমাকে এক্ষুণি যাইতে হইবে। তুমি যদি আইস তবেই পথে তোমাকে সব কথা বলিতে পারি।'

বুদ্বুদ উঠিল। তৈয়ার হইতে হইতে বলিল,—'তোমার সহিত পথে নামিতেছি। কিন্তু মাপ করিও সর্দার, তোমার সহিত নিরুদ্দেশে যাইতে পারিব না। পথে তোমার বিপদের কথা শুনিয়া আমি প্রত্যাবর্তন করিব।'

হিমাচল আপত্তি করিল না। সে ধ্রুব জানত, তাহার বক্তব্য শোনার পর বুদ্বুদ আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

উভয়ে অস্ত্রসজ্জা করিয়া অশ্বারোহণে বাহির হইল। হিমাচলের বক্তব্য শুনিয়া সত্যই বিচলিত হইল বুদ্বুদ। এই একপক্ষকালের মধ্যে মেবারের ভাগ্যচক্র আর এক পাক ঘুরিয়াছে।

সেদিন কোনও কারণবশত যুবরাজ চণ্ডদেবের সারারাত্র নিদ্রা হয় নাই। পরদিন তিনি অসুস্থ বোধ করায় দরবারে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। সুতরাং দরবার বসিবে না। দরবারে তখন সমস্ত সামন্তরাজগণ, মহামন্ত্রী, যোধরাও, রাও রণমল্ল সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহামন্ত্রী তখন বলিলেন,—'তাহা হইলে আজ দরবার বসিতে পারে না।'

সহসা যোধরাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

উপেন্দ্রবজ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি হাসিলেন কেন?'

—'হাসির কথায় হাসিব না? আমাদের ধারণা ছিল মেবার শাসন করেন—মেবারের রানা। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে দরবার বসিবে না এটা হাস্যকর কথা নহে?'

উপেন্দ্রবজ্র নীরব হইলেন।

মহামন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন,—'মহামতি চণ্ডদেবের সীলমোহরাঙ্কিত না হইলে রানার ফরমান তো সিদ্ধ হইবে না—'

যোধরাও কহিলেন,—'সিংহাসনে না বসিয়াও তাহা হইলে রানাগিরি করা চলে।'

এ বক্রোক্তি সহ্য করিতে হইল সকলকে।

রাও রণমল্ল কহিলেন,—'এতগুলি লোক সমবেত হইয়াছে. অনেক প্রার্থীও আছে। তাহাদের আর্জি রানা শুনিতে পারেন। তাঁহার ফরমানও জারী হইতে পারে। অবশ্য চণ্ড অনুমোদন না করিলে কী হইবে সে পরের কথা। কিন্তু এই সামান্য অজুহাতে রানা এতগুলি দূরদেশ হইতে সমাগত প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন ইহাও তো শোভন নহে।'

মহামন্ত্রী কহিলেন,—'কিন্তু তিনি না থাকিলে রানা কি স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিবেন? দাদাকে ছাড়া আর কাহাকেও উনি—'

বাধা দিয়া রাও রণমল্ল বলিলেন,—'কেন বসিবে না। দাদুভাই এস তো। বৃদ্ধ রাও রণমল্ল উঠিয়া গিয়া বালকের বাহুমূল ধরিলেন। বালক বিহ্বল হইয়া চারিদিকে চাহিল শুধু। বালককে জানুর উপর লইয়া রাও রণমল্ল সিংহাসনের উপর উঠিয়া বসিলেন। দৃশ্যটা অনেকেরই মনোমত হইল না।

সামন্ত সর্দারগণ অধোবদন হইলেন। উপেন্দ্রবজ্র ধীর পদ-বিক্ষেপে দরবার তাগ করিলেন। মহামন্ত্রী ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিলেন। রানা সিংহাসনে বসিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভাটগণ রানার বন্দনা সংগীত গাহিল।

মহামন্ত্রী বুঝিলেন, এস্থলে অপমান সহ্য করিয়া রাজকার্য চালাইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।

ধীরে ধীরে প্রার্থীরা আপন বক্তব্য পেশ করিতেছিল। রাজকার্য ঠিকমত চলিয়াছে। সিংহাসনের ঠিক নিম্নের একটি কাষ্ঠাসন যে শূন্য পড়িয়া রহিল তাহা হয়তো কাহারো খেয়াল হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ রণমল্ল অন্যমনস্কভাবে নিম্নস্থিত সেই আসনে একটি চরণ স্থাপিত করিয়া আরাম করিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বালক বলিল,—'ওখানে পা রাখিও না। ওটায় দাদাভাই বসে।'

বৃদ্ধ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন,—'চুপ চুপ দাদাভাই। কথা বলিতে নাই, দরবার হইতেছে।'

—'তাহা হউক, তুমি পা নামাও।'

রণমল্ল বিনাবাক্যব্যায়ে পা নামাইয়া লইলেন।

বালক স্থির হইল।

দরবার প্রহরখানেক অতিবাহিত হইলে উপেন্দ্রবজ্রের নিকট সংবাদ পাইয়া চণ্ডদেব স্বয়ং আসিলেন। দ্রুতপদে অসুস্থ শরীরে তিনি দরবারে আসিয়া প্রবেশ পথেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে টলিয়া উঠিল। মুকুলজী কখন সকলের অলক্ষ্যে মাতামহের ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নের কাষ্ঠাসনের উপর খেলা করিতেছেন। শিশোদীয়া রাজবংশের স্বর্ণসিংহাসনে গিলোট বংশের রাজছত্রতলে মারবারের নৃপতি রাও রণমল্ল বসিয়া নিজেই প্রার্থীদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দরবার কেন করা হইল এই কৈফিয়ত তলব করিতেই আসিয়াছিলেন চণ্ডদেব—কিন্তু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সর্বশরীরে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। তিনি সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন—কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তাঁহার দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়িল রাও রণমল্লের। তিনি রাজকুমারের দৃষ্টির ভিতর কী দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। সমস্ত দরবার তখন তাঁহাকে দেখিয়াছে। কাহারও মুখে বাক্য সরিতেছে না।

সহসা যোধরাও কহিলেন,—'কী হইল? দরবার চলুক।'

যুবরাজ চণ্ডদেব একটিও কথা কহিলেন না। মদ্যপের মতো টলিতে টলিতে দরবার কক্ষের দ্বার হইতেই ফিরিয়া গেলেন।

যোধরাও কহিলেন, 'পিতা, রানাকে ক্রোড়ে লইয়া বসুন।'

কিন্তু রণমল্লের আর সাহস হইল না। চণ্ডদেবের তৃতীয় নয়নের আগ্নেয়গিরি তিনি চকিতের মধ্যে দেখিয়া লইয়াছেন। সামন্ত সর্দারদের মূর্তি দেখিয়াও বুঝিলেন একদিনে এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক হইবে না। যোধরাও কিন্তু নাছোড়বান্দা। কহিলেন,—'মাঝপথে তো সহসা দরবার শেষ হইতে পারে না। মুকুল, উঠিয়া বস।'

মুকুলকে তিনি উঠাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন।

সামন্তসর্দারেরা পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। কিছু বলা উচিত হইবে কিনা কেহই যেন স্থির করিতে পারিলেন না। মহামন্ত্রী মস্তক অবনত করিলেন।

সহসা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এক বৃদ্ধা। মুকুলের বাহু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—'রানা, আপনি ভিতরে আসুন। দরবার শেষ হইয়াছে।'

যোধরাও গর্জন করিয়া উঠিলেন,—'তুমি কোন্ অধিকারে মুকুলের গাত্র স্পর্শ কর?'

বৃদ্ধা আয়ীমাতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। মহামন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'মহামন্ত্রিজী! আমি কোন্ অধিকারে মেবারের মহারানার গাত্রস্পর্শ করি এ প্রশ্নের জবাবটা আপনিই দিবেন। মারবারের কুমার হয়তো আমার পরিচয় জানেন না। হয়তো তিনি জানেন না, সমগ্র রাজস্থানে রানার গাত্রস্পর্শ করিবার আমারই আছে অগ্রাধিকার। জননীর জঠর হইতে জন্মলাভ করিলে মাতা ধরিত্রী রানার গাত্রস্পর্শ করিবার পূর্বেই আমি মহারানার গাত্রস্পর্শ করিয়াছি। এ অধিকার আমার বংশানুক্রমিক অধিকার। কিন্তু মহামন্ত্রিজী! অধিকারের প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন আপনি বলিতে পারেন, মারবারের রাজকুমার সিংহাসনে-আসীন মেবারের মহারানাকে 'রানা' সম্বোধন না করিয়া কোন্ অধিকারে নাম ধরিয়া ডাকেন?'

কোন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আয়ীমা রানাকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৃপ্তপদক্ষেপে দরবার ত্যাগ করিয়া গেলেন। মুখ মসীবর্ণ করিয়া যোধরাও এবং রাও রণমল্ল সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বুদ্বুদ কহিল—'তারপর?'

—'তারপর সবকথা আমি জানি না—তিলাঞ্জলির নিকটে যেটুকু শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।'

—'তিলাঞ্জলির সহিত তোমার সাক্ষাত হইয়াছিল? কোথায়?'

—'সেকথা অবান্তর। শোন।'

অতঃপর হিমাচল বলিল, যোধরাও এবং রণমল্ল অপমানে কম্পিত-কলেবরে দরবার হইতে সোজা রাণীমাতার কক্ষে আসিলেন। রাণীমাতা প্রস্তর প্রতিমার মতো বসিয়াছিলেন। যোধরাও কহিল,—

—'মধুশ্রী, তোমাদের শিশোদীয়া ধাত্রী আমাদের যার-পর-নাই অপমান করিয়াছে।'

রাণী কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না।

—'অবিলম্বে ঐ উদ্ধত ধাত্রীর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে আমরা মান্দোরে ফিরিয়া যাইব।'

রাণী কহিলেন,—'কবে?'

—'কী কবে?'

—'কবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে?'

যোধরাও হতবাক্ হইলেন। রণমল্ল কহিলেন,—'তুমি ধাত্রীর অন্যায় প্রশ্রয় দিতেছ?'

—'আয়ীমা তো অন্যায় করে নাই। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারানাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিবার অধিকার সত্যই তো রাজওয়ারার কোনও রাজপুত্রের নাই।'

রণমল্ল কহিলেন,—'রানা কি যোধার ভাগিনেয় নহে?'

—'যতক্ষণ সিংহাসনে আছেন ততক্ষণ তিনি মেবারের রানা। তাহা না হইলে ছোট ভাইয়ের পদতলে বড় ভাই কখনও রাজ্য পরিচালনা করে না—রানা বলিয়াই করে।'

যোধরাও চিৎকার করিয়া উঠিল,—'চণ্ডের সহিত তুই আমার তুলনা করিস্?'

—'না, করি না! কেমন করিয়া করিব! শার্দুলের সহিত শৃগালের তুলনা হয়?'

যোধরাও খুশী হইয়া বলিলেন,—'তাই বল্।'

—'তাই তো বলিতেছি—তিনি পুরুষ-সিংহ। তুমি শৃগাল হইয়া তাঁহার উপমান হইবে কিরূপে? কিন্তু আর বিরক্ত করিও না, আমার শরীর খারাপ। তোমাদেরও স্নানাহারের সময় হইয়াছে।'

মধুশ্রী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন যোধরাও পিতাকে কহিলেন,—'এ অপমানের পর এক মুহূর্ত আর এখানে নহে।'

রণমল্ল কহিলেন,—'তবে মান্দোরে গিয়া রাব্‌রির [৪] চাষ কর।'

—'তুমি যাইবে না?'

—'আমাকে তো মধুশ্রী অপমান করে নাই। আমার আত্মাভিমান অত তীক্ষ্ণও নহে—অত নির্বোধও নহি আমি। আমি সেই মরুভূমির দেশে ছুটিব কেন?'

মুখ কালো করিয়া যোধরাও নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন।

বুদ্বুদ কহিল,—'বুঝিলাম। কিন্তু তুমি যাইতেছ কোথায়?'

—'আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। রাণীমার সহিত মারবার রাজা ও রাজপুত্রের সাক্ষাতের পূর্বেই যুবরাজ চণ্ডদেবের সহিত রাণীমার সাক্ষাত হয়।'

—'তাই নাকি? সে কথাও বলিয়াছে তিলাঞ্জলি। বল শুনি।'

রাজদরবার হইতে টলিতে টলিতে চণ্ডদেব নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন না—আসিলেন সোজা রাণীমাতার কক্ষে। দাসীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইয়া আজ দীর্ঘদিন পরে মহামতি চণ্ডদেব মুখোমুখি দাঁড়াইলেন রাজমাতা মধুশ্রীর।

চণ্ড কহিলেন,—'আপনি কী চাহেন? আজ স্বচক্ষে দেখিয়া অসিলাম মেবারের সিংহাসনে আপনার পিতা বসিয়া রাজকার্য চালাইতেছেন।'

মধুশ্রী জীবনে প্রথম কথা কহিলেন চণ্ডের সহিত—কিন্তু সে কণ্ঠস্বরে একবিন্দু মাধুর্য নাই—'আপনি কি মনে করেন সিংহাসনে বসিলেই রানা হওয়া যায়—এবং সিংহাসনের একধাপ নিচে বসিয়া রাজ্যের কলকাঠি চালাইলে তাহাকে রানা হওয়া বলে না।'

—'আপনি কী বলিতেছেন?'

—'বলিতেছি 'রানা' এই শব্দটির চরম অপমান তো আপনারই হস্তে হইয়াছে। আমার মুকুলকে সিংহাসন দিয়া ভুলাইয়া আপনিই তো রাজত্ব করিতেছেন। এই আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা?'

চণ্ডের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলিয়া উঠিল। দুর্বল শরীরে আঘাতের পর আঘাতে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইলেন। বক্ষের পঞ্জরে কে যেন তীক্ষ্ণধার একখানি ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। আর্ত ভগ্নকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—'এ কী বলিতেছ মধুশ্রী!'

—'মধুশ্রী নয়। রাজমাতা।'

—'হাঁ, হাঁ, রাজমাতা। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

আবার মাতালের মতো টলিতে টলিতে তিনি নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্বুদের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; কহিল,—'তারপর?'

—'মহামতি চণ্ডদেব স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাইতেছেন। একশত ভীল শুধু তাঁহার সঙ্গে যাইবে। প্রাণের চিতোর তিনি চিরজন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহারই নিকট যাইতেছি। এ জীবনের বাকী

দিন কয়টা কুমারের সেবায় নিয়োজিত করিব। রানার মাতা আছেন, মাতুল আছেন, মাতামহ আছেন—তাঁহার আর প্রয়োজন হইবে না আমার মতো নগণ্য যোদ্ধার। তাই তোমাকেও লইতে আসিয়াছি। তুমি যাইবে না কুমারের সঙ্গে?'

তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল,—কহিল,—'যাইব না?'

রাজকুমার চণ্ডদেব আজ চিরকালের জন্য চিতোর ছাড়িয়া যাইবেন। সমস্ত চিতোর তাই শোকে মুহ্যমান। রানা লখার যুদ্ধযাত্রার দিনেও বোধকরি সকলে এত মুহ্যমান হয় নাই। চণ্ডদেব অতি প্রত্যূষে উঠিলেন। আজ তাঁহার অনেক কাজ। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই রাজপ্রাসাদ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু যাত্রার ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখিলেন বস্তুত কিছুই তাঁহার করণীয় নাই। আজীবনের সঙ্গী প্রিয় অশ্বটি,—নিজস্ব যোদ্ধৃবেশ ভিন্ন সঙ্গে লইবারও কিছু নাই। বেলা বাড়িল। একে একে সকলেই আসিল। কাঁদিল। বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। অথচ যাহারা প্রত্যহ সর্বপ্রথমেই আসিত তাহারাই আসিল না। তিলাঞ্জলি সকাল হইতে একবারও আসে নাই। মুকুলদেব 'দাদা' বলিয়া প্রতিদিনের মতো কোলের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল না, চণ্ডদেব ইতস্তত করিলেন। তিলাঞ্জলি, আয়ীমাতা এবং মুকুল সকলেই রাণীমাতার মহলবাসী—চণ্ডদেবের সহিত মহারাণীর মহলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানের ব্যবধান। অবশেষে যুবরাজ সংবাদ পাঠাইলেন। অল্পপরে তিলাঞ্জলি আসিয়া দাঁড়াইল। বিষাদ মূর্তি। সম্ভবত সমস্ত রাত্রি সে ঘুমায় নাই। চোখ দুইটি লাল হইয়া আছে। চণ্ডদেব কহিলেন,—'মুকুল আসিবে না?'

তিলাঞ্জলি নিরুত্তর। নতনেত্র হইতে তাহার অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়ে।

—'যাইবার পূর্বে কি উহারা একবার মুকুলকে দেখিতে দিবে না?'

তিলাঞ্জলি কী বলিতে গেল। উদ্‌গত অশ্রুর প্রাবল্যে কিছুই বলিতে পারিল না। চণ্ডদেব ধীরে ধীরে কহিলেন,—'বুঝিলাম। সে কী করিতেছে?'

—'তাহাকে আনিতেছি' বলিয়া তিলাঞ্জলি চলিয়া গেল। চণ্ডদেব নির্জন কক্ষে পদচারণ করিতেছিলেন। অল্পপরে মুকুলকে লইয়া তিলাঞ্জলি ফিরিয়া আসিল। মুকুলকে দেখিয়া চণ্ডের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। দুই আজানুলম্বিত বাহু দিয়া শিশুকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। চণ্ডদেব কহিলেন,—'মুকুল, বল বিদেশ হইতে তোমার জন্য কী আনিব?'

মুকুল কহিল,—'তোমার তো যাওয়া হইবে না। দাদা তুমি জান না রাজবাড়িতে দুইটা বাঘ আসিয়াছে। তুমি চলিয়া গেলে বাঘে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।'

চণ্ডদেবের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। শিশু একি বলিতেছে! এ তো শিশুর নিজের কথা নহে। কহিলেন,—'কে বলিল?'

—'আমি জানি যে।'

—'হ্যাঁ, কিরূপে জানিলে?'

—'আমাকে একজন চুপিচুপি বলিয়াছে। নাম বলা বারণ। বল না দাদাভাই, বাঘ দুইটাকে না তাড়াইয়া তুমি যাইবে না তো?'

চণ্ডদেব নাম না শুনিলেও বুঝিলেন, বালককে এ শিক্ষা আয়ীমাতাই দিয়াছেন। যে কথা নিজমুখে কেহ বলিতে পারিতেছে না—যে কথা চণ্ডদেব স্পষ্ট বুঝিয়াছেন—সেই সাবধানবাণীই প্রেরণ করিয়াছেন শিশুর মারফত শিশোদীয়া বংশের প্রধানা ধাত্রী।

মুকুল কহিল,—'দাদাভাই, কৈ বলিলে না?'

চণ্ডদেব কহিলেন—'সেই বাঘ ধরিবার ফাঁদ আনিতেই তো যাইতেছি। তুমি এখানে লক্ষ্মী হইয়া থাকিবে। তিলাঞ্জলির কথা শুনিবে, আয়ীমাতার কথা শুনিবে।'

—'আর মা?'

চণ্ডদেব জবাব দিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতে লাগিলেন।

মুকুল কহিল,—'দাদাভাই, তুমি আবার কবে আসিবে?'

মুকুলের শিরশ্চুম্বন করিয়া চণ্ডদেব কহিলেন,—'বাঘ ধরিবার ফাঁদ পাইলেই আমি আসিব।'

তিলাঞ্জলি মুকুলকে লইয়া গেল।

আর দেরি করিলে মান্দোর পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে। রাওয়ালার সকল পরিচারক-পরিচারিকাকে চণ্ডদেব ডাকিয়া পাঠাইলেন; সকলেই তাঁহার মহলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি কাহাকেও কণ্ঠহার, কাহাকেও অঙ্গুরীয়, কাহাকেও স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। সকলেই সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিল। অতঃপর চণ্ডদেব মধুশ্রীর মহলে আসিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজমাতার নিকট বিদায় লইবার প্রয়োজন। কিন্তু মধুশ্রী আজ সকাল হইতেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেন নাই। ডাকিয়াও তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বারের বাহিরে চৌকাঠে মস্তক স্পর্শ করাইয়া চণ্ডদেব জননীকে প্রণাম করিলেন।

গৃহাভ্যন্তরে কেহ শিহরিল কিনা বুঝা গেল না।

আয়ীমাকে সমস্ত মহল খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। সকাল হইতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। চণ্ডদেব ম্লান হাসিলেন। আয়ীমাই তাঁহার জননী, তাই এই মুহূর্তে নিরতিশয় অভিমানে আত্মগোপন করিয়াছেন। শিশুকে বাঘের ভয় দেখাইয়া চণ্ডদেবকে বাধা দিবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনিই যেন পরাজিত হইয়াছেন। আজিকার পরাভবের সমস্ত লজ্জা যেন তাঁহারই।

চণ্ডদেব সকলের নিকট বিদায় লইয়া একলিঙ্গজীকে প্রণাম করিয়া দুর্গের বাহিরে আসিলেন। সেখানে অগণিত জনতা তাহাদের প্রিয় যুবরাজকে বিদায় জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছে। উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং দেওয়ানী ফৌজ লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। চণ্ডদেবের আদেশমাত্র তাহারা মারবারী ব্যাঘ্র দুইটাকে এই মুহূর্তে রাজ্যসীমার বাহিরে রাখিয়া আসিতে পারে। কিন্তু উপায় নাই! তাহা হইবার নহে। অনধিকারী মারবার রাজই আজ এখানে থাকিবেন—আর এ রাজ্যের সর্বজনপ্রিয় রাজকুমার যাইবেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। এখানেও প্রণাম, আশীর্বাদের পালা সমাপন করিয়া চণ্ডদেব যাত্রা করিলেন। নগরবাসী শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের প্রিয় রাজপুত্রকে চিতোরসীমা পর্যন্ত আগাইয়া দিল। নগরপ্রান্ত হইতে সকলে ফিরিল। শুধু একশত ভীল সঙ্গী লইয়া মান্দোরের পথে—কৈলোর দুর্গের দিকে যুবরাজ যাত্রা করিলেন।

চিতোর ত্যাগ করিবার পূর্বে অনুজ রঘুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল চণ্ডদেবের। রঘুদেব রাজদরবারের কুটিল ঘূর্ণাবর্তের কোন সংবাদ রাখিতেন না। তিনি ছিলেন কবি প্রকৃতির মানুষ। মান্দোরে যাইবার পূর্বে চণ্ডদেব স্থির করিলেন একরাত্রি কৈলোরে কবিগৃহে অতিথি হইবেন।

কৈলোরে দুর্গপ্রান্তে পৌঁছিয়া চণ্ডদেব দেখিলেন দুইজন অশ্বারোহী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের দেখিয়া বিস্মিত চণ্ডদেব কহিলেন,—'হিমাচল, তোমরা এখানে কিরূপে আসিলে?'

সশ্রদ্ধ সামরিক অভিবাদন করিয়া হিমাচল কহিল,—'আমরা দুইজনেও কুমারের দেহরক্ষী হিসাবে মান্দোরে যাইব।'

চণ্ডদেব হাসিয়া কহিলেন,—'তোমাদের কুমার কি এতই হীনবল যে, দেহরক্ষী ভিন্ন পথে ঘাটে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে?'

হিমাচল পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল,—'ক্ষমা করিবেন, মেবারের সকল রানারই দেহরক্ষী ছিল—তাঁহারাও হীনবল ছিলেন না।'

—'আমি রানা নহি।'

—'রাজপুত্রের জীবনও মেবারবাসীর নিকট রানার অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে।'

—'ভুল বলিতেছ হিমাচল। রানার দেহরক্ষী থাকে 'রানা' নামক জীবটির প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নহে। মেবারের শ্রেষ্ঠ মানুষটিই মেবারের শ্রেষ্ঠ সম্মান—সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেই দেহরক্ষীর প্রয়োজন। আমি সামান্য মেবারী, আমার প্রাণ তুচ্ছ। ভুলিও না, মেবারের সম্মান আমি দেওয়ানী ফৌজের নিকটই পিছনে রাখিয়া আসিয়াছি। দেখিও, আমার অনুপস্থিতিতে শিশোদীয়া বংশের সূর্যপতাকা যেন ধুলায় না লুটায়।'

হিমাচল আভূমি নত হইয়া চণ্ডদেবকে অভিবাদন করিল। সে একপদ পিছাইয়া আসিতেই বুদ্বুদ একপদ অগ্রসর হইল। অভিবাদনান্তে কহিল,—

—'চিরায়ুষ্মন্! আমি দেওয়ানী ফৌজভুক্ত নহি। আমাকে আপনার সহিত যাইতে দিন।'

চণ্ডদেব তাহাকে চিনিলেন। কহিলেন,—'তোমাকে চিনিয়াছি, চিতোরে আমি প্রাণাপেক্ষা একটি প্রিয়বস্তু রাখিয়া গেলাম। তাঁহারই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রহিল তোমার উপর।'

বুদ্বুদ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। কুমার কহিলেন,—'বৌদ্ধবিহারের পথে—'

বুদ্বুদ আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। তিলাঞ্জলির বিপদের কথা এতক্ষণে তাহার স্মরণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া দুর্গ হইতে স্বয়ং রঘুদেব অগ্রজকে সাদর সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দুই ভাই দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন।

হিমাচল ও বুদ্বুদ ফিরিয়া গেল চিতোরের পথে।

সে রাত্রে তিলাঞ্জলির গৃহে প্রদীপ জ্বলিল না—সমস্ত দিনমান আয়ীমা কোথায় কাটাইলেন কেহ সংবাদ রাখিল না—চণ্ডদেবের প্রতি মেবারবাসীর অনুরাগ দেখিয়া মারবারী দুইজনও সাহস করিয়া বাহিরে আসিল না। বস্তুত রাজপুরীতেই যেন একটা নিস্তব্ধতার বিভীষিকা নামিয়া আসিল। কেহ কাহারও সহিত দুইদণ্ড বসিয়া আলাপ করিল না। কেবলমাত্র রাজমাতার কক্ষে সুবর্ণ দীপাধারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই স্বল্পালোকে শিশুপুত্রকে লইয়া মধুশ্রী অনুচ্চস্বরে আলাপ করিতেছিলেন,—

—'তুই নিশ্চয়ই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিস্। বলিলে কখনও বাঘের মুখে আমাদের ছাড়িয়া তিনি যাইতে পারিতেন?'

শিশু বারেবারেই প্রতিবাদ করে,—'আমি বলিয়াছি, বার বার বলিয়াছি। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না।'

—'তুই আমার নাম করিস নাই তো? আমি বলিতে বলিয়াছি—বলিস্ নাই তো?'

বালক বারংবার অস্বীকার করে। না, সে কাহারও নাম বলে নাই। মধুশ্রী কহিলেন,—'আর কী কথা হইল?'

—'দাদাভাই বলিলেন,—আমি বাঘ ধরিবার ফাঁদ লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি দুষ্টামি করিও না। পিসীর কথা শুনিও, আয়ীমায়ের কথা শুনিও—'

—'আর মায়ের কথা শুনিও না?'

—'না, মায়ের কথা শুনিতে তিনি ঠিক বারণ করেন নাই; তবে—'

—'তবে?'

—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ''আর মায়ের কথা?' তিনি সে কথার কোনও জবাব দিলেন না।'

মধুশ্রী সহসা বালককে বক্ষপঞ্জরে টানিয়া লইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যেন সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা! হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তিনি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ! মায়ের কথা কখনও শুনিস না মুকুল, তোর মাই তো দাদাভাইকে তাড়াইল। সেই তো মারবারী ব্যাঘ্র দুইটিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।'

মা দাদাভাইকে তাড়াইয়াছে শুনিয়া মুকুল মধুশ্রীর বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিল—কিন্তু অশ্রুধৌত মায়ের মুখখানি দেখিয়া সে কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কোথায় যেন একটা ভুল হইয়া গিয়াছে—মুকুল ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। এ ভুল কেন?

এ ভুল কেন হইল? হয়তো সত্য কথাই বলিয়াছিল তিলাঞ্জলি : 'ভালবাসাটাই ভুল। ভালবাসিলেই লোকে ভুল বুঝে, ভুল করে!'

রঘুদেব অগ্রজের নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে মান্দোর যাইতে নিষেধ করিলেন, কহিলেন,—

'পরের রাজ্যে কেন যাইবেন, কৈলোর আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি। আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে কৈলোর দুর্গ এবং তৎসংলগ্ন জায়গীর আপনাকে অর্পণ করিতেছি—আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করুন। এ বৈষয়িক বন্ধনই আমার সংগীত সাধনার অন্তরায়—আমিও মুক্ত হইয়া বাঁচি।'

চণ্ডদেব সহাস্যে কহিলেন, 'অনুজের নিকট দান গ্রহণে আমার পৌরুষে বাধিবে না?'

রঘুদেব ম্লান হইলেন। বস্তুত এদিক দিয়া চিন্তা করিবার মতো সামাজিক ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার ছিল না।

চণ্ডদেব পুনরায় কহিলেন, 'দুঃখ করিও না রঘুদেব, তোমার স্নেহের দানের কথা আমার মনে থাকিবে। তুমি বুঝিতেছ না, মেবার শাসন করিবে এখন যোধরাও এবং রণমল্ল—তাহাদের অধীনে কৈলোরের দুর্গাধীপ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। প্রতি মুহূর্তে আমাকে উহারা অপমান করিবার চেষ্টা করিবে। আমি মাসুরের সুলতানের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব। প্রয়োজন হইলে তাঁহার সৈন্যদলে চাকুরি গ্রহণ করিব।'

রঘুদেব মর্মাহত হইলেন। সমস্ত রাজস্থানের রাজোয়ারা যাঁহার অঙ্গুলী-হেলনে চালিত হওয়ার কথা, যাঁহার মস্তকের উপরে স্বর্ণসূর্য-লাঞ্ছিত রক্তপতাকা গিলোটবংশের মর্যাদা ঘোষণা করিবার কথা—সেই রাজার কুমার আজ সামান্য জীবিকার সন্ধানে নির্বাসনে যাইতেছেন। যবন রাজার দ্বারে তিনি ভিখারী।

কৈলোর দুর্গের চারিপার্শ্বে রঘুদেব একটি উদ্যান তৈয়ারী করাইয়াছেন। নানান রঙের পুষ্পসম্ভারে সে উদ্যানে নিত্যবসন্ত। অসংখ্য বিহঙ্গের কাকলীতে সে কানন সর্বদা মুখরিত; রঘুদেব এই নিভৃত উদ্যানে বসিয়া কখনও তানপুরা লইয়া আলাপ করিতেন, কখনও চারণদিগের গাহিবার উপযুক্ত সংগীত রচনা করিতেন। এই মনোরম কবির কুঞ্জ হইতে বিদায় লইতে চণ্ডদেবের সত্যই কষ্ট হইতেছিল। রানার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রূপে-গুণে শৌর্যে-বীর্যে মেবারের শ্রেষ্ঠতম মানুষটির স্থান হইল না এ রাজ্যে। জীবিকার অন্বেষণে তাহাকে যাত্রা করিতে হইল ভিন্ন রাজ্যের দরবারে। আবার না জানি কতদিন পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাত হইবে! দুইজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইলেন।

হায়, উহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন!

হিমাচল ও বুদ্বুদ অতঃপর চিতোর অভিমুখে ফিরিল। ফিরিবার পথে দুইজনেই স্তব্ধ ছিল। ধূমকেতুর করাল ছায়াপাতটা আজ আর রাওয়ালার গোপনতম সংবাদ নহে—প্রত্যেক মেবারীই সেটি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছে। সূর্যগ্রহণের সময়ে যেরূপ প্রথমে একটি ধূসর-বর্ণের ক্ষীণ ছায়াপাত হইতে দেখিলে লোকে কৃষ্ণবর্ণের দৈত্যটার আগমন-বার্তা জানিতে পারে—চণ্ডদেবের স্বেচ্ছা-নির্বাসন সেই ধূসর ছায়াটার সঙ্কেত দিয়া গেল যেন। হিমাচল তাই ভাবিতেছিল : দুর্দিন আসিতেছে। সূর্যবংশের অয়নপথে রাহুর আবির্ভাব হইয়াছে। আর বুদ্বুদ ভাবিতেছিল রাহু দৈত্যটা শুধু সূর্যগ্রাস করিতেই আসে না— বরং পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করিতেই তাহার লোলজিহ্বা লক্‌লক্‌ করে।

বুদ্বুদের সংশয় কিন্তু অনতিবিলম্বেই দূরীভূত হইল। অল্পদিন পরেই তিলাঞ্জলির পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে—আশু বিপদের সম্ভাবনা নাই। দুর্গমধ্যেই তাহার একজন বান্ধবী মিলিয়াছে। এই বান্ধবীকে মারবার হইতে আনা হইয়াছে। নবলব্ধ সখীটিকে সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে সখী তাহার স্বামীর সাহায্যে তিলাঞ্জলিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বস্তুত তিলাঞ্জলি সখীর মারফৎ সখীর স্বামীকে রাখী পাঠাইয়াছে।

বুদ্বুদ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইল। আন্দাজ করিল সখী আর কেহ নহে—পর্ণা, অর্থাৎ মারবার কুঙারীর বয়স্যা। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে পর্ণার বিবাহ হইয়াছিল একথা বুদ্বুদ জানিত। দুর্গমধ্যেই তিলাঞ্জলির দুইজন হিতাকাঙ্ক্ষী লাভে সে নিশ্চিন্ত হইল। ইহার অধিক জানিবার নিশ্চিন্ত উপায় বুদ্বুদের ছিল না। সামান্য সৈনিকের পক্ষে রাওয়ালার ভিতরকার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে।

পাঠকের কিন্তু সে অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই। গ্রন্থকারের নিকট ছাড়পত্র লইয়া অনায়াসে তাঁহার পক্ষে রাজান্তঃপুরের ঘটনার সহিত যোগসূত্র রাখা সম্ভবপর।

চণ্ডদেবের প্রস্থানের পর মধুশ্রীর যেন মোহনিদ্রা ভাঙিল। তিনি বুঝিলেন, অভিমানের বশবর্তী হইয়া তিনি কালভুজঙ্গকে ডাকিয়া আনিয়াছেন! হয়ত তাঁহার বুঝিতে সময় লাগিত—কিন্তু আপন ভ্রাতা, আপন পিতা তাঁহাকে সে সময়টুকু দিলেন না। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব লইতে দুইজনে এরূপ প্রতিযোগিতামূলক আগ্রহশীল হইয়া উঠিলেন যে, মধুশ্রী অনতিবিলম্বেই বুঝিলেন সর্বনাশ অতি

নিকটবর্তী। প্রথমেই কী একটা সামান্য কারণে উপেন্দ্রবজ্রের সহিত কুমার যোধরাওয়ের মতবিরোধ ঘটিল। উপেন্দ্রবজ্র প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হইলেন। অথচ যোধরাওয়ের কৌশলে মনে হইলে অপমানটা যেন শিশু রানাই করিয়াছেন। উপেন্দ্রবজ্র সমস্তই বুঝিলেন। উপায় নাই। তিনি সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাই চাহিতেছিলেন রণমল্ল। তৎক্ষণাৎ একজন নবনিযুক্ত সেনাপতিকে উপেন্দ্রবজ্রের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।

রাজ্যশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ, দায়িত্বশীল সামরিক পদগুলি একে একে নবনির্বাচিত মারবারী রাজপুরুষে ভরিয়া উঠিল। মধুশ্রী প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহার চতুর্দিক হইতে কোন্ এক অদৃশ্য আদিম জন্তু তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য করাল দংষ্ট্রা বাহির করিয়া ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। প্রতিক্ষণেই তিনি প্রতিবাদ করিবার কথা ভাবেন কিন্তু প্রতিবাদ অর্থই প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় এই কার্য তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য।

রাজান্তঃপুরে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে একে একে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। মধুশ্রী দুই একবার মৃদু আপত্তি জানাইলেন। কেহ কর্ণপাত করিল বলিয়া মনে হইল না। রাজমাতা দেখিলেন, পুরানো দিনের শিশোদীয়া ধাত্রী ও তাঁহার কন্যা ভিন্ন অন্তঃপুরের সকলেই চলিয়া গেল। অপরিচিত লোকে সেই সকল স্থান ভরিয়া তুলিল। অতঃপর একদিন আয়ীমা আসিয়া মধুশ্রীকে কহিলেন,—'আপনি কি চাহেন? আপনার পিতাই মেবারের রানা হউন?'

মধুশ্রী জবাব দিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, অপরাধ তাঁহারই। একান্ত তাঁহারই। প্রকৃতপক্ষে এই শিশোদীয়া ধাত্রীই তাঁহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী এখন। আয়ীমা কহিলেন,—'আপনি চণ্ডকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, সিংহাসনে না বসিয়াও নাকি আমার চণ্ড রাজ্য চালাইত—এক্ষণে কে রাজ্য চালাইতেছে?'

মধুশ্রী এবারও নিরুত্তর। তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল। আয়ীমা হয়ত আরও কিছু ভর্ৎসনা করিতেন, বাধা দিল তিলাঞ্জলি। সে সম্ভবত নিরুপায় মধুশ্রীর দুঃখটা বুঝিয়াছিল। তৎপরে তিনজনে নিভৃতে পরামর্শ করিল। কাহারও সহিত পরামর্শ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল মধুশ্রীর। এইরূপ শুভানুধ্যায়ীই তিনি খুঁজিতে ছিলেন। অনেক গোপন আলোচনার পর স্থির হইল, কুমার রঘুদেবকে সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন। যদিচ রঘুদেব চণ্ডদেবের মতো নির্ভরযোগ্য নহেন। তবু তিনি রাজপুত এবং রাজপুত্র। সুতরাং বিপদের দিনে সিতার রাখিয়া অসি ধরিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরদিন মধুশ্রী প্রস্তাব করিলেন, রানা তাঁহার কৈলোরের সম্পত্তি পরিদর্শনে যাইবেন। পুত্রকে দেখিতে রাজমাতা কৈলোর যাইতে ইচ্ছুক শুনিয়া রাও রণমল্লের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। কহিলেন,—'এক্ষণে সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।'

মধুশ্রী কহিলেন,—'কেন নহে?'

—'সে কথা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। রাজকার্যের সকল কথা রাজমাতার না জানিলেও চলিবে। চণ্ডের প্রস্থানে প্রজারা এমনিতেই ক্ষেপিয়া আছে। এই সময়ে রানার পক্ষে দুর্গের বাহিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।'

—'বেশ তবে রানা না হয় নাই গেলেন। আপনি আমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।'

রণমল্ল কহিলেন,—'মধুশ্রী, রাজকার্যে আমার চুল পাকিয়াছে। আমার সহিত কূটনৈতিক চালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিও না। তোমার যাওয়া হইবে না।'

—'তবে কি বুঝিব : আমি দুর্গ মধ্যে বন্দিনী?'

—'নিশ্চয়ই নহ। তবে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রানা অথবা রাজমাতার পক্ষে এক্ষণে দুর্গের বাহিরে আসা সম্ভব নহে।'

—'রানা তাহা হইলে ইচ্ছা সত্ত্বেও রঘুদেবের সহিত সাক্ষাত করিতে পারিবেন না?'

—'কেন পারিবেন না? রঘুদেবকে ডাকিয়া পাঠাও—সে দুর্গমধ্যে মুকুলের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাইবে।'

মধুশ্রী বুঝিলেন, রণমল্লের ইচ্ছা সাক্ষাতটা দুর্গমধ্যেই ঘটুক। চিতোর দুর্গের প্রত্যেকটি প্রহরী,

প্রত্যেকটি কিঙ্কর এক্ষণে রণমল্ল-নির্বাচিত,—সুতরাং এস্থলে গোপন ষড়যন্ত্রের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে আর মধুশ্রী পীড়াপীড়ি করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। চক্ষুলজ্জার যে সূক্ষ্ম আবরণটি এখনও রহিয়াছে তর্ক করিতে গেলেই সেটি ঘুচিয়া যাইবে—প্রতিপক্ষ তখন প্রকাশ্যে করাল দংষ্ট্রা বাহির করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। তাই তিনি রাজি হইলেন।

মধুশ্রী তখন শিশুপুত্রের জবানীতে রঘুদেবকে পত্র লিখিলেন। ছোড়দাদাকে দেখিবার জন্য রানা অত্যন্ত আগ্রহশীল—অবিলম্বে যেন ছোড়দাদা পত্রবাহকের সহিত দুর্গমধ্যে মুকুলের সহিত সাক্ষাত করেন। পত্র লিখিয়া সীলমোহরাঙ্কিত করিয়া মধুশ্রী পিতার হস্তে দিলেন। রণমল্ল বিনা দ্বিধায় সীলমোহর ভাঙিয়া পত্রটি মধুশ্রীর সম্মুখেই পাঠ করিলেন। মধুশ্রীর কর্ণমূল রক্তাভ হইল। তিনি কিছু বলিলেন না।

রণমল্ল কহিলেন,—'লেখ, আগামী পূর্ণিমার দিন আসিয়া উৎসবে যোগ দিবেন।'

—'উৎসব? কিসের উৎসব?'

রণমল্লের মুখে পৈশাচিক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন,—'ঐদিন রানা-জননীর জননী আসিবেন।'

মধুশ্রী বুঝিতে পারিলেন না।

—'ঐ দিবসে আমি তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিব।'

—'তিলাঞ্জলিকে? আপনি!'

—'কেন, তুমি তো সম্মতি দিয়াছ!'

—'আমি? আমি সম্মতি দিয়াছি!'

মধুশ্রী স্তব্ধ। তাঁহার কিছুই স্মরণ হইল না। হয়ত যখন তিনি আপন অন্তর্দাহে পুড়িতেছিলেন তখন অন্যমনস্কভাবে পিতার প্রস্তাবে "হুঁ" বলিয়াছেন। আজ সজ্ঞানে সেকথা স্মরণ হইল না।

রণমল্ল কহিলেন,—'অবশ্য তোমার সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই; অমি স্থির করিয়াছি—এইটুকুই জানিয়া রাখ।'

রণমল্ল পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। মধুশ্রী প্রস্তর মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অল্পপরেই তিনি ডাকিলেন,—'কে আছিস?'

পর্দা সরাইয়া তিলাঞ্জলি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মধুশ্রী বুঝিলেন আলোচনার সমস্ত কথাই তিলাঞ্জলি শুনিয়াছে। মধুশ্রী কহিলেন,—'না, না, এ হইতে পারে না—এ হইবে না।'

তিলাঞ্জলি মধুশ্রীর চরণতলে পড়িল।

—'ওঠ তিলাঞ্জলি, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। এ কখনই হইতে দিব না। আমি সজ্ঞানে সম্মতি দিই নাই।'

তিলাঞ্জলি উঠিল। মধুশ্রী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করিলেন। আয়ীমাতার নিকট সংবাদটি আপাতত গোপন রাখিতে বলিলেন এবং যোধরাওকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যোধরাও আসিলে মধুশ্রী তাঁহাকে পিতার পুনরায় বিবাহ বাসনার কথা জানাইলেন। দেখা গেল সংবাদটি যোধরাওয়ের নিকট নূতন নহে। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। শুধু ইচ্ছা নহে, সাহসও নাই। মধুশ্রী তখন বুঝিলেন কূটনৈতিক চাল চালিবার সময় আসিয়াছে। বলিলেন,—'দাদা, তোমারই মুখ চাহিয়া আমি চণ্ডকে তাড়াইয়াছি। তোমাকে শিশুকাল হইতে আমি ভালবাসি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—পিতার বিবাহ অর্থ তোমার সর্বনাশ। মেবারের ইতিহাসে দেখিতেছ না বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে—তাহার সন্তানকেই রাজা সিংহাসন দিয়া যায়? তিলাঞ্জলির সন্তান হইলে কি তুমি কোনদিন মারবারের সিংহাসনে বসিতে পারিবে?'

যোধা চিন্তিত হইলেন। এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া জানাইবেন বলিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিলাঞ্জলি চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল তাহারই পালঙ্কে একজন পরম রূপবতী রাজপুত রমণী বসিয়া আছে। তিলাঞ্জলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—'আপনি কে?'

—'আমি এ দুর্গমধ্যে নূতন আসিয়াছি। এই কক্ষেই আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। আপনার হয়তো অসুবিধা হইবে—কিন্তু যতদিন না আমার অন্য একটি ব্যবস্থা হয় ততদিন আশাকরি আপনি আমাকে এই কক্ষেরই অপর প্রান্তে থাকিতে দিবেন।'

তিলাঞ্জলি বিরক্ত হইল। রাজান্তঃপুরে এতদিন তাহার একটা মর্যাদা ছিল। এই বৃহদায়তন ঘরটিতে সে একাই বাস করিত। দুর্গমধ্যে এখন স্থানাভাবও নাই—নবাগতাকে তাহারই কক্ষে নির্দেশ করায় সে ক্ষুব্ধ হইল। উপায় নাই—এ অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিলাঞ্জলি অনুভব করিল যে, অসুবিধা অপেক্ষা এ ব্যবস্থায় তাহার সুবিধাই অধিক হইয়াছে। নবাগতা নানান গুণশালিনী।

অনতিবিলম্বেই সে তিলাঞ্জলির অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাগতার স্বামী নাকি দুর্গাধিপ হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। নবাগতা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও অল্পসময়ে দুইজনে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। তিলাঞ্জলির উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় এমনই একটি সখীর প্রতীক্ষায় ছিল। দুই চারিদিনেই তিলাঞ্জলিকে সে আপন করিয়া লইল। তখন সখীকে তাহার বিপদের কথা খুলিয়া বলিতে তিলাঞ্জলির আর কোনও বাধা হইল না। শ্রোতা এ কাহিনী শুনিয়া বক্তা অপেক্ষা অধিক কাঁদিল। ভবানীমাতার নামে প্রতিজ্ঞা করিল তাহার স্বামীকে গোপনে সে সকলকথা জানাইবে—এবং দুর্গাধিপের সাহায্যে তিলাঞ্জলির পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইবে না।

সখী কহিল,—'কিন্তু দুর্গ হইতে পলাইয়া তুমি কোথায় যাইবে?'

তিলাঞ্জলি ইতস্তত করিল।

—'বুঝিলাম, তোমার মনের মানুষ দুর্গের বাহিরেই আছে। তবে তাহাকে তো সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন।'

—'আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অন্তত জানাইয়া দিই যে, আমার কোনও আশু বিপদ নাই।'

তখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিল। পত্র রচনা করিয়া তিলাঞ্জলি একজন কিঙ্করীকে বলিল স্বয়ম্ভুকে ডাকিয়া আনিতে। কিঙ্করী ফিরিয়া আসিয়া বলিল স্বয়ম্ভু নামে দুর্গে কোনও প্রহরী নাই—শুনিয়া তিলাঞ্জলির মুখ শুখাইল। প্রহরী বদলের কথা তাহার স্মরণ ছিল না। সখী কহিল,—তাহার জন্য চিন্তা নাই—নাম ঠিকানা পাইলে সেই-ই পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তিলাঞ্জলি দেখিল আর কোনও কথা গোপন রাখা চলে না। নতনেত্রে সে তাহার সৌহরের নাম বলিল; লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না। পারিলে দেখিতে পাইত, তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী সখী শতভিষার নয়ন দুইটি দলিত ভুজঙ্গীর চক্ষুর মতোই জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া শতভিষা কহিল,—'শুনিয়াছি বুদ্বুদ সর্দার একজন স্বনামধন্য অসিবীর—তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।'

শতভিষা প্রহরী অঙ্গদেবকে পাঠাইল বুদ্বুদকে পত্রটি দিয়া আসিতে—এবং অপর একখানি জরুরী পত্র পাঠাইল দুর্গাধিপ মীনকেতন সর্দারকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিলাঞ্জলির পত্রে দুর্গমধ্যে তাহার সখীলাভের সংবাদে বুদ্বুদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল।

সেদিন গভীর রাত্রে নবনিযুক্ত দুর্গাধিপের সহিত দুর্গমধ্যে শতভিষার সাক্ষাত হইল। শতভিষা কহিল,—'কী বুঝিতেছ? মেয়েটিকে ভুলাইয়া দুর্গের বাহিরে আনা যাইবে?'

—'যাইবে।'

—'কিন্তু রণমল্লের চোখ এড়াইয়া তাহাকে মেবারের বাহিরে লইতে পারিবে?'

—'ভয় নাই, যোধা আমাদের সহায়। যোধা আমাকে সাহায্য করিবে। পিতার পুনরায় বিবাহে তাহার গোপন এবং প্রবল আপত্তি আছে। রণমল্ল আমাদের নাগাল পাইবে না।'

—'বুঝিলাম। কিন্তু আরও একটি বাধা আছে। রণমল্ল ছাড়াও তিলাঞ্জলির অপহরণে অপর একটি অন্তরায় আছে। তিলাঞ্জলির সৌহর! দুর্গের বাহিরে সে অপেক্ষা করিবে—সেও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।'

—'ভুলিও না, তাহাকে আমি স্বয়ং অপহরণ করিব। ভুলিও না মীনকেতনের কবল হইতে শিকার ছিনাইয়া লইবার স্পর্ধা যাহার সে এখনও মাতৃগর্ভে।'

শতভিষা হাসিল। কহিল,—'মীনকেতন কিন্তু জীবনে একবার পরাজিত হইয়াছেন। মান্দোরের অসিযুদ্ধে!'

এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় মীনকেতন আহত হইল। দীর্ঘদিন ঐ আলোচনাটা উঠে নাই। বস্তুত দুইজনে যেন সেকথা ভুলিয়াছিল। তাহাদের জীবনে সহসা যে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল দীর্ঘ কয় বৎসর ধূমকেতুর মতোই সে অদৃশ্য হইয়া আছে। মীনকেতন রুষ্ট হইয়া কহিল,—'তুমি কী বলিতে চাও?'

—'আমি বলিতে চাই—এই তিলাঞ্জলি সেই বুদ্বুদের নায়িকা।'

মীনকেতন বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ক্রমে তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিলাঞ্জলি অপহরণ এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট ব্যবসায়ের একটি অনুত্তেজক লেনদেন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এক্ষণে তাহার ভিতর বৈরী-নির্যাতনের এতবড় সুযোগ দেখিতে পাইয়া সে উল্লসিত হইল। শতভিষার কাছে সমস্ত শুনিয়া সে বিদায় হইল। মীনকেতনের বিলম্ব সহিল না। সে বুঝিয়াছিল, এ কার্য যতটা সহজ মনে করা গিয়াছিল, ততটা সহজ নহে। তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিবার পূর্বে বুদ্বুদকে চিতোর হইতে সরাইয়া দিতে হইবে।

সেই গভীর রাত্রেই মীনকেতন যোধরাওয়ের মহলে আসিল। যোধরাওয়ের মহল এতদিন রাজমাতার মহলেরই একাংশ ছিল। চণ্ডদেবের প্রস্থানের পর যুবরাজের মহলটাই পিতাপুত্রে দখল করিয়াছেন। যোধরাওকে সেই রাত্রেই মীনকেতন সমস্ত কথা বলিল। সে জানিত, বুদ্বুদ সর্দারের উপর যোধরাও মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। পূর্বেকার অসিযুদ্ধের কথা উভয়ের কেহই বিস্মৃত হয় নাই। তাই মীনকেতন আশা করিতেছিল তিলাঞ্জলি যে বুদ্বুদের প্রেমিকা এ কথা শুনিয়া যোধরাও উৎফুল্ল হইবে। বৈরী নির্যাতনের আনন্দে সেও মীনকেতনের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। যোধরাও প্রকাশ্যে কোনও ভাব ব্যক্ত করিলেন না। সমস্ত কথা বলিয়া মীনকেতন কহিল,—'এই বিপজ্জনক কার্যে ব্রতী হওয়ার পূর্বে আমার মনে হয় সেই উদ্ধত যুবকটিকে চিতোরের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। কোনক্রমে সে সংবাদ পাইলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা।'

যোধা সম্মত হইলেন। বুদ্বুদকে দূতরূপে পার্শ্ববর্তী কোনও রাজ্যে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া মীনকেতনকে বিদায় দিলেন।

মীনকেতন চলিয়া গেলে যোধরাওয়ের কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাজনৈতিক পটভূমিকাটা তিনি পুনর্বিচার করিয়া দেখিলেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইতেছেন, গোপনে—ধরা পড়িলে সর্বনাশ, দ্বিতীয়ত, এ চেষ্টায় বিরত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিতে পারে। মারবারের সিংহাসন নয়—মেবারের সিংহাসনই। মুকুল যে মৃত্যুমুখে দিন গণিতেছে পিতাপুত্র উভয়েই তাহা জানিতেন। অপরপক্ষে মীনকেতনের উপর তাঁহার পূর্বের বিশ্বাস আর নাই। মীনকেতনের সম্বন্ধে গুপ্তচরমুখে তিনি কিছু কিছু অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন—অথচ কথাপ্রসঙ্গে মীনকেতন জানাইয়াছে দিল্লী শহরে সে কখনও যায় নাই। ইহা ভিন্ন এই বিপদকালে তাঁহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অনুচর মীনকেতন যদি তিলাঞ্জলিকে লইয়া দীর্ঘদিনের জন্য মেবার ত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করে তবে তাঁহার সুবিধা কোথায়? আর একটি কথা—তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিবার এত আগ্রহ কেন শতভিষার? মীনকেতনের আগ্রহের একটি অর্থ হয়; কিন্তু তাহার ধর্মপত্নী কী করিয়া এ প্রস্তাবে আগ্রহান্বিত হয়? যোধরাও বুঝিয়াছিলেন, মেবারের রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন! এ স্থলে মারবারী সৈনিক অপেক্ষা মেবারী সৈনিকের বন্ধুত্ব বিপদকালে তাঁহার অধিক ভরসাস্থল। তিনি জানিতেন, হিমাচল এবং বুদ্বুদ মেবার সেনাবাহিনীর মধ্যে দুইজন অশেষ ক্ষমতাশালী যোদ্ধা। এই সুযোগে সেই দুইজনকে নিজ মুঠায় আনিতে পারিলে তাঁহার সমূহ সুবিধা। তিনি স্থির করিলেন, তিলাঞ্জলিকে দুর্গ হইতে অপহরণ করিয়া বুদ্বুদের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। তাহা হইলে রণমল্লও তাহাকে পাইবেন না, মীনকেতনও আত্মগোপন করিতে পারিবে না এবং বুদ্বুদ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই যুবকটি তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে চলিবে। এই সিদ্ধান্তে আসিয়া যোধরাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পরদিন পরামর্শ পাকা করিতে আসিয়া মীনকেতন নূতন বিপদের সম্মুখে পড়িল। যোধরাও কহিলেন,—'আমি স্থির করিয়াছি তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিয়া বুদ্বুদের হস্তেই সমর্পণ করিব।'

বিস্মিত হইয়া মীনকেতন কহিল,—'সেকি? কেন?'

—'তাহা ভিন্ন আর কোন পথ তো দেখিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য পিতার সহিত তিলাঞ্জলির বিবাহ বন্ধ করা। সে ক্ষেত্রে বুদ্বুদের সহিত বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।'

—'অসম্ভব! আমি ইহাতে কিছুতেই রাজি নহি!'

—'বটে? তোমার প্রস্তাবটা তবে কী? তিলাঞ্জলির অন্তর্ধানের সহিতই যদি দুর্গাধিপ অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে তাহার কী অর্থ হয়?'

মীনকেতন প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না।

—'তাহা ভিন্ন শতভিষা নিশ্চয়ই তোমার সহিত তিলাঞ্জলির পলায়নটা অনুমোদন করিবে না। হাজার হউক শতভিষা তোমার ধর্মপত্নী?'

মীনকেতনের মুখ শুকাইল। একথারও উত্তর নাই।

যোধরাও হাসিয়া কহিলেন,—'তোমার যদি দিল্লীর দরবারের সহিত পরিচয় থাকিত, না হয় বলিতাম সুলতান ফিরোজ শাহ্য়ের হারেমে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও, কিন্তু তুমি তো দিল্লীতে কখনও যাও নাই! কি বল?'

মীনকেতনের মুখ মসীকৃষ্ণ হইয়া গেল। এ কী রহস্যময় রসিকতা! যোধরাও বন্ধুর মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। স্থির হইল পরদিন রাত্রেই তিলাঞ্জলিকে দুর্গ হইতে অপসৃত করা হইবে। বিরাচ নদীর অপর পারে অশ্ব লইয়া বুদ্বুদ অপেক্ষা করিবে; মীনকেতন গুপ্ত দ্বারপথে তিলাঞ্জলিকে লইয়া বাহিরে আসিবে এবং একটি ছোট নৌকায় তিলাঞ্জলিকে পৌঁছাইয়া দিবে। বুদ্বুদ ও তিলাঞ্জলি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে তাঁহারা দুজনেই দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন, যাহাতে এই পলায়নের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগটা কেহ বুঝিতে না পারে। মীনকেতন যোধার পূর্ব রহস্য-সঙ্কেতেই সাবধান হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় সে সায় দিল; আর কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে তাহার চিন্তা হইল কী প্রকারে বুদ্বুদের কবল হইতে তিলাঞ্জলিকে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সে নিজেই এই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যোধাকে ও কথা না বলিলেই চলিত। এক্ষণে দেখিল অমন লোভনীয় পদার্থটা শুধু তাহার কবলমুক্তই হইতেছে না—সে স্বহস্তে তাহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে তাহার চরমতম শত্রুর হস্তে। অথচ প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। যোধার উপর তাহার নিরতিশয় ক্রোধ হইল। মীনকেতন নূতন জাল বিস্তার করিল। বুদ্বুদকে লিখিত তিলাঞ্জলির পত্র শতভিষার মাধ্যমে আনাইয়া তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং তৎপরে গোপনে রণমল্লের সহিত সাক্ষাত করিল। যোধার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রণমল্লকে তিলাঞ্জলি অপহরণ বৃত্তান্ত জানাইল। রণমল্ল ক্রোধে ফুলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—'কে এই ষড়যন্ত্র করিতেছে?'

—'কে করিতেছে তাহা আমি জানি না। তবে দুর্গাধিপ হিসাবে আমার যে সকল নিজস্ব গুপ্তচর আছে তাহারাই সংবাদ আনিয়াছে যে, তিলাঞ্জলিকে লইয়া কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুর্গ হইতে কেহ পলাইবার চেষ্টা করিবে। বিরাচ নদীর অপর পারে তাহারা অপেক্ষা করিবে।'

রণমল্ল কহিলেন,—'দেখি কাহার এতদূর স্পর্ধা! তুমি যোধাকে সংবাদ দাও।'

মীনকেতন যুক্তকরে কহিল,—'মহারাজ অভয় দিলে আর একটি কথা নিবেদন করি।'

—'বলো।'

—'আমার অনুরোধ এ কথা আপনি তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিবেন না!'

—'না, আর কাহাকেও বলিব না—তুমি যোধাকে শুধু ডাকিয়া দাও!'

মীনকেতন বুঝিল তাহার এতবড় ইঙ্গিতটাও স্থূলবুদ্ধি রাও রণমল্ল বুঝিতে পারেন নাই। তাই সবিনয়ে কহিল,—'দিতেছি; কিন্তু একটি কথা মহারাজকে নিবেদন করা বোধহয় আমার কর্তব্য। এ কার্যে আমি ভিন্ন হয়তো দুর্গমধ্যে মহারাজের সহায় আর কেহ নাই। হয়তো মহারাজের এই নবতম মহিষীর সন্তান একদিন মারবারের তথা মেবারের উচ্চতম আসন অলঙ্কৃত করিবেন। যেদিন, সেই

রাজপুত্র এবং তাহার জননী দেবী তিলাঞ্জলিকে সকলে আভূমিনত হইয়া প্রণাম করিবে—আজ কিন্তু মহারাজের সহায় হইতে অনেকেই—'

মীনকেতন স্তব্ধ হইল। বুঝিল আর বলিবার প্রয়োজন নাই। রণমল্লের মুখাবয়বে পরিবর্তন দেখিয়াই সে বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে।

রণমল্ল কহিলেন,—'থাক্ যোধাকে পরামর্শের জন্য ডাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম করিতে পারো।'

মীনকেতন চিন্তিতমুখে ফিরিয়া আসিল। রণমল্ল কী করিবেন বুঝা গেল না। বুঝিল, রণমল্ল নিশ্চয়ই তিলাঞ্জলির পলায়নে বাধা দিবেন, তাহাকে কড়া পাহারায় রাখিবেন—ফলে তাহাকে অপহরণ করা যাইবে না। এ ভালোই হইল—যোধাও তাহাকে দায়ী করিতে পারিবে না—বুদ্বুদও তিলাঞ্জলিকে পাইবে না। মীনকেতনের একটি মাত্র চিন্তা হইল এইবার কী উপায়ে তিলাঞ্জলিকে রণমল্ল, যোধা ও বুদ্বুদের চক্ষু এড়াইয়া পুনরায় অপহরণ করার ব্যবস্থা করিবে।

গুপ্তচরের হস্তে পত্র পাইয়া বুদ্বুদ অবাক হইয়া গেল। রাও যোধরাজ তাহাকে দুর্গমধ্যে রাত্রি একপ্রহরের সময় গোপনে সাক্ষাত করিতে বলিয়াছেন। তাহাকে একাকী যাইতে হইবে, অবশ্য ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে সঙ্গে আনিতে পারে।

এ পত্র পাইয়া বুদ্বুদ কী করিবে স্থির করিতে পারিল না। সে একজন নগণ্য সৈনিক—রানার মাতুল পরম ক্ষমতাশালী মারবারের যুবরাজ যোধরাও তাহার নাম জানিলেন কী প্রকারে? তাহা ভিন্ন তাঁহার এই গোপন সাক্ষাতের প্রস্তাবটাই বা কী উদ্দেশ্যে? বুদ্বুদ অত্যন্ত বিচলিত হইল। তৎক্ষণাৎ হিমাচলের সহিত সাক্ষাত করিয়া সমস্ত কথা বলিল। হিমাচল যথারীতি মদে চুর হইয়া বসিয়াছিল, কহিল,— 'অনুরোধ নয়, আদেশ। তোমাকে যাইতেই হইব।'

—'কিন্তু তুমি তো জানো, আজই তিলাঞ্জলির পত্র পাইয়াছি। কাল রাত্রে তাহার বান্ধবীর স্বামী তাহাকে দুর্গ হইতে বাহিরে আনিবে। আমাকে কালই চিতোর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।'

—'তাহাতে আজ রাত্রে এই সাক্ষাতে কী বাধা?'

—' আমাকে যদি তিনি অন্য কোন কাজ দেন? যদি বন্দী করিয়া রাখেন?'

—'আমি তোমার সহিত যাইব; যদি তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় তবে আমি কাল রাত্রে তিলাঞ্জলিকে সরাইবার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু যোধরাওয়ের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না।'

বুদ্বুদ নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল।

হিমাচল কহিল,—'কী বন্ধু, এত দুশ্চিন্তার কী আছে? আমার মনে হয় কোন কারণে যোধরাও তোমার সাহায্যপ্রার্থী—খুব সাবধানে চলিবে—কোনও ফাঁদে, কোনও প্রলোভনে পা দিবে না—'

—'না, আমি যোধার কথা ভাবিতেছি না—আমি ভাবিতেছি—'

—'বুঝিলাম! তুমি ভাবিতেছ হিমাচলের হস্তে তিলাঞ্জলিকে দিয়া বিশ্বাস করা যায় কিনা?'

হা হা করিয়া হিমাচল হাসিয়া উঠিল।

—'ছিঃ! হিমাচল! ও কথা স্বপ্নেও আমার মনে জাগে নাই।'

—'স্বপ্নে জাগে নাই সত্য—কিন্তু বাস্তবে জাগিয়াছে। ভয় নাই বন্ধু; হিমাচল মদ খায় বটে—কিন্তু দুশ্চরিত্র নয়—তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া—'

বাধা দিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'কী বাজে বকিতেছ! আমি কোনও দিন ও কথা ভাবি নাই—'

—কোনও দিন ভাব নাই? বটে? তবে মান্দোরে সেদিন যখন বলিয়াছিলাম—তিলাঞ্জলিকে আমি ভালোবাসি তখন বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলে কেন?'

—'তখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখনও তোমাকে আমি চিনি নাই!'

—'ভালো, আজ আমাকে চিনিয়াছ আশা করি। কিন্তু মানুষকে কি সত্যই চেনা যায়? আমিই কী আমাকে চিনিয়াছি? ধর যদি তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিয়া আমার চিত্তবিভ্রম হয়—তখন আমাকে দোষ দিবে না তো?'

—'না, দিব না। কিন্তু তোমার মতো মদ্যপের সহিত এভাবে প্রলাপ বকিবার আমার সময় নাই—আমি চলিলাম।'

রাত্রি এক প্রহরের সময় গুপ্তচর আসিয়া বুদ্বুদ ও হিমাচলকে লইয়া গেল। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্বুদ রাজমাতার মহলের দিকে একবার দৃক্‌পাত করিল। চন্দ্রালোকে মীনারের চূড়ায়, ঝরোকার পার্শ্বে লোকজন চলাফেরা করিতেছে দেখা যায়। এতদূর হইতে ব্যক্তি-বিশেষকে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। তিলাঞ্জলি হয়তো অতি নিকটেই রহিয়াছে, হয়তো একটি প্রাচীরের ব্যবধান—অথচ তাহার সহিত সাক্ষাত করিবার উপায় নাই। উদ্যান অতিক্রম করিয়া চণ্ডদেবের মহলে আসিয়া প্রহরী থামিল। উদ্যান হইতে হর্ম্যসোপানাবলী উপরে উঠিয়াছে। দ্বিতলে একপার্শ্বে যোধরাওয়ের কক্ষ, অপর পার্শ্বে রাও রণমল্লের আবাসস্থল। পূর্বেই বলিয়াছি, পিতাপুত্রে এই মহলটি ভোগ-দখল করেন। প্রহরী হিমাচলকে উদ্যানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুদ্বুদকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে চলিল। হিমাচল উদ্যানের একপার্শ্বে অন্ধকারে একটি বৃক্ষতলে পাষাণ-বেদিকার উপর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হিমাচলকে এইস্থলে রাখিয়া আমরা বুদ্বুদের সহিতই দ্বিতলে আসিব। সোপানাবলী একটি প্রশস্ত বারান্দায় শেষ হইয়াছে। শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত উন্মুক্ত বারান্দায় একজন প্রহরী অপেক্ষা করিতেছিল। বুদ্বুদের পথপ্রদর্শকের সহিত তাহার কী কথোপকথন হইল। প্রহরী তাহাদের যাইতে দিল। বারান্দার পরে প্রথম কক্ষের সম্মুখে বুদ্বুদকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রহরী ভিতরে গেল এবং পরমুহূর্তেই বাহিরে আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল।

বুদ্বুদ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল অত্যন্ত সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে একটি রত্নমণ্ডিত পালঙ্কে যোধরাও অর্ধশায়িত অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছেন। বুদ্বুদ জানিত না—এই পালঙ্কেই একদা চণ্ডদেব নিদ্রা যাইতেন। আভূমি নত হইয়া বুদ্বুদ যোধরাওকে অভিবাদন করিল।

যোধরাও কহিলেন,—'তোমার নাম বুদ্বুদ সর্দার?'

বুদ্বুদ সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করিল।

—'তুমি পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে আরাবল্লী পর্বতের কেলোয়ারা অঞ্চল হইতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিলে?'

এবারও বুদ্বুদ স্বীকার করিল।

—'আসিবার পথে একটি পান্থশালায় কোন একটি ঘটনা ঘটে,—ঠিক কি ঘটিয়াছিল আমি জানি না, তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিয়াছিল—কেমন?'

—'আয়ুষ্মন্, আমি বলিতেছি কী ঘটিয়াছিল—'

—'কোনও প্রয়োজন নাই, সে তোমার ব্যক্তিগত কাহিনী, তৎপরে তুমি মান্দোরের অসি-প্রতিযোগিতায় যোগদান কর, কেমন?'

—'আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন!'

—'প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার পর তুমি বৌদ্ধবিহারে দিকে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে গিয়াছিলে। তোমার সহিত একজন মেবারী রাজপুরুষ এবং একজন মেবারী মহিলা ছিলেন। অতঃপর তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তোমার সঙ্গীদ্বয় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

বুদ্বুদের কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া উঠিল। বুঝিল, সে বাঘের বিবরে পা বাড়াইয়াছে। তাহার কোন কথাই যোধরাওয়ের অজ্ঞাত নহে।

—'দীর্ঘদিন পূর্বেকার কথা, হয়তো তোমার স্মরণ হইবে না, ঐদিন বৌদ্ধ-চৈত্যের নিকট সুদৃশ্য পল্যঙ্কিকায় দুইজন মহিলাও আসিয়াছিলেন, নহে?'

বুদ্বুদ সত্য কথা গোপন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না, কহিল,—'আমার স্মরণ আছে। দুইজন মারবারী মহিলা ঐ রাত্রে বৌদ্ধবিহারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার এই কার্যে কি আপনি আমাকে অভিযুক্ত করিতেছেন?'

যোধরাও উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন,—'যুবক, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করিয়াছি; তোমার কোনও কথাই আমার নিকট গোপন নহে। তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি না। সে রাত্রে তুমি তোমার উচিত ব্যবহারই করিয়াছ। যাহারা আদেশ পালন করে, যাহারা বীর, যাহারা বুদ্ধিমান, আমি তাহাদের ভালবাসি।'

অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'যুবরাজের অশেষ অনুগ্রহ।'

যোধরাও কহিলেন,—'সে রাত্রে যে রাজপুরুষটি তোমার সহিত বৌদ্ধ-চৈত্যে গিয়েছিলেন তিনি কে?'

সর্বনাশ!

বুদ্বুদ বুঝিল, তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে সত্য ভাষণের উপর। ধূর্ত যোধরাও নিশ্চয়ই সকল সংবাদ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে শুধু তাহার নিকট শুনিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। একবার মনে হইল সত্য কথাই স্বীকার করে। যাহা যোধরাও নিশ্চিত জানিয়াছে তাহা পুনরায় বলিলে কী ক্ষতি? বিশেষত মিথ্যা বলিলে যেখানে প্রাণ যাইবার সমূহ সম্ভাবনা।

যোধরাও সহাস্যে কহিলেন,—'কী! উত্তর দিতেছ না কেন বন্ধু?'

বন্ধু! সম্বোধনটায় বুদ্বুদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে দীর্ঘদিনের বিস্মৃতি-যবনিকা উঠিয়া গেল। দীর্ঘদিন পূর্বে এক গভীর রাত্রে নির্জন প্রান্তরে একজন রাজপুত্র তাহাকে একবার 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়াছিলেন! বলিয়াছিলেন,—'তুমি আজ মেবারের বিজয়ের অর্ধেক গৌরব লাভ করিয়াছ এজন্য আমি পূর্বেই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম;—এখন ভগিনী তিলাঞ্জলির কথায় তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিলাম।' মনে পড়িল সে রাজপুত্র মেবারীর বিজয়ের বাকী অর্ধেক গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন—সম্মুখে অবস্থিত এই কপট বন্ধুটিকে ধরাশায়ী করিয়া।

—'কী? জবাব দাও! চুপ করিয়া আছ কেন?'

বুদ্বুদের বিশ্লেষণী চিন্তাধারাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সহসা আরাবল্লী পর্বতের আহেরিয়া গোঁয়ারটি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বুদ্বুদ কহিল,—'মাপ করিবেন, তাঁহার নাম বলিতে পারিব না!'

—'নাম বলিবে না? কারণ?'

—'কারণ তিনি প্রকৃতই আমার বন্ধু!'

যোধরাও উঠিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত একখানি কোষমুক্ত অসি দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া বুদ্বুদের দিকে ফিরিলেন! বুদ্বুদ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিল। রাজপুত্রের শয়নকক্ষে তাহাকে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে এ যেন তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। যোধরাও ইচ্ছা করিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন—কেন যে স্বহস্তে এ পরিবেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন বুঝিল না!

কিন্তু আহেরিয়া-শাবক পশ্চাৎপদ হইবার জন্য দুঃসাহস দেখায় নাই। সে উদ্যত কালবৈশাখীর প্রতীক্ষারত স্তব্ধ প্রকৃতির মতো নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

যোধরাও কহিলেন,—'যুবক, তুমি আমাকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছ। বন্ধুর প্রতি তোমার এই বিশ্বাসপরায়ণতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বীরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই তোমাকে কিছু বলিলাম না। শোন বলি—মেবার ও মারবারের মধ্যে যে অসূয়াবহ্নি প্রজ্বলিত আছে আমি তাহা নির্বাপিত করিতে চাই। চিতোর সিংহাসনের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই। মুকুল উপযুক্ত হইলে আমি মান্দোরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত যাহাতে আমি মেবারের অন্তর্বিপ্লব প্রতিহত করিতে পারি তাহার জন্য আমার প্রয়োজন তোমাদের সাহায্যের। এক রাজপুত্রের বন্ধুত্বের যে নিদর্শন তুমি দিলে তাহা দেখিয়া আর এক রাজপুত্রও তোমাকে বন্ধুরূপে পাইতে চায়—তাই বন্ধুর হাত হইতে এই পুরস্কার লও।'

যোধরাও নগ্ন কৃপাণটি বুদ্বুদের দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

উদ্ধত আরাবল্লী গোঁয়ারটি বলিল,—'আমাকে মার্জনা করিবেন। নিজেকে আপনার উপহারের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই আপনার উপহার গ্রহণ করিব। আপনি সত্য কথা ভালবাসেন—আমি সত্য কথাই বলিব—চিরায়ুষ্মন্ চণ্ডদেবের বহিষ্কারে চিতোরবাসী খুশী হয় নাই!'

শুনিয়া যোধরাওয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য। এবারও তিনি ধৈর্য রক্ষা করিলেন। গরজ বড় বলাই। বলিলেন,—'চণ্ডের বহিষ্কার আমা হইতে হয় নাই। সেজন্য আমিও দুঃখিত। চণ্ডকে কেহ বহিষ্কৃত করে নাই—সে আপনিই চলিয়া গিয়াছে।'

বুদ্বুদ নিরুত্তর রহিল।

যোধরাও হাসিয়া বলিলেন,—'বেশ তো! আমার বন্ধুত্ব প্রথমবার গ্রহণ করিলে না—বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রকাশ্যেই প্রত্যাখ্যান করিলে। ভালো কথা। তবে আমি বিশ্বাস রাখি একদিন না একদিন তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করিবেই; হয়তো উপহারটা আরও মূল্যবান করিতে হইবে।'

বুদ্বুদ ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করিতেছিল। কহিল, 'মারবারের রাজপুত্রের জন্য যদি সত্যই কোনদিন অসি ধরি তবে কর্তব্য বুঝিয়াই ধরিব। রাজকুমারের উপহাররূপ উৎকোচের লোভে নয়।'

যোধরাও উচ্চতর হাস্য করিয়া বলিলেন,—'যুবক! লোভ জিনিসটা আপেক্ষিক! স্বর্ণমুঠ তরবারির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেই দুনিয়ার সমস্ত লোভনীয় পদার্থে অনাসক্তি বুঝায় না!'

বুদ্বুদ কহিল,—'সময় আসিলেই পরীক্ষা দিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।'

যোধরাও বলিলেন,—'সময় আসিয়াছে বন্ধু! বৌদ্ধ-চৈত্যের রাজপুত্রটির নাম তুমি বলিলে না—আশাকরি রাজপুতানীর নামও বলিবে না—কে জানে সেও তোমার বন্ধুস্থানীয়া হইতে পারে! এই রাজপুতানীটি কাল দুর্গ হইতে পলায়ন করিবে। জানিও সেও আমারই উপহার!'

বুদ্বুদ নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল শুধু। একটি কথাও বলিতে পারিল না। এ কী অন্তিম রসিকতা।

—'কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে পত্রে নির্দেশিত স্থানে অপেক্ষা করিবে। তোমার জিনিস নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিলে আমাকে জবাব দিও, আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত কিনা। হিমাচল নিচে অপেক্ষা করিতেছে তাহাকেও সবকথা বলিও। যাও।'

বুদ্বুদকে কোন প্রত্যুত্তর করিবার সুযোগ না দিয়াই যোধরাও প্রহরীকে ডাকিলেন। প্রহরীর সহিত স্বপ্নাবিষ্ট বুদ্বুদ বাহিরে আসিয়া দেখিল বৃক্ষতলে হিমাচল নাই। দ্রুতপদে প্রাসাদের অপর প্রান্ত হইতে সে ছুটিয়া আসিল। বুদ্বুদ বলিল,—'ওদিকে কোথায় গিয়াছিলে?'

—'আত্মগোপন করিয়াছিলাম। কয়েকজন প্রহরী এদিকে আসিতেছিল।'

অতঃপর দুর্গের বাহিরে আসিয়া দুইজনে অশ্বারোহণ করিল! বুদ্বুদ কহিল,—'আইস, আমার গৃহে যাওয়া যাক্, অনেক কথা বলিবার আছে! সময়ও হাতে রহিয়াছে।'

—'তোমার থাকিতে পারে, আমার বিন্দুমাত্র সময় নাই। আমাকে এক্ষণি মান্দোরে যাইতে হইবে।'

—'মান্দোর? চিরায়ুষ্মন্ চণ্ডদেবের নিকট? কেন? কী হইয়াছে?'

—'বলিবারও সময় নাই! উহারা রওনা হইয়া গিয়াছে, তৎপূর্বেই আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার ফিরিতে সাতদিন লাগিবে। ইতিমধ্যে উদয় ও বিন্ধ্যাচলকে সংবাদ পাঠাও। তাহারা যেন রাজধানীতে আসে। অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। হয়তো একপক্ষকালের ভিতরেই মেবারে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।'

—'সেইজন্যই তো বলিতেছি তোমার সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন।'

—'এক্ষণে নহে! আমি ফিরিলে। বিদায় বন্ধু!'

বুদ্বুদকে কোনও প্রত্যুত্তর করিতে না দিয়া তীরবেগে সেই অবস্থাতেই হিমাচল অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাঠকের নিশ্চয়ই কৌতূহল হইতেছে, ইতিমধ্যে কী এমন ঘটিল যাহাতে হিমাচলকে পরমুহূর্তেই মান্দোর যাইতে হইল। সে কথাই বলিব। বুদ্বুদকে লইয়া প্রহরী দ্বিতলে উঠিলে হিমাচল পাষাণবেদিতে উপবেশন করিয়াছিল। তৎপরে সত্যই কয়েকজন প্রহরীকে এইদিকে আসিতে দেখিয়া হিমাচল প্রাসাদের পশ্চাদ্‌ভাগে আত্মগোপন করিতে সরিয়া গেল। সেদিকটা কণ্টকগুল্মাবৃত—যাতায়াতের পথ নাই। কিছুদূর গিয়াই হিমাচল দেখিল দ্বিতলের একটি নির্জন অলিন্দে রাও রণমল্ল একজন স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিতেছেন। রণমল্ল হিমাচলের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে স্পষ্ট

দেখা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া হিমাচল বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। এ মুখ চিনিতে তাহার বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। রণমল্ল একটি পানপাত্র লইয়া ধীরে ধীরে সুরাপান করিতে করিতে স্ত্রীলোকটির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। হিমাচল আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। অতি সন্তর্পণে সে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল, উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করা। বৃক্ষটি গৃহ সংলগ্ন। তাহাতে উঠিয়া হিমাচল স্ত্রীলোকটিকে অতি নিকট হইতে দেখিতে পাইল। হ্যাঁ, এই সেই শতাব্দী, যাহাকে দীর্ঘদিন পূর্বে সে দাসব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিজ রাজান্তঃপুরে আনিয়াছিল। সেই মুখ, সেই চাহনি, সেই হাস্যময়ী ভঙ্গিমা! আশ্চর্য, শতাব্দীর উপর দিয়া শতাব্দীর একপাদ অতিক্রান্ত হইয়াছে তবু তাহাকে চিনিতে হিমাচলের অসুবিধা হইল না।

রণমল্ল বলিতেছিলেন,—'দুর্গের বাহিরে অশ্বশকট অপেক্ষা করিতেছে। তুমি এক্ষণে রওনা হইয়া পড়। যা যা বলিলাম সমস্ত বর্ণে বর্ণে পালন করা চাই।'

—'তা তো বুঝিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাতও করিলাম। বিষমিশ্রিত মিষ্টান্নও খাওয়াইলাম, কিন্তু রানার অগ্রজ বিষপ্রয়োগে হত হইয়াছেন জানিতে পারিলে আমাকেও তো মেবারীরা মারিয়া ফেলিবে।'

—'তুমি পথে তাঁহাকে ঐ মিষ্টান্ন খাইতে দিবে। তুমিও অরক্ষিত যাইতেছ না। তোমার সহিত দুইশত সৈন্য যাইবে। খাদ্য মুখে দিবার পর অন্তত দুইদণ্ড মধ্যে তাহার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিবে না। ইতিমধ্যে তুমি পলায়ন করিবে, যদি না করিতে পার তবে এত লোক থাকিতে কেন তোমাকে ডাকিলাম।'

—'বুঝিলাম; কিন্তু এই বিপজ্জনক কার্যে ব্রতী হওয়ায় আমার পুরস্কার?'

—'কী পুরস্কার চাও? অর্থ? সম্পদ?'

—'অর্থ সম্পদ তুচ্ছ! জীবনের বিনিময়ে জীবন!'

—'বটে? ভাগ্যবানের নামটি কী?'

—'পঞ্চম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্বুদ সর্দার।'

—'সে কী করিয়াছে? কেন তাহাকে মরিতে হইবে?'

—'মহারাজ! কুমারকে কেন মরিতে হইবে এ প্রশ্ন তো আমি করি নাই।'

—'বেশ তুমি প্রত্যাবর্তন করিলে সে ব্যবস্থা করা যাইবে। অন্তত একটা বিচারের প্রহসন না করিয়া তো তাহার প্রাণদণ্ড দিতে পারি না।'

—'অন্তত আজই তাহাকে বন্দী করিতে হইবে। না হইলে আমার পক্ষে এ কার্যে যাওয়া অসম্ভব।'

—'বেশ, আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনই লিখিয়া দিতেছি।'

রণমল্ল একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লিখিয়া শতভিষার হস্তে দিলেন। শতভিষা কঞ্চুলীর ভিতর তাহা লুকাইয়া রাখিয়া কহিল, —'আমি এখনই যাইতেছি। যাইবার পথে নগর-কোটালকে পরোয়ানাখানি দিয়া যাইব।'

রণমল্ল গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিলেন। শতভিষা অলিন্দের পশ্চাদ্ভাগের অপ্রশস্ত সোপান বাহিয়া প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে আসিল। হিমাচলও অতি সন্তর্পণে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। শতভিষা চমকিত হইয়া কহিল,—'কে?'

—'প্রহরী। তুমি কে!?'

শতভিষা আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—'প্রহরী, আমার সহিত আইস, আমি দুর্গাধিপের মহিষী!'

শতভিষার পশ্চাতে হিমাচল কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে আসিয়া অস্ফুটে কহিল, —'শতাব্দী!'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শতভিষা ফিরিয়া দাঁড়াইল!

—'কী বলিলে?'

—'জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম আপনি কোন দুর্গাধিপের মহিষী? চিতোর দুর্গ, না দাক্ষিণাত্যের বিজয়গড় দুর্গ?'

শতভিষার উত্তর দিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল,—'তুমি কে?'

—'এক্ষণে সামান্য প্রহরী, এককালে বিজয়গড় দুর্গের মহিষী শতাব্দীর স্বামী ছিলাম।'

শতভিষার পদতলে পৃথিবী দুলিয়া উঠিল। বোধকরি মৃতব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিলেও কেহ এরূপ স্তম্ভিত হয় না। হয়তো শতভিষা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইত। হিমাচল তাহাকে ধরিল। ভীরু কপোতের মতই হিমাচলের বৃষস্কন্ধে মুখ লুকাইল শতভিষা। পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে শতভিষাকে বক্ষে ধারণ করিয়া হিমাচলের কেমন যেন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। শতাব্দী যেন একপাদ পিছাইয়া গিয়াছে। শুধু সময়ের শতাব্দী নহে তাহার বক্ষলগ্না শতাব্দীও।

দুর্গমধ্যে তেমনি প্রমোদ কানন, বাতাসে কুসুমের গন্ধ, আকাশে খণ্ডচন্দ্রের হাসি, পদপ্রান্তে জ্যোৎস্নার অলিম্পনরেখা, হিমাচলের বাহুবন্ধনে ধৃত তাহার প্রেয়সী! সবই তেমনই আছে, অথচ কী প্রভেদ! শতভিষা বাধা দিল না, আলিঙ্গন মধ্যে ধরা দিয়াই কহিল,—'তুমি কেমন করিয়া আসিলে? আমি জানিতাম—'

—'তুমি জানিতে আমি মৃত। আমি মরি নাই শতাব্দী। কেন মরিতে পারি নাই জানি না! হয়তো এ ভাবে তোমার সহিত সাক্ষাত হইবে বলিয়াই। তুমি পঁচিশ বছর আমাকে দেখিতে পাও নাই, কিন্তু আমি তোমার সকল সংবাদই রাখি। আমি জানি তুমিই আমার জীবনের কুগ্রহ;—তুমি আমার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ, তোমারই ষড়যন্ত্রে আমার প্রথমা পত্নীকে হারাইয়াছি, পুত্রকে বক্ষে পাই নাই, তোমারই অভিশাপে আজ আমি পথের ভিখারী। তোমাকে ভুলিবার জন্য আমি মদ্যপান করি অথচ ভুলিতে পারি না। বলিতে পার শতাব্দী, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন আজও তোমাকে ভালবাসি আমি?'

শতভিষা প্রত্যুত্তর করিল না। নীরবে কাঁদিতেছিল। হিমাচল কহিল,—'আশ্চর্য দুনিয়া! আশ্চর্য অভিরুচি দিন দুনিয়ার মালিকের! আমি আজও তোমাকে ভালবাসি। আমি জানি, তুমি স্বয়ং শয়তান —যবন দাসব্যবসায়ীর সহিত তুমি ঘৃণ্য উপজীবিকা বাছিয়া লইয়াছ, আমি জানি, তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, বুদ্বুদের মৃত্যু-পরোয়ানা বুকে করিয়া চলিয়াছ; আমি সংবাদ রাখি, মেবার তিলককে হত্যা করিতে তুমি চলিয়াছ—'

হিমাচলের বাহুবন্ধনের মধ্যে শতভিষা শিহরিয়া উঠিল।

—'সবই আমি জানি। এমন কি একথাও জানি যে, তোমার মায়াকান্নার নির্ভুল অভিনয় সত্ত্বেও এই মুহূর্তে তোমাকে আমার হত্যা করা উচিত, তবু আমার হাত উঠে না শতাব্দী! আমি আজও তোমাকে—'

কথাটা হিমাচলের শেষ হইল না। বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়াই সে শতভিষাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। শতভিষা হিমাচলের বক্ষবদ্ধ অবস্থায় তাহার অস্ফুট প্রণয়কূজন শুনিতে শুনিতে অতি সন্তর্পণে প্রিয়তমের তরবারির মুঠ ধরিয়াছিল। অতর্কিত ধাক্কায় সে পড়িয়া গেল। উঠিবার উপক্রম করিতেই হিমাচল তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া শতভিষার বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া কহিল,—

—'এইখানে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা আছে বাহির করিয়া দাও!'

শতভিষা বিনা বাক্যব্যয়ে পরোয়ানাটি বাহির করিয়া দিল। অবহেলা-ভরে উষ্ণীষের ভাঁজে সেটি রাখিয়া হিমাচল বলিল, 'তুমি মান্দোরে কখন যাইতেছ?'

—'মান্দোরে? আমি?'

—'সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার পূর্বেই পৌছাইয়া চণ্ডদেবকে সাবধান করিতে হইবে আমাকে! ভুলিও না শতাব্দী, শয়তান তোমার সহায় হইতে পারে—একলিঙ্গজী আমাদের সহায়।'

—'আমাকে ওকথা বলা বৃথা, তুমি জানো আমি যবনী। আমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা তোমাদের ঐ পাথরের নুড়ির নাই! আমি এক্ষণি রওনা হইব—এবং জানিয়া রাখ—তোমার পূর্বেই পৌছিয়া কার্য সমাধা করিব।'

—'দেখা যাউক! তুমি স্ত্রীলোক, নহিলে সে সম্ভাবনার মূলে এক্ষণি তরবারি আঘাত করিতে পারিতাম!'

হিমাচল পিছন ফিরিয়া দেখিল প্রহরীর সহিত বুদ্বুদ দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সে দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। শতভিষা একবার ভাবিল রণমল্লের নিকট সমস্ত কথা গিয়া বলে—কিন্তু তাহাতে শতাব্দীর ইতিহাস প্রকাশ করিতে হয়। বিষদন্ত ভাঙিয়া লইয়া সাপুড়ে যখন চলিয়া যায় তখন কালনাগিনী তাহার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায়—সেই মর্মান্তিক দৃষ্টিতে হিমাচলের গমন পথের দিকে চাহিয়া ফুঁসিতে লাগিল শতভিষা। তাহার পর ভূতল হইতে উঠিয়া বিষকন্যা বিষপ্রয়োগের উদ্দেশ্যেই হিমাচলের সহিত পাল্লা দিতে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িল।

সপ্তদিবস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই হিমাচল মান্দোর হইতে ফিরিল। মান্দোরের পথে যাইবার সময়, আসিবার সময়, হিমাচল কোথাও শতভিষার সন্ধান পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল সম্ভবত শতভিষা তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার বৃথা চেষ্টা করে নাই। যদিও শতভিষা তাহাকে স্পর্ধিতভাবে বলিয়াছিল হিমাচলের পৌঁছিবার পূর্বেই সে বিষপ্রয়োগ করিবে—কিন্তু দেখা যাইতেছে সে অবশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। চণ্ডদেবকে সর্ববিষয়ে সাবধান করিয়া উৎফুল্লচিত্তে হিমাচল চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিল।

চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে এই সপ্তদিবসের ইতিহাস শুনিল। সমস্ত শুনিয়া হিমাচলের রক্ত হিম হইয়া গেল। তাহার ভবিষ্যৎবাণীই ফলিতে চলিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত, রণভেরী বাজিবার অপেক্ষা। বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল আসিয়া পৌঁছিয়াছে—শুনা যায় উপেন্দ্রবজ্রও ছদ্মবেশে রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল গুরুতর সংবাদও হিমাচল মন দিয়া শুনিতে পারিল না। দুইটা অধিকতর নিদারুণ সংবাদে হিমাচল আজ দীর্ঘদিন পরে মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান করিল। সংবাদ জ্ঞাপন করিল বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল। প্রথমত, তিলাঞ্জলির উদ্ধার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নির্ধারিত সময়ে বুদ্বুদ নদীর অপর পারে অপেক্ষা করিতেছিল—একটি ক্ষুদ্রায়তন নৌকা দুর্গের দিক হইতে যথাসময়ে এই পারের দিকে আসিতেছিল। নৌকায় দুইজন যাত্রী ছিল, একজন পুরুষ অপরজন রমণী। নৌকা মধ্যনদীতে পৌঁছিলে তীরবেগে একটি ছিপ তাহার দিকে অগ্রসর হইল। ছিপে অন্তত বিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। দুই নৌকায় সংঘর্ষ হইল। রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহাতে বুদ্বুদ বুঝিল সে তিলাঞ্জলি। মুহূর্ত মধ্যে ছিপ হইতে সৈন্যগুলি ছোট নৌকায় আসিয়া তিলাঞ্জলিকে হরণ করিল—তাহার পুরুষ-রক্ষক প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। চক্ষুর সম্মুখে মাত্র ত্রিশ হাত দূরে জলমধ্যে তিলাঞ্জলিকে হরণ হইতে দেখিয়াও বুদ্বুদ নিশ্চল রহিল। কী করিতে পারিত সে? বুদ্বুদ সংবাদ লইয়া জানিয়াছে দুর্গমধ্যে তিলাঞ্জলি নাই। তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানে আয়ীমা অন্নজল ত্যাগ করিলেন; দুর্গমধ্যে বিষাদের ছায়া নামিল। রণমল্ল ও যোধরাওয়ের আদেশে সমস্ত চিতোর তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করা হইয়াছে—কিন্তু তিলাঞ্জলির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কাহারা তাহাকে অপহরণ করিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রণমল্ল সংবাদ পাইয়াছেন পঞ্চম বাহিনীর বুদ্বুদ সর্দারের সহিত তিলাঞ্জলির গোপন যোগাযোগ ছিল—তাই বুদ্বুদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। বুদ্বুদ আত্মগোপন করিয়া আছে।

দ্বিতীয় সংবাদটি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ। মহামতি রঘুদেব রানা মুকুলের আমন্ত্রণ পাইয়া চিতোরে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা তিনি জঠরে সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা অনুভব করেন। ভেষক আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন;—কিন্তু যন্ত্রণা উপশম হয় না। উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। সমস্ত রাত্রি তীব্র যন্ত্রণা সহিয়া ঊষা মুহূর্তে রঘুদেবের সমস্ত যন্ত্রণার চিরলাঘব হয়। রঘুদেবের মৃত্যুরোগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভেষক সন্দেহ করেন বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। রাজাগ্রজের মৃতদেহকে চিতোরে আনিতে দেওয়া হয় নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মহাত্মা রঘুদেবের নশ্বর দেহ পথিমধ্যেই চিতাভস্মে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

বলিতে বলিতে উদয়াচলের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। বিন্ধ্যাচল অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিল। হিমাচল মনে মনে বলিতেছিল,—'ভুল, ভুল করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি

নাই। রানার অগ্রজ বলিতে আমি চণ্ডদেবকেই বুঝিয়াছিলাম। অপাপবিদ্ধ শুদ্ধাচারী মহাত্মা রঘুদেবকে যে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে এ সন্দেহ আমার মনে জাগে নাই।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'কিন্তু এ স্থলে আমাদের আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নহে। আমাদেরও এক্ষণি চিতোর ত্যাগ করিতে হইবে।'

হিমাচল কহিল,—'বুঝিলাম। আমরা এক্ষণে কোথায় যাইব?'

—'চিতোর নগরপ্রান্তে শ্রেষ্ঠী ইন্দ্রগুপ্তের গদিতে। বুদ্বুদ সেই স্থলে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবে।'

—'সেখান হইতে?'

—'তারপর কোথায় যাইব জানি না। শ্মশানযাত্রীরা দুর্গ হইতে বাহির হইবার সময় বুদ্বুদ একবার দুর্গমধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখান হইতে সে একটি গোপন বার্তা আনিয়াছে—তাহাই—'

—'শ্মশান যাত্রা? তুমি যে বলিলে মহাত্মা রঘুদেবের দেহ চিতোরে আনীত হয় নাই।'

—'মহাত্মা রঘুদেবের নহে। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ চিতোরে পৌঁছিলে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ধাত্রীজননী আয়ীমাতার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তাঁহারই জন্য শ্মশানযাত্রীরা দুর্গ হইতে যখন শবদেহ বাহির করিতেছিল তখন অনেক নগরবাসী শিশোদীয়া ধাত্রীমাতার শেষ দর্শন পাইতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। উহারা তখন বাধা দিতে সাহস পায় নাই।'

—'আয়ীমাতা তাহা হইলে মারা গিয়াছেন?'

—'তুমি জানিতে না?'

—'না।'

হিমাচল আর একপাত্র মদ্য পান করিয়া উঠিল।

তিন বন্ধু নগরপ্রান্তে শ্রেষ্ঠী ইন্দ্রগুপ্তের গদির সন্নিকটে বুদ্বুদের সহিত মিলিত হইল—এবং তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল। দুর্গমধ্যে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া বুদ্বুদ রাজমাতার সহিত সাক্ষাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সম্মুখের প্রশস্ত উদ্যানে শিশোদীয়া বংশের ধাত্রী আয়ীমাতার শবদেহ শায়িত। মশালের আলোকে স্থানটা আলোকিত। আয়ীমাতাকে চণ্ডদেব জননীর মত শ্রদ্ধা করিতেন, সমস্ত চিতোরবাসীর চক্ষে তাই তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। তদুপরি মহাত্মা রঘুদেবের মহাপ্রয়াণের সংবাদে আয়ীমাতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে নগরবাসী যেন কাঁদিবার একটা অছিলা পাইল।

রঘুদেবের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা প্রায় রাজদ্রোহের তুল্য—তাই আয়ীমাতার মৃত্যু উপলক্ষে চিতোরবাসী প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। শবদেহ ঘিরিয়া শত শত লোক ভিড় করিয়াছে। বুদ্বুদ সকলের অলক্ষ্যে রাজমাতার মহলের দিকে গেল। তিলাঞ্জলির নিকট সে পূর্বেই শুনিয়াছিল রাজমাতা কোন্ কক্ষে অবস্থান করেন। মহলের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া সে দ্বিতলে উঠিল। মধুশ্রী আপন কক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়া কাঁদিতেছিলেন; সহসা গবাক্ষপথে বুদ্বুদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বুদ্বুদ তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিল,—'আমার নাম বুদ্বুদ সর্দার; আমি গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছি বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।'

মধুশ্রী তিলাঞ্জলির নিকট বুদ্বুদের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই বুদ্বুদকেই তিলাঞ্জলি ভালবাসিত। বুদ্বুদ পুনরায় কহিল,—'মাতা, আমার বাচালতা মার্জনা করিবেন; মান্দোরে বৌদ্ধচৈত্যে মহামতি চণ্ডদেবের সহিত আমিও গিয়াছিলাম। আমি জানি আপনার সমূহ বিপদের কথা। মহাত্মা রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডই এ নাটকের শেষ দৃশ্য নয়। রানার জীবনাশঙ্কার কথাও আমি অজ্ঞাত নহি! আমি শুধু একটি কথা স্বকর্ণে আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই। মাতা! আজও কি মহামতি চণ্ডদেবের প্রত্যাবর্তনের সময় হয় নাই?'

মধুশ্রী কোনো কথা বলিলেন না। কক্ষের কপাট বন্ধ করিয়া আসিয়া কহিলেন,—'তুমি আমার অপরিচিত নহ। শোন, তোমার হস্তে আমি একটি পত্র দিতেছি—যেমন করিয়া হউক এ পত্র বড় রাজকুমারের হস্তে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।'

এই বলিয়া মধুশ্রী কক্ষান্তরালে আসিয়া রানা মুকুলকে দিয়া একটি পত্র লিখাইলেন। তাহা লেফাফা

বন্ধ করিলেন। পত্র এবং একটি পারাবত বুদ্বুদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—'তাঁহাকে বলিও প্রত্যুত্তর লিখিয়া যেন এই পারাবতের মারফত প্রেরণ করেন।'

বুদ্বুদ আভূমিপ্রণত হইয়া প্রণাম করিল মধুশ্রীকে। ফিরিতে উদ্যত হইতেই মধুশ্রী কহিলেন,—'শুধু এই জন্যই আসিয়াছিলে? আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই?'

বুদ্বুদ নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

—'তিলাঞ্জলির সংবাদ লইলে না?'

—'আপনি জানেন?'

—'না, জানি না—তবে এটুকু বলিতে পারি সে দুর্গের বাহিরে যায় নাই। দুর্গমধ্যেই অবরুদ্ধ আছে।'

বুদ্বুদ পুনরায় প্রণাম করিল। মধুশ্রী তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি রত্নহার লইয়া বুদ্বুদের হস্তে দিয়া কহিলেন,—'অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে; মনে রাখিও রানার জীবন তোমার হস্তে গচ্ছিত দিলাম।'

কম্পিত করে মহামূল্য শতনরী গ্রহণ করিয়া বুদ্বুদ মস্তকে স্পর্শ করাইল।

কাহিনী শেষ করিয়া বুদ্বুদ লেফাফা ও পারাবত দেখাইল।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া চারিবন্ধু তৎক্ষণাৎ মান্দোর অভিমুখে যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। মারবারের গুপ্তচর চারিদিকে কড়া পাহারা রাখিতেছে—বুদ্বুদ সর্দারের সন্ধানে শ্যেনদৃষ্টি মারবারীচরেরা চিতোরের ঘরে ঘরে তল্লাস করিতেছে। সুতরাং এমনিতেই স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন। পত্র ও পারাবত বুদ্বুদের জিম্মায় রহিল—স্থির হইল পথে যদি তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তবে উদয়পুরে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রতীক্ষা করিবে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষিত হইবার পূর্বে চিতোরে আসিলে গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা। চারিবন্ধু অনতিবিলম্বে তদবস্থাতেই বন্ধুর পথ বাহিয়া মান্দোরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অতিপ্রত্যুষে চারি বন্ধুতে রওনা হইয়াছিল। ফলে দ্বিপ্রহরের সময় তাহারা উদয়পুরের নিকটে পৌছিল। উদয়াচল সকলকে নিকটবর্তী গ্রাম উন্তালায় আমন্ত্রণ করিয়াছিল—কিন্তু উন্তালায় তাহাদের শনাক্ত করা সহজ, তাই চারি বন্ধু উদয়পুরের সন্নিকটে পথিপার্শ্বের একটি বিপণিতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থে বসিল। খরিদ্দারেরা অনেকই বিপণির সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আহারাদি করিতেছিল। অবিলম্বে প্রার্থনামত ভোজ্যদ্রব্য আসিল এবং চারিবন্ধু দ্রুতগতিতে আহার সমাধা করিল; ইত্যবসরে তাহাদের অশ্বগুলিকেও কিছু আহার্য দেওয়া হইল। আহারান্তে চারিবন্ধু বিপণির মালিককে তাহার পাওনা মিটাইয়া দিয়া আসিলে খরিদ্দারদিগের একজন কহিলেন,—'মহাশয়েরা রাজধানী হইতে আসিতেছেন মনে হয়।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'হ্যাঁ মহাশয়'।

—'রাজধানীর সংবাদ কী?'

—'সংবাদ আর নূতন কি? রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডের পর সমস্ত রাজধানী স্তম্ভিত হইয়া আছে।'

—'হত্যাকাণ্ড! তাহা হইলে আপনারা বিশ্বাস করেন যে রঘুদেবকে রণমল্ল হত্যা করাইয়াছেন?'

—'আমার বিশ্বাসে কী যায় আসে! এ সত্যকথা সমস্ত মেবারই স্বীকার করে—কেন আপনি করেন না?'

প্রত্যুত্তরটা খরিদ্দার ভদ্রলোক জিহ্বায় উচ্চারণ করিলেন না। তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া কহিলেন,—'এ কথা যে উচ্চারণ করে তাহাকে মার্জনা করিতে পারি না।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'তোমরা অগ্রসর হও, আমি অনতিবিলম্বেই আসিয়া যোগ দিব। এ ভদ্রলোক আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং ইনি যাহাতে স্বয়ং কুমার রঘুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন সে ব্যবস্থা করিয়াই আসিতেছি!'

অগত্যা তিনবন্ধু পুনরায় যাত্রা শুরু করিল। হিমাচল কহিল, 'চারিজনের একজন কমিল। বন্ধুগণ! ভুলিও না আমাদের মধ্যে অন্তত একজনকে মান্দোর পৌছিতে হইবেই। বুদ্বুদ যদি আহত অথবা হত হয় তাহা হইলে তাহার পত্র ও পারাবত লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত অশ্বারোহণে উহারা আরাবল্লী পর্বতের নিকটে পৌছিল। এই পর্বতের অপর পার্শ্বেই মেবার রাজ্য সীমার শেষ। মান্দোর হইতেছে মালোয়া রাজ্যের রাজধানী। সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় হইতে মালোয়ায় একজন মুসলমান শাসনকর্তা রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহারই দরবারে চণ্ডদেব আশ্রয় লইয়াছিলেন। বুদ্বুদের ইচ্ছা রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তাহারা মেবার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বস্তুত শত্রুকবলিত স্বদেশই এখন তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিপদস্থল। রণমল্ল ও যোধার গুপ্তচর সমগ্র মেবারে ছড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনো গোলযোগ হইল না। তিনজনে গল্প করিতে করিতে আরাবল্লীর সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়া চলিতেছিল। গিরিসঙ্কট এস্থলে অত্যন্ত সংকীর্ণ—দুইজন অশ্বারোহীর পাশাপাশি চলিতে অসুবিধা। বুদ্বুদ সর্বপ্রথমে, তৎপরে উদয়াচল এবং সর্বশেষে হিমাচল আসিতেছিল। সহসা হিমাচলের অস্ফুট আর্তনাদ শুনিয়া চমকিত বুদ্বুদ পিছনে ফিরিয়া দেখিল হিমাচলের স্কন্ধে একটি তীরবিদ্ধ! সংজ্ঞা হারাইয়া হিমাচল অশ্বের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। বুদ্বুদ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া লক্ষ্য করিল পর্বতের উপরে দশ বারো জন ধানুকী তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে। মুহূর্তে দুইজনে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। একটি তীর আসিয়া বুদ্বুদের উষ্ণীষে বিঁধিল। উষ্ণীষ মস্তকচ্যুত হইল। সেই মুহূর্তে পশ্চাতে একটি পতন শব্দ শুনিল বুদ্বুদ! সম্ভবত উদয়াচল আহত হইয়া পড়িল। পশ্চাতে দেখিবার সময় নাই। কেবলমাত্র প্রাণধর্মের তাগিদে বুদ্বুদ বিদ্যুদ্‌বেগে অশ্বকে ছুটাইল। প্রায় অর্ধদণ্ড পূর্ণ আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে অশ্বচালনা করিয়া বুদ্বুদ বুঝিল বিপদ উদ্ধার হইয়াছে! সে রাজপথ হইতে নামিয়া একটি বৃক্ষান্তরালে আসিয়া অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিল। নিজেও ক্লান্ত দেহ শ্যাম শষ্পের উপর বিছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া বুদ্বুদ সন্তর্পণে লক্ষ্য করিয়া দেখিল উদয়াচল আসিতেছে। নিকটবর্তী হইলে সে তাহাকে থামাইল।

—'হিমাচলের কি হইয়াছে?'

—'না মরিলে আহত হইয়াছে!'

—'আর তুমি? তুমি আহত হইয়া পড়িয়া গেলে মনে হইল!'

—'না, আমি আহত হই নাই। আমার অশ্বটি আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমি হিমাচলের অশ্বটি লইয়া চলিয়া আসিয়াছি।'

অতঃপর দুইবন্ধু পুনরায় যাত্রা শুরু করিল। এক্ষণে অশ্ব দুইটির আর দ্রুতগতিতে যাইবার শক্তি নাই। তাহারা ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইল।

বুদ্বুদ কহিল,—'সম্ভবত আমরা মেবার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছি।'

—'না, আর অর্ধযোজন দূরে কোত্রার পান্থশালা। সবরমতী তীরের এই পান্থশালাই মেবারের সীমানা। চল, আজ রাত্রিতে এই পান্থশালাতেই আশ্রয় লই।'

'না; মেবার অতিক্রম না করিয়া রাত্রি যাপন করিব না। পান্থশালায় গিয়া কাজ নাই—এ পাপরাজ্যে আর এক মুহূর্ত নহে।'

উদয়াচল হাসিল, কহিল,—'মেবার না তোমার মাতৃভূমি!'

—'মাতৃভূমি যে ভাবে প্রতিপদে আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে সেকথা ভুলিতে বসিয়াছি।'

উদয় কহিল,—'বেশ; রাত্রিবাস না কর, পান্থশালায় নৈশ আহারটা সমাধা করা যাউক।'

এ প্রস্তাবে বুদ্বুদ তৎক্ষণাৎ রাজি। বস্তুত ক্ষুধায় তাহার জঠর এতক্ষণে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তাহা ভিন্ন অশ্বও আর বহিতে অশক্ত। অল্পক্ষণ পরেই উভয়ে পান্থশালায় পৌছিল; কিন্তু পান্থশালার প্রাঙ্গণে অনেকগুলি অশ্ব বিচরণ করিতেছে দেখিয়া দুজনেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

উদয় কহিল,—'তুমি অপেক্ষা কর, আমি পূর্বে সংবাদ লইয়া আসি।'

বুদ্বুদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই তাহার অশ্বটি মাটিতে পড়িয়া গেল। উদয়াচল একাই পান্থশালার সন্নিকটে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিজন সশস্ত্র সৈনিক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

একজন রাজপুরুষ প্রশ্ন করিল,—'আপনার নামটি জানিতে পারি মহাশয়?'

অপর দুইজন সৈনিক তখন মুক্ত কৃপাণ হস্তে বুদ্বুদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

উদয়াচল চীৎকার করিয়া বলিল,—'আমার নাম বুদ্বুদ সর্দার। কিন্তু এভাবে আমাকে প্রশ্ন করার অর্থ?'

উদয়াচলের কথা শেষ হইল না। চারিজন সৈনিকই একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিল। এমন কি যে দুইজন সৈনিক বুদ্বুদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—তাহারাও উদয়াচলের আত্মপরিচয় শুনিয়া তাহারই দিকে ফিরিল। বুদ্বুদ আর কালবিলম্ব করিল না। উদ্যানে ভ্রমণরত একটি অশ্বের উপর উঠিয়া তীরবেগে মালবের দিকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বুদ্বুদের নিকট হইতে পত্র পাইয়া যুবরাজ চণ্ডদেব পত্রপাঠ করিলেন! পত্রে লেখা ছিল—

'দাদাভাই, তুমি ব্যাঘ্র ধরিবার ফাঁদ তৈয়ারী করিয়া শীঘ্রই ফিরিবে বলিয়াছিলে। আজও ফিরিয়া আসিলে না। তোমার পথ চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্র দুইটির অত্যাচারে এখানে কেহই শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্র দুইটি ছোড়দাকে খাইয়াছে। আয়ী ঠাকুমাকে খাইয়াছে, দিদিকেও কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাকে খাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে। তোমার দুইটি পায়ে পড়ি তুমি ফিরিয়া আইস।'

পত্রের এই পর্যন্ত হস্তাক্ষর বালকোচিত। পরের অংশের হস্তাক্ষর অধিকতর নিপুণ।

'জানি, তোমার চরণে আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। অন্যায় যদি করিয়াই থাকি নিজে আসিয়া শাস্তি দাও। আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। আর কেহ না জানিলেও তুমি তো জানো দাদাভাই, প্রথম দিন হইতেই তোমাকে আমি কী চক্ষে দেখিয়াছি। আজ ভাগ্যবিড়ম্বনায় আমি তোমার প্রণম্য—তাই কি আমায় ত্যাগ করিলে? কিন্তু এ ব্যবস্থা তো আমি করি নাই। কে তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে বলিয়াছিল? কেন আমার জীবন ব্যর্থ করিয়া এ সম্মানের পদে আমায় অধিষ্ঠিত করিলে? আমি জানি ইহাতে তুমিও সুখী হইতে পার নাই। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আপন অন্তর্দাহে আমি তখন অন্ধ ছিলাম। সে পাপের কি এত বড় শাস্তি? ছোড়দাদার মৃত্যু, আয়ীমায়ের মৃত্যুতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার শাস্তির ব্যবস্থা কর। আমার হঠকারিতায় সমগ্র মেবার কেন শাস্তি পাইবে? ভুলিও না, তুমি মেবারকে রক্ষা করিতে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

'আজ এখানেই শেষ করিতেছি। পারাবতের মারফত প্রত্যুত্তর দিও। জীবনের প্রথম ও শেষ প্রণাম আজ পাঠাইতেছি। সামাজিক মর্যাদায় আমি উচ্চে অধিষ্ঠিত এই অছিলায় আমার প্রণাম প্রত্যাখ্যান করিও না।

ইতি

তোমার ছোটভাই মুকুল।'

পত্রটি পড়িতে পড়িতে চণ্ডদেবের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। এ পত্রের প্রতিছত্রে মুকুলের পিছন হইতে যেন কাহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। এ-প্রণাম রাজা তাঁহার অধীনস্থ সর্দারকে পাঠাইতেছেন না, এ প্রণাম আসিতেছে তাঁহারই কাছ হইতে যাঁহাকে চণ্ডদেব প্রণাম করিলেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

চণ্ডদেব তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর লিখিয়া পারাবতের পক্ষতলে লুক্কায়িত করিয়া পারাবতটিকে ছাড়িয়া দিলেন। শূন্যে পাক খাইতে খাইতে পারাবত নীল আকাশের তলায় মেঘশুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া চিতোরের দিকে ভাসিয়া চলিল। তাহার মুক্ত পক্ষে সূর্যকিরণের আশীর্বাদের স্পর্শ লাগিল—যেন স্বয়ং দিনকর সূর্যবংশের এই আশার মন্ত্রবহনকারী পক্ষীটির দেহে কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

অতঃপর চণ্ডদেব বুদ্বুদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন। তাহার সহিত চিতোর জয়ের পরামর্শ করিলেন। বুদ্বুদের পুনরায় চিতোরে প্রত্যাবর্তনের উপায় ছিল না—সেস্থলে তাহার বিরুদ্ধে

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। অগত্যা বুদ্বুদকে চণ্ডদেবের আশ্রয়েই থাকিতে হইল। বুদ্বুদকে এইখানে রাখিয়া আমরা এক্ষণে চিতোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিব।

মীনকেতন বিশ্বাস করে নাই তিলাঞ্জলিকে দস্যুতে অপহরণ করিয়াছে। যোধা মীনকেতনকেই সন্দেহ করিলেন; মীনকেতন সন্দেহ করিল রাও রণমল্লকে। এমন কি সে রণমল্লকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল অথচ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। মীনকেতন সুতরাং রণমল্লের মহলে গুপ্তচর রাখিলেন। অল্পদিন পরেই সংবাদ আসিল রণমল্লের খাস কামরায় গভীর রাত্রে একটি রমণীমূর্তিকে দেখা যায়, স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে কোন এক বন্দিনী নারীর আর্ত রুদ্ধ ক্রন্দন পাষাণশিলায় আঘাত খাইয়া ফিরে। অথচ রণমল্লের মহলে অনবরত লোকজন যাতায়াত করিতেছে—সন্দেহ হইবার কোনও কারণ নাই। ক্রন্দন তো রণমল্লের কক্ষ হইতে আসে না, কক্ষের প্রাচীর ভেদ করিয়া মর্মরশিলা যেন রুদ্ধশ্বাসে গুমরিয়া মরে। কথাটা লইয়া প্রহরী মহলে আলোচনা শুরু হইল। রণমল্লের কানেও উঠিল। তিনি বলিলেন,—এ শব্দ তিনিও শুনিয়াছেন। প্রতিবিধান করিবার জন্য আয়ীমাতার আত্মার সদ্‌গতি করিতে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইল। তৎপরে আর কেহ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল না, সকলেই বুঝিল আয়ীমাতার অতৃপ্ত প্রেতাত্মাই গুমরিয়া ফিরিত।

শুধু বুঝিল না মীনকেতন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ ক্রন্দন অতৃপ্ত প্রেতাত্মার নহে—বন্দিনী নারীর। তাই সে অন্বেষণ শুরু করিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর ক্রন্দন বন্ধ হওয়ায় সে বুঝিল তিলাঞ্জলিকে রণমল্ল হত্যা করিলেন। সম্ভবত ঐ কিশোরীটির প্রতি কৌতূহল শেষ হইয়াছিল রণমল্লের।

এই সময় সহসা একদিন গভীর রাত্রে মীনকেতন লক্ষ্য করিল রণমল্লের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আলোকরশ্মি আসিতেছে। মীনকেতন অগ্রসর হইতে রণমল্লের গৃহরক্ষক প্রহরী বাধা দিল। মীনকেতন জিজ্ঞাসা করিল,—'মহারাজের কক্ষে কে আছে?'

প্রহরী ওষ্ঠের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া নীরব হইতে বলিল এবং কর্ণকুহর হইতে দুইটি কার্পাসখণ্ড বাহির করিয়া কর্ণমূল মীনকেতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। মীনকেতন পুনরায় প্রশ্ন করিল। প্রহরী একগাল হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল,—'আমি কানে ভাল শুনিতে পাই না।'

তখন প্রহরীকে উদ্যানে আনিয়া মীনকেতন পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিল। এইবার প্রহরী বলিল,—'মহারাজ পিশাচসিদ্ধ। প্রতি রাত্রেই প্রেতাত্মার সহিত তিনি কথোপকথন করেন।'

মীনকেতন হাসিল, 'বুঝিলাম। কিন্তু তুমি কানে ভালো শুনিতে পাও না—তদুপরি কর্ণকুহরে কার্পাসখণ্ড দিয়াছ কেন?

—'আজ্ঞে মহারাজ বলিয়াছেন, প্রেতযোনির কথা শুনিলে মানুষ একেবারে বধির হইয়া যায়। তাই অন্যান্য প্রহরীরা থাকে না, আমাকেই থাকিতে হয়। আমি অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।'

মীনকেতন মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'বেশ করিয়াছ। কিন্তু তুমি কি জানো না, প্রেতযোনিকে দেখিলেও চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়? মহারাজ বলেন নাই?'

—'আজ্ঞে বলিয়াছেন। আমি চক্ষুও বন্ধ করিয়া থাকি।'

—'কিন্তু তোমার উচিত অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চক্ষুর উপর বন্ধনী দেওয়া। চক্ষুদ্বয় একবার হারাইলে আর ফিরিয়া পাইবে?'

প্রহরী এই অকাট্য যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করিল এবং মীনকেতনকে অনুরোধ করিল তাহার চক্ষু দুইটি বাঁধিয়া দিতে। মীনকেতন প্রহরীর উষ্ণীষ দিয়াই তাহার চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া দিল। কর্ণে কার্পাস দিয়া রুদ্ধনয়নে প্রহরী অতঃপর সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল, এবং মীনকেতন গবাক্ষের নিকটে আসিয়া ভিতরে দৃক্‌পাত করিল।

ঘরের ভিতর পালঙ্কে মহারাজ রাও রণমল্ল বসিয়া আছেন। সম্মুখে পাষাণের উপর ভূমিতলে তিলাঞ্জলি বসিয়া আছে। এই কয়দিনেই তাহাকে অতি শীর্ণা ও কাতরা দেখাইতেছিল। রণমল্ল কহিলেন,—'তোমাকে শেষবার বলিতেছি, এখনও বল, কে তোমাকে লইয়া পলাইতেছিল?'

—'আমি তো বলিয়াছি, তাহার নাম বলিব না। অনাহারে আমাকে হত্যা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার পরিচয় আমি দিব না।'

—'তোমার স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তুমি ভাবিয়াছ তাহার নাম না বলিলে আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব? ভুল কথা। আজ এক সপ্তাহ তোমাকে আহার্য দিই নাই—সে তোমাকে হত্যা করিবার জন্য নহে। তোমাকে আজীবন এই অন্ধকূপেই থাকিতে হইবে।'

—'অত্যাচারের চরম তো করিয়াছেন—আর কী করিতে পারেন, করুন!'

—'অত্যাচার তো এখনও শুরুই হয় নাই তিলাঞ্জলি। এখনও তোমার ধর্ম নষ্ট হয় নাই। কেন হয় নাই জানো? সত্যকথা স্বীকার করিলে তোমার স্বামীর নিকটে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া। তুমি বলিয়াছ তুমি বিবাহিত সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিব না—কিন্তু কে তোমাকে দুর্গ হইতে সরাইতেছিল তাহার নাম না বলিলে তোমাকে মুক্তি দিব না।'

তিলাঞ্জলি অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এতবড় প্রলোভনেও সে মীনকেতনের নামোচ্চারণ করিল না। সখীর কথা তাহার মনে পড়িল। না! তাহার প্রিয় সখীর প্রতি সে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না।

—'নাম বলিবে না?'

—'মহারাজ আমাকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন।'

তিলাঞ্জলি রণমল্লের পদতলে পড়িল। রণমল্লের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে উঠিয়া তিলাঞ্জলির কেশাকর্ষণ করিলেন এবং টানিতে টানিতে কক্ষের অপর প্রান্তে লইয়া গেলেন। পাষাণ চত্বরের একটি গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া তিলাঞ্জলিকে অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। নারীদেহের ভারি পতন শব্দের পরে নৈঃশব্দ্য ঘনাইয়া আসিল। মীনকেতন ধীরপদে নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। সে বুঝিল, অবিলম্বে চোরের উপর বাটপারি করিতে না পারিলে তাহার নাম প্রকাশ হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা।

কুমার রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডের পর মেবারীদের অসন্তোষ আর গোপন রহিল না। রঘুদেব রাতারাতি শহীদ হইয়া গেলেন। ঘরে ঘরে রঘুদেবের মূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা চলিতে লাগিল। প্রথমে যাহারা রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডে রণমল্লকে দায়ী করিতেছিল তাহাদের রাজপ্রহরীরা বিচারার্থে রাজসকাশে আনিত। কিন্তু অচিরেই রণমল্ল দেখিলেন শাস্তি দিয়া একথা বন্ধ করা যায় না। সমস্ত মেবার এক বাক্যে রণমল্ল ও যোধরাওকে হত্যাকারী বলিতেছে. সুতরাং একথা উপেক্ষা করাই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

গণ্ডগোলের এখানেই শেষ নহে। সর্বত্র প্রচারিত হইল রানা মুকুলকেও রণমল্ল দুর্গমধ্যে হত্যা করিয়াছেন। তাই দুর্গের বাহিরে তাঁহাকে আনা হইতেছে না। প্রজাদিগের এই বিদ্রোহী মনোভাব জানিয়াও প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিতে রণমল্ল সাহসী ছিলেন না। মুকুলকেও দুর্গের বাহিরে আসিতে দিতেন না। ফলে গুজব দাবানলের মতো রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। দূর দেশ হইতে ভীল, মীনা, আহেরিয়া জাতির সর্দারেরা সমরসাজে সজ্জিত হইয়া রাজধানী অভিমুখে চলিল।

রণমল্ল ও যোধরাও প্রমাদ গণিলেন। উভয়ে আসিয়া মধুশ্রীর শরণাপন্ন হইলেন। কী করা যায়? মধুশ্রী পরামর্শ দিলেন রানাকে লইয়া আহেরিয়ায় যাওয়া হউক। প্রকাশ্য স্থানে রানাকে শিকার করিতে দেখিলে প্রজারা শান্ত হইবে। কথাটা রণমল্লের ভালো লাগিল না। শিকারে যাইতে হইলে সশস্ত্র যাইতে হয়। প্রজারাও সশস্ত্র থাকিবে। সুতরাং যুদ্ধ বাধিতে বিলম্ব হইবে না। এ প্রস্তাবে তাঁহার মন সরিল না। তখন মধুশ্রী বলিলেন,—'তাহা হইলে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে রানা পূজা লইয়া যান। প্রতিদিন এক এক এলাকায় গিয়া পূজা দিয়া আসুন। তাহা হইলেও সকলে তাঁহাকে জীবিত দেখিবে এবং বুঝিবে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য চলিতেছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।'

রণমল্ল এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতিদিন নানা পূজার উপকরণ লইয়া রানা মুকুল অশ্বারোহণে

রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসেন। রানাকে স্বচক্ষে দেখিয়া প্রজাগণ শান্ত হয়। কখনও কখনও স্বয়ং মধুশ্রীও পালকিতে করিয়া রানার সহিত পূজা দিয়া আসেন।

এইরূপে বিদ্রোহের বহ্নিতে রণমল্ল বারি সেচন করিলেন।

বুদ্বুদ মালবে যাইবার পথে তিন বন্ধুকে তিন বিপদের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিল পাঠক নিশ্চয়ই জানিতে উৎসুক।

তিন বন্ধুই উদয়পুরে পুনর্মিলিত হইল। বিন্ধ্যাচল তাহার তার্কিক বন্ধুটিকে সন্দেহভঞ্জনার্থে স্বয়ং রঘুদেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। হিমাচল আহতাবস্থায় উদয়পুরে রাখাল বালকদের দ্বারা নীত হইয়াছিল। আর উদয়াচলকে রাজসকাশে আনা হইলে প্রমাণিত হয় যে, তাহার নাম বুদ্বুদ নহে। তাহার বিরুদ্ধে কোনও পরোয়ানা নাই।

তিন বন্ধু উদয়পুরে মিলিত হইলে উদয়াচল বলিল,—'বুদ্বুদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজধানীতে যাওয়া আপাতত উচিত হইবে না। তোমরা যদি অনুমতি কর নিকটেই উন্তালা গ্রামে আসিয়া আমার অতিথি হইতে পার।'

হিমাচল হাসিয়া কহিল,—'উন্তালা রাজ্য তো তোমার নহে—মেহরা সর্দারের সম্পত্তির যিনি মালিক তিনি নিমন্ত্রণ না করিলে কেমন করিয়া যাই?'

উদয়াচলও হাসিয়া কহিল,—'মেহরা সর্দারের সম্পত্তির আমি মালিক নহি—কিন্তু 'মালকানির' অনুগত ভৃত্য তো বটে। সুতরাং অনুপস্থিত সর্দারণীর পক্ষে এই ভৃত্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।'

তিন বন্ধুই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সকলে উন্তালা গ্রামে গিয়া উদয়াচলের গৃহে অপেক্ষা করাই স্থির করিল। যাত্রার পূর্বেই কথা হইয়াছিল কাহারো আত্মগোপনের প্রয়োজন হইলে উন্তালায় আসিয়া অপেক্ষা করিবে। সুতরাং আশা করা যায় বুদ্বুদ ফিরিবার পথে উন্তালায় সংবাদ লইবে।

উদয়াচলের মনিব. অর্থাৎ স্বর্গগত মেহ্‌রা সর্দারের কন্যা লছমী তিনবন্ধুকে দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল। তাহার এই গ্রাম্য কুটিরে কেহ আতিথ্য গ্রহণ করে না—সুতরাং তিন বন্ধুকে একসঙ্গে পাইয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল। তদুপরি হিমাচল আহত। তাহার সেবার ভারও লইতে হইল।

লছমীর বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ, একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে তাহার। অথচ এই শ্যামাঙ্গী তন্বীটিকে কিশোরী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাণবন্যার চঞ্চলতায় যৌবন যেন এখনও কৈশোরের স্থান অধিকার করে নাই। সে চলিতে গিয়া ছুটিয়া চলে, কথা কহিতে গিয়া যেন গান গাহিয়া ওঠে। চারি বৎসরের শিশুটি ছায়ার মত মায়ের চরণে বাঁধা। বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল প্রত্যূষে শিকার করিতে যায়—নানা বন্য জন্তু মারিয়া আনে; গল্প করিতে বসে। লছমী এই অবসরে গৃহকর্মের কাজগুলি সারিয়া লয়।

অল্প সময়েই হিমাচলের সহিত লছমীর শিশুপুত্রটির গভীর বন্ধুত্ব জন্মিল। উদয়াচল তাহার নাম রাখিয়াছিল ভরত। হিমাচল শিশুকে লইয়া ভরতরাজের উপাখ্যান শুনাইত। রাজা দুষ্মন্তের সহিত শিশু ভরতের দ্বন্দ্বযুদ্ধের গল্প শুনিতে শুনিতে ভরতের দুইচক্ষু বর্তুলাকার ধারণ করে। শিশু বলে,—'জ্যেঠু, আমিও বাবার সহিত যুদ্ধ করিব।'

হিমাচল তাহাকে বক্ষে টানিয়া লয়, বলে,—'বাবার সহিত কখনও যুদ্ধ করিতে আছে?'

তাহার বঞ্চিত পিতৃত্ব যেন বুকের মধ্যে হুহু করিয়া উঠে।

এইভাবে সাতদিন অতিবাহিত হইল। তিন বন্ধুর সুখেই দিন কাটিতেছিল। লছমীর তো খুশীর অন্ত নাই। আর ক্ষুদ্র ভরত মাকে ছাড়িয়া হিমাচলকে যেন পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু এ ভাবে দিনাতিপাত করিলে তো কোনও লাভ নাই। বুদ্বুদের সংবাদ আসিতেছে না কেন? রানা একদিন উদয়পুরেও পূজা দিয়া গেলেন। দুই বন্ধু ভরতকে লইয়া রাজ সন্দর্শনে গেল। হিমাচল গৃহে রহিল।

অবশেষে একদিন বুদ্বুদের পত্রবাহক আসিল। গুপ্তচরের হস্তে বুদ্বুদ পত্র দিয়াছে। তিন বন্ধু পত্র খুলিয়া পাঠ করিল। লছমীও আসিয়া শুনিল। পত্রটি এইরূপ—

'শ্রীএকলিঙ্গ প্রসাদ, শ্রীগণেশ জয়তি,

পরম প্রিয় হিমাচল, সংবাদ পাইলাম আহত অবস্থায় তুমি উন্তালায় মেহ্‌রা সর্দারের গৃহে অবস্থান করিতেছ। আমি পত্র যথাস্থানে অর্পণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছি। শীঘ্রই উন্তালায় গিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আশা করি ততদিনে তুমি রোগমুক্ত হইবে। দুর্গজয়ের ব্যবস্থা কী হইয়াছে সাক্ষাতে বলিব। অন্যান্য সংবাদ মঙ্গল।

পুঃ—তোমার রোগমুক্তির জন্য একলিঙ্গজীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলাম। এই সঙ্গে প্রসাদ পাঠাইলাম। তোমার আশু রোগমুক্তি কামনা করি।'

কদলীপত্রে আচ্ছাদিত একলিঙ্গজীর প্রসাদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া লছমী সেটিকে চারিভাগে ভাগ করিতে লাগিল।

ভরত কহিল,—'মা, তুমি চার ভাগ করিলে কেন? আমি খাইব না?'

লছমী কহিল,—'তুমি আমার ভাগ হইতে খাইবে।'

বালক শুনিল না। তড়িৎগতিতে একটি ভাগ উঠাইয়া লইল। উদয়াচল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ভর্ৎসনা করিল। হিমাচল কহিল,—'তোমাকে শাসন করিতে হইবে না! ও শিশু, খাউক।'

ভরত বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্বে মিষ্টান্ন মুখে পুরিয়া দিল এবং খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাহার দিকে ফিরিল। অট্টহাস্য নহে, যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছে শিশু। সকলেই ছুটিয়া আসিল। শিশু তখন ভূমিতলে পড়িয়া ছিন্নশির ছাগশিশুর দেহের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছিল। হিমাচল চীৎকার করিয়া উঠিল,—'বিষ! শীঘ্র একজন চিকিৎসক!'

উদয়াচল তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। লছমী পাগলের মতে শিশুর বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। শিশু অস্ফুটে একবার মাতৃসম্বোধন করিল মাত্র। তাহার দেহ ধীরে ধীরে নীলবর্ণ ধারণ করিল। সমস্ত দেহ হিমশীতল হইয়া গেল। উদয়াচল ভেষক লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই কীটদষ্ট নীলপদ্মের ন্যায় ভরতের দেহ হইতে শিশুপ্রাণ মুক্তি পাইয়াছে।

ভরতের মৃত্যুতে লছমী এবং উদয়াচল একেবারে দিশাহারা হইল। উদয়কে উন্তালায় রাখিয়া হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল চিতোর অভিমুখে চলিল। আর এ গ্রামে হিমাচলের মন টিকিতেছিল না।

রাজস্থানে দেওয়ালীর উৎসব বড় আনন্দের দিন। বড় পুণ্যদিনও বটে। আজ অতি প্রত্যুষে মধুশ্রী শিশুপুত্রকে লইয়া গোশুন্দা গ্রামে সুন্দেশ্বরীর পূজা দিতে গিয়াছেন। গোশুন্দা চিতোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র এক যোজন দূরে, কিন্তু পূজা ঘোর অমাবস্যা রাত্রে হইবে—সুতরাং রানা ও রাজমাতা মধ্যরাত্রের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রাজপুরীর সকলেই অল্প-বিস্তর নেশা করিয়াছে। কেহ অহিফেন, কেহ সুরা, কেহ বা অন্য কোনও মাদক দ্রব্য। প্রভাত হইতেই আনন্দ উৎসবের বন্যাস্রোত বহিতেছে। রাজাবরোধের বন্ধনী কিছু শিথিল। রণমল্ল সমস্ত দিন সুরাপান করিয়াছেন। যোধরাও কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজপুরী হইতে একাকী কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মীনকেতন বুঝিল এই সুযোগ। আজ অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারে গুপ্তকক্ষ হইতে তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিতে না পারিলে আর কোনও দিন সুযোগ আসিবে না। সে শুধু রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রাসাদশিখর দীপাবলী শোভিত; সমস্ত চিতোর যেন আলোকমালার কণ্ঠহার পরিয়াছে। মাঝে মাঝে রঙিন আতশবাজী শূন্যে উঠিয়া আকাশে তারাফুল ছড়াইয়া দিতেছে। বিস্ফোরক ও বাদ্যের মুহুর্মুহু নিনাদে রাজধানী মুখরিত। মীনকেতন মন্দুরা হইতে একটি তেজস্বী কাম্বোজ লইয়া তাহাকে সুসজ্জিত করিল। রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে নিঃশব্দে মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণমল্লের শয়নকক্ষের দিকে চলিল। আজ দ্বারে প্রহরী নাই। সম্ভবত সেও নেশায় অভিভূত—কোথায় স্ফূর্তি করিতেছে। মীনকেতন দেখিল রণমল্লের কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে। গবাক্ষপথে দেখিল, রাও রণমল্ল পালঙ্কে অর্ধশয়ান অবস্থায় পড়িয়া আছেন—তিলাঞ্জলি তাঁহার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তিলাঞ্জলি এ কয়দিনে আরও শীর্ণা হইয়াছে। তাহাকে আর যুবতী রমণী বলিয়া মনে হয় না। স্নানাভাবে কেশরাশি রুক্ষ, মুখ মলিন। তাহার বেশবাস অসংবৃত। সম্ভবত্র দুর্বল

শরীরে রণমল্লের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতেই তাহার এই দুর্দশা। রণমল্ল অত্যধিক মদ্যপান করিয়াছিলেন। জড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—'ক্রীতদাসি! এখনও তাহার নাম বলিবি না!'

তিলাঞ্জলি রণমল্লের কবলমুক্ত হইয়াছিল,—দূরে সরিয়া বেশবাস সংযত করিয়া কহিল,—'না, মারিয়া ফেলিলেও বলিব না।'

রণমল্ল কহিলেন,—'মারিব না—তোকে মারিব না—কিন্তু তোর কী সর্বনাশ করি দেখ্!'

একপদ অগ্রসর হইতেই কিন্তু তিনি স্খলিত-চরণে ভূতলে পড়িলেন। তিলাঞ্জলি পিছাইতে পিছাইতে রুদ্ধ কবাটে বাধা পাইল। রণমল্ল রাও অতিকষ্টে গাত্রোত্থান করিলেন। হাত বাড়াইয়া পুনরায় একপাত্র মদ্য পান করিয়া তিলাঞ্জলির দিকে ফিরিতেই পুনরায় তাঁহার মস্তক টলিয়া উঠিল। তিনি একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তিলাঞ্জলি আর কালবিলম্ব না করিয়া পার্শ্ববর্তী রৌপ্য চষকদানি লইয়া শায়িত রণমল্লের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। রণমল্লের কপাল কাটিয়া গেল, রক্ত ছুটিল, কিন্তু তাঁহার নেশা ছুটিল না। তখন তিলাঞ্জলি ক্ষিপ্রহস্তে আপন ওড়না দিয়া রণমল্লকে খাটিয়ার সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। রণমল্ল বাধা দিলেন না—বোধকরি তিনি অচৈতন্য তুরীয় অবস্থায় এ বিষয় জানিতেও পারিলেন না। তিলাঞ্জলি দ্বারের দিকে ফিরিল। দ্বার ভিতর হইতেই অর্গলবদ্ধ। রণমল্লের নিকট অর্গলের কুঞ্চিকা পাওয়া গেল। কম্পিতহস্তে দ্বার খুলিবার উপক্রম করিতেই মীনকেতন সশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তিলাঞ্জলির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। তাহার রক্ষক তাহা হইলে তাহাকে ভোলে নাই। তিলাঞ্জলি মীনকেতনের দিকে একপদ অগ্রসর হইতেই মীনকেতন সবলে তাহাকে বাহুমধ্যে আকর্ষণ করিল।

তিলাঞ্জলি এ ব্যবহারে যেন বজ্রাহত। সে আত্মরক্ষার্থে মীনকেতনকে প্রতিহত করিবার উপক্রম করিতেই মীনকেতন তাহাকে দুইহস্তে শূন্যে তুলিয়া কহিল,—'কোন প্রতিবাদ করিলে দ্বিতল হইতে নিচে নিক্ষেপ করিব।'

তিলাঞ্জলির আর শক্তি ছিল না। অস্নাত, অভুক্ত, অত্যাচার-জর্জরিত ক্ষীণতনু মেয়েটির শরীরে শেষ রক্তবিন্দুও যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সে কোনও বাধা দিতে পারিল না। নির্জীবের মতো মীনকেতনের বাহুবন্ধে পড়িয়া রহিল। বস্তুত যাহাকে রক্ষা করিতে দীর্ঘদিন সে এত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে সেই সখীর স্বামী যে এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহা জানিবার পর তিলাঞ্জলির আর বাঁচিবারই ইচ্ছা ছিল না। হতচেতন নারীরত্ন লইয়া দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইয়াই মীনকেতন শুনিল দুর্গ-দ্বারদেশে কিসের গণ্ডগোল হইতেছে। দ্বারপথে আসিয়া দেখিল দশ বারো জন অশ্বারোহী রণমল্লের মহলের দিকে আসিতেছে। মীনকেতন বুঝিল গুরুতর কিছু হইয়াছে। পলায়নের উপায় নাই। মুহূর্তে প্রহরীরা আসিয়া পড়িবে। কালবিলম্ব না করিয়া মীনকেতন গুপ্তদ্বার পথে তিলাঞ্জলিকে লইয়া প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিল। ভিতর হইতে রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

রানা মুকুলকে লইয়া মধুশ্রী সুন্দেশ্বরীর পূজা দিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত একশত মারবারী অশ্বারোহী যোদ্ধা রানার দেহরক্ষী হিসাবে আসিয়াছে। সুন্দেশ্বরীর পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গোগুন্দা দুর্গের মীনার চূড়ায় রাজমাতা মধুশ্রী রানাকে লইয়া উঠিলেন। সমস্ত গোগুন্দা গ্রামের গৃহে গৃহে দীপাবলীর সজ্জা—আতশবাজী—ফুলঝুরি। শিশু রানা দুর্গের শীর্ষে প্রদীপ সাজাইতে ব্যস্ত—সকলেই নানা আনন্দে উৎসবে মগ্ন। শুধু রাজামাতা মধুশ্রী নিষ্পলক নেত্রে দক্ষিণ দিকে চাহিয়া আছেন। আজ চণ্ডদেবের আসিবার কথা! তাঁহার সংকেত লক্ষ্য করিতে যেন ভুল না হয়। চণ্ডদেব লিখিয়াছেন, দীপান্বিতার রাত্রে মধুশ্রী যেন রানাকে লইয়া গোগুন্দা দুর্গে তাঁহার প্রতীক্ষা করেন। চণ্ডদেব সেইস্থলে রাজমাতার সহিত সাক্ষাত করিবেন। যদি কোনও কারণে সাক্ষাত করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দুর্গের দক্ষিণ কোণে রাত্রি একপ্রহরের পরে একযোগে দশটি হাউই উঠিবে। এই সঙ্কেত দেখিলে কালবিলম্ব না করিয়া যেন মধুশ্রী চিতোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

সমস্ত দিন গোগুন্দা দুর্গে অপেক্ষা করিয়া মধুশ্রী বুঝিলেন চণ্ডদেব আসিলেন না। আসিলেও

একশত মারবারী প্রহরীর চক্ষু এড়াইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মধুশ্রীর চক্ষু সজল হইল। সহসা এই সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন দুর্গের দক্ষিণ দিকে একযোগে দশটি হাউই সশব্দে আকাশে উঠিল। একসঙ্গে ফাটিয়া সহস্র পুষ্পধারায় তাহারা ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত দুর্গের উপর তাহার আলোকপাত হইল। সকলেই এই অপূর্ব রোশনাই দেখিল—পুনরায় আতশবাজী উঠিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল—কিন্তু অমানিশীথিনীর যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল। মধুশ্রী দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া মুকুলকে ক্রোড়ে লইলেন। পালকি লইয়া অবিলম্বে তিনি চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পালকিতে উঠিয়া মুকুল নিদ্রাভিভূত হইল। মধুশ্রী বিনিদ্র নয়নে ঈষদুন্মুক্ত দ্বারপথে অধীর আগ্রহে চাহিয়া রহিলেন। চণ্ডদেবকে পথে কোথাও দেখা গেল না। শুধু চিতোরের নগরসীমার নিকট সহসা মধুশ্রী দেখিলেন চল্লিশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে পালকির পাশ দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া গেল। অশ্বারোহীদিগের পুরোভাগে একজন কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত রাজপুরুষ পালকির পাশ দিয়া যাইবার সময় রানাকে অভিবাদন করিলেন শুধু। শূলহস্ত বিরাটকায় রাজপুতটিকে অন্ধকারে চিনিতে পারা গেল না—কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় মধুশ্রীর তনুদেহ শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন কুমার চণ্ডদেব স্বয়ং এই অশ্বারোহীদলকে লইয়া রানার অগ্রে অগ্রে চিতোরে চলিলেন।

মধ্যরাত্রে পালকি দুর্গদ্বারে পৌঁছিল। পালকির পুরোভাগে অপরিচিত অশ্বারোহীদের দেখিয়া দুর্গরক্ষক কহিল,—'তোমরা কে?'

অশ্বারোহী দলপতি কহিল,—'মীনাসর্দার! গোশুন্দা হইতে রানাকে নিরাপদে দুর্গমধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি।'

পালকি সমেত অশ্বারোহীদল দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শত অশ্বারোহীও প্রবেশ করিল। পশ্চাদাগত মারবারী দলপতি দুর্গরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমাদের অগ্রে যে অশ্বারোহীদল আসিতেছিল তাহারা কোথায় গেল?'

রক্ষক কহিল,—'দুর্গমধ্যে।'

—'সর্বনাশ! করিয়াছ কি!'

দলপতির কথা শেষ হইল না। একটি বল্লম আসিয়া তাহার বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ করিল। অতর্কিত আক্রমণে দুর্গরক্ষী সচেতন হইতে হইতেই কাহার মুক্ত সায়ক তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। তারপর সেই অন্ধতমসাবৃত রজনীতে দুর্গদ্বারে একটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিল। দুর্গদ্বার আর বন্ধ করিবার অবকাশ মিলিল না। চল্লিশ জন অশ্বারোহী দুর্গের ভিতর হইতে এবং অসংখ্য মেবারী সৈন্য দুর্গের বাহির হইতে একযোগে অতর্কিত আক্রমণ করায় মারবারী সেনাবাহিনী মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। যে যাহার প্রাণ বাঁচাইতে ছুটিল। মুক্ত কৃপাণ হস্তে চণ্ডদেব, বুদ্বুদ এবং আরও কয়েকজন রণমল্লর মহলে আসিলেন। যোধরাওকে দুর্গমধ্যে পাওয়া গেল না। খাটিয়ার সহিত দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত অবস্থায় রণমল্লের সাক্ষাত মিলিল।

মুক্ত তরবারি দেখিয়া রণমল্লের নেশা ছুটিল। পৃষ্ঠে আবদ্ধ খট্টাঙ্গ লইয়া রণমল্ল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাও রণমল্ল এককালে দৃঢ়হস্তেই অসি ধরিতেন। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন না, কহিলেন,—'চণ্ড! আমি একটি দেশের নৃপতি। এভাবে আমাকে হত্যা করিও না। তরবারি হস্তে আমাকে মরিতে দাও।'

চণ্ডদেব কহিল,—'বেশ তাহাই দিতেছি। তরবারির অগ্রভাগ দিয়া তিনি রণমল্লের বন্ধন উন্মুক্ত করিলেন। রণমল্ল তৎক্ষণাৎ ধাতুপাত্র তুলিয়া লইয়া সম্মুখস্থ মেবারী সৈনিকের মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন। মেবারী পড়িয়া গেল। রণমল্ল তখন চণ্ডদেবকে আঘাত করিবার জন্য বাহু উত্তোলন করিলেন কিন্তু তৎপূর্বেই একটি বল্লম আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ হইল। প্রাণহীন রাও রণমল্লের দেহ চণ্ডদেবের চরণতলে লুটাইল। চণ্ডদেব দেখিলেন বল্লম বুদ্বুদের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

রণমল্লকে শেষ করিয়া সকলে যোধরাওয়ের সন্ধানে চলিলেন। কক্ষ জনশূন্য হইল। কিন্তু বুদ্বুদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কেমন করিয়া সম্ভব। রণমল্লের রক্তমাখা ওড়নাটি লইয়া বুদ্বুদ একদৃষ্টে দেখিতেছিল। এই রক্ত চীনাংশুকটি তো তাহার অচেনা নহে। কিন্তু একই রকম বস্ত্র দুইটি

থাকা বিচিত্র নহে। পরীক্ষা করিতে করিতে বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল বস্ত্রখণ্ডের একটি প্রান্তে তিলাঞ্জলির নামের আদ্যঅক্ষর খচিত রহিয়াছে। চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে বুদ্বুদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রণমল্লের কক্ষে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

সেই নৈঃশব্দের মধ্যে গুপ্ত দ্বারপথ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল। দক্ষিণ হস্তে মুক্ত কৃপাণ, বামস্কন্ধে অর্ধমূর্ছিতা রমণী লইয়া মীনকেতন রন্ধ্রমুখ হইতে বাহির হইল। সম্মুখেই রাও রণমল্লের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। মীনকেতন বুঝিল শত্রুপক্ষ দুর্গ দখল করিয়াছে। এক্ষণে তাহার পক্ষে নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়া পলায়নই কঠিন—এই অর্ধমূর্ছিতা রমণীকে লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মীনকেতন তিলাঞ্জলিকে রণমল্লের রক্তস্রোতে নামাইয়া দিল—এবং গবাক্ষপথে অগ্রসর হইল। তাহার পর কি ভাবিয়া ফিরিল। মনে হইল সে তিলাঞ্জলিকে পাইল না বটে কিন্তু বুদ্বুদ তাহাকে লাভ করিবে। এ চিন্তা মীনকেতনের বক্ষে আগুন ধরাইয়া দিল। হতভাগিনীকে শেষ করিয়া যাইতে হইবে। মীনকেতন তিলাঞ্জলিকে হত্যা করিতে তরবারি উঠাইল। তিলাঞ্জলি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তরবারি তিলাঞ্জলির স্কন্ধে নামিবার পূর্বেই একটি তীর আসিয়া মীনকেতনের বক্ষপঞ্জরে আমূল বিদ্ধ হইল। মীনকেতন যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া দেখিল দ্বারপথে বুদ্বুদ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হস্তধৃত শার্ঙ্গের ছিলা এখনও বেতসপত্রের ন্যায় কম্পমান।

তিলাঞ্জলির পতন শব্দেই আকৃষ্ট হইয়া বুদ্বুদ ফিরিয়াছিল। তাহার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে ধনুকে তীর যোজনা করিল এবং মীনকেতনের আয়ুধ তিলাঞ্জলির অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহার তীর অব্যর্থ লক্ষ্যে মীনকেতনের বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ করিল। মীনকেতন ঘুরিল। বামহস্তে তীর উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিল। আমূলবিদ্ধ শর নিষ্ক্রান্ত হইল না—ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল।

মীনকেতন কহিল,—'তোর সহিত অসিযুদ্ধ করিবার বাসনা ছিল, সে আশা আমার পূর্ণ হইল না।'

বুদ্বুদ কহিল,—'আমারও সে আশা অপূর্ণ রহিল। নারীহত্যা নিবারণ করিতেই তোকে এভাবে বধ করিলাম।'

মীনকেতনের দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। তাহার কণ্ঠ দিয়া আর কোনও শব্দ বাহির হইল না। অচেতন তিলাঞ্জলিকে বক্ষে লইয়া বুদ্বুদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মূর্ছিতা তিলাঞ্জলি কিছুই জানিল না।

অচেতন তিলাঞ্জলিকে মধুশ্রীর চরণতলে রাখিয়া বুদ্বুদ দুর্গদ্বারে আসিল। কুমার চণ্ডদেব এবং উপেন্দ্রবজ্র সসৈন্য পূর্বেই যোধরাওয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। যোধরাও দুর্গমধ্যে ছিলেন না। বাহির হইতে দুর্গের পতন সংবাদ শুনিয়া তিনি দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে মহর্ষি হরোয়া সঙ্কলের যোগাশ্রমের দিকে পলায়ন করিলেন।

অন্ধ তামসী রাত্রি মুহুর্মুহু রানার জয়ধ্বনিতে সচকিত হইয়া উঠিল। দুর্গজয় সমাপ্ত। রানা নিষ্কণ্টক। মারবারী দস্যুদল পলায়িত! বুদ্বুদ দুর্গদ্বারে আসিয়া ক্লান্তদেহে বসিয়া পড়িল। এইস্থলে তাহার তিনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর আলিঙ্গন করার পর বুদ্বুদ কহিল,—'আজ আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে! এস এক্ষণে আনন্দ করি।'

হিমাচল কহিল,—'আমার কর্তব্য এখনও শেষ হয় নাই বুদ্বুদ; আমাকে বিদায় দাও।'

বুদ্বুদ সবিস্ময়ে কহিল,—'কেন?'

—'শতভিষা। আজ রাত্রেই সে পলায়ন করিবে। আমি সন্ধান পাইয়াছি সে কোথায় আছে। তাহার সহিত আমার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয় নাই। তোমরা আনন্দ কর আমি আসিতেছি।'

উদয়াচল কহিল,—'আমারও কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত।'

বুদ্বুদ বলিল,—'সকলের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আনন্দ হইতে পারে না। বেশ, চল কোথায় যাইতে হইবে।'

হিমাচল স্বয়ং দলপতি হওয়ায় কেহ আর কোনও প্রশ্ন করিল না। চারিবন্ধু বুদ্বুদের গৃহে পৌঁছিলে হিমাচল কহিল,—'বুদ্বুদ, তুমি বহুদিন পূর্বে শতভিষার একখানি পত্র পাইয়াছিলে। সেখানি আছে?' বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার পেটিকা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। সেখানি লইয়া হিমাচল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া উদয়াচলের হস্তে দিল।

উদয়াচল পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। বিনাবাক্যব্যয়ে চারিবন্ধু পথে নামিল।

পথ আজ জনশূন্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। এরূপ রাত্রে সচরাচর রাহাজানি হয়—তাই নগরবাসী অর্গলবদ্ধ গৃহে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপথে মাঝে মাঝে দ্রুতচ্ছন্দ অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা যায় মাত্র। সমস্ত নগর অতিক্রম করিয়া চারিবন্ধু নগরপ্রান্তে একটি কুটিরদ্বারে আসিয়া থামিল। রাজপথের উপর একটি অশ্বশকট অপেক্ষা করিতেছিল। চারিবন্ধু ধীরে ধীরে পথ হইতে নামিয়া কুটির অভিমুখে চলিল। কুটিরের দিকে আসিতেই অন্ধকার হইতে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ আসিয়া হিমাচলকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল।।

হিমাচল বলিল,—'এখনও আছে?'

বৃদ্ধ শির সঞ্চালনে জানাইল, আছে। বৃদ্ধকে আর কেহ চিনিল না। কাহার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। বৃক্ষের নিকটে অশ্ব চারিটি রাখিয়া চারিবন্ধু কুটিরের দিকে অগ্রসর হইল। হিমাচল গবাক্ষপথে গিয়া দেখিল একজন রমণী একটি পেটিকায় কিছু রত্নালঙ্কার তুলিয়া রাখিতেছে। প্রস্থানের প্রস্তুতি। স্বল্প দীপালোকেও হিমাচল চিনিতে ভুল করিল না। এই রমণীর সন্ধানেই সে আসিয়াছে। এই সময় একটি কাম্বোজ হ্রেষাধ্বনি করিল এবং শতভিষা গবাক্ষের দিকে চাহিল। সেদিকে দৃক্‌পাত করিয়াই সে সভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। হিমাচল গবাক্ষপথে গৃহে প্রবেশ করিল। সেই মূর্তিমান বিভীষিকার হাত হইতে পলায়ন করিতে শতভিষা দ্রুতহস্তে দ্বারের অর্গল মোচন করিল। সেখানে তাহার জন্য ভীষণতর বিভীষিকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুক্ত অসিহস্তে সর্দার বুদ্বুদ! শতভিষা একপদ পিছাইয়া গেল—তাহার আর্ত চীৎকার নৈশ গগনের সূচীভেদ্য স্তব্ধতার বুকে ছুরিকা হানিল। বুদ্বুদ তাহাকে আঘাত করিতে তরবারি উঠাইতেই হিমাচল চীৎকার করিল,—'ক্ষান্ত হও বুদ্বুদ! উহাকে আমরা হত্যা করিতে আসি নাই। উহার বিচার করিতে আসিয়াছি।'

বুদ্বুদ অস্ত্র সংবরণ করিল।

চারিবন্ধু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। শতভিষার পলায়নের আর পথ রহিল না। সে একটি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কহিল;—'আপনারা কী চাহেন?'

হিমাচল কহিল,—'যবন দাসব্যবসায়ী মীরকাশেমের উপপত্নী, ক্রীতদাসী শতাব্দী, বিজয়গড় দুর্গাধিপের দ্বিতীয়া স্ত্রী, রাজনর্তকী শতভিষার সন্ধানে আমরা আসিয়াছি।'

ঘরে ক্ষণিক স্তব্ধতা।

শতভিষা মুখ তুলিয়া অসীম ধৈর্যে কহিল,—'আমিই! বলিতে পারেন!'

—'তোমার অপরাধের বিচার করিতে আসিয়াছি আমরা। তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ অধিকার আছে, সম্ভব হইলে অপরাধ অপ্রমাণ করিয়া মুক্তি পাইতে পারো। সর্দার উদয়াচল তোমার অভিযোগ বলিতে পারো—'

উদয়াচল অগ্রসর হইল : 'ভবানীমাতাকে সাক্ষী করিয়া আমি আপনাদের নিকট অভিযোগ করিতেছি—এই স্ত্রীলোকটি বিষপ্রয়োগে আমার শিশুপুত্র ভরতকে হত্যা করিয়াছে। একলিঙ্গজীর প্রসাদ বলিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য এ হিমাচলকে পাঠাইয়াছিল। একলিঙ্গজী হিমাচলকে রক্ষা করিলেন—কিন্তু আমার শিশুপুত্রটি বিষজর্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দুইখানি পত্র আমি প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতেছি।'

পত্র দুইখানি হিমাচল শতভিষার সম্মুখে মেলিয়া ধরিল, কহিল, 'পত্র দুইখানি একই ব্যক্তির লিখিত—এ কথা স্বীকার কর?' শতভিষা প্রত্যুত্তর করিল না। হিমাচল পত্র দুইখানি অপর সকলকে দেখাইল। তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিল একই হস্তলিপি।

হিমাচল কহিল,—'সর্দার বুদ্বুদ—তোমার কোনও অভিযোগ আছে?'

বুদ্বুদ অগ্রসর হইয়া কহিল,—'আছে! একলিঙ্গজীর নামে আমি আপনাদের নিকট অভিযোগ করিতেছি এই নারী আমাকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছিল। ঐ পত্রে আমাকে সেইজন্যই সে আমন্ত্রণ করে। আমি যাই নাই বলিয়া আজও বাঁচিয়া আছি।'

শতভিষা কহিল,—'না, প্রমাণ নাই। একথা আর কেহ জানে না!'

হিমাচল কহিল,—'তাহা হইলে এ অভিযোগ প্রতিপন্ন হইল না।'

—'আমি প্রতিপন্ন করিব!'

সকলে সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একজন দাসী দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্বুদ অস্ফুটে কহিল,—'আশা বহিন!'

—'হাঁ আমি আশা, আমি এই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের পরিচারিকা। সর্দার বুদ্বুদকে হত্যা করিবার আয়োজন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি সর্দার বুদ্বুদকে সাবধান না করিলে—'

—'শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!' অস্ফুটে গর্জন করিল শতভিষা।

হিমাচল বলিল,—'আর বলিবার প্রয়োজন নাই, শতভিষা স্বমুখে স্বীকার করিয়াছে। তাহার 'বিশ্বাসঘাতক' সম্বোধনই যথেষ্ট প্রমাণ!'

আশা কহিল,—'আমার কথা শেষ হয় নাই। ঈশ্বরের চরণে আমি আপনাদের সম্মুখে অভিযোগ আনিতেছি—আমি হিন্দু রমণী। এই যবনী ও তাহার উপপতি আমার ধর্মনষ্ট করিয়াছে। আমাকে আজীবন ক্রীতদাসী করিয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য সুকুমার নারীকে আমি দাসীরূপে বিক্রিত হইতে দেখিয়াছি। এই আমার অভিযোগ। আপনাদের বিচারের ফলাফল কী হইবে জানি না কিন্তু এ বিচার অন্তে আমি স্বহস্তে ইহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিব।'

আশা পশ্চাদ্‌গমন করিতে হিমাচল একপদ অগ্রসর হইল, কহিল,—'এইবার আমার সময় আসিয়াছে। এই রমণীকে আমি একদিন ভালবাসিয়াছিলাম। প্রথম যৌবনের সেই আনন্দমুখরিত উচ্ছলদিনে আমি ইহার স্বরূপ চিনিতে পারি নাই। উহার সীমন্তে আমি সিন্দূরবিন্দু আঁকিয়া দিয়াছিলাম। অগাধ ঐশ্বর্য রাজসম্পদ অকাতরে তাহার জন্য ব্যয়িত করিতাম, তবু উহার ক্ষুধা মিটিল না; আমার প্রথমা স্ত্রীকে ও নিজ উপপতি মীরকাশেমের হস্তে সমর্পণ করিল। জানি না কোন হারেমে তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িল। আমি স্ত্রী হারাইলাম, পুত্রকে বক্ষে পাইলাম না; ইহার অপরাধের আমি বিচার করিয়াছিলাম। বিচারে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু সেই রাত্রেই আমার প্রথমা স্ত্রী অপহৃতা হওয়ায় আমি দুর্গ হইতে তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। ব্যর্থ সন্ধানে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম আমার সুখের রাজ্য দস্যুদ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে। বন্দিনী পলাতকা। ছদ্মনামে আজ আমি সামান্য সৈনিক!'

শতভিষা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'আমি এ অভিযোগ অস্বীকার করিতেছি। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! তোমার কোনও সাক্ষী আছে?'

পূর্বদৃষ্ট বৃদ্ধ দ্বারদেশ হইতে বজ্র নির্ঘোষে কহিল,—'আছে!'

শতভিষা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'কে! কে তুমি!'

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একই প্রশ্ন করিল,—'কে তুমি!'

—'ছোটরাণী শতাব্দী দেবীই আমাকে চিনিবেন!'

শতভিষা পুনরায় বসিয়া পড়িল, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল—'চিনিয়াছি।—বিজয়গড় দুর্গের জল্লাদ!'

—'হ্যাঁ, আমি বিজয়গড় দুর্গের জল্লাদ! প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা পাইয়াছিলাম। কর্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে; বন্দিনী দীর্ঘদিন পলাতকা। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যত্ন করিয়া সে পরোয়ানাখানি রাখিয়া দিয়াছি।'

বৃদ্ধ অঙ্গরাখার ভিতর হইতে ধূলিম্লান জীর্ণ একটি পত্রখণ্ড বিচারক হিমাচলের হস্তে অর্পণ করিল। হিমাচল সকলকে দেখাইয়া কহিল, 'এই সেই আদেশনামা।'

বুদ্বুদ কহিল, 'অভিযোগ শেষ হইয়াছে, এইবার তবে বিচারকগণ রায় দিবেন।'

হিমাচল কহিল, 'না! আরও একটি গুরুতর অভিযোগ বাকি রহিল। ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া আমি এই রমণীকে অভিযুক্ত করিতেছি। এ স্বহস্তে কুমার রঘুদেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে।'

শতভিষার প্রতিবাদ করিবার ভাষা ছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িতেছিল।

হিমাচল কহিল, 'বন্ধুগণ! আপনারা এর প্রতি কী শাস্তি বিধান করেন!'

সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিল,—'মৃত্যুদণ্ড!'

শতভিষা উঠিয়া কহিল, 'তোমরা এতগুলি পুরুষ এক নিঃসহায় রমণীকে একযোগে হত্যা করিবে। নারীহন্তার পাতক তোমাদের লাগিবে না মনে করিতেছ?'

হিমাচল অস্ফুটে কহিল, 'তুমি নারী নহ, স্বয়ং শয়তান! শতাব্দী! আমরা তোমাকে হত্যা করিতে আসি নাই, বিচার করিতে আসিয়াছিলাম মাত্র। আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়াছি! রাজপুত কখনও রমণীর দেহে অস্ত্র তোলে না! দণ্ডদান করিবে জল্লাদ! ঈশ্বর নির্দেশে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না!'

পলিতকেশ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া শতভিষার হস্ত বামহস্তে গ্রহণ করিল। দক্ষিণ হস্তে তাহার ভীমদর্শন খড়্গ।

শতভিষা সহসা নতজানু হইল। বুদ্বুদের চরণতলে পড়িয়া কহিল,—'তোমায় আমি সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম সর্দার বুদ্বুদ!'

মৃত্যুভয় ভীতা শতভিষার কালীবর্ণ মুখ দেখিয়া বুদ্বুদের হৃদয় শান্ত হইল। মনে হইল হয়তো সেও ক্ষণিক মুহূর্তে ইহাকে ভালবাসিয়াছিল। হউক ভ্রান্তপ্রেম—তবুও সেই ক্ষণিক মুহূর্তের প্রেমাস্পদের প্রাণভিক্ষায় তাহার হৃদয় দ্রব হইল। সে অস্ফুটে কহিল, 'আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।'

শতভিষা তৎক্ষণাৎ উদয়াচলের পদতলে পড়িয়া কহিল,—'আপনার পুত্রকে আমি ইচ্ছা করিয়া হত্যা করি নাই। আমিও নারী, আমারও সন্তান আছে।'

উদয়াচল দুই হস্তে নিজ মুখ ঢাকিল, কহিল,—'তোমাকে মার্জনা করিলাম।'

শতভিষা তৎপরে হিমাচলের দিকে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল, অস্ফুটে কি যেন প্রিয় নামে সম্বোধন করিল। এক যুগ পরে সেই সম্বোধন শুনিয়া হিমাচল শিহরিয়া উঠিল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো হিমাচল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষুদ্বয় সজল হইল, কপোল বহিয়া দুইটি ধারা নামিল। শতভিষা বুঝিল, হিমাচল তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। তবু হিমাচলের জানু জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—'আমি জানি তুমি তোমার শতাব্দীকে ক্ষমা করিয়াছ, তবু একবার ইহাদের জানাইয়া দাও।'

হিমাচলের ওষ্ঠদ্বয় নড়িল। শান্ত গভীর কণ্ঠে কহিল,—'আমার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তোমার হাত হইতে—তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম!'

শতভিষার মুখে আশার আলোকরশ্মি আসিয়া পড়িল। হিমাচল তখনও বলিতেছিল—'শতাব্দী! সমস্ত জানিয়াও তোমাকে আজও আমি ভালবাসি। কী মন্ত্রে তুমি আমাকে বশ করিয়াছিলে জানি না—তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তবু ভালবাসি! তোমার মৃত্যুতে কেহ কাঁদিবে না—কাঁদিবে শুধু এই হতভাগ্য হিমাচল!'

শতভিষা কহিল,—'কিন্তু আমি তো মরিব না—তুমি তো আমাকে ক্ষমা করিয়াছ।'

হিমাচল কহিল,—'আমি দেওয়ানী ফৌজভুক্ত! ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া আমার কিছু নাই! আমার প্রতি তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ তাহার জন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু কুমার রঘুদেবকে হত্যা করা রাজদ্রোহ! তাহার মার্জনা নাই। শতাব্দী, তোমার প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করিতে পারিলাম না।'

আশা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—'আমিও ক্ষমা করিব না! সমস্ত জীবন ভরিয়া যে সকল নারীর আর্ত ক্রন্দন আমি শুনিয়াছি তাহাদের স্বর্গগত আত্মা তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবে না।'

হিমাচল কহিল,—'জল্লাদ!'

জল্লাদ শতভিষার বাহুমূল ধরিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আনিল। এ দৃশ্য দেখিতে কেহই বাহিরে আসিল না। চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্তিম আর্তনাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সহসা বৃদ্ধ জল্লাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল বৃদ্ধের কবলমুক্ত হইয়া শতভিষা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, কিন্তু সে পারিল না। অল্পদূরে গিয়াই অমানিশার অন্ধকারে একটি উপলখণ্ডে আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধ তামসী রাত্রির ঘনান্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সহসা আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। দেখা গেল আহত শতভিষা নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে; আর তাহারই ভূলণ্ঠিতা দেহের পার্শ্বে জল্লাদ দণ্ডায়মান। তাহার ভীমখড়্গ সবেগে নামিয়া আসিতেছে বসুধালিঙ্গনরতা শতভিষার স্কন্ধে!

পরমুহূর্তেই অন্ধ তামসী রাত্রি নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল—'আল্লাহ্!'

চিতোরে অশান্তি দূরীভূত হইয়াছে। যোধরাওয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও চণ্ডদেব তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। যোধরাও পশ্চিম অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি যোধপুর নগরীর পত্তন করেন। পরে যোধরাওয়ের সহিত চণ্ডদেবের রণক্ষেত্রে সাক্ষাত হইয়াছিল—সে ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, এ কাহিনীর অঙ্গ নহে। মারবারী দস্যুদের অন্তর্ধানে দীর্ঘদিন পরে মেবারবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দীর্ঘ দিবস পরে প্রকাশ্য দরবারে রানা মুকুল আবির্ভূত হইলেন। চণ্ডদেব তাঁহার নিম্ন আসনে বসিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিলেন। সর্বপ্রথমেই উপেন্দ্রবজ্রকে সেনপতির শূন্য আসনে বসাইলেন। বুদ্বুদের অমিতবিক্রমের পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে দেওয়ানী ফৌজ পদে উন্নীত করা হইল। অন্যান্য সৈনিকেরা, যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হইল। মেবারে শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল।

বুদ্বুদের কিন্তু একটি কার্য বাকি আছে।

বিবাহ করা! রাজমাতা মধুশ্রীই কন্যার অভিভাবক হিসাবে কন্যাদান করিতেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাঁহার অশৌচ—সুতরাং অন্য কোনও স্থান হইতে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদয়াচলের গৃহ উন্তালা গ্রামে বিবাহের ব্যবস্থা করা চলিত—কিন্তু সদ্য সন্তানহারা লছমীর নিকটে এ প্রস্তাব করা উচিত হইবে না। অগত্যা হিমাচল কহিল,—'আমিই কন্যাকর্তা। আমার গৃহেই বুদ্বুদ বিবাহ করিতে আসিবে। আমরা তিনবন্ধু মিলিয়া পুষ্পতোরণ রচনা করিব। ক্ষমতা থাকে বুদ্বুদ জয় করুক!'

বুদ্বুদ জোড়হস্তে কহিল,—'বিবাহ মাথায় থাকুক, তোমাদের মতো তিনটি অনড়ান একত্র হইলে আমার তোরণ জয়ের আশা দুরাশা।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'তাহা যেন হইল, কিন্তু হিমাচলের গৃহ বলিতে তো আমি জানি বাজারের আসবাগারের একটি কক্ষ। সেইটাই কি বিবাহ সভা হইবে?'

হিমাচল ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—'ওহে না। হিমাচলেরও ঘর-দুয়ার আছে।'

দেখা গেল যদিচ অতি অল্প সময়ই গৃহমধ্যে বাস করে, তবু তাহারও একটি আবাসস্থল আছে। তিলাঞ্জলিকে এখানে আনা হইল। আশাও তাহার পরিচারিকারূপে আসিল। দুইজনে বৎসর-সঞ্চিত ধূলিজাল মুক্ত করিয়া হিমাচলের গৃহটি মনুষ্যবাসোপযোগী করিয়া তুলিল।

হিমাচল কহিল,—'বুদ্বুদ, এতদিন যাহা করিয়াছ করিয়াছ, ইহার পর আর আমার কন্যার সহিত তোমার দেখা করা চলিবে না।'

—'তোমার কন্যা?'

—'আলবৎ! আমিই তো কন্যাকর্তা! তুমি জামাতারূপে একেবারে বরবেশে আসিবে, তৎপূর্বে এ বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারিলে খুনোখুনি হইয়া যাইবে।'

সকলেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। বুদ্বুদ কহিল,—'তাহা হইলে তোমার কোথায় সাক্ষাত পাইব? বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা তো করিতে হইবে।'

—'বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা অবশ্য আমি করিব—কিন্তু আমার সাক্ষাতের জন্য চিন্তিত হইও না—চিরকাল যেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছ সেইখানেই পাইবে। ঐ অছিলায় এ বাড়িতে আসিতে পারিবে না।'

অতঃপর বিবাহের ব্যবস্থায় সকলে মাতিয়া উঠিল। বিবাহের দিন স্থির হইল। ইত্যবসরে বুদ্বুদ সর্দার একবার রাজমাতার দর্শন প্রার্থনা করিল। মধুশ্রীর পদতলে একটি রত্নহার রাখিয়া কহিল,—'আমাদের পাথেয় হিসাবে এটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন; ইহাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় নাই।'

মধুশ্রী হাসিয়া কহিলেন,—'এই রত্নহার তোমার নববধূকে যৌতুক দিলাম।'

বুদ্বুদ রত্নহার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া মধুশ্রীকে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

বিবাহের আর মাত্র চারিদিন বাকি। আসবাগারের নির্দিষ্ট স্থানটিতে বুদ্বুদ হিমাচলের সহিত সাক্ষাত করিয়া কহিল,—'একটি বাধা আছে। আমি আহেরিয়া এবং তিলাঞ্জলি শিশোদীয়া রাজপুত। আমাদের বিবাহ কিরূপে হইবে?'

হিমাচল কহিল,—'এ বিবাহে বাধা হইতে পারে না। এরূপ বিবাহের নজির আছে। আমি উপযুক্ত পণ্ডিতের বিধান আনিব, যাহাতে বিবাহ সময়ে কেহ বাধা দিতে না পারে।'

বিবাহের পূর্বদিন রাত্রে বুদ্বুদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বস্তুত মীনকেতনের কবল হইতে উদ্ধার করার পর তিলাঞ্জলির সহিত বুদ্বুদের নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় নাই। কাল দেখা হইবে বটে কিন্তু লোকজনের ভিড়ে তিলাঞ্জলির সহিত নিভৃত কূজন করিবার অবকাশ মিলিবে না। বুদ্বুদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। রাত্রিকালে একাকী হিমাচলের গৃহে উপনীত হইল। রাত্রি গভীর হইয়াছে। সম্ভবত গৃহবাসী সকলেই নিদ্রিত, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। বুদ্বুদ গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে আসিল। পতনজনিত একটি শব্দ উঠিল—গৃহবাসী কেহই জাগরিত হইল না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বুদ্বুদ অগ্রসর হইল। পাশাপাশি তিনখানি কক্ষ। প্রথমটিতে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিলাঞ্জলি কোন কক্ষে আছে কে জানে!

শেষকালে ভুলিয়া না হিমাচলের কক্ষে প্রবেশ করে! অবশ্য তাহা হইলেও ভয়ের কিছু নাই। হিমাচল নিশ্চয়ই সত্য সত্যই তাহাকে নগরপালের হস্তে অর্পণ করিবে না। যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহার গবাক্ষপথে বুদ্বুদ মুখ বাড়াইল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তকাল সে প্রাচীরে দেহভার রাখিয়া আত্মসংবরণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দ্বারপথে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

বুদ্বুদ দেখিয়াছিল, ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে তিলাঞ্জলি নিদ্রামগ্ন। তাহার একখানি হাত স্খলিত হইয়া লুটাইতেছে, বক্ষাঞ্চলের কাপড় সরিয়া গিয়াছে—এবং তাহার মস্তকের নিকট হিমাচল দণ্ডায়মান। হিমাচল অঞ্চলটি তুলিয়া দিল, স্খলিত হস্তখানিও বুকের উপর স্থাপন করিল, তারপর নত হইয়া তিলাঞ্জলির শিরশ্চুম্বন করিল। ঘুমের মধ্যে তিলাঞ্জলি পাশ ফিরিল।

বুদ্বুদের সমস্ত শরীর তখন ক্রোধে কাঁপিতেছিল! হিমাচলের এই ব্যবহার যেন স্বপ্নাতীত। তাহার মনে পড়িল দীর্ঘদিন পূর্বে হিমাচল মান্দোরে বলিয়াছিল—এই মেয়েটিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। তখনই বুদ্বুদের সন্দেহ হইয়াছিল। তারপরে যতবার সে তিলাঞ্জলির ভালবাসার কথা হিমাচলকে শুনাইতে গিয়াছে ততবারই সে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে বাধা দিয়াছে; বলিয়াছে—স্ত্রীলোকের ভালবাসায় সে বিশ্বাস করে না। মনে পড়িল একদিন হিমাচল বলিয়াছিল,—'মানুষকে কি সত্যই চেনা যায়? ধর যদি তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিয়া আমার চিত্তবিভ্রম হয়—তখন আমার দোষ দিবে না তো?'

হিমাচল নিশ্চয়ই তিলাঞ্জলির প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণ করিত! উপায় নাই! পরম সুহৃদ হিমাচলকে বুদ্বুদ ক্ষমা করিতে পারিবে না। বুদ্বুদের চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বারপথে হিমাচল আসিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—'তুমি?'

—'হ্যাঁ, আমিই! তরবারি নিষ্কাশিত কর হিমাচল। এক নারীর দুইজন প্রেমিক থাকিতে পারে না।'

—'কী বলিতেছ বুদ্বুদ!'

—'বলিতেছি অস্ত্র গ্রহণ কর কাপুরুষ! নচেৎ আঘাত করিলাম।'

হিমাচল দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া আপনাকে সংযত করিল—কহিল,—'দ্বিতীয়বার ওকথা উচ্চারণ করিও না। দেওয়ানী ফৌজভুক্ত কেহ কাপুরুষ সম্বোধন শুনিয়া ক্ষমা করে না!'

বুদ্বুদ কহিল,—'একবার কেন, সহস্রবার বলিব—ভীরু কাপুরুষ! ভবানীমাতার নামে শপথ করিতেছি তুমি জীবিত থাকিতে আমি তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিব না।'

—'কী বলিলে!'

বুদ্বুদ পুনরায় কহিল,—'অস্ত্র হাতে যদি মরিবার ইচ্ছা থাকে তবে অস্ত্র লও।'

হিমাচল একবার ভিতরে দৃক্‌পাত করিল। তিলাঞ্জলি তখনও নিদ্রাভিভূত।

হিমাচল মুহূর্তকাল কী ভাবিয়া বলিল,—'সর্দার হিমাচল জীবনে কখনও অপমান সহ্য করে নাই—নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতেও নহে। বেশ, তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এস্থলে নহে। এখানে তিলাঞ্জলির নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। অর্ধদণ্ড পরে মহাকালের মন্দির প্রাঙ্গণে আমার জন্য অপেক্ষা করিও।'

—'তথাস্তু!' বুদ্বুদ অসি কোষবদ্ধ করিয়া বীরদর্পে বাহির হইয়া গেল। উত্তেজনায় তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছে। হিমাচল! সুউচ্চ হিমালয়ের ন্যায় উন্নতশির হিমাচল—এত নীচ! নাঃ! হিমাচল অথবা বুদ্বুদ একজনকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবেই। অর্ধদণ্ড সময় গভীর রাত্রে রাজপথে পদচারণ করিতে করিতে কখন অতিবাহিত হইল বুদ্বুদ বুঝিতে পারিল না। দ্রুত পদসঞ্চালনে সে মন্দিরাভিমুখে চলিল। দূর হইতেই দেখিতে পাইল মহাকালের মন্দিরতলে কে তাহার জন্য বসিয়া আছে। বুদ্বুদ নিকটবর্তী হইতে লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। বুদ্বুদ দেখিল সে স্ত্রী লোক, হিমাচল নহে।

—'আশা বহিন! তুমি এত রাত্রে এখানে?'

—'সর্দার হিমাচল আমাকে এইস্থলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। আপনার নামে জরুরী পত্র আছে।'

—'পত্র?' আশার হাত হইতে পত্র লইয়া বুদ্বুদ মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যবনী আয়েসা দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিল;—তাহার ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। মহাকালের মন্দিরে স্বর্ণদণ্ডে ঘৃতের পবিত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই আলোকে বুদ্বুদ হিমাচলের দীর্ঘপত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

—'প্রিয় বুদ্বুদ,

জীবনে এই প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলাম। এই শেষ! জানি, তুমি হাসিবে। হাসিতে পার, আমার পলায়নে প্রমাণ হইল তুমিই রাজোয়ারার শ্রেষ্ঠ তরোয়ারকর। মহিমার্ণব চণ্ডদেবের শক্তির পরিমাপ নাই; তাহা ভিন্ন সাধারণ চিতোরবাসীর বিশ্বাস রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা : হয় তুমি, নয় মীনকেতন, অথবা এই হতভাগ্য! মীনকেতন তোমার আঘাতে হত হইয়াছে—সুতরাং হয় তুমি, নয় আমি! তোমার সহিত আমার দুইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমবার দৈবযোগে ফলাফল নির্ধারিত হয় নাই; এবার আমি পশ্চাদপসরণ করিলাম। সুতরাং তুমিই আজ রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ অসিবীর। ইহাতে আমার দুঃখ নাই। এ পরাজয় আমার কাম্য। কেন জানো? কারণ পুত্রের হস্তে পরাজয় সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক! তোমাকে আমার পুরা ইতিহাস বলি নাই। মীনকেতন আমার প্রথমা স্ত্রীকে যখন অপহরণ করিয়া লইয়া গেল তখন সে পূর্ণগর্ভা ছিল। আমার ধারণা ছিল স্ত্রীপুত্র উভয়েই হত হইয়াছে। বনমধ্যে বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই। অথচ তাহার রত্নালঙ্কারগুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। সম্ভবত সীতাদেবীর আদর্শে সে আমাকে পথসন্ধান দিতেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার দেহের সব কয়টি অলঙ্কারই পাইয়াছিলাম। পাই নাই তাহাকে, আর পাই নাই একপাটি কঙ্কণ। তোমার মনে থাকিতে পারে কয়েকদিন পূর্বে তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আহেরিয়া, তিলাঞ্জলির সহিত বিবাহে সামাজিক আপত্তি উঠিতে পারে। কয়দিন অহরহ আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তিলাঞ্জলি বুদ্ধিমতী, সে বোধহয় আমার মনের কথা বুঝিয়াছিল—কাল সে আমাকে প্রশ্ন করিল,—'আপনি এত কী ভাবিতেছেন?' তখন আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ বাধার কথা বলিলাম। উত্তরে সে বলিল হয়তো তুমি আহেরিয়া নহ! আমি বিস্মিত হইলাম। তখন তিলাঞ্জলি তোমার জন্ম-বৃত্তান্তের কথা আমাকে বলিয়া গেল। আশ্চর্য! তুমি নিকটতম বন্ধুর নিকটেও যে কথা কোনও-দিন প্রকাশ কর নাই তাহাই তাহাকে অকপটে বলিয়াছ দেখিলাম। সর্বোপরি তিলাঞ্জলি যখন তোমার প্রণয়োপহার একপাটি কঙ্কণ আমাকে দেখিতে দিয়া কহিল,—'কঙ্কণের গঠন দেখিয়া মনে হয় তাঁহার মাতা ঘরানা ঘরের মহিলা', তখন আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এ কঙ্কণ দীর্ঘদিন পূর্বে আমার প্রথমা স্ত্রীকে প্রণয়োপহার দিয়াছিলাম। এর দ্বিতীয় পাটি এখনও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে—গহন অরণ্যে একপাটি কঙ্কণই আমি খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

নিঃসংশয়ে বুঝিলাম তোমাকে দেখিয়া কেন প্রথমদিন হইতেই আমার বঞ্চিত পিতৃত্ব বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিত। অর্ধদণ্ড পূর্বে আমার প্রথমা স্ত্রীর সকল অলঙ্কার তিলাঞ্জলির শিয়রে রাখিয়া আসিতে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম! তিলাঞ্জলিকে আমি আন্তরিক স্নেহ করি; করি লছমীকেও; তোমাকে সব কথাই বলিতাম। আমার এত বড় সুখ আর কিছুই হইতে পারিত না! কিন্তু তুমি ভবানীমাতার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ : আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিবে না। তিলাঞ্জলির জীবন ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অনায়াসে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ

করিয়া প্রাণ দিতে পারিতাম। বস্তুত এ পলায়নের লজ্জার হাত হইতে তাহা হইলে নিষ্কৃতি পাইতাম। জীবনে অনেক দুঃখ সহিয়াছি, মাথা কখনও নত করি নাই। আজ মাথা নত করিলাম। বিশ্বাস করিও বুদ্বুদ, প্রাণভয়ে নয়, পিতৃহন্তার পাপ তোমাকে লাগিতে দিব না বলিয়াই আজ আমি কাপুরুষ।

রানা লখার আহ্বান আমি শুনিতে পাইয়াছি। এ পত্র যখন তুমি পাঠ করিবে ততক্ষণে আমি চিতোরের নগরসীমা অতিক্রম করিব। একলিঙ্গজীর নামে শপথ করিতেছি রানা লখার সহিত মিলিত হইতে বিলম্ব করিব না। সুতরাং তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

আমি তোমার অক্ষম পিতা, আমি পিতার কোনও কর্তব্যই পালন করি নাই; হয়তো অনেক সময়ে অনেক আঘাত দিয়াছি—আমাকে মার্জনা করিও। বিদায়কালে আমার শেষ মিনতি ভবিষ্যতে আমার কথা যখন মনে পড়িবে তখন আমাকে মদ্যপ বলিও, উচ্ছৃঙ্খল বলিও, অযোগ্য পিতা বলিও, কিন্তু ভীরু কাপুরুষ বলিও না!

আর একটি অনুরোধ—তোমার পালক পিতা আহেরি সর্দার মঙ্গলরামকে তোমরা দুইজনে প্রণাম করিয়া আসিবে। আমি পিতার কর্তব্য করি নাই—তাই পিতার পুরস্কারও পাইলাম না—তবে তিনি যেন তোমাদের যুগল প্রণাম হইতে বঞ্চিত না হয়েন। একথা কেন বলিলাম, যদি কখনও পিতা হও তবে বুঝিবে।

ভবানীমাতা এবং একলিঙ্গজীর চরণে তোমাদের সঁপিয়া গেলাম। ইতি —

হতভাগ্য তোমার জনক
হিমাচল!'

পত্র পাঠ করিয়া বুদ্বুদ মহাকালের মন্দিরপ্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িল। দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারে তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। রাত্রি প্রভাতপ্রায়।

পূর্বাকাশে নবীন সূর্যের আমন্ত্রণলিপি পৌঁছিয়াছে। মহাকালের মন্দির-শীর্ষের মঙ্গল-কলসে বালার্ক অরুণাভা আসিয়া পড়িয়াছে। শুকতারার স্থির জ্যোতি সে আলোকের ছটায় ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া গেল। নবীন সূর্যের আলোক-সিন্ধুতে প্রভাত-তারকার ক্ষুদ্র তরণী কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

মহাকালের মন্দিরে শুরু হইল মঙ্গলারতি।

তথ্যসূত্র ও নির্দেশ :

প্রথমেই স্বীকার্য : এ কহিনীর মূল প্রেরণা আলেকজান্ডার ডুমার 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'। যোদ্ধাত্রয়ীকে 'হিন্দের বন্দী' করার প্রেরণাটি পেয়েছি শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দী' থেকে।

নির্দেশ :

(1) পৃঃ ১৫৯ হর্দি = ন্যাবা বা জন্‌ডিস্

(2) পৃঃ ১৬২ ঘটনা সাল-তারিখ হিসাবে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ।

(3) পৃঃ ১৭৩ এ আচরণ রাজপুত-যুদ্ধের রীতি বা আইন অনুসারে।

(4) পৃঃ ১৯০ লেখক এস্থলে পাঠক-পাঠিকার মার্জনাভিক্ষু। সকল কার্য-কারণ সম্পর্ক লেখক বিস্তারিত বলিতে অক্ষম।

(5) পৃঃ ২১২ 'বেল' নহে, রাজপুতানায় 'নারিকেল'কেও শ্রীফল বলে।

(6) পৃঃ ২১৪ রাজপুতানার বর বিবাহ করিতে আসিলে বধূর সঙ্গীদল পূর্বেই একটি পুষ্পতোরণ তৈয়ার করিয়া রাখে। বীরবেশে বর উপস্থিত হইলে নববধূর সখীদলের বিরুদ্ধে এক ছদ্মযুদ্ধে বরকে সেই কুসুম-তোরণ দুর্গ অধিকার করিতে হয়। রানা লখার পিতামহ রানা হম্বীরকে এরূপ দুর্গ অধিকার করিতে হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

(7) পৃঃ ২১৬ রাজপুত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের তথা রানা লখার বানপ্রস্থের এ বিচিত্র ব্যবস্থা গ্রন্থকারের কপোলকল্পনা নহে। ঐতিহাসিক সত্য।

(8) পৃঃ ২২৬ একপ্রকার শস্য—Maize-Porridge.

নার্গিস্

শের শাহ্ শূর, পাঠান জমানা

[1455—1545 খ্রিঃ]



দিল্লি-আগ্রার স্থাপত্য-বিচার করার উদ্দেশ্যে যে বইটি রচনা করি : '*লা-জবাব দেহ্‌লী — অপরূপা আগ্রা*', সেই গ্রন্থে এই রচনাটি স্থান পেয়েছে। বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্রদের জন্য নয় — তাই চিত্র এবং আঁক-জোকগুলি হয়তো বর্জন করা উচিত ছিল। কিন্তু কিজানি কেন মন সরল না। তাই 'বড়াভাই' সৈয়দ মুজতবা আলি-সাহেবের ভাষায় ডিটো দিয়ে যাই, 'এ লেখাটিতে কিঞ্চিৎ মাস্টারি-মাস্টারি ভাব থেকে যাবে বলে গুণী লোককে আগেভাগেই হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এটি বাদ দিয়ে পড়েন।" অগ্রজ সাহিত্যিক বলাইদার পরামর্শমতো আরও বলি! যাঁরা শুধু দলবেঁধে ফুচকা খেতে অভ্যস্ত, ক্ষীর যাঁদের সহ্য হয় না, তাদের রসনাতৃপ্তির দায় আমার নেই।

নির্দেশিকা ও ব্যাখ্যা : কাহিনী শেষে সন্নিবেশিত।

সামনেই খাইবার গিরিবর্ত্মের উপলবন্ধুর বিসর্পিল বিপদসঙ্কুল পথ। এপথে দলে ভারি হয়ে যাতায়াত করাই বাঞ্ছনীয়। তাই সরাইখানার ওপ্রান্তে ওই যে প্রৌঢ় লোকটা বসে আগুন পোহাচ্ছে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল ইব্রাহিম, আপনিও কি হিন্দুস্থানে চলেছেন নাকি?

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মাজা ঝুঁকিয়ে সালাম করে বলে, জী হাঁ, মেহেরবান! এ সড়ক বহুৎ খতরনাখ হুজুর ; আপনার যদি এৎরাজ না থাকে, তাহলে কাল সকালে আমরা একসঙ্গেই যাত্রা করব।

সেটাই ইব্রাহিমের মনোগত বাসনা। মুখে স্বীকার করল না যদিও। বরং জিজ্ঞাসা করল, হিন্দুস্থানে রিস্তেদার য়্যাহ্, জান্-পহ্চান কেউ আছে? নাহলে সুলতানী ফৌজে নোকরি মেলা মুশ্কিল-কি-বাৎ।

লোকটা হেসে বললে, না হুজুর, ব্যল্-কি বাপ-দাদা আমাকে সমসের ঘোরাতে শেখায়নি, আমার হাতিয়ার ছেনি-হাতুড়ি।

ওহ্, রাজমিস্তিরি! ইব্রাহিম একধাপ নেমে আসে, 'আপ্' সে 'তুম্'-এ। জানতে চায়, তোমার সঙ্গে ওটি কে? বেটা?

লোকটা তার পার্শ্ববর্তী সতের বছরের জোয়ান ছেলের পাঁজরে বেমক্কা একটা খোঁচা মেরে বলে, সেলাম কর! বে-অকুফ্!

ছেলেটা উবু হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছিল। আফগানিস্তানের হাড়-কাঁপানো জাড়া। বাপজানের দিকে একনজর হিরণ-দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে দেখে। অজানা অচেনা ইনসান্টাকে খাম্কা সেলাম করতে হবে কেন সেটা ঠাহর হয় না। অবাধ্যও হয় না তা বলে। দায়সারা একটা সেলাম ঠুকে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

ইব্রাহিম ওর কচি দেওদার চারার মতো সতেজ মজবুত দেহটা একনজর দেখে নিয়ে জানতে চায়, তুমিও বুঝি রাজমিস্ত্রি?

বাপই জবাব দেয় তার হয়ে, জী হাঁ, খোদাবন্দ্। এই বয়সেই ওর দারুণ এলেম।

—তাই নাকি! কী নাম গো তোমার?—ছেলেটাকেই প্রশ্ন করে ইব্রাহিম।

—আলিওয়াল খান।

—মক্বারা বানাতে জানো?—ইব্রাহিমের অহৈতুকী প্রশ্ন।

কিজানি কেন হঠাৎ অপমানিত বোধ করল ছেলেটা। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বানাবেন না কি? এই খাইবার-এ?

ইব্রাহিম রাগ করল না। হেসে বলল, হ্যাঁ। তবে এখন নয়, বেশ কয়েক বছর পরে। আমার নাম ইব্রাহিম শূরী, আমি সেরাখেল কুবিলার আফগান—এ আমার ছেলে মিঞা হাসান শূরী। মনে থাকবে? আমিও ঐ আজীব দেশ হিন্দুস্তানে চলেছি তগ্দিরের খেল্ দেখতে, যেমন তোমার বাপজান চলেছে তোমাকে নিয়ে। যদি কোনোদিন শুনতে পাও আমি জায়গীরদার বা তার চেয়ে বড় কিছু হয়েছি তখন আমার সঙ্গে মুলাকাত করবে, কেমন? দেখব, তুমি কেমন মক্বারা বানাতে পারো।

আলিওয়াল এবারে যে সেলামটা করল সেটা অকৃত্রিম। বললে, ইয়াদ থাকবে খোদাবন্দ্।

তারপর বহু জল বহে গেছে সিন্ধু দিয়ে। এবং যমুনা দিয়ে। আলিওয়ালের আব্বাজান ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীতে উপনীত হয়ে কোনো ইমারত আদৌ বানিয়েছিল কিনা ইতিহাস সেকথা লিখে রাখতে ভুলেছে—সেটা ইতিহাসের ধাতও নয়, ঐ আলিওয়ালদের কাণ্ডকারখানা মনে রাখা। কিন্তু ইব্রাহিম জায়গীরদার হয়েছিল। তার কবরের ওপর অবশ্য মক্বারা বানানো হয়নি। তার সেদিনকার সেই নাবালক পুত্র

মিএগ্রা হাসানও উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গীরদার হয়েছে—বিহারে ; সাহাবাদ পরগণায়, সাসারামে। এখন মিএগ্রা হাসান নিজেই প্রৌঢ়। তার তিন বেগম, কনিষ্ঠাটি অবশ্য ক্রীতদাসী। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে দুটি পুত্র ; সুলেমান ও নিজাম। এবং বড়বেগমের পুত্র এ কাহিনীর নায়ক : ফরিদ। জন্ম : 1472 খ্রিস্টাব্দে।[1]

ফরিদের জীবনের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে বাবুর-বাদশাহ্-র। দুজনেই নিতান্ত বাউণ্ডুলের বেশে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ইনসানিয়াৎ' নাটকের প্রথম দৃশ্যে এবং শুধুমাত্র নিজ হিম্মতের পিঠে সওয়ার হয়ে পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল নায়ক তামাম্ হিন্দুস্থানের তক্ত-ই সুলেমানে আসীন! বাবুরের জেব্-এ তবু একজোড়া অচল আধুলি ছিল—তাঁর খানদানী বংশ পরিচয়, পিতৃকুলে তৈমুর ও মাতৃকুলে চেঙ্গিস—ফরিদের তাও ছিল না ; বিল্‌কুল নাঙ্গা ফকির। বরং বলব, ফরিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য পরবর্তীযুগের মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবাজীর। দুজনেই বাল্য-কৈশোরে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মায়ের কাছে—যে মা তাঁদের বাপের কাছে উপেক্ষিতা, অবহেলিতা, নির্যাতিতা।

ফরিদের মায়ের অপরাধটা অবশ্য গুরুতর ; তার যৌবন চলে গেছে। সাসারামের জায়গীরদার তার প্রধানা বেগম সরিফার[2] পরিবর্তে যৌবনবতী দাসীপত্নী কানিজার আঁচলধরা। বুঢ্‌ঢ়াস্য জওয়ান-জরু! সংসারে নিত্যি ত্রিশ দিন খিটিমিটি। জায়গীরদারের দৌলৎখানার একান্তে এক অন্ধ কুটুরিতে দিন গুজরান করে ফরিদ-জননী সরিফা ; আর পাঁচ-বাঁদী পরিবৃতা কানিজার বিলাস-ব্যসনের আদি-অন্ত নেই। শেষমেশ মনের খেদে ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করল। হাসান পুত্রকে বললে, সেই যাচ্ছই যখন, তখন তোমার আম্মাজানকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি বাপের মুখের ওপর ফেলে উনিশ বছরের ফরিদ বললে, যাব। মাথা গুঁজবার মতো একটা গরিবখানার এন্তেজাম করতে পারলেই এ দোজখ্ থেকে আম্মাজানকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

শুনে হাসান ব্যঙ্গভরে যে ফার্সী বয়েৎটা ঝাড়লো তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ : 'থাকলো পরান সয়ে/ভাদ্দরমাসে ভাত দেব তোর ঝিঙের ঝোল দিয়ে।'

ফরিদ নিরক্ষর ছিল না জালালউদ্দীন আকবরের মতো। আরবী জানতো, ফার্সীতে তো সে আলিম। গুলিস্তা, বুঁস্তা এবং সিকান্দার-নামাহ্ তার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ।[3] তবু প্রথম কিছুদিন তাকে রীতিমতো মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে রোজগারের ধান্দায়। কায়িক শ্রম করেছে, এমনকি মাঝে কিছুদিন দস্যুবৃত্তিও।[4] শেষ পর্যন্ত বিহারের সুতলান বাহার খাঁ লোহানীর কিল্‌লায় নোকরি জুটল। বাহার খাঁ তার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর জন্য ওকে 'আতালিখ্'[5] নিযুক্ত করলেন। এই গৃহশিক্ষকতার কালেই ফরিদকে আবার একটি 'নাহ্‌র'[6] আক্রমণ করে এবং ফরিদ তলোয়ারের এক কোপে ব্যাঘ্রপ্রবরটিকে বধ করেন। বিহার অধিপতি লোহানী তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষককে ঐ খেতাবটি দেব ; শের খান্।

কিন্তু বেশিদিন এ চাকরি শের খাঁর কিসমতে বরদাস্ত হল না। কে কান ভাঙ্‌চি দিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন—হাসানও হতে পারে। সে যাই হোক, নোক্‌রিতে ইস্তফা দিয়ে শের খাঁ আবার পথে নামল। এই সময় সে কিছুদিন বাবুর বাদশার ফৌজেও নোকরি করে।

এর পরেই আশ্‌মান ফুঁড়ে কিস্‌মতী-হুরী নেমে এল শেরের হাতে ধরা দিতে। কাশীর কাছে চুনার কিল্‌লার অধিপতি তাজ খাঁকে তারই যুবকপুত্র হত্যা করে বসল। সদ্যবিধবা লাদ মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল শের খাঁর কাছে—সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার আর্জি সমেত। শের সসৈন্যে চুনারে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করলেন লাদ মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসমেত তুলে দিলেন কিল্লাদারনীকে!

নিকা সেরে শের ফিরে এল সাসারামে। এতদিনে মায়ের জন্য সে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। সাসারামের সেই স্ত্রৈণ জায়গীরদারের চোখে চোখ রেখে সমান মেকদারে বাৎচিৎ করার হকদার হয়েছে চুনার কিল্লার কিল্লাদার।

পুত্রকে দেখে তাজ্জব বনে গেল সাসারামের জায়গীরদার, মিএগ্রা হাসান। বললে, ক্যা বাৎ? অ্যাদ্দিন পরে কী মনে করে?

ফরিদ চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এ দরবার কক্ষের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড তার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত। আব্বাজান রীতিমতো বুঢ্ঢা বনে গেছেন এই ক-বছরে। মেজাজ কিন্তু ঠিক সেই রকম বে-সরিফ! ফরিদ বললে, আম্মাজানকে নিয়ে যেতে এসেছি ; তাঁকে ডেকে দিন।

ছিলে-খোলা ধনুকের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হাসান। বললে, আম্মা! তোর আম্মা? তাকে অ্যাদ্দিনে নিয়ে যেতে এসেছিস্? আয়!

এগিয়ে এসে খপ্ করে চেপে ধরল জোয়ান ছেলের হাত। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল অন্দরে—হারেমের দিকে। সিঁড়ির নিচে সেই অতি পরিচিত মায়ের অন্ধকুটুরিতে নয় কিন্তু—হারেম-প্রাঙ্গণের একান্তে এনে একটা শিউলি গাছের দিকে আঙুল তুলে বললে, ঐ তোর আম্মাজান! যা, নিয়ে যা এবার!

এতক্ষণে নজর হল—শিউলি গাছটার নিচে একটা চৌকো পাথর। তার ওপর একরাশ ঝরেপড়া শিউলি ফুল।

দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা কামড়ে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ। এতক্ষণে অন্তঃপুরিকার দল ভিড় করে এসেছে রঙ্গ দেখতে। দাঁড়িয়েছে ওদের বাপবেটাকে ঘিরে। তাদের অনেককেই ফরিদ চেনে না—সে গৃহত্যাগ করার পরে এরা হারেমের নয়া-গুড়িয়া তা সে সব দিকে ফরিদের নজরই পড়ল না.....সে শুধু অবাক হয়ে ভাবছিল : কী আশ্চর্য! জায়গীরদারের বড়ি-বেগমের কবরের উপর একটা আচ্ছাদনও দেওয়া হয়নি। রোদে জলে সমানে পুড়ছে, ভিজছে!

—কই? উঠিয়ে নিয়ে যা।—ব্যঙ্গ করলে বাপ।

ছেলে মুখ তুলে তাকালো। বাপের চোখে চোখ রেখে একই কথা বললে আবার : যাব। ওঁর মাথা গুঁজবার মতো একটা মক্‌বারা বানিয়ে এ দোজখ্ থেকে ওঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এরপর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে শের খাঁ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তিল তিল করে সে সঞ্চয় করতে থাকে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ। মায়ের জন্য মক্‌বারা বানানোর কথা যে তার স্মরণ ছিল না তা নয়—কিন্তু মওকা মেলেনি। সেটা হয়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। একজন সংবাদবহ চুনার কিল্লায় শের খাঁকে শুনিয়ে গেল এক বিচিত্র কিস্‌সা—সাসারামের জায়গীরদারের দরবারের একটি ঘটনা :

একদিন মিঞা হাসানের দরবারে এক বৃদ্ধ আফগান এসে হাজির। এক মাথা সফেদ চুল, এক মুখ সফেদ দাড়ি। জায়গীরদারের মীর-মুনশী তাকে হুজুরে সামিল করে বললে, ইনিই সাসারামের জায়গীরদার ; তোমার আর্জি হুজুরে পেশ কর, ভয় নেই।

লোকটা আভূমি নত হয়ে এক খান্দানী সালাম ঝাড়ল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে : আদাব অর্জ, মেহেরবান! আমার একটি প্রশ্ন আছে খোদাবন্দ্!

হাসান গোঁফে চাড়া দিয়ে বললে, বেশক্! পেশ কর তোমার আর্জি?

—সে আজ প্রায় দু-কুড়ি বছর আগেকার কথা। আপনি, হুজুর, আপনার আব্বাজান—তাঁর হাজার সাল বেহেস্ত-বাস মঞ্জুর হোক—ইব্রাহিম মিঞার হাত ধরে আফগান-রাজ্য থেকে হিন্দুস্তানে আসছিলেন। খাইবার 'সুরঙে'[৭] যেদিন আপনারা রাহি,[৮] তার পহ্‌লারাতের সরাইখানায় শাম-ওক্ত-এর বাত আপনার য়্যাদ হ্যয়, গরিবপরবর?

হাসান তাজ্জব। বৃদ্ধকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে, কেন বল তো হে?

—সেদিন আপনার সরিফ আব্বাজান—তাঁর লাখো-বরিষ বেহেস্ত্‌বাস্ মঞ্জুর হোক—এই বান্দার কাছে ওয়াদা করেছিলেন ; বলেছিলেন—তিনি যদি কোনোদিন হিন্দুস্তানে জায়গীরদার হতে পারেন, তাহলে আমি যেন তাঁর দরবারে এত্তালা দিই! তিনি আমাকে তাঁর মক্‌বারা বানাবার হুকুম দিয়েছিলেন। এ বান্দার নাম আলিওয়াল খান।

হাসান দীর্ঘসময় নিমীলিত নেত্রে তার কর্ণকুহরে একটি পাখির পালক প্রবিষ্ট করাতে ব্যাপৃত রইল।

আলিওয়াল ধৈর্য হারালো না—দু-কুড়ি বছরের তুলনায় হাসানের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সে অপেক্ষা করল। অবশেষে সোজা হয়ে বসে হাসান বললে, আমার আব্বাজান কোথায় দেহ রেখেছেন তা আমি জানি না। আর তাছাড়া আমার অত পয়সাও নেই যে, সখ করে তাঁর জন্য মক্‌বারা বানাবো। তুমি এখন আসতে পার।

এবার সেই লোকটাই দীর্ঘসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাসানের দিকে । বেচারী বোধ করি অনেক আশা নিয়ে দিল্লি থেকে এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। তাই হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল : মাফ্ করবেন, আপনি পাঠান তো?

সরল প্রশ্ন। হয়তো সরল নয়। কিন্তু সেজন্য সাসারামের জায়গীরদারের দরবারে তার যে শাস্তির বিধান হয়েছিল সেটাও লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

এই কিস্‌সাই সবিস্তারে হাসান পুত্রকে সংবাদবহ শোনালো চুনার দুর্গে। কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল শের। বল্‌লে উস্তাদ আলিওয়াল খান? সেই যে রাজমিস্ত্রি দিল্লির নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

হ্যাঁ, সেই লোকই বটে। তখনই পাইক ছুটল লোকটাকে ধরে আনতে। চুনার থেকে সাসারাম অশ্বারোহীর কাছে একদিনের পথ। পাইককে বলা হয়েছিল মিস্ত্রিকে ধরে আনতে, সে বেঁধে নিয়ে এল বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রিকে। শেরখাঁর আব্বাজানকে কম্‌বক্তটা জিজ্ঞাসা করেছে, তিনি পাঠান কি না! এবার জেনে নিক তার জবাব!

এল মানুষটা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। শের খাঁকে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর তলব করেছেন?

কিল্লাদার আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল। বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত হাতদুটি ধরে বললে, তুমিই উস্তাদ আলিওয়াল খান? হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

লোকটা আবার আভূমি নত হয়ে আদাব করল। বললে, হুজুর তাহলে আমার হাতের কাজ দেখেছেন?

—না উস্তাদ, দেখিনি। দিল্লিতে আমি এ জিন্দেগীতে কখনও যাইনি। যাবার ইচ্ছে আছে। গেলে, তোমার হাতের কাজ নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু তোমার নাম আমি শুনেছি। শোনো আলিওয়াল, পাঠানের জবানে কখনো নড়চড় হয় না। আমার বড়ি-আব্বা তোমাকে যে ফরমায়েশ করেছিলেন সেই কাজটা মুলতুবি আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, তিনি যে নিজেকে কোন্ জঙ্গ-ময়দানে কুরবানি করেছেন তা আমরা কেউ জানি না। তা হোক, কিন্তু আমার আম্মাজান কোথায় শুয়ে আছেন তা আমি জানি। তুমি আমার মায়ের জন্য একটা মক্‌বারা বানিয়ে দেবে? সেই সাসারামেই? তংকার জন্য পরোয়া নেই।

তৃতীয় বার কুর্নিশ করে আলিওয়াল বললে, বে-ফিকর রহিয়ে জনাব!

আলিওয়াল শুরু করে শের খাঁর মায়ের মক্‌বারা। শের তখন ছুটেছে গৌড় জয় করতে। তালিয়াগড়ির (আধুনিক সাহেবগঞ্জ) প্রচলিত পথে নয় ; শের জানে—সে পথে শত্রুপক্ষ ওর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ; বরং এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গৌড়াধিপতি মাহমুদ শাহর বাহিনী। বহু উপঢৌকন দিয়ে মাহ্‌মুদ বশ্যতা স্বীকার করে নিল শেরের।

গৌড়-বিজয় ফতে করে বহু ধন-দৌলত হাতির পিঠে চাপিয়ে শের খাঁ ফিরে এল সাসারামে। এসে সংবাদ পেল, ইতোমধ্যে আলিওয়াল শেষ করেছে তার মায়ের মক্‌বারা। ঐ সঙ্গে পেল আর একটি দুঃসংবাদ—সাসারামের জায়গীরদার, মিঞা হাসান, নাকি এ কয়মাস ক্রমাগত তড়পাচ্ছে—'দেখব সে চুহাকা-বাচ্চা কত বড় শের খাঁ! আমার কিল্লার ভিতর থেকে আমার বিবির কফিন সে উঠিয়ে নিয়ে যাবে! জান্ থাকতে নয়!'

দুঃসংবাদে বে-দিল হল না শের। বললে—হাসান-হুসেনের সে লড়াই কাজিয়ার কথা পরে হবে। আপাতত চল আলিওয়াল—দেখি, তুমি কেমন মক্‌বারা বানিয়েছ।

দেখে মুগ্ধ হল শের খাঁ। লোদী-সৈয়দী শৈলীতে বানানো অষ্টভুজাকৃতি ইমারত। অপূর্ব! ওস্তাদের হাতের এলেমদারী কাজ। বললে, একটা কথা আলিওয়াল, ছজ্জাটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না?

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ স্থপতি বললে, জী হাঁ হুজুর! বে-হুঁসিয়ারী কাজ নয়, ওটা ইচ্ছে করেই বড় করেছি। বেগম-সাহেবা আজ ক'বছর সাসারামের রোদে পুড়েছেন! কোনো ছাউনি ছিল না তো। তাই রোশনাই আর ওঁর বরদাস্ত হবে না।

—ঠিক কথা, আলি! ওকথা আমার য়্যাদ ছিল না। কিন্তু সন্দৌখ্' তুমি একটা বানিয়েছ কেন? পাশাপাশি দুটো হওয়ার কথা যে!

তৎক্ষণাৎ সমঝে নিল ওস্তাদ। বললে, সরিফ বাৎ খোদাবন্দ্! ও-কথাটা আবার আমার ইয়াদ ছিল না। খ্যয়ের, ব্যস্ত হবেন না, এখনই শুধরে দিচ্ছি।

শের খাঁ এদিকে খলিফা। বাপের কাছে সে আদৌ গেল না দরবার করতে, বরং ধরে পড়ল সাসারামের জাম্-ই মসজিদের বড়া ইমাম সা'বকে। অশীতিপর বৃদ্ধ বড়া ইমাম পাকড়াও করে নিয়ে এলেন মিঞা হাসানকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসানকে আসতে হল। ক্ষুদ্র সাসারাম শহরের চৌহদ্দিতে সে নবাব, কিন্তু শরিয়তী শাসনে বড়া-ইমাম সা'বের প্রজা। এল, তবে স্রেফ্ এক কড়ারে—বিবিজানের কফিন সে স্থানান্তরিত হতে দেবে না কিছুতেই।

বড়া-ইমাম হাসান-মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে মক্‌বারাটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। শের খাঁ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল দ্বারপ্রান্তে। সব দেখা শেষ করে হাসান-মিঞা বড়া ইমাম-সা'বকে একটা জবর প্রশ্ন পেশ করল, একটা কথা মালুম হল না। সন্দৌখ দুটো কেন?

বড়া-ইমাম ঠা ঠা করে হাসল। দাড়ি চুমড়ালো, তসবি ঘোরালো, চোখ পিট-পিট করল, কিন্তু জবাব দিল না।

হাসান বিরক্ত হয়ে বলে, কী হল? জবাব দিলেন না কেন? সন্দৌখ দুটো কেন? ও চুহা-কা-বাচ্চাটার একটাই তো মা?

বড়া-ইমাম এতক্ষণে জবাব দিল, এটা নেহাৎ বে-অকুফের মতো কথা বলেছ মিঞা হাসান। কী জবাব দেব? উপযুক্ত পুত্র কখনো শুধু মায়ের মক্‌বারা বানায়? বাপকে বাদ দিয়ে? তুমি দেখে নিও হাসান, তোমার এই ছাওয়াল একদিন তামাম হিন্দুস্তানের তক্ত-তৌসে বসবে। তখন দেশ-বিদেশ থেকে মানুষজন ভিড় করে দেখতে আসবে শাহ্ য়েন-শাহ্ শের শাহ্ শূরের আব্বাজানের মক্‌বারা।

'হাসান'-এর আর 'সান্' নেই, বিলকুল 'হাঁ'!

পুত্রের দিকে ফিরে বললে, অ্যাই-বে-অকুফ! বড়া-ইমাম সাব যা বলছেন তা হক্ কথা? ঐ বাঁ-দিকের সন্দৌখ্টা তোর বাপের?

শের বললে, বড়া ইমাম সা'ব তামাম জিন্দেগীতে বে-হক বাৎ কখনও বলেছেন? তবে বাঁ-দিকেরটা নয়, ওটা মায়ের, ডান দিকেরটা আমার আব্বাজানের।

হাসান একগাল হেসে বললে, তাহলে হাসান-হুসেনের কাজিয়া খতম! তুইই ফতে করেছিস। আয় বান্দর! বাপ-বেটায় ধরাধরি করে তোর মায়ের কফিনটা বহে নিয়ে আসি।

শের তার বাপের হাঁটু দুটো ছুঁয়ে বললে, গোস্তাকি যদি করে থাকি, মাফ করে দাও! আব্বাজান! কাঁধ দিতে হবে না, তুমি শুধু হুকুম দাও। আম্মাজানের কফিন একাই বহে নিয়ে আসার হিম্মত রাখে তোমার এই অযোগ্য বান্দা!

হাসান ওর পিঠে একটা বিরাশি-সিক্কা থাপ্পড় মেরে বললে, তা তুই পারিস। চুহা-কা-বাচ্চা হলে কি হয়, তুই নিজে যে শের!

শের খাঁ যে কালবৈশাখী মেঘের মতো ঈশান-কোণে দিন দিন স্ফীত হচ্ছে এটা মালুম হতে দেরি হল না হিন্দুস্থানের তদানীন্তন মালিক, বাবুর-তনয় হুমায়ুনের। নটে গাছটি মুড়িয়ে দেওয়া চাই। হুমায়ুন দিল্লি থেকে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে এসে অবরোধ করল চুনার কিল্লা। কিন্তু শের খাঁ অতি খলিফা—এ আশঙ্কা তার ছিলই। তাই স্ত্রীপুত্রদের পূর্বেই স্থানান্তরিত করেছে, অনেক দিনের রসদ মজুত রেখেছে; আর কিল্লারক্ষার দায়-দায়িত্ব একজন সিপাহসালারকে সমঝিয়ে দিয়ে নিজে থেকেছে দুর্গের বাহিরে। ঐতিহাসিকেরা বলছেন, এখানেই হুমায়ুনের দাবার চাল এড়িয়ে গিয়েছিল শের—ঘোড়ার আড়াই পায়ের ডিঙি-মারা চালে। চুনার

কিল্লা অবরোধ করে যে-কয়মাস হুমায়ুন শক্তিক্ষয় করলেন, সেই কয় মাস দুর্গের বাহিরে অবস্থিত শের খাঁ ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করে গেল।

সেই বছরই সাহাবাদ পরগনায় অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ হয়। বিচক্ষণ প্রশাসক শের খাঁ সেই বৃদ্ধ স্থপতিবিদকে ডেকে বললেন, আলিওয়াল, এবার আমার নিজের জন্য একট মক্‌বারা বানাও। শুধু ইমারৎ নয়, তৈরি করতে হবে প্রকাণ্ড একটা তালাও ; তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ঐ মক্‌বারা, দ্বীপের মতো। দেখলে মনে হবে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে আছে : নার্গিস্!

—নার্গিস, হুজুর?

—হ্যাঁ, নার্গিস। তুমি দেখেছ সে ফুল?

মাথা চুলকে আলিওয়াল বললে, হয়তো দেখেছি খোদাবন্দ্, কিন্তু চিনিনা।

শের বললেন, বিশ্বজয়ী ম্যাসিডোনিয়ার শাহ্-এন শাহ্ সেকেন্দার শাহ্-র নাম শুনেছ?

আলিওয়াল এবারে স্পষ্টই মাথা নাড়ে। নামটা তার অজানা।

—তাঁদের দেশে একটি সুন্দর উপকথা আছে : নার্গিস ফুল নিজের মহব্বতে দিওয়ানা! দরিয়া-কিনারে ফোটে সেই ফুল—নার্সিশাস্! দুনিয়াকে সে চেনে না, তার মহব্বত শুধু নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি। পারবে?

আলিওয়াল তাজ্জব বনল জঙ্গী জওয়ানের এ জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাসে। শুধু বলল, পারব হুজুরালী।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই শের তাকে ফিরে ডাকলেন। বললেন, শোন আলিওয়াল, ভিতরের কথাটা খুলে বলি! কাব্য নয়, নিতান্ত কেজো-ভূমিকা—ঐ মক্‌বারার পরিকল্পনায়। প্রকাণ্ড তালাও যদি বানাও তাহলে এক সঙ্গে দু-পাঁচ হাজার মেহনতি মানুষ কাজ করতে পারবে, ঘেঁষাঘেষি হবে না। দিঘির চারপাশ ঘিরে বানাও অস্থায়ী ছাপরা। ওখানেই এসে আশ্রয় নেবে পাঁচ গাঁয়ের নিরন্ন মানুষ—জরু, গরু, বালবাচ্চা নিয়ে। কাটিয়ে দেবে গোটা বছরটা—সেই পরের বছর পর্যন্ত, যতদিন না খোদাতালা এদের দুঃখে আশমান-ভেঙে কাঁদবেন! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য আমি রাজ-শস্যভাণ্ডার খুলে দেব—লেকিন, হুঁসিয়ার! ভুখা-মানুষ যেন ভিখ্ না মাঙে! পসিনার বিনিময়ে মেহনতি মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দেব আমি। বুঝলে?

আলিওয়াল আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করেছিল শুধু।

এর পরেই বক্সার যুদ্ধ। মুঘল-পাঠানের দ্বৈরথ-সমর। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত হার হল হুমায়ুনের। বাবুর বাদশাহর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুর্ভাগ্যের মূলে কী ছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিক নানান মুনির নানান মত। আমার তো মনে হয়েছে—আমোদপ্রিয়তা নয়, অহিফেনসেবা নয়, এমনকি সোপানশীর্ষ থেকে অতর্কিত পদস্খলনও নয়—হুমায়ুনের দুর্ভাগ্যের মূলে আছে তাঁর পিতৃসত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা। অন্তিম-শয়ানে বাবুর-বাদশাহ একদিন তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাত ধরে বলেছিলেন—'বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনের মূলে আছে ভ্রাতৃবিরোধ। তাই এই আখরি আদেশ দিয়ে যাই : 'তোমার ভাইদের শত অপরাধ ক্ষমা কর।' হুমায়ুন সেই পিতৃসত্য অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গেছেন। তিন ভাইকে করে দিয়েছিলেন তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। আর তারা বারে বারে সুযোগ পেলেই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছে। হুমায়ুন তাদের বারে বারে পর্যুদস্ত করেছেন, বন্দী করেছেন এবং অন্তিমে মুক্তি দিয়ে আবার অন্য অঞ্চলের শাসনকর্তা করেছেন। তিন ভাই দূরে সরে গিয়েই, প্রাদেশিক শাসনভার লাভ করেই, দূর থেকে হেঁকেছে : 'ও কুমির তোর জলকে নেমেছি'।

এই শেষ সংগ্রামেও হুমায়ুন তিন ভাইয়ের কাছে দূত পাঠালেন সৈন্য চেয়ে। তারা তিনজন নির্বিকার! মুঙ্গেরের কাছাকাছি এই যুদ্ধে পাঠানের কাছে চূড়ান্ত হার হল মুঘলের। হুমায়ুনের অধিকাংশ সৈন্য সলিল সমাধি লাভ করল গঙ্গায়। এক অখ্যাত ভিস্তিওয়ালার অনুগ্রহে তার ভিস্তি আঁকড়ে হুমায়ুন গঙ্গা পার হয়ে পালালেন। এই প্রসঙ্গে প্রামাণিক ইতিহাসের একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে শোনাই, তাতে শের শাহর চরিত্রে কিছুটা আলোকপাত হবে :[10]

ঐতিহাসিক এর্স্কিনের অনুমান : "হুমায়ুনের আট হাজার সৈন্য হত হয়, অর্ধেক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে, অর্ধেক গঙ্গা গর্ভে। হুমায়ুনের হারেমের প্রতি শের খাঁর ব্যবহার শেষোক্তের চরিত্রে এক অপূর্ব মহিমা আরোপ করে।

যুদ্ধে হার হয়েছে জেনে হুমায়ুনের মহিষী[11] অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে পর্দার বাহিরে এলেন ; সংবাদ শ্রবণে শের খাঁ সসম্মানে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবরোহণ করে মহিলাবৃন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেন। নকিবকে ডেকে আদেশ করলেন ঘোষণা করতে—কোনো আফগান যেন মুঘল মহিলাবৃন্দের প্রতি কোনো রকম অসম্মানজনক আচরণ না করে। করলে, তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শের খাঁর এমনই দাপট ছিল যে, বিজিতের মহিলাবৃন্দ বিজয়ী সৈন্যদলের লুঠের সম্পদ হওয়ার প্রচলিত প্রথা সত্ত্বেও কোনো আফগান সাহস করেনি বন্দিনীদের গাত্রস্পর্শ করতে! সন্ধ্যার পূর্বেই বিশ্বস্ত খিদমৎগারের দল ঐ হতভাগ্য মহিলাবৃন্দকে শের খাঁর হারেমে পৌঁছে দেয়। এবং আহার পানীয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে।"

এই প্রসঙ্গে আরও স্মর্তব্য : এই ঘটনার বত্রিশ বছর পরে আকবর বাদশাহ একটি বাদশাহী ফরমান জারী করেন : পরাজিত শত্রুদলের স্ত্রীকন্যাদের উপর কোনো মুঘল সৈন্য কোনো রকম অত্যাচার করলে তার কঠিন শাস্তি হবে।[12] খবরটা ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগতে পারে—শের ও আকবরের স্থাপত্যে একটা আশ্চর্য পৌরুষের ব্যঞ্জনা আছে, সেই ইমারতগুলি যেন সোচ্চারে ঘোষণা করতে চায়, তাদের জনক ঐ জাতের কাপুরুষতার—পরাজিত সৈন্যদলের স্ত্রীকন্যাদের ওপর পাশবিক অত্যাচারে—সামিল হতে পারে না।

যুদ্ধান্তে বিজয়ী শের ফিরে এলেন সাসারামে। দেখলেন, সদ্যসমাপ্ত নিজের সমাধিসৌধ। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, আলিওয়াল, তুমি কামাল করেছ! যে মক্‌বারা বানিয়েছ তা হিন্দুস্থানে অভূতপূর্ব। বল কী ইনাম চাও?

আলিওয়াল তিনবার কুর্নিশ করে বললে, খোদাবন্দ্ যে খুশ্ হয়েছেন, এই তো আমার ইনাম!

—শোনো আলিওয়াল! আমি দিল্লি চলেছি ; হয়তো তামাম হিন্দুস্তানের তক্ত-ই-সুলেমানে বসব ; দিল্লিতে অনেক-অনেক, অনেক ইমারৎ বানানোর বাসনা আছে আমার। হয়তো অসমাপ্ত আলাই-মিনার গেঁথে শেষ করব! কুৎবের চেয়েও যা বৃহত্তর! তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

আলিওয়ালের কোটরগত স্বপ্নালু চোখ দুটি শেষ বারের মতো চকচক করে উঠল। যেন পোপ প্রশ্ন করছেন মিকেলাঞ্জেলোকে—অসমাপ্ত সেন্ট পিটার্স শেষ করার দায়িত্ব নেবে তুমি?[13]

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার জমানা খতম হয়েছে গরিবপরবর! আমি বৃদ্ধ। এই সাসারামেই জিন্দেগির বাকি কটা দিন গুজরান করতে চাই।

শের বললেন, বেশ্‌ক, তবে তাই হোক। তাহলে এই সাসারামেই বানাও আর একটা মক্‌বারা তোমার পসন্দ্-মোতাবেক।

আলিওয়াল একটু অবাক হল। ইতস্তত করে বলল, শাহ্-য়েন-শাহ্। পিতা-মাতার মক্‌বারা বানিয়েছেন, জওয়ানী না খোয়াতেই নিজেরটা বানিয়ে রাখলেন দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে ; কিন্তু এবার কার মক্‌বারা চাইছেন? শাহ্‌জাদারা তো নিতান্ত নাবালক!

শাহ্-য়েন-শাহ্! এ সম্বোধন এখনো কেউ করেনি বক্সারযুদ্ধ-বিজয়ী শের খাঁকে। আলিওয়াল শিল্পী—শিল্পীরা না সমকালের চেয়ে দু-কদম এগিয়ে থাকে? সকৌতুকে শের খাঁ হেসে বললেন, সে যে কে, তা এখনই তোমাকে বলতে পারছি না উস্তাদ্। মক্‌বারা তৈরি খতম হোক, তারপর বলব।

ক্ষুণ্ণ হল আলিওয়াল। ইতস্তত করে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা! আপনার আব্বাজানের মক্‌বারা বানিয়েছি ;—দৃঢ়মূল, উন্নতশির, জায়গীরদারের চরিত্র সে ইমারতে প্রতিফলিত ; আপনার মক্‌বারা আপনারই মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে আত্মনিমগ্ন, আপনিই বলেছেন, সে 'নার্গিস্'। লেকিন এবার—

হক্ বাৎ! শের খাঁর মালুম হল শিল্পীর সমস্যাটা। মক্‌বারা তার স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে উৎসর্গীত-প্রাণের স্বাক্ষর রাখতে চায়। কার সমাধিসৌধ বানাতে হবে, না জানলে ওর ধ্যানের দৃষ্টিতে কেমন করে ধরা দেবে সে ইমারত? শিল্পীর স্বপ্ন জলভরা বর্ষার লঘুপক্ষ মেঘের মতো ভেসে ভেসে যাবে, শরৎকালীন কিউমিউলাসের মতো স্তরে-স্তরে, স্তবকে-স্তবকে দৃঢ়তা লাভ করবে না। শের বললেন, কাছে এস আলিওয়াল—তোমার কানে কানে বলব!

সভয়ে এগিয়ে এল বৃদ্ধ শিল্পী। শের অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, হুঁশিয়ার! তার কথা কেউ জানে না, মায় বেগম-সাহেবা পর্যন্ত নন্‌! তার নামটা তোমাকে এখনই বলতে পারছি না, তবে এইটুকু জেনে রাখ : সে, আমার দিল্‌কা কলিজা! যার জন্য বলতে পারি :

অগর আন্‌ তুর্ক-ই সিরাজী বদস্ত আর্দ দিল্‌-ই-মারা।

ব্‌-খাল-ই হিন্দোওশ বখসম্‌ সমরকন্দ-ওয়া-বুখারারা।[14]

বজ্রাহত হয়ে গেল বৃদ্ধ শিল্পী। শের খাঁর জীবনে যে এমন একটি অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায় আছে—তিনি যে এমন একজন সুন্দরী সাকীর মহব্বতে দিওয়ানা তা তো কাক-পক্ষীতেও কখনও অনুমান করেনি!

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।

সাহাবাদ জেলার নগণ্য জায়গীরদার শের খাঁ এবারে চলেছেন দিল্লির পথে। এলাহাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা, দিল্লি। অবশেষে তামাম হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউস! অপ্রতিরোধ্য শের খাঁর শেষ সাফল্য। হুমায়ুন তখন গাঙ্গেয় উপত্যকা পার হয়ে, সিন্ধু পার হয়ে, খাইবার গিরিপথ দিয়ে কাবুলের পথে পালাচ্ছেন। তাঁর হারেম পড়ে আছে শের খাঁর হেপাজতে।

মাত্র পাঁচ বছর দিল্লিশ্বর ছিলেন ঐ আশ্চর্য সুলতান—শের শাহ্‌ শূর। তুলনায় আকবর ছিলেন উনপঞ্চাশ বছর, শাহজাহাঁ একত্রিশ বছর, আলমগীর উনপঞ্চাশ বছর। অথচ এই পাঁচ বছরে শের শাহ্‌ যে স্থাপত্যকীর্তি ও পুরাকীর্তি রেখে গেছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, তা ঐন্দ্রজালিক। পুরানা-কিল্লার অসংখ্য ইমারত, বিশেষ করে তার অভ্যন্তরস্থ কিল্লা-ই খুনহা মস্‌জিদ। পাঞ্জাবে ঝিলাম নদীর তীরে রোহ্‌তাশ দুর্গ। আর সবার ওপরে—না, অসমাপ্ত আলাই-মিনার শেষ করেননি, তবে তার চেয়েও বড় কীর্তি গড়ে গেছেন। কুৎব-মিনারের চেয়েও বড় মিনার বানাবার স্পর্ধায় ঐ একই চত্বরে বৃহত্তর 'আলাই মিনার' বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জী। শুরু করেছিলেন কাজ, কুৎব-এর দ্বিগুণ ব্যাসের বনিয়াদ ও ভিত্তি। একতলার চেয়ে বেশি গাঁথা যায়নি। রাবণের অসমাপ্ত সিঁড়ির মতো হাড়-পাঁজরা বার করে সেটা পড়ে আছে কয়েক শতাব্দী। কেউই সাহস পায়নি তাতে নতুন করে পাথর বসাতে। প্রথম যৌবনের দার্ঢ্যে সেটাকেই গেঁথে তুলবার কথা বলেছিলেন শের শাহ্‌; কিন্তু তক্তত্তাউসে আসীন হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে। তাই গড়ে তুললেন অপর একটি স্থাপত্য কীর্তি, যা কুৎব কেন, আলাই মিনারের স্বপ্নকেও পিছনে ফেলে গেছে: সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক, গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড। প্রতি পাঁচ-দশ কিলোমিটার অন্তর তৈরি করালেন মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা, পানীয়ের জন্য কূপ-তালাও-বাওলী, উপাসনার জন্য মস্‌জিদ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ মিনার—'অবজারভেশন টাওয়ার।' আর দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মারফতে ঘোড়ার 'ডাক'। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবধানে আস্তাবল, অশ্বের আহার্য, বদলি-ডাকবাহী, ডাকঘর। সব কিছুর শুরু ও শেষ মাত্র পাঁচ বছরে!

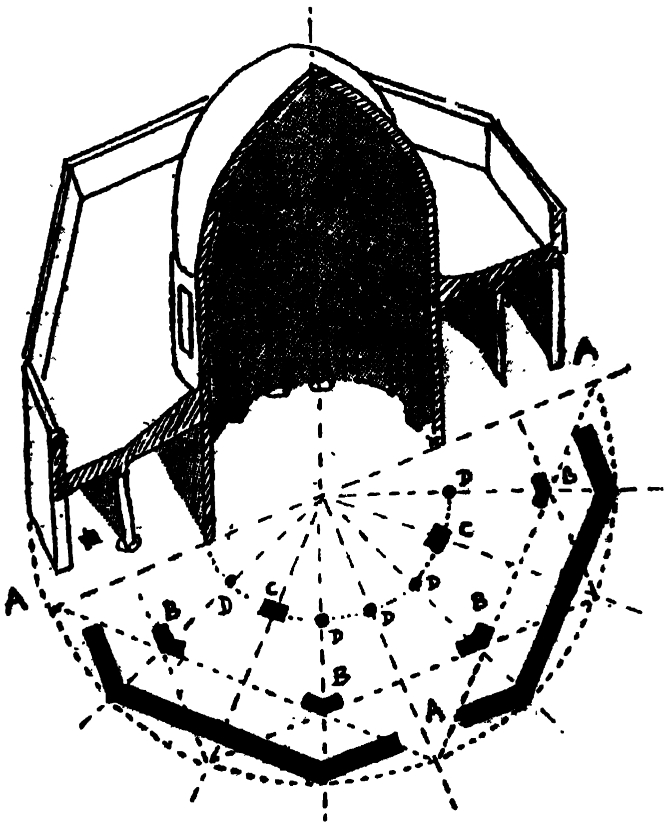
শের শাহ্‌র স্থাপত্য-কীর্তি ত্রিধারায়। ভৌগোলিক বিচারে। প্রথমত, সাসারামে গুটিতিনেক মক্‌বারা, যার প্রধানতম হচ্ছে নিজের সমাধিসৌধ। দ্বিতীয়ত, রাজধানী দিল্লিতে পুরানা-কিল্লা সংলগ্ন অনেকগুলি ইমারত। তৃতীয়ত, বঙ্গাল থেকে পাঞ্জাব-তক বাদশাহী-সড়কের ধারে ধারে গণনাতীত স্থাপত্য-কীর্তি—যেখানে স্থাপত্যকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদ।

সাসারাম পর্যায়ে যাবতীয় কীর্তির মূল নিয়ামক আলিওয়াল খান। তাদের মূল ছন্দ একটি সমবাহুর অষ্টভুজ। এই প্ল্যানিং একটি দীর্ঘ ঘরানার বিবর্তন-ধারায় পুষ্ট—জেরুসালেমের 'ডোম-অব-দ্য-রক' আছে তার উৎসমূলে ; লোদী ও সৈয়দ জমানায় সেই ঘরানার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'-কারের মতো ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের মূল আছে তিনটি 'ম' : মস্‌জিদ, মক্‌বারা ও মকান্‌। প্রথমটি পারত্রিক, শেষেরটি ঐহিক, মাঝেরটি ঐ দুইয়ের সংক্রমণধর্মী। মসজিদের পরিকল্পনা শরিয়তী বিধি-বিধানে সুনির্দিষ্ট। সেটি হবে আয়তক্ষেত্র, পূর্বমুখী, তার পশ্চিমের প্রাচীরে 'ইবান', তাতে 'মিহ্‌রাব', মিহ্‌রাবে 'কিব্‌লা'র চিহ্ন—মক্কার দিক নির্দেশ করে। তিন দিকে 'লিয়ান', শেহানের মাঝখানে অজুর জলাধার, আজানের জন্য মিনার অথবা মিনারিকা।

মক্‌বারার পরিকল্পনায় স্থপতিকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ভূমি-নকশায় তা হতে পারে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ বা অষ্টভুজ। লিয়ান, গুলদস্তা, ছত্রী, গম্বুজ তাতে কী থাকবে, কী থাকবে না, তার কোনো বাঁধাধরা নির্দেশ নেই। ধর্মীয় নির্দেশ শুধু এইটুকু :

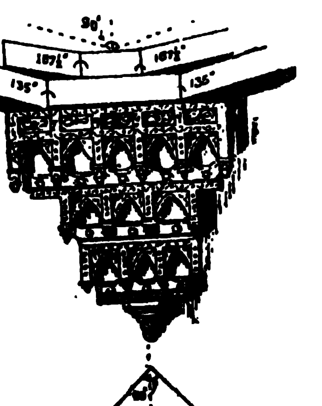
মৃতদেহ থাকবে ভূগর্ভে একটি কক্ষে, কবরের তলায়। ঠিক তার ওপরে, সচরাচর প্লিন্থ সমতলে, নির্মিত হবে আর একটি কক্ষ—'হুজরাহ'। তার কেন্দ্রস্থলে—ভূগর্ভস্থ কবরের ঠিক ওপরে—নির্মিত হবে একটি অনুরূপ শূন্যগর্ভ কবর-প্রতিম। ইসলামী স্থাপত্যে তার নাম 'সন্দৌখ' বা 'জারিহ্'। ইংরাজিতে 'সেনোটাফ' বলতে পারি। বাঙলায় তার পরিভাষা আমার জানা নেই। তবে ঐ 'সন্দৌখ' থেকে বাঙলায় আর একটা শব্দ উৎপন্ন হয়েছে : সিন্দুক বা সিন্ধুক। কবরে মৃতদেহ চিৎ হয়ে শোবে না, শোবে পাশ ফিরে। মাথা থাকবে হয় উত্তরদিকে, অথবা দক্ষিণে। উত্তরদিকে মাথা করলে, দেহ থাকবে ডাইনে পাশ ফিরে, দক্ষিণ দিকে শিয়র করলে বাঁয়ে পাশ ফিরে—যাতে অনিবার্যভাবে সে পশ্চিমদিকে মুখ করে থাকতে পারে অনন্তকাল। ঐ কক্ষে তার পশ্চিম দেওয়ালে গড়ে তোলা হয় একটি কুলুঙ্গির মতো অলঙ্করণ, 'মিহ্‌রাব', যার গায়ে মক্কার দিক-নির্দেশক 'কিব্‌লার' চিহ্ন। ক্ষেত্রবিশেষে—বড় জাতের মক্‌বারায় মূল সৌধের পশ্চিমে—একটি পৃথক মসজিদও গড়ে তোলা হয়, যেমন আছে তাজমহলে।



চিত্র 1 - ডোম অব দ্য রক্

সাসারাম পর্যায়ের তিনটি মক্‌বারাই অষ্টভুজাকৃতি। এটি জেরুসালেমের 'কুবেৎ-এস সাক্‌কারাহ্‌'-র (ইংরাজিতে 'ডোম-অব-দ্য রক্‌' নামে বিখ্যাত) অনুসরণে। স্থাপত্যের অন্যতম মৌলিক সমস্যা চতুষ্কোণ কক্ষের উপরে গোলাকৃতি গম্বুজ বানানো। তারই একটি সহজ সমাধান করেছিলেন ওমায়িয়দ বংশের খলিফা আবদুল মালিক (685-703 খ্রিঃ) জেরুসালেম মসজিদে (চিত্র 1)।—সমবাহুর অষ্টভুজে যার বহিরাবরণ বিধৃত। আটটি কোণার বিপরীতে আটটি 'পায়ার' (B চিহ্নিত)। ভিতর দিকে চারটি 'পায়ার' (C) এবং তাদের ফাঁকে-ফাঁকে তিনটি করে স্তম্ভ (D চিহ্নিত) একটি গোলাকার রূপ নিয়েছে। তাদের ওপরেই উঠেছে প্রাচীর, উপরিস্থিত গম্বুজটিকে ধরে রাখতে।

আটকোণা দেওয়ালে গোলাকৃতি গম্বুজ ধারণের এই সহজ সমাধানটা কিন্তু ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে অনুকৃত হয়নি। দাস বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ইলতুৎমিস তাঁর নিজের সমাধিতে (কুৎব-চত্বর, দিল্লি) ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য প্রথম গম্বুজটি যখন বানাতে চাইলেন, তখন তিনি অষ্টভুজাকৃতি বহিরাবরণ অনুমোদন করলেন না—সমাধিসৌধ হল চতুষ্কোণ। প্রাক্‌-ইসলাম ভারতীয় স্থাপত্যে গম্বুজ ছিল না—স্থানীয় স্থপতি যেভাবে তার সমাধান করতে চাইল স্থাপত্যের ভাষায় তার নাম স্কুইঞ্চ (Squinch) (চিত্র 2)। চারটি কোণায় চারটি কড়ি (আর্কিট্রেভ বা বীম) পাতা হল, যাতে আভ্যন্তরীণ কোণটা হল 135° ; ঐ বীমকে তিনভাগ করে দু-পাশে আবার দুটি বীম পাতা হল যাতে আভ্যন্তরীণ কোণগুলি হল $157^1/_2$°। এতক্ষণে চারকোণা ঘরটি ষোলো কোণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তারই ওপর গেঁথে তোলা হল গোলাকৃতি গম্বুজ। কোণায় কোণায় নয়নাভিরাম স্ট্যালাক্‌টাইট গড়ে মনমুগ্ধকর রূপারোপ করা হল। ভাষায় যা ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি তা চিত্র 2-এ এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এটি সম্রাট শের শাহ্‌ নির্মিত পুরানা কিল্লার 'খুন্‌হা' মসজিদ থেকে! এই স্কুইঞ্চ পদ্ধতি কিন্তু ইসলাম আবিষ্কার করেনি, অনুকরণ করেছে মাত্র—বাইজেন্টাইন স্থাপত্য থেকে। তাঁরাও মূল আবিষ্কারক নন। সম্ভবত এর আদিম আবিষ্কারক সাসানিয়ানরা। তাদের তৈরি স্কুইঞ্চ-পদ্ধতিতে নির্মিত একটি গম্বুজ তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে টিকে আছে, যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত আদিমতম ভারতীয় স্কুইঞ্চটি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি।



চিত্র 2 - স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে ভারবহন

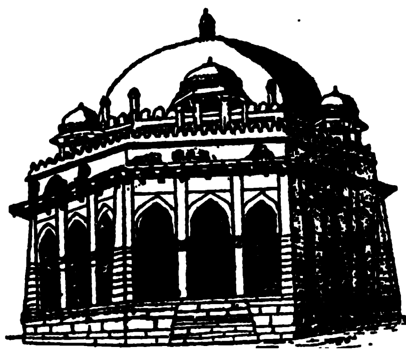
অষ্টভুজাকৃতি ইমারত ভারতবর্ষে প্রথম নির্মিত হল—খুব সম্ভবত ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রধানমন্ত্রী খান্‌-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্‌বারায়। ধর্মান্তরিত মুসলমান—নাম, মকবুল খান ; সাকিন, দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানা। তাঁর মক্‌বারা কোন্‌ স্থপতিবিদ ডিজাইন করেছিলেন, ইতিহাস তা লিখে রাখতে ভুলেছে—কিন্তু এইটিই বোধ করি 'ডোম-অব-দ্য রকের' প্রথম ভারতীয় রূপান্তর। স্থাপত্য-ইতিহাসে এ এক চিহ্নিত সম্পদ।

এখানে কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার কারিগুরীটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে ; আপাতদৃষ্টিতে মোকাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। জেরুসালেম মসজিদে বাহির দিকে ছিল রুদ্ধ প্রাচীর, তিলাঙ্গানীর মক্‌বারায় বাহিরে রইল অলিন্দ ; ভিতরে অষ্টভুজাকৃতি মূল কক্ষ। দুর্ভাগ্যবশত এ ইমারত এখন ভগ্নদশায়। তা-হোক, তিলাঙ্গানীর মক্‌বারাতে যে নতুন চিন্তাধারা জন্মগ্রহণ করল—চতুষ্কোণ সমাধিকক্ষের অষ্টভুজাকৃতি রূপগ্রহণ, তা স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারায় বিবর্তিত হতে শুরু করল। বিবর্তনের ধারাটি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত রূপ :

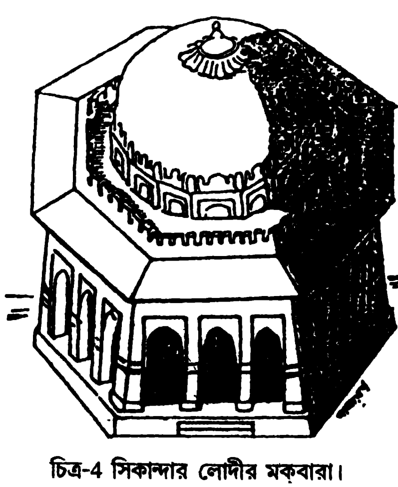
নাম	চিত্র	অবস্থান	যুগ	সময় (আঃ)
ডোম অব দ্য রক	চিত্র 1	জেরুসালেম	ওমায়িয়দ	670
খান্-ই জাহান তিলাঙ্গানী	–	দিল্লি	তুগলুক	1370
মুবারক শাহ্ সৈয়দ	চিত্র 3	ঐ	সৈয়দ	1434
মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দ	–	ঐ	ঐ	1444
সিকান্দার লোদী	চিত্র 4	ঐ	লোদী	1517
হাসান শূর	–	সাসারাম	শূর	1530
শের শাহ্ শূর	–	ঐ	ঐ	1534
ঈশা খাঁ	চিত্র 5	দিল্লি	ঐ	1547
আধম খাঁ	চিত্র 6	ঐ	আকবর	1561

ওমরের জেরুজালেম ইমারতের ভারতীয় রূপান্তরকরণে খান-ই জাহান মক্‌বারায় যে পরিবর্তন করা হয়েছিল —অর্থাৎ কক্ষ ও অলিন্দের স্থান পরিবর্তন এবং একটি ছজ্জার প্রবর্তন, সেটি পরবর্তী প্রত্যেকটি উদাহরণে অনুসৃত। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভিতরে আটকোণা মূল সমাধিকক্ষ বা 'হুজুরাহ', আর তার বাহির দিয়ে অষ্টভুজাকৃতি অলিন্দের আটকোণায় আটটি প্রায়স্তম্ভ (pier) এবং তাদের মাঝখানে তিনটি করে খিলান।

মুবারক শাহ্ সৈয়দের পরিকল্পনাকার ছাদের আটপ্রান্তে আটটি ছত্রী গেঁথে তুলেছেন, কুর্সি (ভিত বা plinth) যথেষ্ট উঁচু। তবু বিস্তারের আপেক্ষিকে উচ্চতা যথেষ্ট না হওয়ায় গোটা ইমারত নয়নাভিরাম হয়নি। গম্বুজটির কোনো ভিত্তিমূল বা 'গম্বুজ-কুর্সি' না থাকায় তা যেন অনেকটা চাপা পড়ে গেছে (চিত্র 3)। ভূমি-নকশায় (প্ল্যানে) জ্যামিতিক বিন্যাসছন্দটা ভালোই লাগে। 'মডেল' তৈরি করে যদি গরুড়াবলোকনে দেখা যায় তাহলেও মন্দ লাগে না ; কিন্তু বাস্তবে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শকের দৃষ্টিতে মনে হয় ছত্রীগুলি গম্বুজের ঘাড়ে চড়েছে। ইমারত গম্বুজের অনেকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলে 'ঘাড়ে-গর্দানে', সেই ত্রুটি যেন হয়েছে ইমারতের। এই অবকাশে তাজমহলের কোনো ফটো চট্ করে দেখে নিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কী বলতে চাইছি—'গম্বুজ-কুর্সি' পরিমাণ মতো বৃদ্ধি করায় তাজমহলে এই দোষ আদৌ নেই।



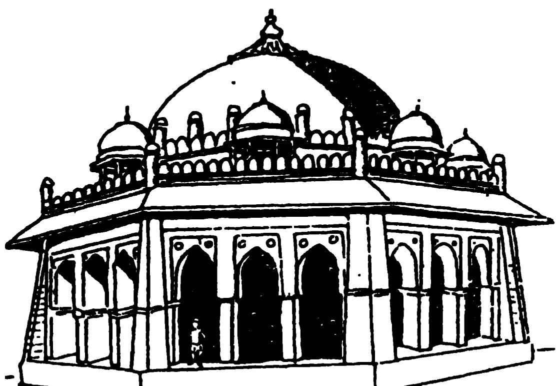
চিত্র-3 মুবারকশাহ্ সৈয়দ-এর সমাধি (সম্মুখ দৃশ্য)।



চিত্র-4 সিকান্দার লোদীর মক্‌বারা।

প্রায় দশ বছর পরে মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দের সমাধি রচনার সময় স্থপতিবিদ এই ত্রুটিগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই তিনি গম্বুজকে বসালেন পিচের ড্রামের মতো (barrel-shaped) গোলাকার একটি গম্বুজ-কুর্সির ওপর। ফলে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শক এবার গম্বুজটার স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হল। গোটা ইমারতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সামঞ্জস্য বিধান করে ঐ 'ঘাড়ে-গর্দানে' দোষটা দূরীভূত করা হল। বৈচিত্র্য আনতে দুই খাম্বিয়ার মধ্যবর্তী তিনটি খিলানের মাঝেরটিকে উচ্চতায় কিছু বড় করা হল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাগ্বর্তী যুগের স্থাপত্য-চিন্তায় উন্নতিবিধান করা গেল।

তবু দেখছি, আরও পঞ্চাশ বছর পরে সিকান্দার লোদীর মক্‌বারা (চিত্র 4) বানানোর সময় স্থপতিবিদ আত্মসন্তুষ্ট নন। তিনি ছত্রীগুলিকে বর্জন করলেন। ইমারতের ভিতটাকেও কমিয়ে আনলেন। গম্বুজকে এবারও বসানো হল গম্বুজ-কুর্সির ওপর। শুধু তাই নয়, সেই গোলাকৃতি গম্বুজ-কুর্সির ধার ঘেঁষে ষোলো-কোণাবিশিষ্ট একটি অলঙ্কৃত প্রাচীর গেঁথে তোলা হল। যেন মসজিদের সমুখে 'মাখ্‌সুরা'। অথবা বলা যায়, সাঁচী স্তূপের চারিদিক ঘিরে অণ্ডের মাঝামাঝি যেমন প্রদক্ষিণ পথের অলঙ্করণ। আরও লক্ষ্য করে দেখুন, এতকাল গম্বুজের ওপর যে ছত্রীটি ছিল, সেটি অপসারিত। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে হিন্দুমন্দিরের পদ্মকলস।

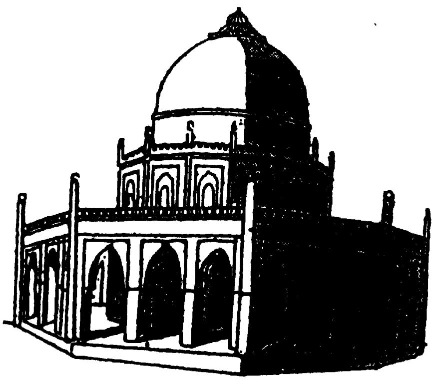


চিত্র-5 ঈশা খাঁর সমাধিসৌধ

এই ধারারই বাহক আলিওয়াল খান, যাঁর স্থাপত্যকীর্তি ঐ সিকান্দার লোদী মক্‌বারার দু-দশকের মধ্যে নির্মিত। সে প্রসঙ্গে এখনই আসব। ধারাবাহিকতার সূত্রটা ধরে বরং বলি, আলিওয়ালের উত্তরসাধকদের কথা। শের শাহ্-র পুত্র সালিম-শাহ্ শূরের আমলে নির্মিত ঈশা খাঁর মক্‌বারায় আবার পূর্ববর্তীযুগের বিভিন্ন কায়দায় বিচিত্র 'পারমুটেশন' করা হল (চিত্র 5)। গম্বুজটাকে বসানো হল উঁচু কুর্সির ওপর। কিন্তু স্থপতিবিদের মনে হল—সিকান্দার লোদীর ঐ ছত্রী-বর্জনটা ঠিক হয়নি। তিনি তাই মুবারক শাহ্ সৈয়দের হারিয়ে যাওয়া ছত্রীগুলিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেন। অর্থাৎ ঈশা খাঁর স্থপতির মতে মুবারক শাহ্-এর মক্‌বারাতে যে অলঙ্করণ, ছত্রীর ঘননিবদ্ধ পুষ্পগুচ্ছ, সেটা খোলতাই হয়নি ফুলদানিটা খর্বাকার হওয়ায়। তাই তিনি দুটির মিলিত রীতির এক 'সিনথেসিস্' বানাতে চাইলেন।

পরবর্তী উদাহরণ আধম খাঁর মক্‌বারা, ঐ দিল্লিতেই (চিত্র 6)। ইতোমধ্যে কিন্তু ভারত ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে গেছে। পাঠান যুগ অতিক্রমণে আমরা পৌঁছেছি মুগল-ই-আজমে। শেরশাহ, ইসলাম শাহ, হুমায়ুন পার করে আকবরী জমানায়। আধম খাঁ ছিলেন আকবরের দুধ-ভাই, ধাত্রী জীজী আঙ্গার পুত্র, আকবরের সেনাপতি। নূতন যুগের মুঘল স্থপতি পূর্বযুগের সব কয়টি কীর্তি খুঁটিয়ে দেখে শোনালেন

নতুন কথা। যেন বললেন, না ছত্রী চলবে না। ওরা বড় ভিড় করে। তার চেয়ে গম্বুজ সই-সই ঐ প্রাচীরের আটপ্রান্তে বানাও আটটি গুলদস্তা। 'গুলদস্তা' কাকে বলে জানো না? ছোট আকারের মিনারিকা ; সরু, লম্বা, বর্শার মতো, যার অনেকটাই ইমারতের গা সই-সই। আর তার ওপরে আধফোটা পদ্মকুঁড়ি। কবর ঘিরে যেমন মোমবাতি সাজানো হয়, সেই কায়দায় গুলদস্তাগুলি সাজিয়ে দাও। তাছাড়া গম্বুজ-কুর্সির সই-সই পাঁচিলটাকে খাড়াইয়ে আরও বড় কর, তাতে বসাও এক-একদিকে তিন-তিনটে করে কৃত্রিম খিলান, কুলুঙ্গি আর কি! তাতেই ছত্রীর অভাবজনিত শূন্যতা পূরণ হবে। গম্বুজ-কুর্সিটাকে আরও অনেক উঁচু করতে হবে (তা তো বটেই! সেটা সিকান্দার লোদীর মক্‌বারায় যতটা উঁচু করা হল, তার চেয়েও উঁচু করতে হবে—যা হয়েছিল, আরও দু-পুরুষ পরে, তাজমহলে)। তাছাড়া চারিদিক ঘিরে এতদিন ঐ যে ছজ্জাটা বানাচ্ছিলে, ওটা বাতিল কর। তার বদলে গম্বুজকে বেষ্টন করে একটা বর্ডার দাও। খিলানের মাথায় মাথায় চওড়া ফেট্রি বাঁধো দেখি—এবার দেখ, কেমন খোলতাই হয়েছে।



চিত্র-6 আধম খাঁর সমাধিসৌধ

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এই অষ্টভুজাকৃতি মক্‌বারা, যার প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন আলিওয়াল, তা রাজধানীর বাহিরেও ভারত ভূখণ্ডে দূর দেশে ও দূরকালে প্রসারিত হয়েছিল। তার প্রভাব অনুধাবন করতে আপনাকে সাসারাম-দিল্লি-আগ্রা দৌড়তে হবে না। ট্রেনের বদলে ট্রামে চেপেও তা দেখে আসতে পারেন। বি-বা-দী বাগে। এই শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধিতে। অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে আলিওয়াল খান একটি সোপানমাত্র। হয়তো একটি বড় জাতের সোপান : ল্যান্ডিং। কিন্তু তাঁর একটি কীর্তি 'ল্যান্ডিং' নয়, 'ল্যান্ডমার্ক'। শের শাহর সমাধি।

সাসারাম পর্যায়ে সর্বপ্রথম নির্মিত মক্‌বারায় আলিওয়াল যেন নিজেকে তখনো খুঁজে পাননি। তবু তাঁর স্বকীয়তার অভাব নেই কোনো। আলিওয়াল ছজ্জাকে সম্প্রসারিত করেন, ছত্রীগুলিকে বসিয়েছেন ছজ্জা থেকে অনেকটা উঁচুতে, একটা আটকোণা পাঁচিল গেঁথে তুলে। ইমারত বিস্তার ও উচ্চতার সুষম ছন্দের অনুপাতে সুদৃশ্য। ছজ্জা ও প্রাচীরের মধ্যে ভূমি-নকশায় যে প্রশস্ত স্থানটা রাখা হয়েছে সেখানে চার-আটে-বত্রিশটা ছোট-ছোট গম্বুজ বানিয়ে একটা নয়নাভিরাম স্নিগ্ধতা আনা হয়েছে। খিলানগুলি দু-পর্দায় গাঁথার জন্য নিম্নাঙ্গে একটা বাড়তি অলঙ্করণ পাওয়া গেছে, যা ঊর্ধ্বাঙ্গের ঐ গম্বুজ অলঙ্করণকে ব্যালেন্স করছে।

মাত্র চার বছর পরে আলিওয়াল সাসারামে যা বানালেন তা 'লতিফ', তা 'সরিফ', তা 'কামাল', তা 'আজীব-ও-ঘড়ি'! শের শাহ্ শূরের সমাধি। পার্সি ব্রাউন বললেন, "It is a class by itself, for it is one of the grandest and most imaginative architectural conceptions in the whole of India."[15] শুধু তাই নয়, দেখছি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে কুৎব-মিনার, বুলন্দ-দরওয়াজা, বিজাপুরের গোলগম্বুজ এমনকি স্বয়ং তাজমহলকে উপেক্ষা করে তিনি ঠাঁই দিয়েছেন আলিওয়ালের স্বপ্নকে—হ্রদের জলে প্রতিফলিত শের শাহ্ মক্‌বারা পার্সি ব্রাউনের অমর গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে উপস্থিত।

ইমারতটি একটি বর্গক্ষেত্র আকারের দীর্ঘিকার কেন্দ্রস্থলে দ্বীপের মতো নির্মিত। পরবর্তীকালের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ব্যতিরেকে এ পরিকল্পনা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তিতে দেখিনি। পুষ্করিণী অতি বিশাল, এক এক দিকে 427 মিটার—পাড় বরাবর ঘুরে এলে প্রায় পৌনে দু-কিলোমিটার হাঁটা হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থ ইমারতের বিস্তার 76 মিটার, উচ্চতা 46 মিটার। ইমারতে পাঁচটি তল—সর্বনিম্নে দিঘির বুক থেকে দ্বীপের মতো জেগে উঠেছে এক বর্গক্ষেত্র-আকারের ভিত্তি-মূল বা মোকাম-কুর্সি। তাকে ঘিরে একটি চতুষ্কোণ সুউচ্চ প্রাচীর, যার চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতি ছত্রী। তৃতীয় তল মূলসৌধের অষ্টভুজ অলিন্দ, যার প্রতিটি দিকে দুই খাম্বিরার মাঝখানে লোদী শৈলীতে নির্মিত তিন-তিনটি খিলান। উপরে অপ্রশস্ত ছজ্জা। তার ওপর কুঞ্জর (battlement) শোভিত ছাদ-পাঁচিল (parapet)। এবং আটটি ছত্রী। এর পরের তলায় আবার একটি খাড়া পাঁচিল ইমারতকে বেষ্টন করেছে—যাতে হাসান-মক্‌বারার ছাপ, এবং তার ওপর পুনরায় আটটি ছত্রী। লক্ষণীয়, মুবারক শাহ্ সৈয়দের সমাধিতে মনে হয় ছত্রীগুলি মূল গম্বুজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে সে দোষ হয়নি। যদিও শের শাহ্‌র ক্ষেত্রে ছত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণিত। তার হেতু : ষোলটি ছত্রী মূল গম্বুজকে বেষ্টন করেছে দুটি বিভিন্ন আনুভূমিক তলে এবং গম্বুজের আকার এত বড় যে, ছত্রীরা ভিড় করে তার মহিমা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

গম্বুজটি প্রকাণ্ড। নির্মাণ সময়ে ছিল তামাম হিন্দুস্থানে বৃহত্তম—ব্যাসে ও উচ্চতায়। ব্যাস 20 মিটার, উচ্চতা 27.5 মিটার। সেকেন্দার শাহ্‌র মক্‌বারা থেকে হুমায়ুনস্ টুম্ব, তাজমহল পার হয়ে সফদরজঙ মক্‌বারা পর্যন্ত প্রতিটি গম্বুজের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটি 'ডবল-ডোম' নয়। এখানে আলিওয়াল এক মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার চেয়ে বড় গম্বুজের ক্ষেত্রে দু-পর্দায় বানানোর প্রথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। স্থপতি মনে করেন, না হলে ভিতর থেকে দর্শকের রসাভাস ঘটে। সমাধিকক্ষের ভিতরে দণ্ডায়মান দর্শকের মনে হয় গম্বুজ অন্ধকারে মিশে গেছে! আলিওয়াল সব জেনে-বুঝে তবুও 'সিঙ্গল-ডোম' বানালেন। ঐ অনুভূতির হাত থেকে দর্শককে মুক্তি দিতে গম্বুজের ভিতরে আলো আসার এক বিচিত্র ব্যবস্থা করলেন। যা অভূতপূর্ব। প্রয়োগবিদ্যায় তার পরিচয়—'ট্রিফোরিয়াম আর্কেড-জালিকায় মক্ষিকোষ নির্মাণ করে।' সেটি কী, তা এঁকে দেখাতে গেলে শিল্পের আঁকজোক করতে হবে। কখনো সাসারামে গেলে স্বচক্ষেই দেখবেন।

অনুমান হয়, নির্মাণ-সময়ে গম্বুজটা নীল রঙে আস্তর করা ছিল—সে আস্তর ধুয়েমুছে উঠে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি-নকশায় পশ্চিমদিক নিরূপণে সামান্য ভুল হয়েছিল। বনিয়াদের কাজ শেষ করার পর এ ত্রুটি আলিওয়ালের নজরে পড়ে। ইসলামী ঐতিহ্যে কিব্‌লা চিহ্নিত মিহরাব নিখুঁত পশ্চিমে থাকা চাই। আলিওয়াল এই আট ডিগ্রি গলতি উপরাংশে সুন্দরভাবে শুধরে নিয়েছেন। এমনকি ভূমি-নক্‌শা বা প্ল্যানে ঐ ত্রুটিটাকে মনে হয় স্থপতিবিদের একটি সজ্ঞানকৃত প্যাটার্ন বুঝি!

দিল্লি মহানগরীতে শের শাহের স্থাপত্যকীর্তি : পুরানা কিল্লা বা ষষ্ঠ দিল্লি নগরী। সে স্থপত্যকীর্তি দেখতে আজকের দিনের ট্যুরিস্ট যায়-কি-না যায়! নেহাৎ এক্‌জিবিশন গ্রাউন্ডে কোনো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে, অথবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাত্রী ওপাড়ায় পা মাড়ায়। যদি যান : দেখবেন, কঙ্কালসার কিছু ধ্বংসস্তূপ। হুমায়ুন পরবর্তী জমানাতে—শের শাহের মৃত্যুর পর—দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন : এই

অঞ্চলের অনেকগুলি শেরশাহী ইমারত ধ্বংস করে নতুন মোকাম বানিয়েছিলেন। তাই পুরানা কিল্লার জৌলুষ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবু এখনও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন—শের শাহ্ দরওয়াজা বা বড়া দরওয়াজার বিচিত্র অলংকরণ ; কিম্বা কিল্লা অভ্যন্তরস্থ কিল্লাই-ই খুহ্না মসজিদ।

খুহ্না মসজিদ—সম্রাটের প্রার্থনাস্থল—এক যুগের অবসান ও অপর যুগের আগমনের দ্যোতক। ভূমি-নক্শায় আয়ত ক্ষেত্র—48×13.7 মিটার। উচ্চতা 33.33 মিটার। মসজিদে প্রবেশ দ্বারটি লক্ষ্য করে দেখুন, খিলানগুলি দু-পর্দায় নির্মিত। বাহিরে ইমারতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার অনুপাতে বিশালকায় খিলান, তার কিনার বরাবর গিয়াস-উদ্দীন মকবারা অথবা আলাই দরওয়াজার সেই পদ্ম-কুঁড়ির নকশা। আর ভিতর দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় প্রকৃত প্রবেশ দ্বার। বাহিরের দিকের উচ্চতা স্থাপত্যের প্রয়োজনে, ভিতর দিকে মানুষের প্রয়োজনে। এই রীতিটি পরবর্তী বহু ইমারতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে—যার চরম সাফল্য ফতেপুর সিক্রিতে আকবরী বুলন্দ্ দরওয়াজায়। আরও দেখুন, প্রবেশ পথের ঐ অরিয়ল গবাক্ষটি আকবরী-জমানার আগ্রা কিল্লার জাহাঙ্গীরী মহলে, ফতেপুর সিক্রির বহু বহু গবাক্ষ, এমনকি জয়পুরের হাওয়া-মহলের স্মৃতিও আপনার মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রবেশপথের দু-পাশে দেওয়াল সই-সই দুটি মিনারিকাকে লক্ষ্য করেছেন? যা উপরে গিয়ে গুলদস্তায় রূপান্তরিত? ওর গায়ে ঐ খাঁজ-কাটা নক্শাটা কেমন যেন চেনা-চেনা, নয়? ওটা দেখেছেন কুৎব-মিনারে। অরিয়ল গবাক্ষটা ঘিরে পাথরের জালিকাজ, তাও পরবর্তীকালে নানান নূতন ছন্দে বিবর্ধিত হয়েছে—ইতমৎউদ্দৌলায়, সেলিম চিস্তির দরগায়, এমনকি তাজমহলে। দিল্লি পরিক্রমাকালে এই ক্ষুদ্র ইমারৎটি স্বতই উপেক্ষিত হয়ে যায়—কিন্তু আপনি যদি স্থাপত্যের ছাত্র হন, তাহলে বলব ও তীর্থে একবার হাজিরা দিয়ে যাবেন। হোক ছোট, এই উপেক্ষিত স্থাপত্যকীর্তিতেই শের শাহ্ শূর অনেকগুলি বীজ বপন করেছিলেন যা অন্যত্র অনন্য মহীরুহে বিকশিত হয়েছে।

মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর কেমন করে শের শাহ্ এত এত কাণ্ড করে ফেললেন? কেমন করে বুঝলেন—কুৎব-মিনারকে অতিক্রম-করা কীর্তি আলাই-মিনার নয় ; গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড! উচ্চতায় শুধু দার্ঢ্যেরই ব্যাঞ্জনা, বিস্তারে মহত্বতের! দু-হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সোনারগাঁও-পাঞ্জাব সড়ক কুৎব-এর 273 মিটার উচ্চতাকে পিছনে ফেলে গেল। আজ পাঁচ শ' মানুষ যদি দৈনিক কুৎব দেখতে যায়, তবে পঁচিশ লাখ ব্যবহার করে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড!

সাসারামের সেই নগণ্য যুবক ফরিদ কোন্ মন্ত্রবলে দিল্লির তক্ত-ই-সুলেমানে আসীন হয়ে এ ইন্দ্রজাল সফল করল? জবাব মিলবে সূফী পণ্ডিত জালালের ভাষায় :

আন্ নিশান্ এ-দীদ্ এ হিন্দুস্থাঁ বুবদ্।
কি জহদ অজ্ খাব ও দিওয়ানা শবদ।।[৬]

কলিঞ্জর দুর্গ আক্রমণের সময় এক দুর্ঘটনায় এই অনন্যসাধারণ সুলতানের মৃত্যু হয়। বারুদের স্তূপে আগুন ধরে যাওয়ায় ঘটল এই দুর্ঘটনা। বিস্ফোরণমাত্র মৃত্যু হয়নি শের-এর। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন তিন দিন। দুর্গের পতন হয়েছে জেনে তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। পাঁচ দিনের দিন কলিঞ্জর কিল্লায় এসে উপনীত হলেন শাহজাদা—যিনি ইসলাম খাঁ নামে পরবর্তী দিল্লির সুলতান। সদ্য-বিজিত কলিঞ্জর দুর্গে অনাড়ম্বর অভিষেক সেরে ইসলাম খাঁ প্রাক্তন দিল্লীশ্বরের মরদেহ নিয়ে রওনা হলেন সাসারামের দিকে।

ইতোমধ্যে উস্তাদ আলিওয়াল খাঁ নির্দেশ মতো সেই তৃতীয় মক্বারাটি সমাপ্ত করেছে। অথচ সেটি শূন্যগর্ভ। এ পাঁচ বছরে দিল্লীশ্বরের সাক্ষাৎ পায়নি শিল্পী, তাই জেনে নেওয়া হয়নি—কে সেই শাহ্-এন-শাহের গোপন প্রেমের পাত্রী!

বিরাট শোকযাত্রার মিছিল এসে সামিল হল সাসারামে। সারা সাহাবাদের মানুষ ছুটে এল তাদের অতি-আপনজনকে শেষ দেখা দেখতে। সেই জনসমুদ্রের একান্তে অন্তেবাসীর মতো দাঁড়িয়েছিল আলিওয়াল। এ কয় বছরে সে আরও বুড়িয়ে গেছে। মনে মনে বলছিল—প্রভু, এ কী বিড়ম্বনার মধ্যে

তুমি ফেলে গেলে আমাকে? মকবারা বানিয়েছি, অথচ তার মালিকানা কার তা জানি না!

এই শেষ বয়সে অকৃতদার আলিওয়াল কি আল্লাহ্‌তালার নাম ভুলে গিয়ে চিরাগ হাতে পথে পথে ফিরবে খুঁজতে—কে হতে পারে সেই সুন্দরী, যার কপোলের ভ্রমরকালো তিলের খাতিরে তামাম-হিন্দুস্তাঁর শাহ্-এন-শাহ্ সমরখন্দ-বুখারারাও বিলিয়ে দিতে পেছপাও নন!

সুলতানী সেপাই এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললে, ওস্তাদজী, স্বয়ং সুলতান তোমাকে তলব করেছেন। তুরন্ত্ চলে এস।

বিহ্বল আলিওয়াল এসে দাঁড়ালো নয়া-সুলতান ইসলাম শাহ্ শূরের সম্মুখে। আভূমি নত হয়ে তিনবার কুর্নিশ করল। ইস্‌লাম শাহ্ বললেন, উস্তাদজী! সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার! আব্বাজানের মরদেহ সমাধিস্থ কর।

বৃদ্ধ ওস্তাদ হুকুম তামিল করল। শোকযাত্রার পুরোভাগে নির্দেশ দিতে দিতে সে নিয়ে গেল সম্রাটের মরদেহ মক্‌বারার ভূগর্ভে। সেই আকাশচুম্বী আশ্চর্য ইমারতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল না। নতনেত্রে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। নব্বই-ছুঁই-ছুঁই বড়ো ইমাম-সাহেব মিম্‌বারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করলেন। হাজার হাজার মানুষ নতজানু হল।

অনুষ্ঠান শেষে ইস্‌লাম শাহ্ যখন আলিওয়ালকে পারিশ্রমিক দিতে গেলেন তখন তিন-পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হাত দুটি জোড় করে বললে. ইমান ইনসাফের মালিক! আপনাদের নিমক খেয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু আজকের এ কাজের জন্য আমাকে কোনো খিলাৎ দেবেন না, খোদাবন্দ্! এ বান্দার এটাই ছিল শেষ কর্তব্য!

ইস্‌লাম বললেন, তুমি এখানেই থাকবে উস্তাদজী! আব্বাজান নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এখানকার মক্‌বারাগুলির দেখভাল, মেরামতির সব দায়-দায়িত্ব তোমার! সেজন্য তামাম-জিন্দেগী তুমি একই হারে মাসোহারা পেয়ে যাবে।

অশ্রুসজল চোখে বৃদ্ধ কোনক্রমে সাহস সঞ্চয় করে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আপনার আব্বাজান—তাঁর লাখোবরিষ বেহেস্তবাস মঞ্জুর হোক —হুকুম দিয়েছিলেন, আরও একটি মক্‌বারা বানাতে। সেটি শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মালিকানা কার তা তো এ বান্দা জানে না।

ইস্‌লাম খাঁ অতি দুঃখেও হেসে ফেলে। বলে, সে কি হে? তুমি জান না? আমরা তো অনেকদিন থেকেই জানি। বাদশাহী খেয়াল! শাহ্-এন-শাহ্ ঐ মক্‌বারাটা বানিয়েছিলেন তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদের জন্য।.....কী? চেন তাঁকে? লোকটার নাম : উস্তাদ আলিওয়াল খান্!

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আলিওয়াল। কুর্নিশ করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল হয়ে গেল তার। এ কি বিশ্বাস্য? কোথায় মহামহিম দিল্লীশ্বর আর কোথায় অতি ক্ষুদ্র কীট আলিওয়াল....সেই রহস্যঘন রসিকতা....'ব-খালই হিন্দোওশ বখসম্ সমরখন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বৃদ্ধ।

গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে যদি কখনো পশ্চিমে যান, আল্লাহর দোহাই, একবার গাড়ি থামাবেন সাসারামে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না—নজরে পড়বেই শের শাহ্ শূরের সমাধি। কাঁকচক্ষু নির্মল জল নয়, সবুজ শ্যাওলা-গোলা ঘোলা পানি। নীল আস্তর করা গম্বুজটা হাড় পাঁজরা বার করা। তা হোক, তবু আজও সেই মগ্নচৈতন্য ইমারত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—দেখছে, নিজ প্রতিবিম্বটাকে। শের রসিকতা করে বলেছিলেন, এ ইমারত নার্গিস! সত্যিই, প্রতিবিম্বের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ঐ কঙ্কালসার ইমারতকে দেখে নার্সিশাস ফুলের সেই আত্মরতিমূলক গ্রীক উপকথাটি মনে পড়ে যাবে আপনার। কিন্তু না! সেটাই বোধ করি শেষ কথা নয়। এই নার্সিশাস্ নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিন্তু আন্‌জনের কথা—একটা ভুলে-যাওয়া মুখের আদল! যে বৃষস্কন্ধ মানুষটা ওকে চিনতে পেরেছিল, যে বলেছিল : তুমি নার্গিস!

তারপর চারশ বছর পার হয়ে গেছে—তেমন দরদী সমঝদার আর কেউ আসেনি এ ফুল বাগিচায়!

কোথায় গেল সেই মানুষটা? বেচারী জানে না, সে আছে ওরই অন্তরতম হয়ে :

হাজারোঁ সাল সে নার্গিস
আপ্‌না বে-নূরী-পর রোতি হ্যয় ;
—বড়া মুশ্‌কিল সে হোতি হ্যয়
চ্যমন্ মে দিদাবর পয়দা।।[17]

[বে-নূরী = অতুলনীয় সৌন্দর্য ; চ্যমন = বাগিচা ; দিদাবর = connoisseur]

অদূরেই মিঞা হাসানের মক্‌বারা। বড়া-ইমাম সাহেবের দোহাই, দেখতে ভুলবেন না সেই দামাল ছেলে ফরিদের বাপমায়ের কবর। শের শাহ্‌র দাপটে শের-বক্‌রি নাকি এক ঘাটে পানি পিত। হলফ্ নিয়ে হক্-বেহক্ কবুল করতে পারব না ; কিন্তু দেখবেন, জেদী একরোখা মিঞা হাসানকে সে শুইয়ে দিয়েছে তার আম্মাজানের কলিজা সই-সই করে। ভঙ্গিটা দেখেছেন? দেখুন, দেখুন, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। মা আছে পশ্চিমে, পশ্চিম দিকে ফিরে! তার মানে? জীবিতকালে যৌবনোত্তীর্ণা যে মহিলাটি ছিলেন সুবেদারের করুণার ভিখারিণী তিনি আছেন মুখ ফিরিয়ে, আর পিছন থেকে হাসান তার জরুর দিকে ফিরে!

এখানেই সাসারাম দেখা শেষ করবেন না যেন। খোদ শেরের দোহাই—চলুন দেখে আসি তাঁর ‘দিলকা কলিজাকে’। রিকশা-ওয়ালা, ভাজি-ওয়ালা, পথ চল্‌তি মানুষজনকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করুন—কেউ না কেউ হদিস্ বাতলে দেবেই। দেখিয়ে দেবে দূর থেকে, ঘন কাঁটাগুল্মে ঢাকা একটি চুনবালি-খসা উপেক্ষিত ধ্বংসস্তূপ। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনো তা-বড় তা-বড় ‘দিদাবর’ সে ‘চ্যমনে’ কস্মিনকালেও পদার্পণ করেননি, দেখলেই বোঝা যায়! কোন্ এক নাম-না-জানা আলিওয়ালের কবর।

—‘বহ্ কৌন থা? ক্যা জানে! কোই ছোটা-মোটা জায়গীদার, মনসবদার, ইয়ে সিপাহসালার হোগা সায়েদ। মুঝে না মালুম।’—স্থানীয় লোকটা পাশ কাটাবে।

* * *

আজ্ঞে না, মীর মহম্মদ আলিওয়াল খাঁর হক্-হদিশ্ আমিও জানি না। অতি ভাসাভাসা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যকে মূলধন করে, মনগড়া সংলাপ ফেঁদে এ কিস্‌সা পয়দা করেছি। তবু বিশ্বাস করুন, ঐতিহাসিক লেখকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্মণ-গণ্ডির বাইরে আমি একবারও পদার্পণ করিনি। শের শাহ শূর অথবা তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ আলিওয়ালের ইতিহাসকে আমি সজ্ঞানে বিকৃত করিনি একতিল।

অদ্বিতীয় কুৎবমিনারের মূল স্থপতিবিদ কোন হতভাগ্য—সে কথা জানিয়ে কুৎবের গায়ে কোনো ফলক লাগাবার কথা খেয়াল হয়নি আইবক-ইলতুৎমিস-আলাউদ্দীনের ; বুলন্দ্ দরওয়াজার ঐ আকাশচুম্বী দার্ঢ্য জন্ম নিয়েছিল কোন্ ‘বিশ্রুত-বিস্মৃতকীর্তি’ স্থপতির ধ্যানে, সে কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি জনদরদী স্বয়ং আকবর বাদশাহ্ তাঁর দু-হাজার এক শ’ ছিয়াশি পৃষ্ঠার জীবনীতে। তাজমহলের নির্মাণ-ইতিহাসে শুধু লেখা আছে—‘কাগজ নক্‌শায়ে মক্‌বারা হর এক উস্তাদ মেঁ আআভর্দান্দ। চুন-এক নক্‌শা পসন্দ্ আলিজাঁ হজরৎ!’—ব্যস! ঐটুকুই! গ্লোবাল-টেন্ডারে সাড়া দিতে কাবুল-কান্দাহার-ইরান-তুরাণ থেকে হরেক উস্তাদ্ নকশার টেন্ডার দাখিল করলেন, এবং তার ভিতর বেছে-বেছে একটি বিশেষ নক্‌শা আলিজাঁ-হজরত অর্থাৎ কিনা শাহজাহাঁ, পছন্দ করলেন। কিন্তু কার নক্‌শা? কে দেখেছিল ধ্যানের দৃষ্টিতে সেই মর্মর-স্বপ্ন—সবার আগে, সবার অগোচরে? কাগজের-বুকে-ছকা কোন্ হতভাগ্যের নক্‌শা আলিজা হজরত পসন্দ করলেন? সেই মীর মহম্মদ গাজী মিঞা ‘অ্যানন্’-এর নামটা ইতিহাসে লিখে রাখতে ভুল হয়ে গেল বেগম-বিরহাতুর-শাহজাহাঁর!

এই যখন দুখিনী ভারতজননীর সহস্রাব্দীব্যাপী ললাট-লিখন, তখন আপনার মনে হতে পারে—সেই জননীকণ্ঠে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের শতনরী দুলিয়ে দিয়েছেন বলেই নয়, বিহারের জনপদপ্রান্তে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মক্‌বারাটি বানিয়ে শিল্পের উপর শিল্পীর মর্যাদা স্বীকার করেছেন বলেই শের শাহ্ শূর ভারতেতিহাসে অনন্য, একমাত্র ব্যতিক্রম!

বড়া মুশ্‌কিল সে হোতি হ্যয় চ্যমন্‌মে দিদাবর পয়দা!

কণ্টকগুল্মাবৃত সেই ভগ্নস্তূপের পূতিগন্ধময় পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোনো অস্তসূর্যউদ্ভাসিত সন্ধ্যায় হঠাৎ হয়তো আপনার মনে হবে—না, শাহজাঁহা নয়, একমাত্র শেরশাহ্ শূরের প্রতিই ঐ পংক্তিটা সুপ্রযুক্ত :

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!'

তথ্য ও নির্দেশনা ঃ

(1) পৃঃ ২৬৪ শের শাহ্-র প্রামাণিক জীবনীকার ডঃ কানুনগোর মতে ফরিদের জন্ম 1486 কিন্তু শ্রীপরমাত্মা সারণ এ মত অস্বীকার করে প্রমাণ করেছেন [The date and place of Sher Shah's Birth', J. B. O. R. S. 1934, P. 108-22] যে, ফরিদের জন্ম 1472 খ্রিস্টাব্দে। রমেশচন্দ্র এ মত স্বীকার করেন।

(2) পৃঃ ২৬৪ ফরিদের গর্ভধারিণীর নাম ইতিহাসে খুঁজে পাইনি। না পাওয়াই স্বাভাবিক—জাহাঙ্গীর তাঁর অতবড় আত্মজীবনীতে মায়ের নামটা লিখে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। স্ত্রীলোক ও স্থপতিকে সে যুগ সমদৃষ্টিতে দেখত। স্থপতি ইমারৎ পয়দা করে, স্ত্রী করে সন্তান। তাদের নাম লিখে রাখা নিষ্প্রয়োজন। কাহিনীর খাতিরে 'সরিফা' ও 'কানিজা' নাম দুটি নিয়েছি। 'সরিফা' মানে সৎ-বংশজাতা, 'কানিজা' তার বিপরীতার্থবোধক।

(3) পৃঃ ২৬৪ **Advanced History of India**, R. C. Mazumdar, p. 435.

(4) পৃঃ ২৬৪ Ibid, P. 436

(5) পৃঃ ২৬৪ আতালিখ — গৃহশিক্ষক — Private tutor.

(6) পৃঃ ২৬৪ নাহর — ব্যাঘ্র

(7) পৃঃ ২৬৫ সুড়ঙ্ — pass. গিরিপথ

(8) পৃঃ ২৬৬ রাহি — পান্থশালার আশ্রয়গ্রহণকারী

(9) পৃঃ ২৬৭ সন্দৌখ্ — কবর থাকে মাটির নিচে তার একটি হুবহু নকল থাকে উপরে,—তাজমহলে দেখে থাকবেন—তাকেই বলে 'সন্দৌখ্'।

(10) পৃঃ ২৬৮ **History of India**, Elliot, Vol III, P. 375-76.

(11) পৃঃ ২৬৯ আবুল ফজলের মতে (আকবরনামা Part I, 343) এই মহিষী হাজী বেগম, যিনি 'হুমায়ুন্‌স্ টুম্ব' বানিয়েছেন দিল্লিতে ; অথচ ডক্টর কানুনগোর মতে তিনি বেগা বেগম। স্মর্তব্য, হুমায়ুন তখনও আকবর-জননীকে বিবাহ্ করেননি।

(12) পৃঃ ২৬৯ **Advanced History of India**, R. C. Mazumdar.

(13) পৃঃ ২৬৯ প্রসঙ্গত : ইতিহাসের এদুটি কৌতুক কিন্তু প্রায় সমকালীন। মিকেলাঞ্জেলোকে পোপ সেন্ট পিটার্স সমাপ্ত করতে বলেন 1538 খ্রিস্টাব্দে। শের শাহ প্রয়াত হন 1548!

(14) পৃঃ ২৭০ 'তুর্কী-দেশের সুন্দরী সে, আমার সাকী সিরাজী!
যাহার লাগি বাওরা হল হাজার হাজী কাজী,
যার কপোলের ভ্রমর-কালো তিল-এর তরে বান্দা
সমরকন্দ্ ও বুকায়ারাও বিকিয়ে দিতে খুব্ রাজী।।' (হাফিজ)

(15) পৃঃ ২৭৬ **Indian Architecture, Islamic Period,** Percy Brown.

(16) পৃঃ ২৭৯ 'হিন্দুস্থানের অন্তরাত্মার প্রকৃত পরিচয় যখন কেউ পায় তখন তার নাওয়া-খাওয়া ছুটে যায়। সুপ্তোত্থিত মানুষটা উন্মাদ হয়ে যায়!'

(17) পৃঃ ২৭৮ হাজার বছর ধরে নার্গিস/অনিন্দ্য-সৌন্দর্য-পশরার উপর কাঁদছে। (ও জানে) এ বাগিচায় দরদী সমঝদার/এক অতি সুদুর্লভ ব্যতিক্রম।।

হামিদা-রূপমতী মাহম্ আঙ্গা

আকবর, মুঘল জমানা

[1540—1562 খ্রিঃ]



মুঘল জমানার এই কাহিনীটি *'লা-জবাব দেহ্‌লী—অপরূপা আগ্রা'* থেকে সংকলিত। যদিও কাহিনীর নায়ক জালালউদ্দিন আকবর বাদশা, কিন্তু সে অর্থে নায়িকা অনুপস্থিত। তিনজন ইতিহাস উপেক্ষিতা মহিমময়ী মহিলার কথা এখানে বলতে চেয়েছি। তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

তথ্য ও নির্দেশনা :

(1) পৃঃ ২৮৩ **আকবরনামা,** ইং অনুবাদ Vol. I, P. 375.

(2) পৃঃ ২৮৫ **আইন-ই-আকবরী,** ইং অনুবাদ Vol. I, PP. 253-268.

(3) পৃঃ ২৮৫ **আইন-ই-আকবরী,** ইং অনুবাদ Vol I, PP. 484-485

(4) পৃঃ ২৮৬ '**Akbar the Great**, by Dr. Srivastava' Vol I, P. 41

(5) পৃঃ ২৮৭ '**Muntakhab ut Tauwarikh**', by Abdul Quadir, Badayni, (Tr) Vol III, PP. 47-48

(6) পৃঃ ২৮৯ "When the expecting Khan removed the veil from her face he found her dead."—Firista (Tr) Vol II, p 274

(7) পৃঃ ২৯০ **আইন-ই-আকবরী** (ইং অনুবাদ) Vol II, pp 159-60.

(8) পৃঃ ২৯২ 'Delhi & Its Neighbourhood,' by Y. D. Sharma, Archaeological Survey of India Publication, New Delhi p. 119

বাদশাহী-জমানায় বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল দু'-জাতের : রাজনৈতিক প্রয়োজনে অথবা পুত্রার্থে, মানে উত্তরাধিকারার্থে। জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে বিবাহিত ধর্মপত্নী নিতান্ত 'অধিকন্তু ন দোষায়'। কারণ হারেমে গুদামজাত সে উপকরণ পর্যাপ্ত। এই বাতাবরণে এক বিচিত্র ব্যতিক্রম আকবর-জননী। তিনি মহব্বতে দিওয়ানা হয়ে সাদি করেছিলেন।

হুমায়ুনকে তখন 'শের'-এ তাড়া করেছে! বাঘ-মারা বাঘ! শের খাঁর হস্তে পরাজিত বাবুর-তনয় এসে তাঁবু গাড়লেন সিন্ধু নদের তীরের এক অখ্যাত গ্রাম : 'রোহ্‌রি'-তে। হুমায়ুনের দুই বেগম—বেগা বেগম ও সারাহ্ বেগম তখনো শের খাঁর অবরোধে সসম্মানে বন্দিনী ; হুমায়ুন তখনো জানেন না, যে, শের তাঁদের যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে নিজের হারেমে অতিথিসেবা করছেন ; অচিরেই তিনি পূর্ণমর্যাদায় তাঁদের প্রত্যর্পণ করবেন।

সৈন্যসামন্তদের সেই রোহ্‌রি-গ্রামের অস্থায়ী ছাউনিতে রেখে একজনমাত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন অশ্বপৃষ্ঠে ছুটলেন : 'পাতাড়'-এ। সিন্ধুনদের অববাহিকা ধরে প্রায় একশ মাইল দক্ষিণে। সেখানে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা মীর্জা হিন্দালের আস্তানা—যে ভাইকে দিল্লীশ্বর হিসাবে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে। এবং যে-ভাই তাঁর চরম বিপদের দিনে মুখ ফিরিয়ে ছিল। সেখানেই হিন্দালের ছাউনিতে চারচক্ষুর প্রথম মিলন। হুমায়ুনের বয়স তখন তেত্রিশ পার হয়েছে আর হামিদাবানু বেগম মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোরী।

বানু বোমের আব্বাজান মীর বাবা দোস্ত্ ছিলেন হিন্দালের একজন উচ্চপদস্থ সিপাহ্-সালার, জাতি ইরানী। হুমায়ুন আকৃষ্ট হলেন অস্ফুট পদ্মকোরকের মতো ওই অনাঘ্রাতা ইরানী কিশোরীর সৌন্দর্যে। বানু বেগমও মুগ্ধ হলেন এই প্রায়-প্রৌঢ় পরাজিত প্রাক্তন সুলতানকে দেখে। মীর বাবা দোস্ত এবং তাঁর পত্নীর ঘোরতর আপত্তি ছিল। থাকতেই পারে—হুমায়ুন পরাজিত, যে কোনো মুহূর্তে শেরনিযুক্ত হসিসিয়ুন (গুপ্তঘাতক) তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাছাড়া দুলহন-দুলহার বয়েসেও যথেষ্ট ফারাক কিন্তু দেখা গেল দুজনেই তাঁদের সঙ্কল্পে সুদৃঢ়।

মুসলিম বিবাহে ধর্মত পিতামাতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা অনুমতি অবান্তর—'মিঞা বিবি রাজি, তো ক্যা করেগা কাজী?' হুমায়ুন অনতিবিলম্বেই বানু বেগমকে বিবাহ করলেন (14 Aug, 1541)। ফলে, হিন্দালের আশ্রয় ত্যাগ করতে হল তাঁকে।

প্রায় বছরখানেক হুমায়ুন মিথ্যা আশ্বাসের মোহে মাড়ওয়ার-যোধপুরে ছোটাছুটি করলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গকে দোষ দেওয়াও চলে না ;তক্ত-তাউসে আসীন হয়েই শেরশাহ্ এমন দৃঢ় মুষ্টিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন যে, সমগ্র রাজপুতানা সমঝে নিয়েছিল তখন হুমায়ুনকে সমর্থন করা হবে নিত্যন্ত বুড়বকি। হুমায়ুনের অনুগামীরা একে একে সরে পড়তে থাকে। যে কোনো দিন তিনি শেরের গুপ্ত হসিসিয়ুনের হাতে খুন হয়ে যেতে পারেন। পূর্ণগর্ভা বেগম সাহেবাকে নিয়ে হুমায়ুন যেদিন অমরকোটে হাজির হলেন সেদিন তামাম হিন্দুস্থানের প্রাক্তন মালিকের সহচর মাত্র নয়জন।' অমরকোটের রাজা সংবাদ পেলেন, বাবুর বাদশাহ্‌র পুত্রবধূ পান্থশালায় প্রসববেদনায় কাতর। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের আহ্বান জানালেন দুর্গমধ্যে। শেরশাহ্-র ভয়ে অমাত্যবর্গ নিষেধ করেছিল। হিন্দু রাজা কর্ণপাত করেননি। সেখানেই হামিদা বানু বেগমের গর্ভে জন্ম নিলেন ভারতেতিহাসের সেই বিস্ময়কর পুরুষটি : *জালালুদ্দিন আকবর!*

হামিদা বানু বেগম পরবর্তীকালে আকবরের হারেমে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছেন। হুমায়ুনের অপরা মহিষী হাজী বেগম ছিলেন একটু আত্মনিমগ্না। কিন্তু এ সব কথা বলার পূর্বে প্রবেশ্য আকবর জমানায় হারেম-ভুক্ত কয়েকজন প্রধানা মহিলার হক-হদিশ্ এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই। ইতিহাসে মহিলাবৃন্দ স্বতই উপেক্ষিতা। জাহাঙ্গীর তাঁর সুদীর্ঘ আত্মজীবনীতে গর্ভধারিণী জননীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। জাহাঙ্গীরের পূর্বে আকবর বাদশাহ্র যে যমজ-সন্তান হয়েছিল — যারা মাত্র একমাস, বয়সে মারা না গেলে হয়তো হিন্দুস্থানের তক্ত তাউসে আসীন হত, তারা যে কার গর্ভজাত, তার হদিশ্ আমি আজও সঠিকভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। ফতেপুর-সিক্রি ও আগ্রার জেনানা মহলে ইমারত গুলিকে সনাক্ত করার প্রয়োজনে ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি এবং বারে বারে বুড়বক্ বনেছি। 'মরিয়াম' নাম দুজনের—আকবরের মা ও পত্নী : ফলে গলতি হতেই পারে। আপনারাও যাতে আমার মতো বেওকুফ্ না বনেন, তাই আকবরের জেনানা মহলের কুশীলবদের প্রথমেই শনাক্ত করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

হাজী বেগম : হুমায়ুনের মহিষী, যিনি শেরশাহ্-র হাতে বন্দী ও পরে মুক্ত হন। হুমায়ুন সমাধি এঁরই স্ত্রীধনে নির্মিত। পরে ইনি হজ করেন। মক্কা থেকে ফিরে 1582 সালে মারা যান। আকবর এঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।

বেগা বেগম : হুমায়ুনের অপরা মহিষী। হুমায়ুন সমাধিতে এঁর কবর।

হামিদা বানু বেগম : মীর বাবা দোস্ত ওরফে আলি আকবর জামির কন্যা এবং আকবরের গর্ভধারিণী জননী। হুমায়ুন মক্‌বারায় এঁর সমাধি। হারেমে তাঁর পরিচয় : 'মরিয়াম মকানী' (যীশুজননীর সমতুল্য)। ফতেপুর-সিক্রিতে 'সুন্‌হারা মকামে' থাকতেন। আকবরের মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে মারা যান।

গুলবদন বেগম : বাবুরের কন্যা, অর্থাৎ আকবরের পিসি। হামিদার চেয়ে দু-চার বছরের বড়। হামিদার অন্তরঙ্গ বান্ধবী, একই সঙ্গে থাকতেন। ফার্সিতে আলিম, অত্যন্ত বিদূষী। হুমায়ুনের প্রামাণিক জীবনী হুমায়ুন-নামা রচনা করেছেন। 'মিসেস্ বিভারিজকৃত তার অনুবাদ আছে। 'সুন্‌হারা মকামে' প্রায়শই থাকতেন। বিরাশী বছর বয়সে, আকবরের মৃত্যুর মাত্র দু-বছর পূর্বে এঁর মৃত্যু হয়।

রুখেয়া বেগম : হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দালের কন্যা। আকবরের প্রথমা স্ত্রী। বিবাহ : 1551। লেখকের অনুমানে ফতেপুর-সিক্রিতে তথাকথিত বীরবল-প্রাসাদে থাকতেন। তার পূর্বে, অর্থাৎ ঐ মহল তৈরী হবার পূর্বে, 'তুর্কি-সুলতানা' মহলে থাকতেন। নিঃসন্তানা। শাহ্‌জাহাঁকে মানুষ করেন।

সালিমা বেগম : আবদাল্লা খান মুগল (যিনি ছিলেন হুমায়ুনভ্রাতা কামরানের শ্যালক)-এর কন্যা। আকবরের দ্বিতীয়া মহিষী। বিবাহ : 1557। গ্রন্থকারের অনুমান, ইনিও বীরবল-প্রাসাদের অপরাংশে থাকতেন। ইনি মুরাদের জননী।

মরিয়াম জামানী : আকবরের প্রধানা মহিষী। বিবাহ : 1562 ; অম্বররাজ ভারমলের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী জননী। কন্যার পিতামাতার উদ্যোগে কোনো হিন্দু কুমারীর এই প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান বিবাহ। ফতেপুর-সিক্রিতে যোধপুরী প্যালেসে থাকতেন।

সালিমা সুলতানা : হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী, ফার্সী-কবি। কয়েকটি ফার্সি কাব্যের রচয়িতা।

আকবর কয়টি বিবাহ করেছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সকলে একমত নন। কেউ বলেন সাত, কেউ বলেন বেশি। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের চারের বেশি বিবাহ করার কানুন তখনো খুব বেশি জোরদার ছিল না—আদৌ সে নির্দেশ তখন চালু হয়েছে কিনা জানি না। প্রধানা কয়েকজনের কথাই শুধু বলা হল এখানে।

কিন্তু আকবরকে তার খুড়িমা, সুলতানা বেগমের (হুমায়ুন-ভ্রাতা আশকারির স্ত্রী) হেপাজতে রেখে হামিদাবানু তাঁর স্বামীর সঙ্গে পলাতকজীবনে অংশগ্রহণ করেন। সেই শৈশবকাল থেকেই আকবরের

জীবনে যুক্ত হয়ে যান তিনজন ব্যক্তি, যাঁদের প্রভাব পড়েছে আকবরের জীবনে এবং স্থাপত্যে। এঁদের দুজন হচ্ছেন আকবরের ধাইমা ; যাঁদের বুকের দুধ খেয়ে আকবর মানুষ হয়েছিলেন ; মাহম আঙ্গা ও জীজী আঙ্গা। তৃতীয়জন মীর সামস্উদ্দীন গজনভি ;—জীজীর স্বামী, যাঁকে ইতিহাসকারেরা তাঁর উপাধি 'আৎকা খান্' নামে উল্লেখ করে গেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, মাহম আঙ্গার পুত্রের নাম ; আধম খান, খাঁর সমাধিসৌধের কথা পূর্ববর্তী কাহিনীতে আলোচনা করা হয়েছে।

শিশু আকবরের জীবনের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব তথ্য সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রামাণিক বিস্তারিত ইতিহাসে প্রাপ্তব্য। আমাদের এ কাহিনীতে আৎকা খান এবং আধম খানের প্রসঙ্গে অনেক কথা বলতে হয়ে। তাই দুষ্প্রাপ্য ইতিহাস থেকে সংকলিত এই তথ্যগুলি এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। হয়তো তা আপনাদের রসাস্বাদনের সহায়ক হতে পারে।

শিশু আকবর এতদিনে আশ্কারি পরিবার থেকে কামরানের হেপাজতে এসেছেন। তখন তার বয়স মাত্র চার। হঠাৎ সংবাদ এল কাবুল যুদ্ধে হুমায়ুন নাকি নিহত হয়েছেন। কামরান তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে এলেন হুমায়ুনের যা-কিছু পার্থিব সম্পত্তি তা হাতিয়ে নিতে হয়। শিশু আকবরকে বন্দী করে কামরান ঘোষণা করলেন—তিনিই বাবুর বাদশাহ্র অবশিষ্ট সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ফলে হিন্দুস্থানের তখত্-তাউসের হক্ হিস্যাদার! বাস্তবে হুমায়ুন আহত হয়েছিলেন মাত্র ; মাস-দুয়েকের ভিতর সুস্থ হয়ে সসৈন্য এসে উপস্থিত হলেন। কামরানের কিল্লা আক্রমণের উদ্যোগ করতেই নজরে পড়ল দুর্গপ্রাকারের সর্বোচ্চস্থানে দড়ি-দিয়ে বাঁধা আছে একটি শিশু, আর তাকে এক হাতে জাপ্টে ধরে অপর হাত নেড়ে নেড়ে একটি মহিলা কী-যেন চিৎকার করে বলছে। ইতিপূর্বেই কামান দাগার হুকুম হয়েছিল। হুমায়ুন ছুটে গিয়ে কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। অগ্নিস্পর্শে কামান গর্জে উঠল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বলা যায়, প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষিত হল শিশু আকবরের প্রাণ। আকবরকে আড়াল করে এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যে মহিলা কামান দাগতে নিষেধ করেছিলেন তিনি ঐ শিশুর ধাইমা : মাহম আঙ্গা।[2]

তবু যুদ্ধ হল। 'ও কুমীর তোর জল্কে নেমেছি' খেলায় এবারও কামরানের হার হল। জান-মান নিয়ে তিনি খিড়কি দরজা দিয়ে পালাবার পর হুমায়ুন কিল্লা ফতে করলেন।

এর পরেই ঘটল দ্বিতীয় একটি কৌতুককর ঘটনা। আকবর ও তার মায়ের পুনর্মিলন।

মাত্র একবছর বয়সে আকবর মাকে ছেড়ে অন্যত্র মানুষ। হারেমের মহিলাবৃন্দের কৌতূহল হল জানতে যে, আকবর তার অদেখা মাকে ঠিকমতো চিনে নিতে পারে কিনা। আবুল ফজল বলেছেন[3], হারেমের একটি কামরায় দশ পনের জন সমবয়সী ঔরৎ প্রায় একই রকম সাজ-পোশাক পরে বসেছিলেন। হামিদা বানুর মাথায় তাজ বা পরিধানে অন্য কিছু ছিল না, যাতে তাঁকে হুমায়ুন-মহিষী বলে সনাক্ত করা যায়। মাহম আঙ্গা শিশু আকবরকে হাত ধরে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বললেন, ওই ওঁদের মধ্যে তোমার আম্মাজান বসে আছেন, খুঁজে নাও দিকিন, খোকন!

কঠিন পরীক্ষা! চার বছরের শিশু, মাকে খুইয়েছে মাত্র এক-বছর বয়েসে। তসবির দেখেনি কখনো, গল্প শুনেছে মাত্র। অথচ একঘর মহিলার সম্মুখে নিজের মাকে না চিনতে পারাও যে বড় লজ্জার—সে বোধটুকুও হয়েছে তার। ডাগর দুটি চোখ মেলে বালক একবার দেখে নিল গোল হয়ে বসা মহিলাবৃন্দকে। তারপর ম্যাগ্নেটিক-কম্পাস যেমন দুল্তে দুল্তে এক সময় থেমে যায়, ঠিক সেইভাবে স্থির লক্ষ্যে তাকালো একটি অসামান্যা সুন্দরীর দিকে। এক ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে। কাঁচুলির উপর মুখটা চেপে ধরে বল্লে, তুমিই আমার মা! তাই না, মা?

বানু বেগম ওর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন, কেমন করে চিন্লি খোকা?

কেমন করে চিনলেন আকবর? আবুল ফজলের ব্যাখ্যা : এ হচ্ছে ভবিষ্যৎ বাদশা, দীন-ইলাহীর হবু প্রবর্তক জালালউদ্দীন আকবরের 'গুংগা' ঘোষণা। তিনি এতই অভিভূত যে, তাঁর জীবনীর ঐ

পৃষ্ঠায় একটি ছবিও যোগ করেছেন। ঘটনা যদি সত্য হয়, তা হলে এটাকে অলৌকিক বলে মনে করার কিছু নেই। পোশাক-পরিচ্ছদ একরকম হলেও পুত্র স্নেহবঞ্চিতা জননীর অন্তরেও যে চৌম্বকশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা কি তাঁর মুখে রেখাপাত করেনি?

শেরশাহ্-র অযোগ্য বংশধরদের হাত থেকে হুমায়ুন তাঁর হৃতরাজ্য উদ্ধার করে যখন দিল্লি পুনরায় প্রবেশ করলেন(July, 1555) তখন আকবরের বয়স তের। আর যেদিন পুরানা কিল্লায় সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেলেন সে সময় আকবর বৈরাম খাঁর হেপাজতে পাঞ্জাবে। হুমায়ুন যে মারা গেছেন এ খবর সঙ্গোপনে রাখা হল। দ্রুতগামী গুপ্তচর ছুটল বৈরামকে গোপনে সংবাদ দিতে ; আর প্রতিদিন সকালে পুরানা কিল্লার দেওয়ানী-আমের ঝরোকায় তাজ পরে, জোব্বা জড়িয়ে কৃত্রিম হুমায়ুন প্রজাবৃন্দকে আশীর্বাদ করে গেলেন। লোকটার নাম মোল্লা বক্শি—তার একমাত্র গুণ, তাকে দেখতে হুবহু হুমায়ুনের মতো!

বৈরাম খাঁ এক অসামান্য চরিত্র। আকবরের প্রথম জীবনের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1556) আদিলশাহ্ শূরের মন্ত্রী হঠাৎ-সুলতান হিমুকে পরাস্ত করে বৈরামই আকবরের বাদশাহীর সূচনা করেন। তিনিই তাঁর অভিষেকের যাবতীয় আয়োজন করেন।

আকবর তের-চৌদ্দ বছর বয়সে বাদ্শা হলেন। বৈরাম তাঁর অভিভাবক। কিন্তু বছর পাঁচেকের মধ্যেই বৈরামের সঙ্গে কিশোর আকবরের মতপার্থক্য দেখা দিল। বিরোধের নয়টি হেতু দেখিয়েছেন আকবরজমানার প্রামাণিক ইতিহাসকার।[৮] কিন্তু সে সব ইতিহাস আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আকবর বৈরামকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে মক্কা-তীর্থে রওনা হবার পরামর্শ দিলেন। ঐ পত্রেও তিনি বৈরামকে 'খান্-বাবা' বলে পিতৃ-সম্বোধন করেছেন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। বৈরাম স্বীকৃত হয়ে মক্কা যাওয়ার আয়োজন করতে থাকেন ; হঠাৎ সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে বৈরামের মত বদলায় এবং তিনি বিদ্রোহ করে বসেন। আকবর এ বিদ্রোহ দমন করে বৈরামকে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পুনরায় সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মক্কায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ভাগ্যবশত মক্কা যাবার পথে আততায়ীর ছুরিকায় বৈরাম নিহত হন। এ কাজে আকবরের কোনো হাত ছিল না। বরং তিনি বৈরামের স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে আনেন। বৈরাম পুত্রই সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবদুর রহিম খান্-ই খানান্, যিনি বাবুরের চুগতাই তুর্কীতে লেখা আত্মজীবনী সহজবোধ্য ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং যাঁর সমাধি আমরা খুঁটিয়ে দেখব একটি বিশেষ কারণে।

বৈরাম-বিতাড়ন নাটকের নেপথ্যে যে চক্রান্ত হয়েছিল তার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ দুটি চরিত্র আমাদের অপরিচিত নন—মাহম আঙ্গা এবং তাঁর পুত্র আধম খান। মাহম আঙ্গা সম্রাটকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন ; তাঁর বিশ্বস্ততার বিষয় কেউ কোনোদিন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল—বাদশাহী রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার উগ্র বাসনা। নিশ্চয়ই তার বনিয়াদে ছিল উচ্চাশা ; কিন্তু তা আকবরকে অতিক্রম করে নয়। অপরপক্ষে মাহিম আঙ্গার পুত্র আধম খান ছিল বেপরোয়া, মুশ্কিল-পসন্দ্, অসম সাহসিক যোদ্ধা অথচ ইন্দ্রিয়াসক্ত, নীতিজ্ঞানহীন এবং নিষ্ঠুর। তাঁদের প্রসঙ্গে এখনই আসব।

ইতোমধ্যে—অর্থাৎ বৈরাম-বিতাড়নের পূর্বযুগেই একবার আকবর যমুনা বেয়ে বজরা চেপে এসে হাজির হলেন আগ্রায় (Oct, 1558)। তখনও আগ্রা-কিল্লার পয়দা হয়নি। উনি এসে উঠলেন সিকান্দার লোদী নির্মিত 'বাদলগড়' দুর্গে। এখান থেকেই তিনি গোয়ালিয়র, মালোয়া, রণথম্ভোর প্রভৃতি অভিযানের আয়োজন করেন।

বৈরামের বিদ্রোহের সময় আকবরকে বাধ্য হয়ে দিল্লিতে ফিরে আসতে হয়। তিন-চার জনকে উনি পর পর প্রধানসচিব নিযুক্ত করলেন ; এমন কি স্বয়ং মাহম আঙ্গাকেও কিছুদিন, যৌথভাবে। কিন্তু

মনোমত হল না। বৈরামের শূন্যস্থান পূর্ণ করবার মতো উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন। মাহম আঙ্গা চেয়েছিলেন, আকবর তাঁর পুত্র আধম খাঁকে ঐ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করুন। কিন্তু আকবর ঐ বে-দরদী জঙ্গী মানুষটির হাতে তামাম হিন্দুস্থানের শাসনদায়িত্ব দিতে স্বীকৃত হলেন না। পরিবর্তে জীজী আঙ্গার স্বামী গজ্‌নবীকে করলেন 'আৎকা খান' অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারি। আধমকেও বঞ্চিত করলেন না তা বলে। তাঁকে সেনাপতি করে পাঠিয়ে দিলেন মালোয়া জয় করতে।

মালোয়ার তদানীন্তন অধিপতি বাজ বাহাদুর সে আমলের হিন্দুস্থানে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। শৌর্য-বীর্যের জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারও কারও মতে সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের তিনি পূর্ব-সূরী—এমনই ভারত-বিখ্যাত সুযশ ছিল তাঁর সঙ্গীত জগতে। আকবরী দরবারে তখনও সঙ্গীত প্রবেশ করেনি, তানসেন অনাগত, সেই প্রাক-তান্‌সেনী জমানায় বাজ বাহাদুর গীতভারতীর বরপুত্র। তাঁর দরবারে সেনাপতির চেয়ে সঙ্গীতজ্ঞের কদর বেশি। আর সবার চেয়ে খ্যাতি ছিল এক অসামান্যা বাইজির : রূপমতী!

অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী এবং অসামান্যা গায়িকা। বাজ বাহাদুর নাকি তার মহব্বতে দিওয়ানা। বাইজি কিন্তু হারেমে থাকতে রাজি হয়নি ; নগরপ্রান্তের নির্জন নদীতীরে নিভৃত মঞ্জিলে বাস করত সে। মধ্যরাত্রে সহসা সেখানে আবির্ভূত হতেন বাজ বাহাদুর, দরবারী-কানাড়া শুনবার বাসনা হলে ; অথবা শেষ রাত্রে—রামকেলীর আকর্ষণে। কারণটা বড়ই বিচিত্র—দুইজনেরই বিশ্বাস : বিরহ নাকি শুধু মহব্বতেরই নয়, সঙ্গীতেরও অন্যতম প্রধান উপজীব্য!

এ হেন কিন্নর রাজ্যে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে আবির্ভূত হল আধম খাঁ আর পীরমহম্মদ—যেন কুমোরের দোকানে জোড়া বলিবর্দ! বাজ বাহাদুর তানপুরা-বীণা-রবাবের ভিতর থেকে কোনোক্রমে খুঁজে বার করলেন তাঁর মরিচাধরা তলোয়ারখানা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ধন-দৌলত, ইমান-ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গেলেন খান্দেশের দিকে।

বিজয়োন্মত্ত আধম আর পীর মহম্মদ মালোয়ায় যে অকথ্য অত্যাচার চালালো, তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন দুজন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক।[5] বিজয়ী দুজন বসেছিল সুউচ্চ মঞ্চের উপর, আর হতভাগ্য মালোয়াবাসীদের সার দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল কুরবানি করতে। মৃত্যুভয়ে ভীত আর্ত নরনারীর চীৎকার শুনে ওরা দুজন হাসিমশ্‌করা করছিল। শেখ-সৈয়দদেরও নিষ্কৃতি মেলেনি।

আধম হুকুম জারি করে রেখেছিল—মুঘলসৈন্য মালোয়ার যৌবনবতীদের ইচ্ছামতো দখল করতে পারে, শুধু যদি রূপমতীকে জীবন্ত ধরতে পারা যায় তাহলে কেউ তার গাত্রস্পর্শ করবে না। তাকে পৌছে দিতে হবে স্বয়ং সিপাহসালারের শিবিরে।

হত্যা-উৎসব শেষ হল রাত্রির তৃতীয় যামে। ক্লান্ত অবসন্ন রক্তমাখা আধম শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছে, ঠিক তখনই এল জবর খবর : রূপমতীকে জিন্দা পাওয়া গেছে!

উৎসাহে চারপাইয়ের উপর উঠে বসল আধম : তব্‌ লাও বহ্‌ ছুকরিকো!

দুই মুঘলসৈন্য দুই বাহুমূল ধরে নিয়ে এল বন্দিনীকে। রূপমতীর ঘাঘ্‌রা ছিন্নভিন্ন, ওড়না খসে গেছে, কাঁচুলি স্থানচ্যুত। তার কপালে রক্তের ধারা। আধম অবাক বিস্ময়ে দেখছিল তাকে—একই অঙ্গে এত রূপ!

কে যেন বলেছিল—পানের পিক যখন ওর কণ্ঠনালী দিয়ে নামে তখন ঐ কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠ নাকি রক্তিম হয়ে ওঠে। আধমের মনে হল, কথাটা হয় তো মিছে নয়।

বন্দিনীকে সিপাহ্‌-সালারের সম্মুখে রেখে দুই সৈনিক কুর্নিশ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

শিবির নির্জন হলে নতনেত্র বন্দিনী তার হরিণ নয়ন দুটি তুলে একবার তাকালো সেনাপতির দিকে। সে দৃষ্টিতে মৃত্যুভয়ের আর্তি নেই কিন্তু। আধম বললে, তোমারই নাম রূপমতী?

প্রথামাফিক আদাব জানালো বাইজি। যার নীরব ভাষ্য : জী হাঁ, খোদাবন্দ্‌!

গোঁফে চাড়া দিয়ে আধম বললে, শোন বাইজি! বেয়াদবী আমার বিলকুল লা-পসন্দ্‌। রাত্রে যাকে আমার বিছানায় উঠে বসার অধিকার দিই তার সতীপনা আমার বরদাস্ত হয় না। বেচাল দেখলে তোমার ঐ কাঁচুলী-খসা বুকের উপত্যকায় এই ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না।—কিছু বুঝলে?

রূপমতী একটি কুর্নিশ করে অস্ফুটে বললে,

'বক্‌ৎল্‌-এ চুন মনীগর খাতিরৎ
খুশনূদ মী গরদদ্‌।
বজায়ঁ মিন্নৎ ওয়ালি টেঘ্‌-ই-তু দন্‌
আলুদ মী গরখূদ্‌।*

কিছু বুঝলেন?

আধম ফার্সী না জানে তা নয়, কিন্তু কাব্যমাধুর্য শিরস্ত্রাণ ভেদ করে ওর মগজে প্রবেশ করতে পারল না। বল্‌লে, সোজা ভাষায় বল, কী বল্‌তে চাও?

—সোজা ভাষায় তার অর্থ—আপনার শারীন্‌-জবানে আমি বে-হুঁস্‌! কিন্তু খোদাবন্দ্‌! আমি বাকিরা (অসূর্যম্পশ্যা কুমারী : vergin) নই, বাইজি, সুরৎ আর জওয়ানি নিয়েই আমার মহব্বতের বেসাতি। আর জানি গাইতে, নাচতে, সুর ও সুরার ভানুমতীতে বেহেস্ত্‌ পয়দা করতে! তাই আমি জানতে চাইছি—মুঘল সেনাপতির অভিরুচিটা কী জাতের? মালোয়া রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নটী রূপমতীকে তার স্বমহিমায় পেতে চান্‌, না কি রক্তমাখা একটা বিবস্ত্রা নারীদেহ ধর্ষণ করতে আপনি উৎগ্রীব?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো মরমানুষের মুখে এমন মর্মান্তিক স্পষ্টভাষ কখনো শোনেনি আধম। সবিস্ময়ে বললে, তুমি খুশ্‌-দিলে আমাকে গান শোনাবে? নাচ দেখাবে?

খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল রক্তক্ষয়ী নটী। বললে, এইমাত্র কী বললাম, শুনলেন না? আপনার খিদ্‌মদ্‌গারদের বলুন না নিয়ে আসতে—ঘুঙঘট, তানপুরা, বাঁয়া—আমি এই জঙ্গি ছাউনিতেই বেহেস্ত পায়দা করব!

আধম বললে, বহুৎ খুব! এখানে নয়। কাল সূর্যাস্তকালে তোমার মঞ্জিলে যাব, দেখব মেহ্‌মানকে কেমন আদর-আপ্যায়ন করতে পার। গান শুনব, নাচ দেখব, আর.....

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাদপূরণ করল বাইজি, সিরাজি পান করব, আর....

—আর?

আভূমি নত হয়ে আদাব জানাবার অছিলায় মুখ লুকিয়ে বাইজি অস্ফুটে বললে, আর পরখ্‌ করে দেখব, সেটা কী জিনিস, যা সিরাজির চেয়েও নেশা ধরায়!

বাঁকপটু বাইজির সঙ্গে রসালাপ দীর্ঘতর করার হিম্মত নেই বস্তুতান্ত্রিক অধম আধমের। প্রহরীকে ডেকে বললে, একে এর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে আয়। লেকিন হুঁশিয়ার, সেখান থেকে পালাতে না পারে।

পরদিন শোণিতপিচ্ছিল মালোয়ার রাজপথে ঘোড়া ছুটিয়ে মুঘল সেনাপতি এসে উপস্থিত হল বাইজির মঞ্জিলে। আজ আর তার জঙ্গীপোশাক নয়, সান্ধ্য অভিসারে সিপাহ্‌-সালারের জামদার আঙরাখায় আতরের সুবাস, মৌচ-এর প্রান্ত মোম দিয়ে পাকানো। দেউড়িতে যে প্রহরী ছিল সে এগিয়ে এসে ধরল ঘোড়ার লাগাম। বাঁদী চিরাগ-হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল অন্দর মহলে, মর্মর-অলিন্দের

---

* 'খুন-খারাবির রঙ-তামাশায় খেল্‌তে হোলী চাও?/খুশ্‌ হবে কি গুপ্তিখানা বিঁধলে বুক? দাও!
তোমার খুশেই হই খুশিয়াল, ভয় শুধু মোর দিলে/খুন-কলঙ্কে লিপ্ত হবে তোমার ছোরাটাও।।'

শেষ প্রান্তে রাজনটীর খাশ্-কামরায়। বিধ্বস্ত নগরীর কোন্ মস্‌জিদ-মিনার থেকে ভেসে আসছে শাম-ওয়াক্তের আজান—যেন প্রিয়জনবিরহে কোন হতভাগ্যের বিলাপধ্বনি। পূর্ববর্তিনী হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো ; কুর্নিশ করে নিঃশব্দে তুলে ধরল একটি দ্বারপথের রেশমী পর্দা। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয় ঘরের দিকে, যার অর্থ : তস্‌লিম রাখিয়ে।

সতর্ক আধম খাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলল : এমনটা হবার কথা নয়, এতটা আপ্যায়ন, এতটা অভ্যর্থনা! কোমরবন্ধ্ থেকে সমসেরখানা টেনে বার করল সে, দ্বারপথে মাথা গলানোর পূর্বে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় কী-যেন একটা বিস্ময় তার জন্য ওৎ পেতে প্রতীক্ষা করছে!

না, কক্ষের অভ্যন্তরে নেই কোনো প্রতীক্ষারত গুপ্তঘাতক। চৌকো সাদা-কালো মার্বেলের মেঝে, যেন দাবার ছক। নির্জন কক্ষের কেন্দ্রস্থলে চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড পালঙ্কে রূপমতী শায়িতা। তার ভঙ্গিটা দেখে চম্‌কে উঠ্‌ল আধম।

বাইজির সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখা আছে একটি আস্বচ্ছ রেশমী চীনাংশুক—তাজা-খুনের বরণ, ঠিক ঐ পশ্চিম আকাশটার মতো লালে লাল! যেন কাফন! পালঙ্কের ধারে পাশাপাশি দুটি মেজ। একটিতে ভৃঙ্গার, চষক, সিরাজি, তবক্-দেওয়া সুগন্ধী পান, রেকাবিতে একজোড়া গোড়ে মালা। সেটি মেহমানের প্রতীক্ষায় প্রহর গুন্‌ছে। পাশের মেজ-এ ঠেস্ দিয়ে রাখা আছে একটি প্রকাণ্ড তানপুরা, তার তারগুলো ছেঁড়া, আর সেই ছেঁড়া তারের গায়ে জড়ানো একখণ্ড তুলট-কাগজে মুক্তোর মতো তুঘ্‌রী হরফে কী-যেন লেখা!

বুঝতে আর বাকি রইল না কিছু। তবু হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিল আচ্ছাদনটা। রাজনর্তকীর মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার কোনো স্বাক্ষর নেই। সে মুখে বিশ্ববিজয়িনীর হাসি।।

তানপুরার তারে জড়ানো চিঠিখানা তুলে নিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না—এটা তার জন্য নয়, সেই পলাতক মালোয়া-রাজের উদ্দেশ্যে বাইজির আখেরিআর্জি—সেই যে পাগলটা অমন সুন্দরীকে হারেমজাত করেনি, বিরহ-সঙ্গীতের দোহাই পেড়ে!

কিন্তু আধম খাঁর নীতিজ্ঞান অত প্রখর নয়—পরের পত্র পড়তে তার সরম নেই কোনো। পড়ল, কিন্তু অর্থগ্রহণ হল না কিছু!

"তুম্‌কো দুনিয়াকে গমের্দর্দসে ফুরসৎ নহী,
সব্‌সে উলফত সহী মুঝ্‌সেহি মুহব্বৎ না সহী।
মৈঁ তুমহারি হুঁ, য়হী মেরে লিয়ে ক্যা কম হৈ?
তুম্ মেরে হো কে রহো, য়ে মেরী কিস্‌মৎ না সহী।
তুম্ মুঝে ভুল্‌ভি জাও, য়ে হক্ হৈ তুম্‌কো,
মেরী বাত ঔর হৈ, মৈঁ তো মুহব্বৎ কী হৈ।।*

---

* "দুনিয়াদারীর দুঃখদুর্দশা থেকে
তোমার কোনো ফুরসত এখন নেই।
সবার সঙ্গে তোমার প্রীতির-বন্ধন, শুধু আমিই বাদ।
আমি যে তোমার, এটাই তো আমার তরফে শেষ কথা,
তুমিও যে আমার হবে, এমনটা আশা করি কিসের জোরে?
আমাকে ভুলে যাওয়ার হক তোমার আছেই; আলবাৎ!
জানি, জানি তা।
আমার কথা স্বতন্ত্র!
আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবেসেছিলাম।"

মালোয়ার নৃশংস খিয়ানৎ-এর (বিশ্বাসঘাতকতা—ন্যস্ত দায়িত্বের অবহেলা করা অর্থে) কথা আকবর বাদ্‌শার কানে উঠ্‌ল। শুনে বাদ্‌শা সংক্ষেপে বললেন, বাহিনী সাজাও। আমি এখনই মালোয়া যাব।

শিউরে উঠ্‌ল মাহম আঙ্গা। আকবরকে সে চেনে। তারই বুকের দুধ খেয়ে আজ শিশু জালাল হিন্দুস্থানের শাহ্‌-য়েন-শাহ্‌! ক্ষুরধার-বুদ্ধি মাহম আঙ্গার। তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি সংবাদবহ প্রেরণ করল মালোয়ায়। নির্দেশ দিল পুত্রকে—এখন কী করতে হবে। আকবর মালোয়াতে উপস্থিত হতেই তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল আধম খাঁ। অপহৃত ধনদৌলত উজার করে ঢেলে দিল সম্রাটের চরণে।

আকবর বললেন, তোমার মা পুত্রহীন হবে—শুধু সেজন্যেই এ যাত্রা তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু মনে রেখ, এই শেষ বার! তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আগ্রা ফিরে যাবে। মালোয়ার শাসন-দায়িত্ব তোমার হাতে রাখতে পারব না।

এর পরেই আকবর হজরত খাজা মৈন্‌উদ্‌দীন চিস্তির দরগায় তীর্থ করতে যান। পথে রাজপুত কুলতিলক অম্বররাজ ভারমল প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সম্রাট সম্মত হলেন। তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অম্বর-কুঙারীর পাণিগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অম্বর রাজকন্যার ধর্মান্তরকরণ হয়নি। তিনি আজীবন হিন্দু দেবদেবীর পূর্জা-অর্চনা করেছেন। বোধকরি ইতিহাসে তিনিই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ মহিলা, যিনি মুসলমানের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু! বিবাহের পক্ষকালের মধ্যেই সম্রাট এক ফরমান জারী করে আদেশ করেন, যুদ্ধে বন্দী হিন্দুদের বলপূর্বক ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করা চলবে না ; পরাজিত সৈন্যদলের স্ত্রী-কন্যাদের উপর কোনো অত্যাচার করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ইতিহাস দেয়নি, আশা করব আপনারা দেবেন, প্রকৃত অধিকারীকেই। আমি এই মানবিক আদেশের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার কথা বলছি ; আকবরকে নয়, অম্বর-কুঙারীকে।

এর পরেই আগ্রা-কিল্লাতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা,[7] যা এত বিদ্যুদ্‌গতি যে, ইতিহাস তার কার্য কারণ সম্পর্কের ধরতাইটা ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেনি। আৎকা খানের উপর মাহম আঙ্গা এবং আধম খানের জাতক্রোধ ছিলই—বোধকরি আধম অনুমান করেছিল, তার মালোয়ার কীর্তিকাহিনী আর রূপমতীর কিস্‌সা ঐ আৎকাই সম্রাটের কানে তুলছে। তা সত্য হলেও অন্যায় নয়—সে কাজ মুখ্যসচিবের কর্তব্যভুক্ত। মোটকথা একদিন সকালে আৎকা খান যখন আগ্রা-কিল্‌লার সদর-দফতরখানায় বসে কাজ করছেন তখন দুর্বার বেগে দুই সহচরকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ আধম খাঁ এসে হাজির। আধম খাঁ সিপাহ্‌-সালার, তাই প্রহরীরা বাধা দেয়নি ; এমন কি দফতরের অন্যান্য কর্মচারী—মুনীম খাঁ. সিহারউদ্দীন প্রভৃতি সসম্মানে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পদমর্যাদায় আৎকা উচ্চতর ; ফলে গজ্‌নবী শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, গাত্রোত্থান করলেন না।

আধম তার সহচর কুশম্‌ উজ্‌বেককে কনুইয়ের এক গোঁত্তা মেরে বললে, কী দেখছিস বুড়বকের মতো? এই তো সেই বেইমান! কাজ হাসিল কর!

উজ্‌বেক বিনা বাক্যব্যয়ে তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল আৎকা খানের পাঁজরে। হায় হায় করে উঠল সবাই। যন্ত্রণার চেয়েও যেন বিস্ময়ের অভিব্যক্তিটা বেশি—বৃদ্ধ আৎকা খান টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন ; ঠিক তখনই কোষমুক্ত আধমের সামসের খানা আকাশে একটি ঈদের চাঁদ রচনা করল— আৎকা খাঁর দেহচ্যুত মস্তক ছিটকে গিয়ে পড়ল দফতরখানার পাষাণ-চত্বরে।

চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে এসেছে সবাই। আধম ঘুরে দাঁড়ালো। রক্তরাঙা আলা-ই-মুহলিখ্‌খানা

(মারাত্মক অস্ত্র) তুলল মাথার উপর। সন্ত্রস্ত প্রহরীর দল পিছিয়ে গেল এক এক পা। আধম লাফ দিয়ে নেমে এল নিচে ; রুদ্ধশ্বাসে ছুটল খাস্-মহলের দিকে। সম্রাট তখন হারেমে।

হাতিয়ারবন্দ্ সিপাহ্সালারকে ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে হারেমের খোজা প্রহরী নিজ বুদ্ধি বিবেচনামতো রুদ্ধ করে দিল প্রকাণ্ড সিং-দরওয়াজা। আধম তরবারীর আঘাত করল রুদ্ধ কবাটে ; ক্যারি খোল্ দো!

আকবর ছিলেন খোয়াবগাহ্-এ। সোরগোল শুনে এদিকেই আসছিলেন। কে একজন প্রহরী ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে, জাহাঁপনা! সিপাহ্সালার আধম খাঁ নে হামারা আৎকা খান্-সাবকো জান সে মার ডালা!

জান সে মার ডালা! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সম্রাট। উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন হারেমের নির্গমন দ্বারের দিকে। সেই যে খোজা প্রহরী সিং-দরওয়াজা রুদ্ধ করেছিল সেই লোকটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দরওয়াজায় পিঠ দিয়ে দু-দিকে দু হাত প্রসারিত করে রুখল সম্রাটকে। বজ্রাহত হয়ে গেলেন সম্রাট! সামান্য খোজাপ্রহরী আজ তাঁর পথ রোধ করতে চায়! এরা সব্বাই কি বিদ্রোহীদের দলে! হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি : তোর এত বড় স্পর্ধা! আমার পথ রুখ্ছিস্!

লোকটা আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে বল্লে, দীন্-দুনিয়ার মালেক! আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আপনি নিরস্ত্র!

কোমরবন্দ্ থেকে একটা বাঁকা ছুরি বার করে সে সম্রাটের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে। তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে তিন পা পিছিয়ে যায়, কুর্নিশ করতে করতে।

দ্বার খুলে বেরিয়েই মুখোমুখি হলেন আধম খাঁর। তার হাতে তখনো আৎকা খানের রক্তেরাঙা নাঙা তলোয়ার। সম্রাটের হাতে বিঘৎপ্রমাণ চোরা গোপ্তা। আধম একটা চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ল সম্রাটের উপর। ডান হাতে ধরা তলোয়ারটা সে কিন্তু ব্যবহার করেনি—শুধু বাঁ হাতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে শাহ্য়েন শাহের দক্ষিণ মণিবন্ধ! চীৎকার করে ওঠে লোকটা : সমস্ত ব্যাপারটা আগে তলিয়ে দেখুন জাহাঁপনা! আমার নামে আৎকা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

আধম খাঁর মায়ের যে অধিকার আছে, তার তা নেই—সম্রাটের গাত্রস্পর্শ করার! দুরন্ত ক্রোধে আকবর জ্ঞান হারালেন। দৈহিক শক্তি তাঁর অপরিসীম। মাত্র তের বছর বয়সে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে এক কোপে তিনি স্বহস্তে হিমুর মস্তক স্কন্ধচ্যুত করেছিলেন! এখন তিনি বিশ-বছর বয়সের নওজোয়ান। বাঁ-হাতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন আধম খাঁর দক্ষিণ মণিবন্ধে—হস্তচ্যুত হল হাতিয়ার। কিন্তু আধম খাঁও মত্তহস্তীর বল রাখে তার দেহে—ইতোমধ্যে হস্তচ্যুত হয়েছে আকবরের ডান হাতের সেই ছোরাখানাও! দুজনেই নিরস্ত্র! দুজনেই অসীম বলশালী। ওঁদের পায়ের কাছে পড়ে আছে একজোড়া হাতিয়ার। খণ্ডমুহূর্তের জন্য দুই রাজপুরুষ পরস্পরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন—যেন আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বমুহূর্ত। সহসা বিদ্যুদ্গতিতে আকবর মুষ্ট্যাঘাত করলেন আধমের চিবুকে। ভূতলশায়ী হল যেন ভূধর! তৎক্ষণাৎ তিন-চারজন প্রহরী ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতলশায়ী লোকটার উপর।

আকবর বজ্রনির্ঘোষে বললেন, ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাও ঐ পাঁচিলের উপর—ফেলে দাও নিচে!

দুর্গ-প্রাকার রাজপথ থেকে দশ মিটার উঁচু—পাক্কা তিনতলা। নিচে শাহ্ন-বাঁধানো পাথরের চত্বর! নিঃসন্দেহে—এ মৃত্যুদণ্ড!

আধম চীৎকার করে উঠল মৃত্যুভয়ে!

ইতিহাসকার আবুল ফজল দেখছি উল্লেখ করতে ভুলেছেন—আধমের সেই মৃত্যুভয়-জনিত আর্তির সঙ্গে মালোয়াবাসীর মৃত্যুভয়-জনিত চীৎকারের কোনো ধ্বনিসাদৃশ্য ছিল কিনা!

মুহূর্তমধ্যে দুর্গ-প্রাকারের কুঞ্জর (প্যারাপেট) অন্তরালে অবলুপ্ত হল আধম খাঁর দোদুল্যমান দেহ।

আকবর কুৎব মিনারের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন বাহুবদ্ধবক্ষে। যে প্রহরীটা আৎকা খাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রথমে জানিয়েছিল, তাঁকে বললেন ঝুঁকে পড়ে দেখতে। প্রশ্ন করলেন, আভি তক্ জিন্দা হ্যয়, ক্যা?

লোকটা কুর্নিশ করে বললে, জী হ্যাঁ, খোদাবন্দ্! মখ্সূর লেকিন জিন্দা।

আকবর তাকে আদেশ করলেন, তাহলে ওকে আবার উঠিয়ে নিয়ে আয়। আবার ছুঁড়ে ফেল! না মরলে, আবার! যতক্ষণ না তুই এসে আমাকে বলতে পারিস্ : ম্যয়-নে বহ্ আধম খান্ সাব কো জান সে মার ডালা।

একটু পরেই প্রহরীরা আবার চ্যাঙদোলা করে নিয়ে এল হতভাগ্য সিপাহ্সালারকে। লোকটা মখ্সূর, অর্থাৎ মারাত্মকভাবে আহত, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি! দ্বিতীয়বার প্রাণভিক্ষা চাইবার মতো বাক-ক্ষমতা তার ছিল না। একইভাবে তার দোদুল্যমান দেহটা দুর্গ-প্রাকার থেকে নিক্ষিপ্ত হল রাজপথে। এবার পতন হয়েছে মাথা নিচু দিকে করে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আধম খাঁর মস্তিষ্ক!

আকবর পিছন ফিরেই মুখোমুখি হলেন তাঁর ধাইমার। এতক্ষণে দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন মাহম আঙ্গা। তিনি শুধু জেনেছেন, আৎকা খান নিহত এবং বাদ্শা স্বয়ং আততায়ীকে শাস্তি দিচ্ছেন। তিনি অনুমান করেছেন, স্থিতধী আকবর অপরাধীকে গ্রেফ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন মাত্র। মাহম আঙ্গাকে দেখে বাদ্শা শুধু বললেন, লোকটা আমার আৎকাকে (চীফ সেক্রেটারিকে) কর্তব্যরত অবস্থায় হত্যা করেছে। হক্ হকিয়ৎ ওকে ক্ষমা করতে পারে না।

মাহম শুধু বললেন, তুম্ নে ঠিকই কিয়া হ্যয়, বেটা!

জানতে পারলেন অনতিবিলম্বেই। অন্নজল ত্যাগ করলেন বৃদ্ধা। আকবরের সঙ্গে আর দেখা করেননি। আবুল ফজলের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত—তবু তিনি মনে মনেও আকবরকে অভিশাপ দেননি। একচল্লিশ দিনের দিন পুত্রশোকে কাতর অনশনরতা বৃদ্ধার সব যন্ত্রণার অবসান হল। সংবাদ পেয়ে শাহ্-য়েন-শাহ্ স্বয়ং উপস্থিত হলেন আগ্রা-শহরের অপর প্রান্তে বৃদ্ধার আবাসে। শববাহীরা তখন তাঁকে ধরাধরি করে বাহিরে আনছে। আকবর তাদের একজনকে সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং কাঁধ দিলেন। কে একজন অমাত্য সাহস করে বলল, আপনি কেন জহাঁপনা? আমরা তো আছিই।

সম্রাট বললেন, সে তোমরা বুঝবে না।

আৎকা আর আধম খাঁর জন্য দিল্লিতে মক্বারা বানিয়ে দিলেন সম্রাট—রাজকোষ থেকে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। আধম খাঁ মক্বারার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি; শুধু তখন উল্লেখ করতে ভুলেছি, ঐ অষ্টভুজাকৃতি ইমারতেই শায়িতা আছেন একজন ভগ্নহৃদয়া বৃদ্ধা—যিনি তোপের মুখ থেকে শিশু আকবরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলেন একদিন, যাঁর মরদেহ বহন করতে তামাম হিন্দুস্থানের শাহ্-য়েন-শাহ্কে তখ্ত-তাউস ছেড়ে নেমে আসতে হয় পথের ধূলায়।

গিয়াস্উদ্দীন গজনবী, আৎকা খান-এর মক্বারা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার উত্তর প্রান্তে। ছোট্ট মক্বারা। ভিতরটা মাত্র 6 মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার বড় বড় ইমারতের মাঝখানে একান্তবাসী ঐ ইমারতটা দেখলে মনে হয় যেন ধর্মভীরু একজন কেরানি আপন মনে দফ্তরে বসে কাজ করছে—'ডেবিট-ক্রেডিট' আর 'লেজার'-এর বাইরেও যে একটা দুনিয়া আছে তা ও জানে না। শর্মাজির ভাষায়, 'Although small in size, it is virtually a gem of architecture.'[8] (হোক

আকারে ছোট, এ একটি স্থাপত্য-রত্ন)।

গাইড আমাকে বলেছিল, লক্ষ্য করে দেখুন, এ ইমারতের পাথর সব লাল, আর তার মাঝে মাঝে ধপ্ধপে সাদা কী সুন্দর মার্বেলের কাজ! এমনটি আর কোনো বাড়িতে দেখতে পাবেন না গোটা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-চত্বরে।

তাই তো! কিন্তু কেন এই বিচিত্র পরিকল্পনা? গাইডকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে জবাব দিতে পারেনি। আমিও কোনো কারণ খুঁজে পাইনি।

আজ আবুল ফজলের প্রামাণিক ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে—তার মানে সম্রাট কি ভুলতে পারেননি সেই দৃশ্যটা? দফ্‌তরখানার শাহ্‌ন আৎকা খানের রক্তে লালে-লাল হয়ে গেছে! আর উবুড় হয়ে পড়ে থাকা হতভাগ্যের পিঠ থেকে উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে আততায়ীর ছুরির সেই ধপ্ধপে সাদা হাতির-দাঁতের মুঠ?